ইতিহাসের পাতা

(রচনাসঙ্কলন)

ইমরান রাইহান

www.itihaserpata.com

উৎসর্গ...

ইতিহাসের সেই মহানায়কদের প্রতি যাদের বীরত্বগাঁথা আমাদের চেতনার প্রদীপ। আল্লাহ্ তাআলা তাদের নেক কর্মের উত্তম বিনিময় দান করুক।

২০১৭ সাল থেকে অনলাইনে ইতিহাস বিষয়ে লেখার চেষ্টা করছি। প্রিয় বন্ধু হেমায়েত উল্লাহ অনেকবার বলেছিল লেখাগুলো একত্র করতে। নানা কারনে তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি খালেদ হাসান আরাফাত খান সবগুলো লেখা একত্র করেছে। প্রচুর সময় নিয়ে সে লেখাগুলো সাজিয়েছে। টীকা ঠিক করেছে। কোনো প্রশংসা বা স্তুতিই তার কর্মের প্রতিদান দিতে পারবে না।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিক।

ইমরান রাইহান

আজিমপুর, ঢাকা।

১৬-১-২০২০

প্রাককথন

হামদ ও সালাতের পর, প্রিয় পাঠক! আপনার সামনে উপস্থিত কাগজগুলো **লেখক ইমরান রায়হান** এর বিভিন্ন সময়ে লেখা ও ব্লগ (ইতিহাসের পাতায়) থাকা লেখা সমুহের সংকলন মাত্র। কিছু পাঠক যারা 'ইলেকট্রনিক ডিভাইসের' মাধ্যমে বড় কোন আর্টিকেল পড়তে পারেন না তাদের দিলি তামান্না থেকে এই সংকলনটি করা। আর এই কাজটি খুবই অল্প সময়ে ও অসতর্কতার সাথে করা হয়েছে ফলে রয়েছে নানান প্রকার ভুল। যার কারণে পূর্ব থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তবে আনন্দিত হবেন এই সামান্য প্রয়াসটুকু দেখেও, কেননা আর্টিকেলগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হলেও সংকলনের সময় দেয়া হয়েছে একে স্তরবিন্যাস। সূচিতে দেওয়া হয়েছে ক্যাটাগরি পদ্ধতি সাথে তার পৃষ্ঠাসংখ্যাও। যা অবশ্যই আপনার নয়ন জুড়াবে।
প্রত্যেকটি আর্টিকেলে রয়েছে একাধিক টিকা। এমনকি কিছু টিকা, টিকা আকারে না দিয়ে প্যারার সাথে 'ফাস্ট ব্রাকেট' এর মাধ্যমে দিয়ে দেয়া হয়েছে।
পাঠের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে দেখা যাবে _ইরা, ইমরান, অনুবাদক নানা শব্দের ব্যবহার সে লেখা গুলো সব লেখকের নিজের গবেষণা থেকে বলেছেন এবং উক্ত শব্দ ব্যবহার নিজের দিকে করেছেন।

প্রিয় পাঠক! এত অল্প সময়ে করা কাজে নানান ভুল থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষ করে একটি ভুল যা আমাদের নজরে পড়েছে সেটি হল_ আরবী ইবারত, আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে সেগুলো ভেঙে যাওয়া। ২য়, ভুল সহযোগী পুস্তক সমূহের তালিকা যোগ না করা যা যোগ করলে হয়তো আপনার জন্য অনেক উপকারী হতো তবে আমাদের এই অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

প্রিয় পাঠক! এখন হয়তো উক্ত pdf খানা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না (প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ কিছু কারণসমূহ)। তবে ইনশাআল্লাহ, একদিন প্রকাশ করা হবে তাও বই আকারে ততদিনের জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন

খালেদ হাসান
৩১-১-২০২০

ইতিহাস পাঠ ; এদিক সেদিক থেকে এলোপাথাড়ি অধ্যয়নের পরিবর্তে ঘড়ির কাঁটার মত এক প্রান্ত থেকে শুরু করুন। দেখতে দেখতে ঘড়ির মত তার অপর প্রান্তে এসে মিলে যাবে। আপনি জানতে পারবেন মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক ইতিহাস। দেখবেন প্রতিটি চরিত্র আপনার সাথে এসে মিতালী করবে।

সুচি...

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস

মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

মূল – রিয়াসত আলী নদভী (র.)
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ — ইমরান রাইহান

(মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে রিয়াসত আলী নদভী রচিত 'ইসলামি নেজামে তালিম' বইটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমৃদ্ধ। মূল বইটি অনুবাদ করা সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই আপাতত, মূল বইয়ের সারকথা অনুবাদ করে দিচ্ছি। এই লেখাটি বইয়ের হুবহু অনুবাদ নয়। শুধু বইয়ের মূল তথ্যগুলো অনুবাদ করেছি। কোথাও রেফারেন্স বা অতিরিক্ত তথ্য যোগ করতে হলে তা টীকায় সংযুক্ত করেছি। — ইমরান রাইহান)

- প্রারম্ভিকা

প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিন যুগে ভাগ করা যায়।

১। রাসুল ﷺএর যুগ থেকে উমাইয়া শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত।
২। উমাইয়া শাসনামলের শুরু থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দী।
৩। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে হিজরী অষ্টম শতাব্দী।

বৈশিষ্ট্য :

এবার এই যুগগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

প্রথম যুগ — এটি শুরু হয় রাসুল ﷺএর জীবদ্দশাতেই। সে সময় দারুল আরকামে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মাদরাসা। এরপর সুফফার মাদরাসা[১]। মসজিদে নববীতে সাহাবীদের এক জামাত কোরআন পড়তেন, অন্যরা শুনতেন। মদীনার বাহির থেকে যেসকল সাহাবী আসতেন তারা আনসারদের গৃহে থাকতেন। সুফফার মাদরাসায় পড়তেন। মুসলমানদের বিজয়ের ধারা শুরু হলে বিজিত অঞ্চলে শিক্ষক পাঠানো হতো সেখানকার লোকজনকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও এই ধারা চলতে থাকে। যেমন, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কে যখন বসরায় পাঠানো হয় তখন তার সাথে ইমরান বিন হুসাইন (রা.)

[১] সুফফা মাদরাসার শিক্ষাপদ্ধতী নিয়ে ডক্টর তাফসির আব্বাস 'দরগাহে সুফফা কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গেলেন বসরার মানুষদেরকে কোরআন ও শরিয়ত শিক্ষা দিতে। হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা.) হিমসে লোকজনকে কোরআন শিক্ষা দিতেন।

হজরত মুয়াজ বিন জাবাল যান ফিলিস্তিনে। হযরত আবু দারদা (রা.) দামেশকে গমন করে মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তারা নিয়মতান্ত্রিক দরস দিতেন। হযরত আবু দারদা (রা.) যখন দামেশকের শাহী মসজিদে দরস দিতেন তখন এত মানুষের ভীড় হত, মনে হত কোনো বাদশাহ আগমন করেছেন।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানেই তারা হাদিসের দরস দিতেন। যেমন – হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) দরস দিতেন মসজিদে নববীতে। হযরত হুযাইফা বিন ইসহাক (রা.) দরস দিতেন কুফার মসজিদে [২]।

এ যুগের দরসগাহের বৈশিষ্ট্য ছিল-

১। কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মধ্যেই পাঠ্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য কোনো বিষয় পড়ানো হতো না।

২। কোনো পাঠ্যপুস্তক ছিল না। পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বলা ও শোনা নির্ভর।

৩। শিক্ষাদানের জন্য কোনো বেতন-ভাতা আদান-প্রদান করা হতো না।

৪। মসজিদগুলোই ছিল মাদরাসা। মসজিদেই দরস দেয়া হতো। মাদরাসার আলাদা কোনো অবকাঠামো ছিল না।

৫। হাদিস অন্বেষণে সফর করা হতো। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের কাছ থেকে হাদিস শোনার জন্য অনেকদূর সফর করতেন[৩]।

৬। শিক্ষক যদি টের পেতেন ছাত্র দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করতে চাচ্ছে, তাহলে তার কাছে হাদিস বর্ননা করতেন না।

দ্বিতীয় যুগ – এ যুগের শুরু হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয (র.) এর সময়কাল (রাজত্বকাল- ২২ সেপ্টেম্বর ৭১৭ – ৪ ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে। তিনি ইলমের প্রচার প্রসারে জোর দেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণ করেন। সে সময় বিভিন্ন ভাষা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের কাজও শুরু হয়।

---

[২] সাহাবায়ে কেরামের দরসগাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন কাজি আতহার মোবারকপুরী লিখিত 'খাইরুল কুরুন কি দরসগাহে আওর উনকা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত' বইটি।

[৩] সহীহ বুখারীর ইলম অধ্যায়ে বর্নিত আছ, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য এক মাস সফর করে হযরত আবদুল্লাহ বিন উনাইসের (রা.) কাছে যান। এ সম্পর্কে আরো বর্ননা পেতে দেখুন খতিব বাগদাদী লিখিত 'আর রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস' গ্রন্থটি।

একইসাথে পাঠ্যক্রমে কোরআন, হাদিস, ফিকহ, মাগাজি, সিয়ার, তারিখ, আদব, নাহু, সরফ, ফালসাফা, মানতেক ইত্যাদী বিষয় সংযুক্ত হয়।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল-

১। ইলম লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

২। সংকলন, অনুবাদ, লেখালেখির ধারা চলতে থাকে।

৩। ছাত্র শিক্ষকের ভাতা নির্ধারণ হয়।

৪। মসজিদে পড়াশোনার জন্য পৃথক স্থান নির্ধারিত হয়।

৫। পাঠদানের কাজ চলতো মসজিদেই। অনেক সময় পাঠদানের জন্যই নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হতো।

৬। এই সময়ে বিভিন্ন কিতাব পড়ার ও শোনার সনদ প্রদানের রীতি শুরু হয়।

৭। শিক্ষকরা অন্যের লিখিত কিতাব পড়াতেন। আবার কখনো কখনো নিজের লিখিত কিতাবও পড়াতেন।

তৃতীয় যুগ – এই যুগে মসজিদের বাইরে আলাদা ইমারত নির্মানের প্রবণতা শুরু হয়। মসজিদেও দরস দেয়া হতো। একইসাথে আলাদাভাবে মাদরাসার অবকাঠামো নির্মানের কাজও চলতে থাকে। ছাত্র শিক্ষকদের থাকা-খাওয়া ও পোষাকের ব্যবস্থা করা হতো।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য

১। মাদরাসার জন্য নিজস্ব ভবন নির্মান শুরু হয়।

২। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও মাদরাসা নির্মান করা হয়। সামাজিক দৃষ্টিতে এটা ছিল সম্মানের কাজ। আমিররা এ কাজে আগ্রহের সাথে এগিয়ে আসতেন।

৩। পড়া এবং পড়ানো ছিল সম্মানের কাজ। রাজকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সময় পেলেই পড়াতেন কিংবা কারো দরসে বসতেন।

৪। পৃথক পৃথক শাস্ত্রের জন্য পৃথক পৃথক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

৫। নানা পাঠ্যক্রম প্রনয়ণ হয়। একইসাথে পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের ধারাও চলতে থাকে।

আল্লামা ইবনে খাল্লিকানের মতে, জামিয়া নিজামিয়া বাগদাদ ছিল মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদরাসা (প্রতিষ্ঠাকাল ১০৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। তবে আল্লামা তকিউদ্দিন আস সুবকি লিখেছেন, এটি প্রথম মাদরাসা নয়। এর আগে নিশাপুরে

মাদরাসা বাইহাকিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মাহমুদ গযনবীর ভাই নাসির বিন সুবক্তগিনও সায়িদিয়্যাহ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন[৪]।
ভারতবর্ষে প্রথম মাদরাসা নির্মান করেন নাসিরুদ্দিন কুবাচাহ। তিনি মুলতানে মাওলানা কুতুবুদ্দিন কাশানির জন্য একটি মাদরাসা নির্মান করেন।[৫]

এই মাদরাসাতেই শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী লেখাপড়া করেন। আল্লামা মাকরেজি মিসরে প্রতিষ্ঠিত অনেক মাদরাসার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন তিনি লিখেছেন ৬৫৪ হিজরীতে বাহাউদ্দিন আলি বিন মুহাম্মদ বিন সালিম মিসরে একটি বৃহৎ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

এবার মাদরাসার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক –

১। মক্তব/মাকাতিব- এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো।
২। মাদারিসে আম্মাহ- শরয়ী ইলম, আদব, আকলি ইলম এগুলো পড়ানো হতো।
৩। মাদারিসে কুরআন- এসব মাদরাসা শুধুমাত্র কুরআনুল কারিমের দরসের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হতো। ওয়াসিত শহরে এমন একটি মাদরাসা ছিল।

---

[৪] তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল কুবরা, ৪য় খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা– আল্লামা তাজ উদ্দিন আস সুবকী। দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা। এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মতামত উদ্ধৃত করা হল-
ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় (আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী।) বিখ্যাত ভূগোলবিদ মাকদেসী হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তার লেখাতেও দেখা যায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মসজিদেই দরস দেয়া হতো (আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, পৃষ্ঠা ২০৫– আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ মাকদেসী। দার সাদের, বৈরুত)।
ড. নাজি মারুফের অনুসন্ধান মতে জামেয়া নিজামিয়া নিশাপুর , জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের ৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় (মাদারিসুন কবলান নিজামিয়্যা — ড. নাজী মারুফ। প্রবন্ধটি অনলাইনে আছে)। ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে সর্বপ্রথম নিশাপুরের মাদ্রাসা বাইহাকিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হয় (আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী)। জালালুদ্দিন সুয়ুতী লিখেছেন ৪০০ হিজরীতে মিসরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয় (হুসনুল মুহাজারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহেরা, ২য় খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা– আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী)।
ঐতিহাসিক কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন ৪ ১০ হিজরীতে মাথুরায় সুলতান মাহমুদ গজনভী একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন (তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা– আবুল কাসেম অস্ত্রাবাদী। নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ)।

[৫] অবশ্য হিন্দুস্তান কি কদিম ইসলামি দরসগাহে বইয়ের লেখকের অনুসন্ধান মতে ভারতবর্ষে প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আজমীরে, মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয়ের পর।

৪। দারুল হাদিস- শুধুমাত্র হাদিস পড়ানোর জন্য এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হতো। সুলতান নুরুদ্দিন জেংগি দামেশকে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন। আল কামিল নাসিরুদ্দিন কায়রোতে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। মাদারিসে ফিকহ- এসব মাদরাসায় ফিকহ পড়ানো হতো। কখনো শুধু নির্দিষ্ট একটি মাজহাবের ফিকহ পড়ানো হতো। আবার কখনো সকল মাজহাবের ফিকহই পড়ানো হতো। দামেশক, হালাব, মিসরে এমন অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি 'হুসনুল মুহাজারা' গ্রন্থে এবং আল্লামা মাকরেজি 'আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার' গ্রন্থে এমন অনেক মাদরাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

৬। মাদারিসে তিব্বিয়া- চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানোর জন্য পৃথক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হতো। আবার কখনো মাদরাসাতেই চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো হতো। হাসপাতালে থাকতো বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বাগদাদ ও কায়রোতে এমন অনেক মাদরাসা ছিল।[৬]

মাদরাসার পাশাপাশি মসজিদেও দরসের ব্যবস্থা চালু ছিল। অনেকে শুধু সপ্তাহে একদিন দরস দিতেন। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, শায়খ আবু বকর সাজ্জাদ জামে মানসুরে প্রতি শুক্রবার দরস দিতেন। জুমার সালাতের পূর্বে তিনি ফতোয়া দিতেন। সালাতের পর বয়ান করতেন এবং ইমলা [৭]করাতেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

---

[৬] এ বিষয়ে আরো জানতে দেখুন ড. মুস্তফা আস সিবায়ী রচিত 'মিন রাওয়াইউ হাদারাতিনা"।

[৭] ইমলা ছিল এক ধরণের বিশেষ মজলিসের নাম। এই পদ্ধতীতে শিক্ষক পড়াতে বসতেন, তার পাশে বসতো খাতা-কলম হাতে ছাত্ররা। শিক্ষক তার স্মৃতিশক্তি থেকে বলতে থাকতেন, ছাত্ররা তা লিখে ফেলতো। পরে এই কথাগুলোই স্বতন্ত্র পুস্তকের আকার ধারণ করতো। একে বলা হতো আমালি। আমালি ইবনে দুরাইদ এমনই এক গ্রন্থ। মজলিসে ছাত্র অতিরিক্ত হয়ে গেলে উস্তাদের ডানে বামে আরো ছাত্র দাঁড়িয়ে যেত। তারা উস্তাদের কথাগুলো হুবহু নকল করে দুরের লোকদের শুনিয়ে দিত। এদেরকে বলা হতো মুস্তামলি। ইমলার এই পদ্ধতি মুহাদ্দিসের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ইমাম মালেক, শু'বা, ইমাম দারা কুতনি, ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ি প্রমুখের ইমলার মজলিস ছিল বিখ্যাত। তবে ধীরে ধীরে ইমলার পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে হাফেজ যাইনুদ্দিন ইরাকি আবারও ইমলা চালু করেন। তিনি প্রায় চারশো ইমলার মজলিস করেন। তার দেখাদেখি তার ছাত্র হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি ও আল্লামা সাখাভীও এমন কিছু দরস দেন। তাদের পরেই এই ধারা সমাপ্ত হয়ে যায়। পরে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী ইমলার মজলসি করতে চেয়েও লোকদের অনাগ্রহ আর উদাসিনতার কারনে করতে পারেননি। (মাকালাতে শিবলী, ৩য় খন্ড –আল্লামা শিবলী নোমানী। দারুল মুসান্নেফিন,আযমগড়)।
এ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন আবু সাদ আব্দুল করিম বিন মুহাম্মদ সামআনি (মৃত্যু ৫৬২ হিজরী) লিখিত 'আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা' গ্রন্থটি।

আলেমদের দরসে প্রচুর লোক সমাগম হতো। আবুল হাসান আলি বিন আসেম ওয়াসেতির দরসে ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ হতো। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*
ইয়াজিদ বিন হারুনের দরসে আশি হাজারের মত মানুষ বসতো। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

বসরার মসজিদে ইমাম বুখারী ইমলার মজলিস চালু করলে এক হাজারের বেশি মুহাদ্দিস, ফকিহ ও হুফফাজ উপস্থিত হন। মুহাদ্দিস আসেম বিন আলি বাগদাদ এলে শহরের বাইরে হাদিসের দরস দেন। খলিফা হারুনুর রশিদ সেই মজলিসে উপস্থিত হন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

এসব মাদরাসার জন্য প্রচুর ওয়াকফের ব্যবস্থা থাকতো। বাগদাদের জামিয়া মুস্তানসিরিয়ার জন্য যে সম্পদ ওয়াকফ করা হয় তা থেকে বার্ষিক আমদানী ছিল সত্তর হাজার মিসকাল স্বর্ণ। বাগদাদ শহর সম্পর্কে বিখ্যাত পর্যটক ইবনু যুবাইর লিখেছেন, এখানে ত্রিশটি মাদরাসা আছে। প্রতিটি মাদরাসার ইমারত অত্যন্ত সুন্দর। প্রতিটি মাদরাসার জন্য নিজস্ব ওয়াকফের ব্যবস্থা আছে। এই ওয়াকফ থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যয় বহন করা হয়। *(রিহলাহ)*

হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করার এই ধারা চালু ছিল। অনেক সময় ওয়াকফকারী কিছু শর্ত আরোপ করতেন। যেমন তার ওয়াকফ থেকে শুধু হানাফি ছাত্রদেরকেই ভাতা দেয়া হবে। মিসরে শাফেয়ী ও হানাফিদের এমন অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসা খুরুরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বদরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ খুরুবি শর্ত দেন তার ওয়াকফ থেকে কোনো অনারব ছাত্রকে ভাতা দেয়া যাবে না।

মাদরাসা নির্মান শুরু হওয়ার আগে ছাত্র-উস্তাদ সবাই মসজিদের কুঠুরিতে ঘুমাতেন। মাদরাসার জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ শুরু হলে সেখানেই ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা হত। জামেয়া মুস্তানসিরিয়া সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন, মাদরাসার প্রাংগনে একটি হাসপাতাল ছিল। মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে ২৪৮ জন ছাত্র ভর্তি হয়। তাদের থাকা-খাওয়া, এমনকি কাগজ-কলমও মাওদ্রাসা থেকে দেয়া হত। সাধারণ খাবার ছাড়াও প্রায় সময় ফিরনি দেয়া হত। ছাত্রদের মাসিক ভাতা ছিল এক আশরাফী।

ইবনে বতুতা ওয়াসিতের একটি মাদরাসার কথা লিখেছেন। সেখানে তকিউদ্দিন নামে একজন আলেম নিজ খরচে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন সেই মাদরাসায় প্রায় তিনশো কামরা ছিল।

ভারতবর্ষের মাদরাসাগুলিতেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ইবনে বতুতা ৮৩৪ হিজরীতে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি সিন্ধের একটি মাদরাসার কথা লিখেছেন।

তিনি এই মাদরাসায় এক রাত ছিলেন। গ্রীষ্মকাল ছিল তাই তিনি ছাত্রাবাসের ছাদে ঘুমিয়েছেন। দিল্লির মাদরাসা ফিরোজশাহী সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী লিখেছেন, আদিল শাহ শাহী মাদরাসার ছাত্রদের জন্য দারুল ইকামার ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে প্রতিদিন খাবার দেয়া হত। পড়ার জন্য কিতাব দেয়া হত। মাসিক ভাতা দেয়া হত।

এ সকল ভবনে উস্তাদরাও থাকতেন। তারা ছাত্রদের পড়াশোনার দিকে খেয়াল রাখতেন। তাদের স্বভাব চরিত্র গঠনে কাজ করতেন। নিজেরা এমনভাবে চলাফেরা করতেন, যেন তাদের আখলাক দেখেই ছাত্ররা নিজেদের বদলে নেয়। সাধারণত উস্তাদরা থাকতেন নিচতলায়। ছাত্ররা থাকত দোতলায়।

উস্তাদরা এমনভাবে চলাফেরা করতেন, তাদেরকে ছাত্ররা শ্রদ্ধাও করতো আবার উপকৃতও হতো। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া উস্তাদরা নিজের কামরা থেকে বের হতেন না। সবসময় সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করতেন। মুস্তাহাব আমল করার প্রতিও তারা সচেষ্ট ছিলেন। দরসের সময় ছাড়াও আলাদা সময় নির্ধারিত ছিল। সে সময় ছাত্ররা এসে পড়া সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলাপ করতে পারতো। উস্তাদদের অনেকে রাতের বেলাতেও পড়াতেন। যেমন ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানী রাতের বেলা সিসিলি বিজেতা আসাদ ইবনুল ফুরাতকে পড়াতেন।

ছাত্রদের জন্য কিছু নিয়ম ছিল, যেমন –

১। কমবয়সী ছাত্রদেরকে অভিবাবক ছাড়া দারুল ইকামায় অবস্থানের অনুমতি দেয়া হত না।

২। বিনা প্রয়োজনে দারুল ইকামার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

৩। অপরিচিত লোকজনকে দারুল ইকামায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হত না।

৪। ছাত্র, উস্তাদ ও কর্মচারী ব্যতিত আর কারো রাতের বেলা মাদরাসায় অবস্থানের অনুমতি ছিল না।

৫। শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল।

৬। শিক্ষকদের সাথে দেখা করার সময় আদবের দিকে খেয়াল রাখতে হত।

৭। দরসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হত।

৮। হাসি-ঠাট্টা ও গল্পগুজব করা নিষেধ ছিল।

মাদরাসার কুতুবখানা

মাদরাসার সাথে নিজস্ব কুতুবখানাও নির্মাণ করা হত। ছাত্র উস্তাদ সকলেই এটি ব্যবহার করতো। জামিয়া মুস্তানসিরিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে শাহী কুতুবখানা থেকে একশো ষাট উট ভর্তি কিতাব পাঠানো হয় মাদরাসার কুতুবখানার জন্য। আল

হাকেম মিসরে দারুল হিকমাহ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা সম্পর্কে আল্লামা মাকরেজি লিখেছেন, এই মাদরাসায় আমিরুল মুমেনিনের পক্ষ থেকে এতবেশি কিতাব পাঠানো হয়, যা আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এই কুতুবখানা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। কেউ কিতাব পড়তে আসতো, কেউ আসতো অনুলিপি তৈরী করতে। অনেকে আবার পড়ার জন্য বই নিয়ে যেত। এই কুতুবখানায় কাগজ, কলম ও দোয়াত পাওয়া যেত। মাদরাসা নাসিরিয়াতেও একটি বিশাল কুতুবখানা ছিল।[৮]

বসার স্থান প্রতিটি হলে উস্তাদদের বসার জন্য আলাদা স্থান নির্মান করা হত। ইবনে বতুতা জামিয়া মুস্তানসিরিয়া সম্পর্কে লিখেছেন, এখানে চার মাজহাবের ছাত্রদেরকেই পড়ানো হয়। সবার জন্য আলাদা আলাদা দরসগাহ (ক্লাসরুম)। উস্তাদদের জন্য কাঠের উপর বিছানা পাতা থাকে।

পোষাক

শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পোষাক থাকতো। জামিয়া মুস্তানসিরিয়ার শিক্ষকরা কালো আবা ও পাগড়ি পরতেন। দরসের সময় এ পোষাক পরা বাধ্যতামূলক ছিল।

শিক্ষক নির্বাচন

শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো অনেক যাচাই-বাছাই করে। জামিয়া নিজামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুলক বলখের একটি গ্রামে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি একজন আলেমের খ্যাতি শুনে তার সাথে দেখা করেন। পরে তাকে বাগদাদ নিয়ে আসেন এবং জামিয়া নিজামিয়াতে নিয়োগ দেন। নিজে তার কাছে সুনানে আবু দাউদ পড়েন। এই আলেমের নাম হাফেজ আবু আলি হাসান বিন আলি দাখশি।

বেতন-ভাতা

উস্তাদদেরকে বেতন দেয়া হতো। তবে অনেকে বেতন গ্রহণ করতেন না। তারা উপার্জনের জন্য অন্য মাধ্যম খুঁজে নিতেন।

দরসে উস্তাদদেরকে সাহায্য করার জন্য থাকতেন মুয়িদ। তার কাজ ছিল উস্তাদদের আলোচনা আবার ছাত্রদের বুঝিয়ে দেয়া। ইবনে বতুতা লিখেছেন, উস্তাদদের দুপাশে দুজন মুয়িদ থাকেন। মর্যাদার দিক থেকে এদের অবস্থান হলো ছাত্র-

---

[৮] মাদরাসার সাথে সংযুক্ত অন্যান্য কুতুবখানাগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন ডক্টর শাবান আবদুল আজিজ খলিফা লিখিত ‘আল কুতুব ওয়াল মাকতাবাত ফিল উসুরিল উসতা’, সাইয়েদ নাশশার লিখিত ‘তারিখুল মাকতাবাত ফি মিসর- আল আসরুল মামলুকি’, ডক্টর ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরি লিখিত ‘আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা’।

উস্তাদের মাঝামাঝি। তারা মাদরাসাতেই অবস্থান করেন। দরসের পর ছাত্ররা কোনো পড়া ভুলে গেলে তারা তা মনে করিয়ে দেন।
হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত মাদরাসায় মুয়িদের পদ অবশিষ্ট ছিল। আরেকটি পদ ছিল নকীবে দরস। তার কাজ ছিল ছাত্রদেরকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী আসনে বসানো। এছাড়া কেউ দরসের মাঝে কথা বলে উঠলে সে তাদের ইশারায় চুপ করাতো।

শিশুদের শিক্ষা

শিশুদের অল্পবয়সেই শিক্ষা শুরু হত। ভারতবর্ষে মুঘল আমলে ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে বাচ্চাদের পড়ালেখা শুরু করার নিয়ম ছিল। খতীব বাগদাদি বলেন, আমি এগারো বছর বয়সে হাদিস শ্রবণ শুরু করি। [৯]

ছাত্রদের জন্য বয়সের কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না। যখন যার সুযোগ হতো পড়াশোনা শুরু করতেন।

অনেকে লেখাপড়া শেষ করেও উস্তাদের কাছে দীর্ঘদিন থেকে যেতেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, আবদুল্লাহ বিন ওহাব মালেকি ছিলেন মিসরে ইমাম মালেকের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ২০ বছর ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে ছিলেন।

আবু ইসহাক সিরাজি তার উস্তাদ গাজি আবুত তিবের কাছে টানা ১০ বছর অবস্থান করেন। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী তার উস্তাদ শায়খ আবুল হোসাইন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব নিশাপুরির কাছে ২০ বছর অবস্থান করেন।

ইবনে মাগরেবি বলেন, আমি ইবনে হাজমের কাছে ৭ বছর অবস্থান করি এবং তার সকল লেখা পড়ে ফেলি। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

পুরো শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করতে কত বছর লাগতো তার সঠিক কোনো পরিমাপ নেই। ইবনে খালদুন লিখেছেন, মরক্কোতে পড়ালেখা শেষ করতে ১৬ বছর ব্যয় হয়। আবার তিউনিসে এই সময় ৫ বছর।

মাদরাসায় তীরন্দাযি ও ঘোড়দৌড় এসবও শেখানো হত। ইমাম শাফেয়ী ১০ টি তীর নিক্ষেপ করলে একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

ইমাম বুখারী প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে খোলা ময়দানে বের হতেন এবং তীর নিক্ষেপ করতেন। *(ফাতহুল বারীর ভূমিকা)*

---

[৯] মুসলিম শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে ডক্টর শাবান আইয়ুব একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটির নাম 'কাইফা রব্বাল মুসলিমুনা আবনাআহুম'। কেউ আগ্রহী হলে দেখে নিতে পারেন।

[১০]উলামাগন বিকালে হাটতে বের হতেন। মুক্ত বাতাসে তাদের ক্লান্তি দূর হত। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, আবু নসর ফারাবি দামেশকে অবস্থানের সময় বাগানে বসেই লেখালেখি করতেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন, কওয়ামুদ্দিন কিরমানির কথা। তিনি জামে আজহারে দরস দিতেন। আসরের পর খোলা প্রকৃতিতে হাটতে বের হতেন।

ইমাম ইবনে খুজাইমা ৩০৯ হিজরীতে তার বাগানে আলেমদের দাওয়াত দেন। শহরের সব মুহাদ্দিস ও ছাত্ররা উপস্থিত হন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*
ছাত্রদেরকে শাসনের ক্ষেত্রে কঠোরতা করা হতো না। নম্রভাবে শাসন করা হত। কিন্তু কারো অপরাধ গুরুতর হলে কিংবা সেই অপরাধের প্রভাব অন্যদের মধ্যে ছড়ানোর আশংকা থাকলে কঠোর শাস্তি দেয়া হত। ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, একবার কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত দরস দিচ্ছিলেন।
রুইয়াতে বারি তাআলা' মাসআলা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। দরসে একজন ছাত্র সুলাইমান মুতাজেলিও উপস্থিত ছিল। সে এটি অস্বীকার করে এবং আবোলতাবোল প্রশ্ন করে। তখন আসাদ ইবনুল ফুরাত তাকে প্রহার করেন। *(তারিখে সকলিয়্যাহ)*

এসব মাদরাসায় বার্ষিক পরীক্ষা হতো কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তবে বিজাপুরে আদেল শাহি মাদরাসায় বার্ষিক পরীক্ষা হত এবং ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হত। বেশিরভাগ মাদরাসায় শুক্রবার ও মংগলবার বন্ধ দেয়া হত। এই দুদিন ছাত্ররা বিভিন্ন কিতাবের প্রতিলিপি প্রস্তুত করতো। মৌসুমী ছুটির ব্যবস্থা ছিল কিনা সে ব্যাপারে তথ্য নেই তবে কাজি ইবনে জুমআ প্রচন্ড গরমে ও শীতকালে দরস দিতে নিষেধ করেছেন। *(তাজকিরাতুস সামি ওয়াল মুতাকাল্লিম)*
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের মতই। তবে দরসগাহে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা হত। ইমাম মালিকের দরসগাহ সম্পর্কে কুতাইবা বলেছেন, ইমাম মালিকের দরসগাহ ছিল ভাবগাম্ভীর্যপূর্ন। ইলম ও প্রজ্ঞার মজলিস। কোনো হৈ চৈ করা হত না।

---

[১০] উলামায়ে কেরামের শরীরচর্চার আরো কিছু বর্ননা পেতে দেখুন নবাব সদরে ইয়ার জং হাবিবুর রহমান শেরওয়ানি রচিত 'উলামায়ে সালাফ'।

ছাত্র অসুস্থ হলে উস্তাদরা দেখতে যেতেন। কেউ ভুল করলে ইশারায় সতর্ক করতেন। এতেও সতর্ক না হলে সরাসরি বলতেন। বিদায়ের সময় অসিয়তবানী লিখে দিতেন। এই অসিয়তবানী অনেক সময় কিতাবাকারে প্রকাশিত হত।
কাজি ইবনে জুমআ লিখেছেন, কোনো ছাত্র উপস্থিত না হলে উস্তাদের জন্য আবশ্যক তার অনুপস্থিতির কারন জানা। সম্ভব হলে উস্তাদ নিজে তার কাছে যাবে।
কাজি আবু ইউসুফ বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফার কাছে হাদিস ও ফিকহ পড়তাম। সে সময় আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। আমার পিতা আমাকে বললেন, আবু হানিফার দরসে বসার দরকার নেই। তিনি ধনী মানুষ। তিনি এসব পারবেন। আমরা দরিদ্র। আমাদেরকে আয় রোজগার করতে হবে। পিতার কথায় আমি কয়েকদিন দরসে গেলাম না।
পরে দরসে গেলে উস্তাদ আমাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব বললাম। দরস শেষে সবাই চলে গেল। উস্তাদ আমাকে বসতে বললেন। তিনি আমার হাতে ১০০ দিরহাম দিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও খরচ করো। শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। আবার দিব। আর কখনো দরসে অনুপস্থিত থেকো না। *(ওফায়াতুল আইয়ান)*

ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা অনুভব করা যায় খতীব বাগদাদির ঘটনা থেকেও। তিনি দামেশকের শাহী মসজিদে দরস দিতেন। আবু জাকারিয়া তাবরেযি তার কাছে আদব পড়তেন। তিনি মসজিদের মিনারের উপর একটি কক্ষে থাকতেন। একবার ছুটির দিনে খতীব বাগদাদি তার সাথে দেখা করতে আসেন।
তিনি বলেন, তোমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হলো। তাই আসলাম। এরপর কিছুক্ষণ থেকে চলে যাওয়ার সময় তিনি ছাত্রকে ৫ দিনার হাদিয়া দিলেন। বললেন, এটা দিয়ে কলম কিনবে। এর পরেও কয়েকবার তিনি এসেছিলেন ছাত্রের সাথে দেখা করতে। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

সিসিলি বিজেতা আসাদ ইবনুল ফুরাত বলেন, একদিন আমি ইমাম মুহাম্মদের দরসে বসা ছিলাম। রাস্তায় পানিওয়ালা আসার শব্দ শুনে উঠে গেলাম। পানি পান করে ফিরে এলে ইমাম মুহাম্মদ বললেন, তুমি রাস্তার পানি পান করো? আমি বললাম, আমি নিজেই তো রাস্তার ছেলে (এতীম)। রাতের বেলা আমার কাছে ইমাম মুহাম্মদের খাদেম আসলেন। তিনি আমাকে ৮০ আশরাফী দিয়ে বললেন, ইমাম মুহাম্মদ জানতেন না আপনি এতিম। এগুলো দিয়ে নিজের প্রয়োজন সারুন। *(মাআলিমুল ঈমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরাওয়ান)*

কোনো ছাত্র পেরেশানিতে থাকলে উস্তাদরা তার পাশে দাড়াতেন। শায়খ আবু ওয়াদ্দার স্ত্রী মারা গেলে তিনি পেরেশানির কারনে কয়েকদিন দরসে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি দরসে উপস্থিত হলে তার উস্তাদ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব তাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করেন।

কারণ জেনে তিনি আফসোস করেন এবং ছাত্রকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলেন। আবু ওয়াদ্দা বলেন তার মোহর আদায়ের সামর্থ্য নেই। অল্প কিছু দিরহাম আছে। এই কথা শুনে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সেই সামান্য দিরহামে সেই মজলিসেই নিজের মেয়ের সাথে আবু ওয়াদ্দার বিয়ে পড়িয়ে দেন। সন্ধ্যায় তিনি মেয়েকে আবু ওয়াদ্দর গৃহে দিয়ে আসেন।

তিনি বলেন, আমি চাই না বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকুক। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের এই কন্যা ছিলেন আলেমা। হাদিস শাস্ত্রেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। তার গুনে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন যুবরাজ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সাঈদ সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। *(ওফায়াতুল আইয়ান)*

মুজাকারা/আলোচনা

ইলমের মুজাকারা ছিল আলেমদের প্রিয় বিষয়। আলি বিন হাসান বিন শাকিক এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক একরাতে ইশার সালাতের পর বাড়ি ফিরছিলেন। শীতের মৌসুম ছিল। চারপাশে ঘন কুয়াশা। তারা মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এই আলোচনাতেই তাদের সারারাত কেটে যায়। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

উলামায়ে কেরাম কোনো শহরে গেলে সেখানকার আলেমরাও তাদের কাছে আসতেন। তাদের মজলিসে বসতেন। আবু আলি নিশাপুরী বাগদাদ গমন করলে সেখানকার বিখ্যাত আলেমরা যেমন আবু ইসহাক বিন হামযা, আবু তালিব বিন নসর প্রমুখ উপস্থিত হন। তাকে হাদিসের দরস দিতে অনুরোধ করেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

মুনাজারা/বিতর্কসভা

সেকালে মুনাজারার ব্যাপক প্রচলন ছিল। উস্তাদ-ছাত্র সবাইই এতে অংশগ্রহণ করতো। উলুমুল হাদিস, ফিকহ, কালাম, আদব নানা বিষয়ে এসব বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। আমির কিংবা খলিফাও অনেক সময় এসব মজলিসে উপস্থিত হতেন।

ইলমের জন্য সফর করা

ইলমের জন্য সফর করা সাহাবিদের যুগ থেকেই শুরু হয়। তারা একেকটি হাদিস সংগ্রহের জন্য শাম থেকে মিসর, হেজাজ থেকে শাম সফর করেন। তাবেয়ীদের সময় এই সফর আরো বেড়ে যায়। আবু হাতেম রাজি বলেন, আমি সাত বছর সফর করি। এ সময় আমি এক হাজার ফারসাখের[১১] বেশি পথ অতিক্রম করি।
তারপর ফারসাখের হিসেব করা ছেড়ে দেই। আমি পায়ে হেটে মিসর থেকে বাহরাইন সফর করি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে রামাল্লা আসি। সেখান থেকে তরতুস। এভাবে আমার বিশ বছর কেটে যায় ইলমের জন্য সফর করে। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

ইমাম বুখারী ষোলো বছর বয়সে নিজ এলাকার উস্তাদদের কাছে পড়াশোনা শেষ করে সফর শুরু করেন। বলখ, বাগদাদ, বসরা, শাম, আসকালান, দামেশক এসব এলাকায় সফর করে ইলম অর্জন করেন। ইমাম দারেমি হারামাইন, মিসর, খোরাসান, শাম, ইরাক এসব অঞ্চলে সফর করে ইলম অর্জন করেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

হাফেজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম ইলমের জন্য ইস্ফাহান, বাগদাদ, মোসুল, আসকালান, কুফা, তুসতর, বাইতুল মাকদিস, দামেশক, বৈরুত, রামাল্লা, ওয়াসিত, আসকার, হিমস, বাক্কা, মিসর এসব এলাকা সফর করেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

হাফেজ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ রাজি ছিলেন জন্মান্ধ। তবু তিনি ইলম অন্বেষনের জন্য বুখারা, নিশাপুর, বাগদাদ ও বলখে সফর করেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

হাফেজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ ১২০টি স্থানের নাম বলেন যেখানে তিনি ইলমের জন্য সফর করেছিলেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*
ইমাম শাবী বলেন, যদি কেউ হেকমত শেখার জন্য শামের একমাথা থেকে ইয়ামানের অন্য মাথায় সফর করে তাহলে তার এই সফর বৃথা যায়নি।

ইলমের জন্য কষ্ট সহ্য করা

ইলমের পথে নানা বাধা-বিপত্তি আসলেও ছাত্ররা এই পথ ছাড়তেন না। আবু নসর ফারাবি রাতে পড়ার জন্য তেল পেতেন না। তাই তিনি চৌকিদারদের পাশে বসে

---

[১১] দূরত্ব পরিমাপের একটি একক। এক ফারসাখ= তিন মাইল। (তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ, ১৮২৩ পৃষ্ঠা)

তাদের প্রদীপের আলোয় পড়তেন। আবুল আলা হামদানি রাতের বেলা মসজিদের বাতীর আলোতে পড়তেন।[১২]

বেশিরভাগ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা কম খেতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি ষোলো বছর ধরে পেট ভরে খাবার খাইনি। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তারা কম ঘুমাতেন। ইমাম মুহাম্মদ রাতের পর রাত জেগে থাকতেন।

একবার তিনি আসাদ ইবনুল ফুরাতকে জাগানোর জন্য তার চেহারায় পানি মারেন। সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন খুবই সতর্ক। যে কোনো মানুষের সান্নিধ্যও তারা গ্রহণ করতেন না। দুজন কোথাও একত্রিত হলেই ইলমের আলোচনা শুরু করতেন। বইকে তারা খুব সম্মান করতেন। এর উপর তারা অন্যকিছু রাখতেন না। হাতে অর্থ এলেই তারা কিতাব সংগ্রহ করতেন। কারো দ্বারা অনুলিপি তৈরি করতেন। দরিদ্র হলে নিজেই অনুলিপি তৈরী করতেন।

এ সময় তারা কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতেন

১। হাতের লেখা সুন্দর বা পৃষ্ঠার অলংকরণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতেন না। শুধু স্পষ্টাক্ষরে লিখে যেতেন।

২। তারা লাল কালিতে লিখতে পছন্দ করতেন না।

৩। ধর্মীয় বইপত্র লেখার সময় অনেক সতর্ক থাকতেন। অযু করে নিতেন। আল্লাহ তাআলার নামের সাথে সম্মানসূচক তাআলা, সুবহানাহু, ও আযযা ওয়া জাল্লা ইত্যাদী লিখতেন। রাসুল ﷺ এর নামের সাথে দরুদ লিখতেন। সাহাবিদের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহু, সালাফদের নামের সাথে রহিমাহুল্লাহ লিখতেন।

শিক্ষকের সম্মান

ছাত্ররা শিক্ষককে খুবই সম্মান করতেন। শো'বা বলেন, আমি যার কাছ থেকে একটি হাদিস শুনেছি সারাজীবন আমি তার গোলাম। রবিআ বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীর সামনে আদবের কারনে পানি পান করার সাহসও করিনি।

দরসগাহের বিবরণ

শিক্ষকরা দরসে যেতেন গুরুত্ব সহকারে। তারা পরিচ্ছন্ন পোষাক পরতেন, শরীরে সুগন্ধী মেখে নিতেন। ইমাম মালেক দরসে যাওয়ার আগে গোসল করতেন। তারপর পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে সুগন্ধী মেখে দরসে যেতেন। দরসের আগে তিনি এই দুআ পড়ে নিতেন,

---

[১২] ইলম অর্জনে উলামায়ে কেরাম কীরুপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করতেন তার কিছুটা ঝলক মিলবে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ লিখিত 'সফাহাত মিন সবরিল উলামা' গ্রন্থে।

জিকির করতে করতে দরসে প্রবেশ করতেন। সবাইকে সালাম দিতেন। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দরসগাহে দু'রাকাত সালাত পড়ে নিতেন। এরপর দরসে বসতেন। শিক্ষকদের বসার স্থান একটু উঁচু হতো। আলেমদের বেশিরভাগ মসজিদের প্রাঙ্গণে দরস দিতেন। তারা কোনো পিলার বা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসতেন। দরসে হাসি-তামাশা করা থেকে বিরত থাকতেন। ওয়াকি ইবনুল জাররাহ এর দরস সম্পর্কে সালেম বিন জানাওয়াহ বলেন, আমি তার সান্নিধ্যে সাত বছর ছিলাম। আমি তাকে কখনো থুথু ফেলতে দেখিনি। কোনো পাথরের টুকরো নাড়াচাড়া করতে দেখিনি [১৩]। যে গাম্ভীর্য নিয়ে দরসে বসতেন শেষ পর্যন্ত সেটা ধরে রাখতেন। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

দরসের শুরুতে কারী তেলাওয়াত করতেন। এরপর মুস্তামলি ও নকীব দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলতেন। শিক্ষক বিসমিল্লাহ ও দরুদ পড়তেন। তারপর সবাইকে নিয়ে হাত তুলে দুআ করতেন। তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে তাকরির শুরু করতেন। *(তাজকিরাতুস সামি ওয়াল মুতাকাল্লিম)*

দরসে কণ্ঠস্বর থাকতো স্বাভাবিক। বেশি জোরেও নয়, আবার আস্তেও নয়। এমনভাবে কথা বলা হতো যেন উপস্থিত সবাই শুনতে পারে। কিন্তু মজলিসের বাইরে আওয়াজ না যায়। মাসআলা বুঝানোর জন্য সাধারণত একটি কথা তিনবার বলা হত। কোথাও বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার হলে কিংবা ভ্রান্ত মতালম্বীদের রদ করতে হলে তাও করা হত।

দরস খুব বেশি লম্বা হতো না, আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও হতো না। ছাত্ররা কোনো প্রশ্ন করলে শিক্ষক রাগ করতেন না। সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তবে কেউ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলে তাকে শান্তভাবে সতর্ক করতেন। মাঝে মাঝে ছাত্রদের প্রশ্ন করতেন। কঠিন প্রশ্ন হলে অনেক সময় জবাব দেয়ার জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় দিতেন। কখনো প্রশ্ন করে তাদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করতেন। জবাব পছন্দ হলে পুরস্কৃত করতেন। একবার ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ইমাম শাফেয়ী উত্তর দিলে তিনি খুশি হয়ে তাকে একশো দিরহাম উপহার দেন। *(মিফতাহুস সাআদাহ)*

ভিনদেশী ছাত্রদের প্রতি তারা মমতার দৃষ্টি দিতেন। তাদের ভীতি ও একাকিত্ব দূর করার জন্য প্রায়ই তাদের সময় দিতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন। শিক্ষকরা চেষ্টা করতেন প্রতিটি ছাত্রের নাম, বংশ, জন্মস্থান ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতে। অন্য কোনো আলেম দরসে উপস্থিত হলে শিক্ষক পড়া থামিয়ে

---

[১৩] অর্থাৎ অনর্থক কাজ করতেন না।

দিতেন। তাকে স্বাগত জানাতেন। এরপর আবার পড়ানো শুরু হত। সেই আলেম কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন। জানা না থাকলে বলে দিতেন, জানা নেই। একে অপরকে সম্মান করতেন। ইমাম আউযায়ির কাছে আবু মুহাম্মদ সাইদ বিন আবদুল আজিজের উপস্থিতিতে কোনো প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, আবু মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করো। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

মুস্তামলি দাঁড়াতেন উস্তাদের ডানে বা বামে। সামনে বসতেন আলেমরা এরপর ছাত্ররা। ছাত্ররা উস্তাদের আগেই দরসে উপস্থিত হতেন। তারাও পরিপাটি পোষাক পরে আসতেন। শায়খ আবু উমর বিন সলাহ যেসব ছাত্র টুপি ছাড়া পাগড়ি পরে আসতো তাদেরকে দরস থেকে উঠিয়ে দিতেন। বইপত্র রাখা হতো কাঠের রেহালে বা হাতে। ছাত্ররা কোনো কথা বলতে হলে উস্তাদের অনুমতি নিতেন। কেউ কোনো দরকারে উঠে গেলে সে স্থান খালিই থাকতো, অন্য কেউ বসতো না। দরসের শুরু শেষে দরুদ পড়া হতো। লেখকের জন্য দোয়া করা হতো। দরস শেষে অনেকসময় উস্তাদ ছাত্রদের নসিহত করতেন। বাল্যকালে ছাত্রদের পিতামাতাই তাদের জন্য উস্তাদ নির্ধারণ করে দিতেন। ইমাম মুসলিমের সহপাঠী আহমাদ বিন সালামাহ বলেন, আমার পিতা আমাকে কুতাইবার দরসে বসার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
পড়ালেখার সূচনা হতো কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে। হিফজ ও তাফসির পড়ার পর অন্যান্য ইলম অর্জন করা হত। ইবনু আবি হাতেম বলেছেন, আমার পিতা আমাকে ততক্ষণ হাদিস সংগ্রহের অনুমতি দেননি যতক্ষণ আমি ফজল বিন শাজানের কাছে কুরআন খতম করিনি। *(তাজকিরাতুল হুফফাজ)*

ভারতবর্ষেও এমনই নিয়ম ছিল। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেছেন, তিনি প্রথমে কুরআন শিখেছেন।[১৪] কুরআন খতমের আগে অন্য কোনো ফন বা শাস্ত্র পড়ানো হতো না। ইবনে খালদুন লিখেছেন, মরক্কোর লোকেরা বাচ্চাদের শিক্ষার শুরুতে কেবল কুরআনুল কারিম শিক্ষা দেয়। এ সময় তারা হাদিস বা ফিকহ পড়ায় না। আন্দালুসে কোরআনের সাথে আরবী ব্যকরন, কাব্য এবং

---

[১৪] ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে দেখুন সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানি রচিত ‘হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত’। এছাড়া শায়খ আবদুল হাই হাসানি নদভী লিখিত ‘আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ’ গ্রন্থেও ভারতবর্ষে মুসলমানদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা আছে।

হস্তলিপিও পড়ানো হত। আন্দালুসে হস্তলিপিকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হত। আফ্রিকার লোকেরাও আন্দালুস দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারাও হস্তলিপিকে বেশ গুরুত্ব দিত।[১৫] কুরআন পড়ার পর ফিকহ, হাদিস, তাফসীর ইত্যাদী পড়ানো হত। গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলী মুখস্থ করানো হত। এটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। এমনকি সুলতানদের পক্ষ থেকেও এ কারনে পুরস্কার দেয়া হত। মিসরের অনেক সুলতান ইমাম মুহাম্মদের কিতাব মুখস্থ করার কারনে ছাত্রদের পুরস্কৃত করতেন। সাহাবী, তাবেয়ী , খলিফা্ মুহাদ্দিস, ফকিহদের জীবনি ও ঘটনাবলী পড়ানো হত। মুখস্থও করানো হত।

ইমাম যাহাবী ফকিহ ইউনিনির ব্যাপারে বলেছেন, তিনি প্রথমে কুরআন হিফজ করেছেন। এরপর হুমাইদির আল জামউ বাইনাস সহিহাইন মুখস্থ করেছেন। হারিরির তিনটি মাকামাত মুখস্থ করেন। ইমাম বুখারী বাল্যকালেই ইবনুল মুবারকের বইপত্র মুখস্থ করেন। ইবনে কুতাইবার ছেলে আবু জাফর আহমদ সম্পর্কে সুয়ুতি বলেছেন তার পিতার সব কিতাব (২১ টি) তিনি মুখস্থ করেছিলেন।

উসমান ইবেন দাউদ মুলতানির হেদায়া, বাযদাভী, এহইয়াউল উলুম ইত্যাদী গ্রন্থ মুখস্থ ছিল। (সিয়ারুল আউলিয়া)। দাউদ কাশ্মিরীর মিশকাতুল মাসাবিহ মুখস্থ ছিল।

পড়ানোর ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি পদ্ধতী ছিল

১। উস্তাদ নিজেই পড়তেন ও ব্যখ্যা করতেন।

২। ছাত্র পড়তো, উস্তাদ ব্যখ্যা করতেন।

সনদ

পড়ালেখা শেষে ছাত্রদের সনদ দেয়া হত। একটি ছিল ইজাজত। অর্থাৎ উস্তাদ একজন ছাত্রকে একটি কিতাবের কিছু অংশ পড়িয়ে দিতেন। এরপর বাকি অংশ তাকে এমন কারো কাছে পড়ার অনুমতি দিতেন যাকে উস্তাদ আগে সনদ দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী একজন ছাত্রকে কিতাবুল উম্মের কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল মানাসিক পড়িয়ে দেন। এরপর তিনি বাগদাদ গেলে সেখানে একজন

---

[১৫] আন্দালুসের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে দেখুন, ডক্টর সাদ আবদুল্লাহ সালেহ বাশারি রচিত 'আল হায়াতুল ইলমিয়্যা ফি আসরিল খিলাফাহ ফিল উন্দলুস'

তার কাছে কিতাবুল উম্ম পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন ইমাম শাফেয়ী তাকে বলেন, আমি তোমাকে ইজাজত দিচ্ছি। তুমি আমার অমুক ছাত্রের কাছে গিয়ে এই কিতাব পড়ে নাও। *(তকাবাতুশ শাফিয়িয়্যাহ)*

মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে গনিত, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদীও শেখার সুযোগ ছিল। যারা আগ্রহী হতেন তারা পড়ে নিতেন। প্রতিদিন একেকজন ছাত্রকে অনেকগুলো বিষয় পড়তে হতো। ইমাম যাহাবী, **ইমাম নববীর প্রতিদিনের যে পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন তা নিম্মরুপ –**

আল ওয়াসিত, কিতাবুল মুহাজ্জা্ হুমাইদির আল জামউ বাইনাস সহিহাইন, সহিহ মুসলিম, তা'রীফ, আসমাউর রিজাল, উসুলুদ দীন, মানতিক।

তিনি এসব পড়তেন এবং নোট করতেন

সকল বিষয়ের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত রচিত বুনিয়াদি গ্রন্থগুলো পড়ানো হত। হাদিসের জন্য সহিহাইন পড়ানো হত। এরপর সিহাহ সিত্তার বাকি কিতাবগুলো। এরপর সুনানে বাইহাকি, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে হুমাইদি ইত্যাদী পড়ানো হত। উসুলে হাদিসের জন্য ইমাম দারা কুতনির কিতাবুল ইলাল, হাকিম আবু আবদুল্লাহর মারিফাতু উলুমিল হাদিস ইত্যাদি পড়ানো হত। এরপর আরো ইলম অর্জনের জন্য ছাত্ররা এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করতেন।

আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ নিশাপুরি সম্পর্কে ইবনে আসাকির লিখেছেন, তিনি প্রথমে নিশাপুরে হাদিস শুনেন। এরপর তিনি নাসা গমন করেন। সেখানে হাসান বিন সুফিয়ান থেকে মুসনাদে ইবনে মুবারক ও মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা শ্রবন করেন।

এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মতামত উদ্ধৃত করা হল –

ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় (আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী।) বিখ্যাত ভূগোলবিদ মাকদেসী হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তার লেখাতেও দেখা যায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মসজিদেই দরস দেয়া হতো *(আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, পৃষ্ঠা ২০৫– আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ মাকদেসী। দার সাদের, বৈরুত)।*

ড. নাজি মারুফের অনুসন্ধান মতে জামেয়া নিজামিয়া নিশাপুর , জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের ৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় *(মাদারিসুন কবলান নিজামিয়্যা — ড. নাজী মারুফ। প্রবন্ধটি অনলাইনে আছে)*।

ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে সর্বপ্রথম নিশাপুরের মাদ্রাসা বাইহাকিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হয় *(আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী)*।

জালালুদ্দিন সুয়ুতী লিখেছেন ৪০০ হিজরীতে মিসরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয় *(হুসনুল মুহাজারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহেরা, ২য় খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা– আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী)।*

ঐতিহাসিক কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন ৪ ১০ হিজরীতে মাথুরায় সুলতান মাহমুদ গজনভী একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন *(তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা– আবুল কাসেম অস্ত্রাবাদী। নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ)।*

উলামায়ে কেরামের বিচিত্র পেশা

জীবন ধারণের জন্য জীবিকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলাম কখনো এর গুরুত্ব অস্বীকার করেনি। বরং বিভিন্নভাবে জীবিকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে [১৬]। রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনে ব্যবসা করেছেন [১৭]। জারেক নামক স্থানে তিনি কৃষিকাজও করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও বিভিন্ন পেশায় জড়িত ছিলেন। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের জীবনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারাও নিজেদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রেখেছেন। হালাল উপার্জনের মাধ্যেম তারা স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছেন। একইসাথে তারা ইলমচর্চাতেও ব্যাঘাত ঘটতে দেননি। জীবিকা ও ইলমচর্চার মধ্যে তারা বিস্ময়কর ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। হাম্মাদ বিন যায়দ বলেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস আইয়ুব সখতিয়ানির কথা। হাম্মাদ বলেন, আমরা আইয়ুব সখতিয়ানির কাছে বাজারে যেতাম হাদিস পড়তে। তিনি বলতেন তোমরা আমার সামনে বসে ক্রেতাদের পথ আটকে দিচ্ছ। আমার পেছনে বসো তারপর যা জানতে চাও প্রশ্ন করো [১৮]।

---

[১৬] ক. আল্লাহ ব্যবসা বা কেনাবেচাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন” (সূরা বাক্বারা: আয়াত ২৭৫)।

খ.সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, এবং আল্লাহকে অধিক স্মরন করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা জুমআহ: ১০)। এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনাদি পূরণে বেড়িয়ে পড়ো। (আলজামে লি আহকামিল কুরআন, খ.১৮,পৃ.৯৬)

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার জমি রয়েছে সে নিজেই চাষাবাদ করবে (সহীহ বুখারী, হাদীস নং – ২৩৪০)

ঘ. হযরত রাফে ইবনে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? জবাবে তিনি বলেন: ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্দ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়। (মুসনাদে আহমদ)

[১৭] নবীয়ে রহমত, ১১৮,১১৯ পৃষ্ঠা- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। বাংলা সংস্করণ, মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

[১৮] তারীখে জুরজান, ২৭০ পৃষ্ঠা,– আবুল কাসেম হামযাহ বিন ইউসুফ বিন ইবরাহিম জুরজানি। আলামুল কুতুব, বৈরুত।

পেশা বা আয়ের সুসংহত খাত থাকার ফলে তাদের ইলমচর্চার পথ হতো মসৃন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তার ছাত্র হাসান বিন রবি কুফিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার পেশা কী? হাসান বললেন, আমি চাটাইর ব্যবসা করি। কয়েকজন কর্মচারী আছে। তারা চাটাই বানায় এবং বিক্রি করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, তোমার এই ব্যবসা না থাকলে আমার এখানে থাকা তোমার জন্য কঠিন হতো [১৯]। আবু উমর মুহাম্মদ বিন খশনাম বিন আহমদ নিশাপুরী। নিশাপুরের বিখ্যাত আলেম। তিনি কাগজের ব্যবসা করতেন [২০]। আবুল ফজল মানসুর বিন নসর বিন আব্দুর রহিম নিশাপুরিও কাগজের ব্যবসা করতেন। আল্লামা সামআনি তার সম্পর্কে লিখেছেন, খোরাসানের প্রসিদ্ধ মানসুরি কাগজ তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয় [২১]। আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ ওয়াররাক ছিলেন শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি কলম ও কালি বিক্রি করতেন। আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদের বাবে নববীর পাশে কালি বিক্রি করতেন। যারা অর্থের বিনিময়ে বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন তাদের ওয়াররাক বলা হতো। ইবনে খালদুন ওয়াররাকদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে , 'বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করা, প্রুফ দেখা, বাধাই করা এবং বই সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু ওয়াররাকদের কাজের আওতায় পড়ে'[২২] ।

আল্লামা সামআনি অবশ্য সংজ্ঞাটা আরো পরিস্কার করেছেন,'ওয়াররাকরা কুরআনুল কারীম, হাদীস ও অন্যান্য বইপত্র লেখার কাজ করে। এছাড়া যারা কাগজ বিক্রী করে তাদেরকেও ওয়াররাক বলা হয়।' আলেমদের অনেকেই এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আইয়ুব বাগদাদি ছিলেন বাগদাদের প্রখ্যাত আলেম। তিনি ফজল বিন ইয়াহইয়া বিন খালেদ বারমাকির গৃহে অবস্থান করে বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন[২৩] আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সাইদ বিন আব্দুর রহমান বসবাস করতেন

---

[১৯] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ১৫ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

[২০] প্রাগুক্ত, ৩১ পৃষ্ঠা।

[২১] প্রাগুক্ত, ৩৬ পৃষ্ঠা।

[২২] আল মুকাদ্দিমা, (২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা)– ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব, দামেশক।

[২৩] ওয়াররাকু বাগদাদ ফিল আসরিল আব্বাসি, ৪৫৬ পৃষ্ঠা – ড খাইরুলাহ সাইদ। মারকাযু মালিক ফয়সল লিল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া, রিয়াদ, সৌদী আরব।

কুফায়। পেশায় ছিলেন ওয়াররাক। খতীব বাগদাদি তার সুন্দর হস্তলিপির প্রশংসা করেছেন[২৪]।

আবু মুসা সুলাইমান বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ পরিচিত ছিলেন হামেদ বাগদাদী নামে। তিনি ছিলেন কুফার বিখ্যাত নাহুবীদ। তিনিও পেশায় ওয়াররাক ছিলেন। আবুল কাসেম সোলাইমান বিন আব্দুল মালেকও ছিলেন পেশায় ওয়াররাক[২৫]। মাহা নামক স্থানের অধিবাসী আলেমগন কোরআন শরীফের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। বিখ্যাত পর্যটক ও ভূগোলবিদ মাকদিসি তাদের সম্পর্কে লিখেছেন, তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তাদের হাতের লেখাও খুব সুন্দর [২৬]। আবুল কাসেম ইসমাইল বিন আহমদ সমরকন্দী ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের একজন। বাগদাদের জামে মানসুরে হাদিসের দরস দিতেন। ইবনুল জাওযি লিখেছেন, তিনি ওয়াররাকদের বাজারে বই বিক্রি করতেন [২৭]।

ব্যবসার সাথে জড়িত উলামাদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ বাজারে ব্যবসা করতেন। দাউদ বিন আবি হিন্দ রেশমি চাদর বিক্রি করতেন। ইমাম আবু হানিফার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। বিখ্যাত কারী হামযাহ যিয়াত যাইতুন ও আখরোটের ব্যবসা করতেন। কুফা ছিল তার ব্যবসাস্থল। মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমানের ছিল ঘোড়ার ব্যবসা। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকও ব্যবসা করতেন। তাজকিরাতুল হুফফাজে তার জীবনি আলোচনায় যাহাভী তাকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছেন[২৮]।

উলামায়ে কেরাম কখনো কখনো রাজদরবারে চাকরি করেছেন। ইবনে হাযম আন্দালুসি ছিলেন খলিফা মুস্তানতাহির বিল্লাহর উযির। শাফেয়ী মাজহাবের ফকিহ কামালুদ্দিন ছিলেন সুলতান নুরুদ্দিন যিংকির সরবারের সভাসদ। ইবনে খাল্লিকান

---

[২৪] মাওসুআতুল ওয়াররাকাহ ওয়াল ওয়াররাকিন, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, – ড খাইরুল্লাহ সাইদ। আল ইনতিশারুল আরবী, বৈরুত, লেবানন।

[২৫] প্রাগুক্ত, ৭৬ পৃষ্ঠা।

[২৬] আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, পৃষ্ঠা ৩৩৫– আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ মাকদিসী। দার সাদের, বৈরুত।

[২৭] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম ,১০ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

[২৮] উলামায়ে সালাফ, ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা– হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানি। মুসলিম ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, আলীগড়, ভারত।

তার প্রশংসা করেছেন। মাওলানা তাজুদ্দিন ইবরাহিম পাশা ছিলেন উসমানি সুলতান বায়যিদ ইয়ালদারমের মন্ত্রী[২৯]।

আবু বকর আহমদ বিন সালমান বিন হাসান ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের আলেম। বসবাস করতেন বাগদাদে। প্রতি শুক্রবার জামে মনসুরে তার দুটি মজলিস হতো। জুমার আগে তিনি হাম্বলি ফিকহের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জুমার পরে হাদিসের দরস দিতেন। তিনি লেপ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন[৩০]।

হাজার বছর আগের মুসলিম বিশ্ব। সেকালে নানা ধরনের কাপড় তৈরী করা হতো। কুফার রেশম কাপড় তৈরীর অনেক কারখানা ছিল। এখানকার পাগড়ির কাপড় ছিল বিখ্যাত। উলামায়ে কেরামের অনেকে কাপড় ব্যবসার সাথেও জড়িয়ে পড়েন। এমনই একজন ফুরাত কাজাজ তামিমি। তার জন্মস্থান বসরায় হলেও তিনি কুফায় বসবাস করতেন। করতেন কাপড়ের ব্যবসা। আবু মানসুর আব্দুর রহমান বিন আবু গালেব একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। অনেকের থেকে তিনি হাদিস বর্ননা করেছেন। তিনিও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আবুল হাসান মোহাম্মদ বিন সান্নান বিন ইয়াযিদ হাদিসের দরস দিতেন। পাশাপাশি তার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। আবু ইয়াহইয়া বিন ঈসা ছিলেন ইমাম মালেকের ছাত্র। অনেক মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদিস বর্ননা করেছেন। তিনিও ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। আবু সুলাইমান আইয়ুব বিন সালমান বসরায় বসবাস করতেন। তার পেশা ছিল সুতি কাপড়ের ব্যবসা। রবি বিন সালেম বসরায় পুরাতন কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন হুসাইন হাল্লাজ ছিলেন বাগদাদের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক। তিনি তুলার ব্যবসা করতেন [৩১]।

উলামায়ে কেরাম সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথেও নানাভাবে জড়িয়েছেন। এমনকি শাসকদের প্রেরিত দূত হয়ে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে সফরও করেছেন। এমনই একজন ইমাম শাবী। খলিফা আল মালিক তাকে রোমের কায়সারের নিকট প্রেরণ করেন। কায়সার ইমাম সাহেবের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, আমি অবাক হচ্ছি, মুসলমানদের মধ্যে এমন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে তারা কী করে আরেকজনকে খলিফা নির্বাচিত করে।ইমাম আবু ইয়াকুব সিরাজিকে বাগদাদের খলিফার পক্ষ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। শাইখ শিহাবুদ্দিন

---

[২৯] প্রাগুক্ত, ১১০,১১১ পৃষ্ঠা।

[৩০] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ৮৮ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

[৩১] প্রাগুক্ত, ৬০-৬৫ পৃষ্ঠা।

সোহরাওয়ার্দি খলিফার দূত হয়ে সমরকন্দে গমন করেন। মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ মিসরের শাসকের প্রতিনিধি হয়ে রোমে যান। খলিফা মুত্তাকি বিল্লাহ কামালুদ্দিন শাফেয়িকে দূত মনোনিত করে রোমে পাঠান। আল্লামা কোশজি শারেহকে সমরকন্দের শাসক মির্জা উলুগ বেগ প্রতিনিধি হিসেবে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের নিকট প্রেরণ করেন। হাফেজ ইবনে মাকুলাও বাগদাদের খলিফার প্রতিনিধি হয়ে সমরকন্দে সফর করেন[৩২]।

আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন গাজাল ছিলেন হজরত হাসান বসরির ছাত্র। তিনি সুতার ব্যবসা করতেন। আবু মানসুর মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ বাগদাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সুতার ব্যবসা করতেন। তিনি হাদিস পড়ার জন্য মিসর যান। খতিব বাগদাদী তার কথা উল্লেখ করেছেন[৩৩]। মাওলানা উসমান খয়রাবাদী। তার সম্পর্কে 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদে' সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া লিখেছেন, 'তিনি সবজী বিক্রি করতেন এবং শালগম ও অন্যান্য তরকারী রান্না করে বিক্রি করতেন'। এমন নয় যে তিনি নামের মাওলানা ছিলেন। স্বয়ং নিজামুদ্দীন আউলিয়া লিখেছেন, 'তিনি কুরআনের মুফাসসির ছিলেন।' মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী লিখেছেন আহমদ হাসান কানপুরির ছেলের কথা। তিনি নিজেও পিতার মতো বড় আলেম ছিলেন। তিনি দোকানে বসে মিঠাই বিক্রি করতেন। কানপুরে তার মিঠাইয়ের খুব সুনাম ছিল[৩৪]।

বর্তমানের মতো সেকালেও সাবানের ব্যাপক চাহিদা ছিল। নিশাপুরে একটি পেশাজীবি সম্প্রদায় ছিল যারা সাবানের ব্যবসা করতো। তাদের অভিহিত করা হতো সাবুনিয়া নামে। আলেমদের অনেকে সাবান ব্যবসাও করতেন। শাইখুল ইসলাম আবু উসমান ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান বিন আহমদ সাবুনি নিশাপুরি ছিলেন নিশাপুরের বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস। প্রায় ষাটবছর তিনি ইলমচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। নিয়মিত ওয়াজ নসিহত করতেন। নিশাপুরের বাইরে খোরাসান, গজনি, হিন্দুস্তান, জুরজান, তবারিস্তান, শাম, আজারবাইজান প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে হাদিসের দরস দেন। তিনি সাবানের ব্যবসা করতেন। আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ছিলেন এমন আরেকজন সাবান ব্যবসায়ী

---

[৩২] উলামায়ে সালাফ, ১১২,১১৩ পৃষ্ঠা– হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানি। মুসলিম ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, আলীগড়, ভারত।

[৩৩] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ৬৮ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

[৩৪] হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত , ১ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা– সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী। মাকতাবাতুল হক, মুম্বাই, ভারত।

আলেম[৩৫]। উলামাদের কেউ কেউ মাটির পাত্র তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেন। সাইদ বিন যুরআ ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। তিনি আবু আব্দুল্লাহ সাওবান থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন। তার পেশা ছিল মাটির পাত্র বিক্রি। আবু বকর মোহাম্মদ বিন আলি রাশেদি ছিলেন ব্যাকরনবিদ। তিনিও মাটির পাত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন[৩৬]।

উলামায়ে কেরাম নিজেরা বিভিন্ন পেশায় জড়িয়েছেন। আবার তাদের পেশাজীবি ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার দিকেও তারা খেয়াল রাখতেন। ওলিদ বিন উতবার ঘটনা থেকে এর প্রমান মেলে। তিনি দামেশকের জামে মসজিদে হাদিস পড়াতেন। একজন ছাত্র প্রায়ই দরসে দেরী করে পৌছাতো। একদিন তিনি প্রশ্ন করলে ছাত্র জানালো সে ব্যবসা করে। সকালে উঠে দোকানের মাল খরিদ করে দরসে আসে ফলে দেরী হয়ে যায়। একথা শুনে ওলিদ বিন উতবা বলেন, আজ থেকে তুমি এখানে আসতে হবে না। মসজিদের দরস শেষে আমি তোমার দোকানে গিয়ে তোমাকে হাদিস পড়াবো[৩৭]।

ঈসা বিন আবু ঈসা। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম শাবী ও ইমাম নাফে থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন ওয়াকি বিন মাইসারাহ। জীবিকার তাগিদে তিনি নানা পেশা অবলম্বন করেছেন। কাপড় সেলাই করতেন তাই খইয়াত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া গম বিক্রি করতেন তাই কেউ কেউ তাকে হান্নাত (গম বিক্রেতা) বলতো। এছাড়া তিনি গাছের পাতা বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করতেন । সবাই সহজ পেশা গ্রহন করেননি। কেউ কেউ জীবিকার জন্য কঠিন পরিশ্রমের দিকেও ঝুকেছেন। এমনই একজন আবু জাফর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মেহরান। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস। তিনি ইসহাক বিন ইউসুফ থেকে হাদিস বর্ননা করেন। তিনি জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন। সেই লাকড়ি বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সেকালে খেজুর পাতা, বাশ, গাছের ছাল ইত্যাদি দিয়ে টুকরি বানানো হতো। উলামায়ে কেরামের অনেকে টুকরি তৈরীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। মুসলিম বিন মাইমুন খাওয়াস ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার একজন মুহাদ্দিস। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তার জীবিকা ছিল টুকরি বানিয়ে বাজারে

---

[৩৫] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ৮২ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

[৩৬] প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা।

[৩৭] প্রাগুক্ত, ১৬ পৃষ্ঠা।

বিক্রি করা। আবু সালামা ঈসা বিন মাইমুন ছিলেন একজন বিখ্যাত মুফাসসির। তিনিও টুকরি বিক্রি করতেন। শীতকালে শীত থেকে বাচার জন্য মোজার প্রয়োজন পড়ে। আলেমদের অনেকে মোজা বিক্রি করতেন। আতা বিন মুসলিম খফফাফ কুফি হালবে বসবাস করতেন। তিনি মোজা বিক্রি করতেন। সেকালে বসরা থেকে মোসুলে বড় বড় নৌকা চলাচল করতো। পুরনো হয়ে গেলে এই নৌকাগুলো ভেংগে এর তক্তা ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করা হতো। আবার কখনো নৌকা মেরামত করে বিক্রি করা হতো। এভাবে নতুন একটি পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে উঠে। উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ এই পেশাতেও যোগ দেন। আবু রবি সোলাইমান বিন মুহাম্মদ বসরি। বসরার অধিবাসী এই মুহাদ্দিস আতা ইবনু আবি রবা ও মুহাম্মদ ইবনে সিরিন থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন। তার সম্পর্কে আল্লামা সামআনি লিখেছেন, তিনি বসরায় নৌকা বিক্রি করতেন। আবুল ফজল জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদিও এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বাজারে যারা নিলাম তুলতো তাদেরকে মুনাদি বলা হয়। আবু বকর আহমদ বিন মুসা বিন মুহাম্মদ নিশাপুরের বাজারে নিলাম ডাকতেন। এটিই ছিল তার পেশা। আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আবু দাউদ উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াযিদও এই পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন[৩৮]।

মুসলিম শাসনামলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র গোসলখানার ব্যবস্থা ছিল । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কর্ডোভা নগরীতেই নয়শো স্নানাগার ছিল[৩৯]। এসব স্নানাগারে গরম পানি, সাবান ও তেলের ব্যবস্থা থাকতো। স্নানাগারও ছিল আয়ের মাধ্যম। যারা স্নানাগার নির্মানের মাধ্যমে আয় করতেন তাদের হাম্মামি বলা হতো। সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আবুল আস সাকাফি বসরায় একটি হাম্মাম নির্মান করেন। এর অবস্থান ছিল ঈসা বিন জাফরের প্রাসাদের সন্নিকটে। মুসলিম বিন আবু বকর বসরায় আরেকটি হাম্মাম নির্মান করেন। এর দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবুল হাসান আলি বিন আহমদ বিন উমর ছিলেন বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের একজন। তিনিও হাম্মাম নির্মান করে এর দ্বারা উপার্জন করতেন [৪০]। আবু তালেব মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আহমদ করতেন চালের ব্যবসা। আবুল কাসেম আলি বিন আহমদ বিন মুহাম্মদও চালের ব্যবসা করতেন।

---

[৩৮] প্রাগুক্ত, ১৪৫-১৬০ পৃষ্ঠা।

[৩৯] আন্দালুসের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, – ড. রাগিব সারজানি। বাংলা অনুবাদ, মাকতাবাতুল হাসান, ঢাকা।

[৪০] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ১৬৮ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

আবু মুহাম্মদ হাসান বিন আলি বিন মুসা করতেন ডালের ব্যবসা। আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ তহহান এমনই আরেকজন ডাল ব্যবসায়ী আলেম। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন প্রখ্যাত ওয়ায়েজ। তিনি বেশকিছু জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রুটি বিক্রি করে উপার্জন করতেন। আবুল হাসান আলি বিন সুলাইমান বিন ইযও রুটি বিক্রি করতেন। আবু মোহাম্মদ সাহল বিন নসর বিন ইবরাহিম। বাগদাদের অন্যতম মুহাদ্দিস। তার একটি হোটেল ছিল। এটিই ছিল তার আয়ের মাধ্যম। আবু সাইদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইস্ফাহানিও হোটেল চালাতেন। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন ইউসুফ বিন মাইমুন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ননা করেন। তিনি মুরগি পালতেন। মুহাম্মদ বিন আলি বিন জাফর বিন মাকিয়ানিও মুরগি পালতেন এবং বাজারে বিক্রি করতেন। আবু আব্দুর রহমান হোসাইন বিন আহমদ ছিলেন ইমাম মুসলিমের শাগরিদ। তিনি দুধ বিক্রি করতেন। আবু সাদ নসর বিন আলি পাথরের ব্যবসা করতেন[৪১]।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। পেশাগত ব্যস্ততা উলামায়ে কেরামকে ইলমচর্চা থেকে দূরে সরায়নি। সকল ব্যস্ততার পরেও তারা নিজেদের ইলমচর্চায় ব্যস্ত রেখেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কারন তারা সময়কে সঠিক খাতে ব্যয় করতেন। সময় নষ্ট করতেন না। তারা কখনো সস্তা বিনোদনের ফাদে পা দেননি। ইলমই ছিল তাদের বিনোদন। আবু ইমরান মুসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাইদ আন্দালুসি তার ছেলেকে বলেছিলেন, তুমি কি মুতালাআর বাইরে অন্য কিছুতে আনন্দ পাচ্ছো? আল্লাহর শপথ আমি তো এর মতো তৃপ্তি আর কিছুতেই পাই না[৪২]।

ইলমের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষনের ফলে তারা সর্বোচ্চ সময় এর পেছনেই ব্যয় করতেন। ফাতাহ ইবনে খাকান ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাকে মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। দায়িত্বের ব্যস্ততা সত্বেও তিনি প্রচুর পড়ালেখা করতেন। খলিফার দরবার থেকে বের হলেই তিনি হাটতে হাটতে কিতাব পড়তেন। খলিফা দরবার থেকে অল্প সময়ের জন্য উঠলেও তিনি পড়া শুরু করতেন। তার ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার[৪৩]।

---

[৪১] প্রাগুক্ত, ১৮০ পৃষ্ঠা।

[৪২] মনীষীদের কাছে সময়ের মূল্য, ১৫৯ পৃষ্ঠা — শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ। বাংলা অনুবাদ: কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক, দারুল আরকাম, ঢাকা।

[৪৩] প্রাগুক্ত, ৮৩ পৃষ্ঠা।

আবু ফজল মুহাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াযি বলখী ছিলেন একাধারে মন্ত্রী ও বিচারক। তিনি নিজের দায়িত্বের ফাকেফাকেই লেখালেখি করতেন [৪৪]।

উলামায়ে কেরাম নানা পেশা অবলম্বন করে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতেন কিন্তু তারা বিলাসে ডুবে যেতেন না। সাধারনত উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগই তারা জনকল্যানে ব্যয় করতেন। ইমাম লাইস ইবনে সাদ তার জমিদারী থেকে বার্ষিক আশি হাজার দিনার পেতেন। এর পুরোটাই তিনি অভাবগ্রস্ত ছাত্র ও আলেমদের জন্য ব্যয় করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ দরিদ্র ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের জন্য ব্যয় করতেন। ইমাম আবু উবাইদ মুহাম্মদ বিন ইমরান সবসময় তার গৃহে ৫০ টি বিছানা তৈরী রাখতেন, যেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সফর করে আসা ছাত্র ও আলেমরা সেখানে অবস্থান করতে পারে। ইমাম হাফস বিন গিয়াস কুফী। কুফায় বসবাসকারী এই মুহাদ্দিস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তিনি বলতেন যে ছাত্র আমার ঘরে খাবার খাবে না, আমি তাকে হাদিস বর্ননা করবো না[৪৫]।

[৪৪] প্রাগুক্ত, ১০৭ পৃষ্ঠা।

[৪৫] মুসলমানো কে হার তবকা ও হার পেশাহ মে ইলম ও উলামা, ১৭-১৯ পৃষ্ঠা- কাজি আতহার মোবারকপুরী। শাইখুল হিন্দ একাডেমী দেওবন্দ, ভারত।

মক্তব : ইসলামী শিক্ষার প্রথম সোপান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের সময়ে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য আলাদা কোনো মক্তব ছিল না । সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের কে ঘরেই শিক্ষা দিতেন। সাধারণত কথা বলা শিখলেই তারাবাচ্চাদের সাতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াতেন। সাত বছর বয়স থেকে তাদের কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজের পদ্ধতী শিক্ষা দিতেন। হযরত উমর রা এর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি এসব মক্তবে শিক্ষক নিয়োগ দেন । মদীনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি মক্তবের শিক্ষকদের মাসিক ১৫ দিরহাম ভাতা দেয়া হতো ।বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা বুঝা যায় হযরত উমরের শাসনামলে মক্তবগুলোতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। আইয়ুব বিন হাসান রাফেয়ী বলেন, আমরা প্রতি শুক্রবার মদীনার মক্তবের বাচ্চাদের সাথে বাইরে যেতাম।

ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলিমরা বিজীত অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষার দিকেও মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা এসব মক্তবে পড়াশুনা করতো। হেমসের বিখ্যাত কবি আদহাম বিন মেহরাজ বাহেলি এমনই এক মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পুরো মুসলিম বিশ্বে মক্তব প্রতিষ্ঠার এই ধারা এতোটাই বেগবান হয় যে, বিখ্যাত পর্যটক ও ভুগোলবিদ ইবনে হাউকাল সিসিলির একটি শহরেই তিনশো মক্তব দেখেছেন। এসব মক্তবে শিশুরা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান ও কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শিখতো । হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে এমনই এক মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, হাজ্জাজ রুটির বিনিময়ে বাচ্চাদের পড়াতেন। জনৈক কবি তাই হাজ্জাজকে কটাক্ষ করে লিখেছিলো,

----

কুলায়ব (কুকুর ছানা) কি ভুলে গেছে সেই কংকালসার দিনগুলোর কথা,
যখন সে রুটির বিনিময়ে সুরাতুল কাউসার শিক্ষা দিত।
হরেক রকমের রুটি, কোনোটা ফোলা ফোলা ,
কোনোটা উজ্জ্বল চাদের মতো গোল।
(অনুবাদ : শায়খ আবু তাহের মিসবাহ)

যাহহাক ইবনে মুজাহিম কুফার একটি মক্তবে পড়াতেন। তার মক্তবে তিন হাজার ছাত্র পড়তো। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন আবুল কাসেম বলখীর মক্তবের কথা। তার মক্তবেও তিন হাজার ছাত্র ছিল। তিনি গাধায় চড়ে ছাত্রদের চারপাশে চক্কর দিতেন এবং তাদের দেখাশোনা করতেন। তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে প্রচুর মক্তব গড়ে উঠে। কিছু কিছু মক্তব ছিল শুধু সুলতান ও আমিরদের সন্তানদের জন্য। সাধারনত প্রাসাদের এক কক্ষ এসব মক্তবের জন্য নির্ধারিত ছিল। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ বিন আলী (মৃত্যু ৩৯৯ হিজরী) ছিলেন কাইরাওয়ানের বিখ্যাত আলেম। তিনি নিজের গ্রামের মক্তবে শিশুদের পড়াতেন।

এসব মক্তবে কখনো কখনো একের অধিক শিক্ষক থাকতো। সিসিলির মক্তবগুলোতে কমপক্ষে পাচজন শিক্ষক থাকতো। একজন থাকতেন প্রধান। তিনি সব দেখভাল করতেন।একারনে সিসিলিতে প্রচুর মক্তব শিক্ষক ছিলেন। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন শুধু পালের্মো শহরেই ৩০০ মক্তব শিক্ষক ছিলেন।
মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ও ফকীহরা তাদের বাল্যকালে এসব মক্তবেই প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী নিজের বাল্যকালের কথা বলেছেন, ‘আমি ছিলাম এতীম। আমার মা আমাকে মক্তবে ভর্তি করেন। কোরআনুল কারীম খতম করার পর আমি মসজিদে প্রবেশ করি এবং উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসি। ইবনে আব্দুল বার ‘জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি’তে এই বর্ননা এনেছেন। আবু মুসলিম খুরাসানিও তার বাল্যকালে এমন এক মক্তবে পড়াশুনা করেছেন বলে ইবনে খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন।
অভিবাবকরা চাইতেন সন্তানদের প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য শিক্ষকের কাছে পাঠাতে। সেকালের এমনই এক প্রসিদ্ধ শিক্ষক মুসলিম বিন হুসাইন বিন হাসান আবুল গানায়েম (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী)। ইবনে আসাকির তার প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ জনগন মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতো। এমনকি খলীফা ও আমীররাও মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তার দুই সন্তান মামুন ও আমিনের জন্য মালেক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। ইমাম মালেক তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ইলমের কাছে আসতে হয়। ইলম কারো কাছে যায় না। শেষে খলীফা

তার দুই সন্তানকে ইমাম মালেকের কাছে পাঠাতে সম্মত হন। ইমাম মালেক শর্ত দেন, তারা সবার চোখের আড়ালে মজলিসের একেবারে শেষ প্রান্তে বসবে। খলীফা এই শর্ত মেনে নেন। মেহরাজ বিন খালাফ তিউনেসিয়ার একটি মক্তবে পড়াতেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

মক্তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না । তারাও সকাল বেলা বাচ্চাদেরকে পড়াতেন। তাবেয়ী আবদু রব্বিহী ইবনে সুলাইমান জানিয়েছেন উম্মে দারদা কাঠের ফলকে বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক বাক্য লিখে তাকে শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে একটি ছিল 'বাল্যকালে প্রজ্ঞা শিখ, পরবর্তী জীবনে সে অনুযায়ী কাজ করবে'।

এ সকল মক্তবের পাঠ্যক্রমও ছিল বৈচিত্র্যময়। এসব মক্তবে শেখানো হতো কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত ও হস্তলিপি। পড়ানো হতো প্রয়োজনীয় মাসআলা -মাসায়েল, কবিতা ও আরবী ব্যকরণ। প্রাথমিক হিসাব নিকাশও ছিল পাঠ্য এমনকি ছাত্ররা পড়তো ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীও। আলকামা বিন আবি আলকামার মকতবে আরবী ভাষা, ব্যকরন ও ছন্দ পড়ানো হতো। সাধারণত পাচ ছয় বছর বয়সী বাচ্চারাই এসব মক্তবে পড়তো । এই বয়সেই বাচ্চারা কুর আন হিফজ শুরু করত।এসব মক্তব শিক্ষকদের অনেকেই নিজের জীবনে উন্নতি করেছেন পরে। শুরুতে বলা হয়েছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা । শুরুর দিকে ছিলেন মকতবের শিক্ষক। পরে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তিনি ইরাকের গভর্ণর হন। এমনই আরেকজন হলেন ইসমাঈল বিন আব্দুল হামিদ । জীবনের শুরুর ভাগে মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসনামলে তিনি মন্ত্রী হন।

সাধারণত শিক্ষকরা ছাত্রদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করতেন। তবে যাহহাক বিন মুজাহিম ও আব্দুল্লাহ বিন হারিস সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা লিখেছেন তারা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না । এখানে বিস্ময়কর এক শিক্ষকের কথা বলা যেতে পারে। আবু আবদুল্লাহ তাউদি (মৃত্যু ৫৮০ হিজরী)। তিনি মরক্কোর ফাস শহরে মক্তবে পড়াতেন। তার নিয়ম ছিল ধনী ব্যক্তিদের সন্তান পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করতেন এবং সেই অর্থ দরিদ্র ছাত্রদের হাতে তুলে দিতেন। ইবনে যুবাইর আন্দালুসী ও ইবনে বতুতার সফরনামায় এসব মক্তবের বিবরণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা দামেশকের উমাভী মসজীদের মক্তবের বর্ননা দিয়েছেন এভাবে,

'একদল শিক্ষক কোরআনুল কারীমের পাঠদানে ব্যস্ত। তারা বসেছেন মসজিদের পিলারে হেলান দিয়ে। তারা কাঠের ফলকে লিখে নয়, বরং মুখে উচ্চারণ করে

করে পড়ান। এছাড়া আছেন হস্তলিপির শিক্ষক। তারা বিভিন্ন কবিতার পংক্তি লিখে ছাত্রদের হস্তলিপিতে পারদর্শী করে তোলেন।'

এসব মক্তবের শাসনপদ্ধতীর দিকেও উলামায়ে কেরামের সতর্ক নজর ছিল। আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাচ্চাদের প্রহার করা যাবে কিনা? তিনি বলেছিলেন, করা যাবে, অপরাধ অনুসারে তবে ভালোমন্দের পার্থক্য করতে অক্ষম এমন শিশুদের প্রহার করা যাবে না। এসব মক্তবের শিক্ষকরা সমসাময়িক সামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। মিসরের অধিপতি আহমদ ইবনে তুলুন যখন অসুস্থ হন, ২৭০ হিজরীতে, তখন তার সুস্থতার জন্য বিভিন্ন মক্তবে দোয়া করা হয়।

বাংলায় সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে প্রচুর মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারনত এসব মক্তবের ব্যয়ভার রাষ্ট্র কিংবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জমিদান ইত্যাদী থেকে করা হতো। প্রতিটি মসজিদে মক্তব ছিল। এমনকি ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির সামনেও মক্তব থাকতো। হিন্দু কবি মুকুন্দরামের উক্তি থেকে জানা যায়, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে উঠা ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লীতেও মক্তব ছিল। সাধারনত পাচ বছর বয়সে শিশুদের শিক্ষা শুরু হত। বাংলাসহ সমগ্র ভারতে একটা সাধারন রীতি ছিল চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে শিশুদের শিক্ষা শুরু করা হত। শিশুদের শিক্ষা শুরুর দিনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত। পূর্ব থেকে নির্ধারিত সময়ে শিশু তার শিক্ষকের সামনে বসতো। শিক্ষক কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন, শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো।অনুষ্ঠানের দাওয়াত পত্র লেখা হতো ফারসীতে। এই অনুষ্ঠানকে বিসমিল্লাহ-খানি বলা হত। এসব মকতবে বালক-বালিকা একসাথেই পড়ত। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি দৌলত উযির বাহরাম খানের লাইলি মজনু কাব্য থেকে জানা যায়, বাল্যকালে লাইলি ও মজনু একই মক্তবে পড়ত।ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল মক্তবের প্রধান উদ্দেশ্য। কবি বিপ্রদাস লিখেছেন, মক্তবে মুসলমান ছেলেমেয়েদের অযু করা ও নামাজ পড়া শেখানো হতো। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও মক্তবে আরবী, ফার্সী ও বাংলা পড়ানো হতো। 'শমসের গাজীর পুথি' থেকে জানা যায় , শমসের গাজী একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মক্তবের জন্য ঢাকা থেকে একজন মুন্সী (ফার্সি শিক্ষক), হিন্দুস্তান থেকে একজন মৌলবী (আরবী শিক্ষক) এবং জুগদিয়া থেকে একজন পন্ডীত (বাংলা শিক্ষক) নিয়োগ দেন।

সেকালে ফার্সী ছিল রাজভাষা। ফলে হিন্দু বালকরা , বিশেষ করে কায়স্থ পরিবারের ছেলেরা প্রায়ই মক্তবের মৌলভীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতো। বিদ্যাসুন্দরের লেখক রামপ্রসাদ সেনকে তার পিতা একজন মৌলভীর নিকট

প্রেরণ করেন এবং তিনি ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায়ও বাল্যকালে মক্তবে ফার্সী শিখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। দুহাল ইসলাম — ড. আহমদ আমীন
২। মাজা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলম — ড. রাগেব সিরজানি
৩। আল হায়াতুল ইলমিয়্যা ফি ইফ্রিকিয়া — ড. ইউসুফ বিন আহমাদ হাওয়ালাহ
৪। আল হায়াতুল ইলমিয়া ফি সকিলাতিল ইসলামিয়া — ড আলী বিন মুহাম্মদ বিন সাঈদ যাহরানি
৫। খাইরুল কুরুন কী দরসগাহে — কাজী আতহার মোবারকপুরী
৬। হিন্দুয়ো কি ইলমি ও তালিমি তরক্কি মে মুসলমান হুকুমরানো কি কোশিশে — সাইয়েদ সুলাইমান নদভী।
৭। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস — ড. এম এ রহিম
৮। সুলতানি আমলে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ — মো. আব্দুল করিম
৯। লাইলি মজনু — দৌলত উযির বাহরাম খান (আহমদ শরীফ সম্পাদিত)

দরসে নেজামির প্রণেতার খোঁজে

(পরিচিত একজন কথা প্রসঙ্গে বললেন , বাগদাদের জামিয়া নিজামিয়াতে নিজামুল মুলক যে পাঠ্যক্রম তৈরী করেছিলেন তা-ই উপমহাদেশের মাদ্রাসাসমূহে দরসে নেজামি নামে পরিচিত। যদিও আলেমদের বেশিরভাগই এই তথ্য জানে না। হুবহু একই ধরনের কথা শুনেছিলাম পাকিস্তানি টিভি উপস্থাপক যায়েদ হামিদের মুখেও। এদের কথা বাদই দিলাম। অনেক সময় দরসে নেজামীতে পড়ুয়া অনেককেও দেখা যায় দরসে নেজামীকে নিজামুল মুলকের পাঠ্যক্রম বলে পরিচয় দিতে। এ বিভ্রান্তির নিরসন করতেই এই লেখা)

নিজামুল মুলক

নিজামুল মুলকের জন্ম ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে (৪০৮ হিজরী)। তুস শহরে। ১১ বছর বয়সে হিফজ শেষ করেন। এরপর তাফসীর, হাদিস ও শাফেয়ী ফিকহে পান্ডিত্য অর্জন করেন[৪৬]। প্রথমদিকে তিনি গজনীর সুলতানদের অধীনে চাকরি করতেন। পরে সেলজুকি সাম্রাজ্যের উজির হন। আলপ আরসালান (১০৬৩-১০৭২) ও মালিক শাহ সেলজুকির (১০৭২-১০৯২) রাজত্বকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। উজিরের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে স্থাপিত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম প্রধান কীর্তি। আলেমদের খুব সম্মান করতেন।

[৪৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৬শ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ।

আজানের শব্দ শুনলে সব কাজ থামিয়ে দিতেন[৪৭]। রাজত্বের উপর লিখিত তার সিয়াসতনামা গ্রন্থটি তার পান্ডিত্যের প্রমান বহন করে। ৪৮৫ হিজরির ১০ রমজান (১৪ অক্টোবর ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ইসফাহান থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

মাদরাসার সূচনা

ইসলামের ইতিহাসে মাদরাসার সূচনা হয়েছে মসজিদ থেকেই। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের যুগে কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। তখন মসজিদেই পাঠদানের কাজ চলতো। ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়[৪৮]। বিখ্যাত ভূগোলবিদ মাকদেসী হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তার লেখাতেও দেখা যায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মসজিদেই দরস দেয়া হতো[৪৯]। প্রথম মাদ্রাসা কোনটি তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না । আল্লামা ইবনে খাল্লিকান যদিও জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ (প্রতিষ্ঠা ৪৫৮ হিজরী) কে প্রথম মাদ্রাসা মনে করেন[৫০], কিন্তু আল্লামা তাজ উদ্দিন সুবকী নিশাপুরের অন্তত চারটি মাদ্রাসার কথা লিখেছেন যেগুলো জামিয়া নিজামিয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত[৫১]। ড. নাজি মারুফের অনুসন্ধান মতে জামেয়া নিজামিয়া নিশাপুর , জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের ৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়[৫২]। ঐতিহাসিক মাকরেজির মতে সর্বপ্রথম নিশাপুরের মাদ্রাসা বাইহাকিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হয়[৫৩]। জালালুদ্দিন সুয়ুতী লিখেছেন ৪০০ হিজরীতে মিসরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ

---

[৪৭] আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, ১২শ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা– সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সফাদি। দার এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

[৪৮] আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী।

[৪৯] আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, পৃষ্ঠা ২০৫– আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ মাকদেসী। দার সাদের, বৈরুত

[৫০] ওফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান, ২য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা– আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে খাল্লিকান। দার সাদের, বৈরুত।

[৫১] তবাকাতুশ শাফেয়িয়া আল কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা– আল্লামা তাজ উদ্দিন আস সুবকী। দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা।

[৫২] মাদারিসুন কবলান নিজামিয়্যা — ড. নাজী মারুফ। প্রবন্ধটি অনলাইনে আছে।

[৫৩] আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা– তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী।

করা হয়[৫৪]। ঐতিহাসিক কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন ৪১০ হিজরীতে মাথুরায় সুলতান মাহমুদ গজনভী একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৫]

জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ

জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের নির্মানকাজ শুরু হয় ৪৫৮ হিজরীতে। এর প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে চমৎকার এক ঘটনা। ঐতিহাসিক সদরুদ্দিন আবুল হাসান লিখেছেন, একবার সুলতান আলপ আরসালান গেলেন নিশাপুরে। তার সফরসংগী হলেন নিজামুল মুলক। সেখানকার জামে মসজিদের সামনে কজন ফকীহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? নিজামুল মুলক বললেন, এরা আলেম। মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। তারা দুনিয়ার স্বাদ ত্যাগ করে আত্মার উতকর্ষ সাধনে নিয়োজিত আছেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে সকল শহরে এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মান করবো যেখানে তারা কাজে নিয়োজিত থাকবেন। সরকারী কোষাগার থেকে তাদের বেতন দেয়া হবে। তারা ইলম প্রচার করবেন ও আপনার জন্য দোয়া করবেন। সুলতান এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দিলেন। সে বছরই মাদরাসার নির্মান কাজ শুরু হয়।[৫৬]

১ অক্টোবর ১০৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের পূর্ব প্রান্তে দজলা নদীর তীরে এক প্রশস্ত জমিতে জামিয়া নিজামিয়ার নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজের উদ্বোধন করেন শায়খ আবু সাদ সুদী নিশাপুরী। দুই বছর পরে ১৩ সেপ্টেম্বর ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মান কাজ শেষ হয়। মাদরাসার চারপাশে বাজার নির্মান করা হয়। এই বাজার মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়। মাদ্রাসার নির্মানকাজে ৬০ হাজার দিনার ব্যয় হয়। মাদরাসায় ছাত্রদের জন্য আবাসন কক্ষ, শিক্ষকের কক্ষ, পরিচালকের অফিেবি ও সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া নিজামিয়ার উদ্বোধন হয়। শহরবাসী এতে উপস্থিত হয়। উদ্বোধন করেন শায়খ আবু নসর বিন সব্বাগ। প্রথম থেকেই জামিয়া নিজামিয়া শুধু শাফেয়ী মাজহাবের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এখানে শুধু শাফেয়ী ফিকহ পড়ানো হতো[৫৭]। এই

---

[৫৪] হুসনুল মুহাজারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহেরা, ২য় খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা– আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

[৫৫] তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা– আবুল কাসেম অস্ত্রাবাদী। নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ।

[৫৬] যুবদাতুত তাওয়ারিখ, ১২৯ পৃষ্ঠা– সদরুদ্দিন আবুল হাসান আলি বিন নাসের আল হুসাইনি। দার ইকরা, বৈরুত।

[৫৭] মাদরাসার ওয়াকফ সম্পর্কে ইবনুল জাওযির উদ্ধৃতি

তথ্য থেকেও দরসে নেজামিকে নিজামুল মুলকের সাথে জুড়ে দেয়ার অসারতা প্রমান হয়। কারন উপমহাদেশের দরসে নেজামি প্রনয়ণ করা হয়েছে হানাফী ফিকহের ছাত্রদের জন্য।

জামিয়া নিজামিয়া বাগদাদ অনেকদিন টিকে ছিল। তাতারী হামলার ৮১ বছর পর ইবনে বতুতা জামিয়া নিজামিয়া পরিদর্শন করেন। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং যখন বাগদাদ আক্রমন করেন জামিয়া নিজামিয়া তখনো চালু। ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া মুস্তানসিরিয়ার সাথে একে একীভুত করা হয়। জামিয়া নিজামিয়ার ধবংসাবশেষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত টিকে ছিল। গভর্নর খলিল পাশা রাস্তা নির্মানের জন্য তা অপসারন করেন।[৫৮]

মিসরে ফাতেমী শাসকরা আল আযহারের মাধ্যমে শিয়া আকীদার যে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছিলেন তার মোকাবিলায় জামিয়া নিজামিয়া আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা প্রচারে অবিস্মরনীয় অবদান রাখে।

জামেয়া নিজামিয়ার পাঠ্যক্রম

জামিয়া নিজামিয়ার জন্য কোনো সুবিন্যস্ত পাঠ্যক্রম প্রনয়নের প্রমান পাওয়া যায় না। নিজামুল মুলক মাদরাসার জমি ওয়াকফের যে দলিল লিখেছেন তাতে কোরআন, হাদিস ও ফিকহের প্রতি সর্বসাধারনের মনোযোগ আকর্ষন করেছেন। শুরুর দিকে জামিয়া নিজামিয়াতে কোরআন হাদিস ও শাফেয়ী ফিকহ পড়ানো হতো। পাশাপাশি সামান্য কিছু নাহু সরফ। ধীরে ধীরে ছাত্র বাড়তে থাকে। পাঠ্যক্রমে নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়। ইমাম গাজালী এখানে শিক্ষকতা করার সময় উসুলের বইপত্র পড়ানো শুরু করেন। খতিব তাবরেজি ও তার শিষ্য আবু মানসুর সাহিত্যের বইপত্র যোগ করেন। পরে জামিয়া নিজামিয়াতে হাদিস, তাফসীর, ফিকহ, উলুমুল কোরান, ইলমুল কালাম, নাহু সরফ, বালাগাত, লুগাত, মাআনি, মুনাজারা এসব শাস্ত্রও পড়ানো শুরু হয়। যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা জামিয়া নিজামিয়াতে দরস দিতেন।[৫৯]

ভারতবর্ষের মাদরাসা

হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। প্রথম দিকে দক্ষিন ভারতের মালাবার অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন। তখন মসজিদেই তারা

---

[৫৮] জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ কা ইলমি ও ফিকরি কিরদার, পৃষ্ঠা ১৪০-১৯৭- ড সোহাইল শফিক। ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়।

[৫৯] জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ কা ইলমি ও ফিকরি কিরদার, পৃষ্ঠা ১৪০-১৯৭- ড সোহাইল শফিক। ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাঠদানের কাজ সারতেন। ৫৮৭ হিজরীতে শিহাবুদ্দিন ঘুরী আজমীর বিজয়ের পর সেখানে কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে মুসলিম শাসকরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। মাদরাসার জন্য জমি ওয়াকফ করা হয়। শিক্ষকদের ভাতা দেয়া হয়।[৬০] [৬১]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের পাঠ্যক্রম

ভারতবর্ষের বিস্ময়কর প্রতিভা শায়খ আব্দুল হাই হাসানি নদভী ভারতবর্ষে মুসলমানদের পাঠ্যক্রমকে চার যুগে বিন্যস্ত করেছেন। এর চতুর্থ যুগটি দরসে নেজামীর, যা এখনো চলমান। আপাতত তার লেখা থেকে প্রথম তিন যুগ উদ্ধৃত করছি।

প্রথম যুগ

এই যুগের শুরু হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে। সমাপ্তিকাল হিজরী দশম শতাব্দী। প্রায় দুইশ বছরের বেশি সময়কাল এই পাঠ্যক্রম চালু ছিল। এ সময় যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো তা হলো, নাহু, সরফ, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতেক, ইলমুল কালাম, তাসাউফ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদী। নাহুর জন্য পড়ানো হতো মিসবাহ, কাফিয়া এবং কাজী নাসিরুদ্দীন বায়জাভির লুব্বুল আলবাব। পরে কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর ইরশাদ ও পড়ানো হতো।

ফিকহ = হেদায়া
উসুলে ফিকহ = মানার এবং তার শরাহ, উসুলে বাযদাভী
তাফসীর = মাদারেক, বায়জাভী, কাশশাফ
তাসাউফ = আওয়ারেফ, ফুসুস। (পরবর্তীকালে খানকাহ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলোতে নকদুন নুসুস পড়ানো হতো)
হাদীস = মাশারিকুল আনোয়ার, মাসাবিহুস সুন্নাহ
আদব = মাকামাতে হারিরি। এর মাকামাতগুলো মুখস্থ করানো হতো।
নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মালফুজাত থেকে জানা যায় তিনি তার উস্তাদ শামসুদ্দীন খাওয়ারেজমীর কাছে মাকামাত পড়েছিলেন এবং এর চল্লিশটি মাকামাত মুখস্থ করেছেন।
মানতেক = শরহে শামসিয়্যাহ

---

60 ইসলামি উলুম ও ফুনুন হিন্দুস্তান মে, পৃষ্ঠা- ১৯-৩০, — আব্দুল হাই হাসানি নদভী। দারুল মুসান্নেফিন আযমগড়।

61 হিন্দুস্তান কি কদিম ইসলামি দরসগাহে, পৃষ্ঠা-১৬ — আবুল হাসানাত নদভী। দারুল মুসান্নেফিন আযমগড়।

ইলমুল কালাম = শরহে সহায়েফ, কোথাও কোথাও আবু শাকুর সালেমির তামহিদ।

(এই যুগটি জামেয়া নিজামিয়া প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কাছের যুগ।দেখা যাচ্ছে ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়া পাঠ্যতালিকাভুক্ত। যা কোনোভাবেই জামেয়া নিজামিয়ার পাঠ্যক্রম হতে পারে না। জামিয়া নিজামিয়ায় শাফেয়ী মাজহাব ছাড়া অন্য মাজহাবের কাউকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো না[৬২]। এমনকি কোনো শিক্ষক শাফেয়ী মাজহাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাকে বরখাস্ত করা হতো। সেক্ষেত্রে হেদায়ার মত কিতাব নিজামিয়ার পাঠ্য থাকবে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই ভারতবর্ষে জামিয়া নিজামিয়ার পাঠ্যক্রমের কোনো প্রভাব ছিল না)

দ্বিতীয় যুগ

হিজরী নবম শতাব্দীর শেষভাগে মুলতান থেকে শেখ আবদুল্লাহ ও শেখ আজিজুল্লাহ নাম দুজন আলেম আসেন। শেখ আবদুল্লাহ দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং শেখ আজিজুল্লাহ সাম্বলে অবস্থান নেন। সিকান্দার লোদী তাদের কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বিভিন্ন সময় তাদের দরসেও উপস্থিত হতেন। তার আগমনে যেন দরসে ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য তিনি সরাসরি দরসে না বসে মসজীদের এক কোনে বসে পড়তেন। পরে দরস শেষ হলে শেখ আব্দুল্লাহর সাথে গিয়ে দেখা করতেন। এই দুই আলেম নিজেদের যোগ্যতাবলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় শীঘ্রই পুরো ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে তারা পাঠ্যক্রমে কাজী ইযদের আল মাওয়াকিফ এবং সাক্কাকীর মিফতাহুল উলুম অন্তর্ভুক্ত করেন।
মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ূনী মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখে লিখেছেন, ‘সুলতান সিকান্দার লোদীর যুগে শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর শায়খ আব্দুল্লাহ তালবানী এবং সাম্ভলের শেখ আজিজুল্লাহ তালবানী । এই দুজন মুলতানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে হিন্দুস্তানে এসে ইলমে মাকুল কে এদেশে প্রসারিত করে ছিলেন। এ দুজনের পূর্বে শরহে শামসিয়া এবং শারহে সাহায়েফ ব্যতিত ইলমে মানতেক এবং কালামের অন্য কোন কিতাব ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না’।

---

[৬২] আহমাদ বিন আলী বিন বোরহান প্রথম জীবনে ছিলেন হাম্বলি। পরে তিনি শাফেয়ী মাজহাব অনুসরণ করেন এবং নিজামিয়ার শিক্ষক হন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৬/২৬৫, -- ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ)

এ সময় মীর সাইয়েদ শরীফের ছাত্ররা শহরে মাতালি ও শরহে মাওয়াকিফ এবং তাফতাজানির শিষ্যরা মুখতাসারুল মা'আনি ও শরহে আকাইদে নাসাফী পড়ানো শুরু করেন। শরহে জামী ও শরহে বেকায়াও এ সময় ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রমে প্রবেশ করতে থাকে। এই যুগের শেষদিকের একজন আলেম যিনি তার সময়কালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বও বটে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী আরবে যান এবং সেখানে তিন বছর অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি এবং তার সন্তানরা হাদীসের এই বরকতময় সিলসিলার প্রচার প্রসারে মনোযোগী হন কিন্তু তাদের এই ধারা বেশিদিন সচল থাকে নি। এই সৌভাগ্য অর্জন করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। সে যুগের উলামায়ে কেরামের জীবনি পড়লে এটা পরিস্কার হয়, সেকালে মিফতাহুল উলুম ও মাওয়াকিফকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। মুফতী জামাল খানের জীবনিতে বাদায়ুনী লিখেছেন, 'তিনি দরসে বসে মিফতাহুল উলুম ও মাওয়াকিফ আগাগোড়া চারবার পড়েছেন'।

তৃতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যক্রমে যেসকল পরিবর্তন , পরিবর্ধন এসেছে তার ফলে আলেমরা আরো আশাবাদী হন এবং পাঠ্যক্রমে যে কোনো পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। এ কারনেই আকবরের শাসনামলে যখন শেখ ফতহুল্লাহ সিরাজী আসেন এবং পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন আনেন , তা সর্বত্র সমাদৃত হয়। মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী 'মাআছিরুল কিরামে' লিখেছেন, 'পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে মীর সদরুদ্দীন, মীর গিয়াসুদ্দিন মানসুর, মীর্জা জান প্রমুখ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দরসদানে মনোযোগী হন'। এই আলোচনায় অবশ্যই শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন গুজরাটির নাম নিতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম মুতাআক্ষেরিন উলামায়ে কেরামের বইপত্র পড়ানো শুরু করেন। তার এই ধারা গুজরাটের বাইরেও জনপ্রিয়তা পায়। তার ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ইলমের প্রদীপ জ্বেলেছেন। মুফতী আব্দুস সালাম ছিলেন ফতহুল্লাহ সিরাজীর ছাত্র। তিনি চল্লিশ বছর লাহোরে বসে দরস দেন। হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে পড়তো। অবশ্য তিনি খুব কম ছাত্রকেই সনদ দিতেন। দেওয়াহর মুফতী আব্দুস সালাম এবং এলাহাবাদের শায়খ মুহিব্বুল্লাহ এমনই দুই ভাগ্যবান যারা লাহোরে পড়াশুনা করেন এবং সনদ অর্জন করেন। তাদেরই ছাত্র শায়খ কুতুবুদ্দীন সাহালভি, যিনি দরসে নিজামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীনের পিতা। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত্যু ১১৭৪ হিজরী), যিনি এই পাঠ্যক্রমের সবচেয়ে বিখ্যাত আলেম, তিনি নিজের ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন। *তা নিম্নরূপ :*

নাহু = কাফিয়া, শরহে জামী।
মানতেক = শরহে শামসিয়া, শরহে মাতালি।
দর্শন = শরহে হেদায়াতুল হিকমাহ।
কালাম = শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহে মাওয়াকিফ।
ফিকহ = শরহে বেকায়া, হেদায়া।
উসুলে ফিকহ =হুসামি এবং তালবি আলাত তাওজি এর কিছু অংশ।
বালাগাত = মুখতাসারুল মাআনি , মুতাওয়াল।
গনিত = নির্বাচিত কিছু পুস্তিকা।
চিকিৎসা বিজ্ঞান = মুজিজুল কানুন।
হাদীস = মিশকাতুল মাসাবিহ (সম্পূর্ণ), শামায়েলে তিরমিযি (সম্পূর্ণ), সহীহ বুখারীর কিছু অংশ।
তাফসীর = তাফসীরে মাদারেক, বায়যাভী।
তাসাউফ = আওয়ারেফ, রাসায়েলে নকশেবন্দীয়া, শরহে রুবাইয়াতে জামী, মুকাদ্দিমা নাকদুন নুসুস।

এসব পড়া শেষে শাহ সাহেব আরবে যান। সেখানে তিনি শায়খ আবু তাহের মাদানীর কাছে অবস্থান করে ইলমে হাদীস চর্চা করেন এবং এই উপহার নিয়ে দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে তিনি হাদীস চর্চার যে মশাল জ্বেলেছেন তার আলো আজো জ্বলছে। মূলত শাহ সাহেবের সময়কাল থেকেই ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সিহাহ সিত্তার পঠনপাঠন শুরু হয়। শাহ সাহেব এ সময় নতুন একটি পাঠ্যক্রম প্রনয়ণ করেন। কিন্তু ততোদিনে ইলমের কেন্দ্র দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে লখনৌতে চলে গেছে। ফলে শাহ সাহেবের এই পাঠ্যক্রম খুব একটা কার্যকরী হয় নি এবং শাহ সাহেবের সন্তানরাও এই পাঠ্যক্রমকে প্রচার করার আগ্রহ দেখান নি।[৬৩]
শায়খের দীর্ঘ লেখা উদ্ধৃত করার পর এবার আমরা দরসে নেজামি ও এর প্রতিষ্ঠাতার আলোচনা করবো।

মোল্লা নিজামুদ্দিন সহালভী

লখনৌ থেকে ২৮ মাইল দূরে সহালি নামক এলাকায় ১০৮৮/৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৬৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে মোল্লা নিজামুদ্দিনের জন্ম। তার পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দিন ছিলেন তার সময়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। বংশীয় শত্রুতার জের ধরে

[৬৩] মাকালাতে শিবলী , ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৮-১০৭, — আল্লামা শিবলী নোমানী। দারুল মুসান্নেফিন আযমগড়।

১১০৩ হিজরীতে মোল্লা কুতুবুদ্দিন কে হত্যা করা হয়। নিজামুদ্দিন তার ভাইদের সাথে লখনৌ পালিয়ে আসেন। ১১০৫ হিজরীতে মুঘল সম্রাট আলমগীর তাদের জন্য ফিরিংগি মহল এলাকায় একটি দোতলা ভবন নির্মান করে দেন। মোল্লা নিজামুদ্দিন এখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ইলমের অন্বেষনে বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। শেষে বেনারসের হাফেজ আমানুল্লাহ বেনারসির কাছে শিক্ষাজীবনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। পড়াশোনা শেষে তিনি দরস দেয়া শুরু করেন। দরসদানকালে তিনি নতুন একটি পাঠ্যক্রম চালু করেন। পাঠ্যক্রম প্রনয়নকালে তিনি পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দিনের উদ্ভাবিত পন্থাকে সামনে রাখেন ।অর্থাৎ এককভাবে এই পাঠ্যক্রম তার উদ্ভাবন নয়।তার পিতাই সর্বপ্রথম এই পাঠ্যক্রম প্রনয়ন করেন। তিনি একে পরিমার্জন করেন। তবে তার নামে এই পাঠ্যক্রম পরিচিত হয় দরসে নেজামী নামে। খুব শীঘ্রই এই পাঠ্যক্রম ভারতবর্ষের সর্বত্র গ্রহনযোগ্যতা পায়। ১১৬১ হিজরীতে (১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ) তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৪] দরসে নেজামী

এবার দরসে নেজামীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলীর নাম দেখা যাক

ইলমুস সরফ (শব্দ ও তার রুপান্তর শাস্ত্র) = মীযানুস সরফ , মুনশায়িব, পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুস সীগাহ (মুফতী ইনায়েত আহমাদ কাকুরী প্রনীত), ফুসুলে আকবরী, শাফিয়া।

নাহু (ব্যাকরণ) =নাহবেমীর, মিয়াতে আমেল (আব্দুল কাহির জুরজানির ব্যখ্যাসহ), আবু হাইয়ান আন্দালুসীর হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে জামী।

মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) =সুগরা-কুবরা, মুখতাসার ঈসাগুজি, তাহযিবুল মানতিক ওয়াল কালাম, শরহে তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, সুল্লামুল উলুম।

হিকমত ও ফালসাফা (দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান)=হিদায়াতুল হিকমাহ ব্যখ্যাগ্রন্থ মারযুবী, সদরা, শামসে বাযেগা।

গণিত =খুলাসাতুল হিসাব ওয়াল হানদাসা, উসুলুল হানদাসাতিল ইকলীদাস, তাশরিহুল আফলাক, রিসালাতু কুশজিয়া, শরহে চুগমীনী (প্রথম অধ্যায়)।

বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) =মুখতাসারুল মাআনি, মুতাওয়াল ।

ফিকহ =শরহে বেকায়া, হেদায়া।

উসুলে ফিকহ =নুরুল আনোয়ার, আত তাওহীদ ফী হাললি গাওয়ামিদিত তানকীহ, আত তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবুত।

---

64 ইসলামি উলুম ও ফুনুন হিন্দুস্তান মে, পৃষ্ঠা-৩০, — আব্দুল হাই হাসানি নদভী। দারুল মুসান্নেফিন আযমগড়।

ইলমে কালাম =শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহুল আকাইদিল আদদিয়া, মীর যাহেদ।
তাফসীর =তাফসীরে জালালাইন, বায়জাভী।
হাদীস =মিশকাতুল মাসাবিহ।[৬৫]
এবার আমরা দরসে নেজামীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলীর লেখকদের জীবনি নিয়ে আলোচনা করবো। দেখা যাবে তাদের অনেকের জন্মই হয়েছে নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পর। যা থেকে দরসে নেজামীকে নিজামুল মুলকের দিকে সম্পর্কিত করার অসারতা প্রমান হবে। ইনশাআল্লাহ।

দরসে নেজামীর কয়েকটি কিতাব ও তার লেখক

১। তাফসীরে জালালাইন- লেখক দুজন। জালালুদ্দিন মহল্লী। জন্ম ৭৯১ হিজরীতে। অপরজন জালালুদ্দিন সুয়ুতী। জন্ম ৭৪৯ হিজরী।[৬৬]
২। মিশকাতুল মাসাবিহ– খতীব তাবরেজি। ইন্তেকাল ৭৪০ মতান্তরে ৭৪৮ হিজরী। নিজামুল মুলকের ইন্তেকাল ৪৮৫ হিজরীতে। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায় নিজামুল মুলকের ইন্তেকালের পর মিশকাতের সংকলকের জন্ম।[৬৭]
৩। হেদায়া — বুরহানুদ্দিন আলি ইবনে আবু বকর। জন্ম ৫১১ হিজরীতে।[৬৮]
৪। সুল্লামুল উলুম — লেখক মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী। ইনি ১১১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৬৯]
৫। মুসাল্লামুস সুবুত — ঐ
৬। নুরুল আনোয়ার — মোল্লা জিয়ুন। জন্ম ১০৪৮ হিজরী।[৭০]
৭। ফুসুলে আকবরী — আলী আকবর। সম্রাট আলমগীরের যুগে জন্ম।[৭১]
৮। কাফিয়া — জামালুদ্দিন আবু আমর উসমান। জন্ম ৫৭০ হিজরীতে।[৭২]
৯। নাহবেমীর — মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানি। জন্ম ৭৪০ হিজরীতে।[৭৩]

---

[৬৫] ইসলামি উলুম ও ফুনুন হিন্দুস্তান মে, পৃষ্ঠা-৩০, — আব্দুল হাই হাসানি নদভী। দারুল মুসান্নেফিন আযমগড়।
[৬৬] হালাতে মুসান্নেফিনে দরসে নেজামি, পৃষ্ঠা, ৩৩/৩৪– মাওলানা হানিফ গাংগুহী। দারুল ইশাআত করাচী।
[৬৭] প্রাগুক্ত, ১৪০ পৃষ্ঠা।
[৬৮] প্রাগুক্ত, ১৫৫ পৃষ্ঠা।
[৬৯] প্রাগুক্ত, ২৮৬ পৃষ্ঠা।
[৭০] প্রাগুক্ত, ১৮৬ পৃষ্ঠা।
[৭১] প্রাগুক্ত, ২৫৫ পৃষ্ঠা।
[৭২] প্রাগুক্ত, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
[৭৩] প্রাগুক্ত, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

১০। সুগরা কুবরা –ঐ
১১। শরহে জামী — আবুল বারাকাত ইমাদুদ্দিন আব্দর রহমান। জন্ম ৮১৭ হিজরীতে।[৭৪]
১২। মুখতাসারুল মাআনি– সাদুদ্দিন তাফতাজানি। জন্ম ৭২২ হিজরীতে।[৭৫]
১৩। শরহে আকাইদ — ঐ
১৪। তালবীহ — ঐ
১৫। তাহযিবুল মানতেক — ঐ
১৬। কুতবী — আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন। জন্ম ৬৯২ হিজরীতে।[৭৬]
১৭। ইসাগুজি — আসিরুদ্দিন মোফাজ্জল বিন আমর। মৃত্যু ৬৬০ হিজরী।[৭৭]
১৮। হিদায়াতুল হিকমাহ — ঐ
১৯। সদরা — সদরুদ্দিন মোহাম্মদ। মৃত্যু ১০৬১ হিজরী।[৭৮]
২০। শামসে বাজেগা — মাহমুদ বিন মোহাম্মদ। জন্ম ৯৯৩ হিজরী।[৭৯]
২১। শরহে চুগমিনি — সালাহুদ্দিন মুসা পাশা। মৃত্যু ৮৯৯ হিজরী।[৮০]
২২। তাশরিহুল আফলাক — বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ বিন হুসাইন। মৃত্যু ১০৩০ হিজরী।[৮১]
২৩। খুলাসাতুল হিসাব — ঐ

দরসে নেজামীর অন্তত ২৩টি কিতাবই রচিত হয়েছে নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পরে। এরপরেও কী করে এই পাঠ্যক্রমকে নিজামুল মুলকের সাথে সম্পর্কিত করা হয় তা অবাক করার মতো বিষয়। বস্তুত যারা নিজামুল মুলকের সাথে দরসে নেজামীকে গুলিয়ে ফেলেন তারা অনুমানের ভিত্তিতেই এমনটা করেন। প্রকৃতপক্ষে দরসে নেজামীর সাথে নিজামুল মুলকের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে দরসে নেজামী দেখা যায় তা মূল দরসে নেজামীর পরিমার্জিত রুপ। ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে এটি বর্তমান রুপ লাভ করেছে। এই পরিবর্তনের ইতিহাস এখানে প্রাসংগিক নয়।

---

[৭৪] প্রাগুক্ত, ২৬৬ পৃষ্ঠা।
[৭৫] প্রাগুক্ত, ২৭২ পৃষ্ঠা।
[৭৬] প্রাগুক্ত, ২৮১ পৃষ্ঠা।
[৭৭] প্রাগুক্ত, ২৭৯ পৃষ্ঠা।
[৭৮] প্রাগুক্ত, ২৯৬ পৃষ্ঠা।
[৭৯] প্রাগুক্ত, ২৯৭ পৃষ্ঠা।
[৮০] প্রাগুক্ত, ৩০৩ পৃষ্ঠা।
[৮১] প্রাগুক্ত, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

হারিয়ে যাওয়া কুতুবখানা

সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো রায় থেকে সমরকন্দ। হায় হায় করে উঠলো সবাই। রেশম পথের ধারে সরাইখানাগুলোতে পরিব্রাজক দলের মুখরোচক আড্ডায় বারবার ঘুরে ফিরে আসলো কথাটা । প্রথমে কেউ কেউ অবিশ্বাস করলেও জানা গেলো সংবাদটা আসলেই সত্যি । আগুন লেগেছে বাগদাদের জামিয়া নিজামিয়ার কুতুবখানায় । অবশ্য খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতির আগেই বেশিরভাগ বই সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। সময়কাল ৫১০ হিজরী । ইবনে আসীর ৫১০ হিজরীর ঘটনাবলীতে এই অগ্নিকান্ডের কথা উল্লেখ করেছেন।

সব কুতুবখানার ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন হয় নি । বসরার দারুল কুতুবের কথাই ধরা যাক। ৪৮৩ হিজরীতে আগুন লেগে পুড়ে গেলো এই কুতুবখানা । ৫৫৬ হিজরীতে নিশাপুরে আভ্যন্তরীন গোলযোগে পুড়ে গেলো ১২ টি কুতুবখানা ।

৫৬৭ হিজরীতে আইয়ুবীরা মিসরে প্রবেশ করার পর ফাতেমীদের কুতুবখানার এক বিরাট অংশ আগুনে পোড়ানো হয়, নীলনদে ডুবানো হয়। ৫৪৮ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ বিন সুবক্তগীন যখন রায় শহর অধিকার করেন তখন পোড়ানো হয় রাফেজীদের বইপত্র।

কায়রোর বিখ্যাত বাইতুল ইলমের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হাকেম বি আমরিল্লাহ । মাত্র ৬৪ বছর পরে ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর উযির আবুল ফারাজ সেই কুতুবখানায় এলেন ২৫ টি উট নিয়ে । ২৫ উট ভর্তি বইপত্র নিয়ে এক লাখ দিনারে বিক্রি করে দেন। সেই টাকায় সেনাবাহিনীর বেতনভাতা পরিশোধ করেন। কয়েক মাস পর তুর্কীরা বিজয় লাভ করে কায়রো প্রবেশ করে। পুড়িয়ে ফেলে বাইতুল ইলমের বইপত্র। কেউ কেউ আবার ব্যস্ত ছিল বইয়ের বাধাই খুলে সুতা তৈরীতে ।

মধ্য এশিয়ার কুতুবখানাগুলো ধংস করে তাতারীরা। কী পরিমান কুতুবখানা ছিল মধ্য এশিয়ায় তা ইয়াকুত হামাভীর বিবরণ থেকে ধারণা করা যায় । হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি মার্ভ শহরে ভ্রমন করেন। সেখানে তখন ১২ টি কুতুবখানা ছিল। এগুলো ছিল সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত। একটি কুতুবখানায় তিনি ১২০০০ বই দেখেছেন। গোবী থেকে ধেয়ে আসা তাতারী ঝড়ে বিপর্যস্ত হয় সোনালী গম্বুজের শহর সমরকন্দ । হারিয়ে যায় নিশাপুর , হেরাত ও বলখের কুতুবখানাগুলো। রায় এবং হামাদানের মধ্যবর্তী সাওয়াহ একটি ছোট শহর। এখানের কুতুবখানা ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন তাতারীরা শহরে হামলা করে পাইকারী গনহত্যা চালায় এবং এই কুতুবখানা পুড়িয়ে ফেলে। ৬৫৬ হিজরীতে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পতন হয় । ধংস হয় বাইতুল হিকমাহ । দজলার পানিতে ডুবানো হয় বই , কালো হয়ে যায় দজলার পানি । বাগদাদেও সেদিন পুড়ছে বই। তাতারীরা মাসউদ বেগের কুতুবখানা পুড়িয়েছে ৬১৭ হিজরীতে (১২২০ খ্রিস্টাব্দ), বোখারায়। পারস্যে খারেজম শাহের পাঠাগার ছিল সুপ্রসিদ্ধ। চেংগিজ খানের তাতারী বাহিনী যখন পারস্যে প্রবেশ করলো তারা জনপদে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালায় । পুরো কুতুবখানা ধবংস করে দেয় । এটা ৬১৮ হিজরীর (১২২১ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনা।তাতারীরা দামেশকের কুতুবখানায় আগুন ধরিয়ে দেয় ৭০০ হিজরীতে (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) ।

মাহমুদুদ্দৌলা ইবনে ফাতিক। একাদশ শতকের ফাতেমী যুবরাজ। বইয়ের প্রচন্ড নেশা ছিল। যুদ্ধের ময়দানেও বই নিয়ে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে আবার বইয়ে ডুবে যেতেন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী একদিন স্বামীর পাঠাগার দেখতে এলেন । বইগুলো দেখেই তার রাগ উঠে যায়। দাসীদের আদেশ দিলেন সব বই হাউজে ফেলতে। তাই করা হলো। পরে একজন সামান্য কিছু বই উদ্ধার করেছিলেন।

কিতাব পোড়ানোর এই যজ্ঞে শামিল আছে ইউরোপিয়ান ক্রুসেডাররাও। ৫০৩ হিজরীতে তারা তরাবলিসের কুতুবখানা পুড়িয়ে ফেলে। ১১০৯ খ্রিস্টাব্দে ধংস করা হয় ত্রিপোলির কুতুবখানা । ক্রুসেডাররা যখন ধেয়ে আসে মুসলিম বিশ্বের দিকে তখন তারা ধবংস করে শহরের পর শহর। তাদের তান্ডবলীলায় পুড়েছে সাজানো জনপদ, পুড়েছে বই। তরাবলিস, কুদস, আসকালান ও অন্যান্য অঞ্চলে তারা যে পরিমান বই পুড়িয়েছে তার পরিমান ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। ড মোস্তফা আস সিবাইয়ের মতে সেদিনের পৃথিবীতে ক্রুসেডারদের হাতে পুড়েছে ত্রিশ লক্ষ বই। স্পেন যখন আমাদের হাতছাড়া হলো, আমরা হারালাম আমাদের আন্দালুসকে, তখন গ্রানাডার ময়দানে একদিনেই পোড়ানো হয়েছে দশ লক্ষ বই। হালাবের বিখ্যাত খাজানাতুস সুফিয়াহ ধবংস হয় শিয়া সুন্নী দাংগায়। আশুরার দিনে

সংঘটিত এই দাংগায় এই পাঠাগারের বেশিরভাগ বইই পুড়ে যায়। বার্বাররা যখন কর্ডোভা প্রবেশ করে তারা লুটপাট চালায় হাকেম মুস্তানসিরের পাঠাগারে। প্রচুর বইপত্র তারা বিক্রি করে দেয়। বাকিগুলো ধবংস করে।

কখনো আবার নিজেই পুড়িয়েছেন নিজের বই। উরওয়াহ ইবনে যুবাইর এমনই একজন। ৯১ হিজরী তথা ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালকারী এই তাবেয়ী নিজের সব বইপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। কিতাব পোড়ানোর এই যজ্ঞে শরিক হয়েছেন আবু ওমর বিন আলা (মৃত্যু ১৫৪ হিজরী/৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) । তার সম্পর্কে আবু উবাইদা জানাচ্ছেন, আবু ওমর অন্যদের চেয়ে আইয়ামে আরব ও কবিতায় অধিক জ্ঞান রাখতেন। তার বইয়ের সংগ্রহ ঘরের ছাদ ছুয়েছিল। এরপর তিনি যুহদের পথ অবলম্বন করেন এবং নিজের বইপত্র পুড়ে ফেলেন ।

কখনো কখনো কিতাব পুড়েছে দুর্ঘটনায়। মিসরের কাজী আব্দুল্লাহ বিন লাহিমার গৃহে আগুন লেগে তার সব বইপত্র পুড়ে যায়। ৫১০ হিজরীতে আগুন ধরে জামিয়া নিজামিয়ার কুতুবখানায়। অবশ্য খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতির আগেই আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হয়।

অনেকসময় বই নষ্ট করার পেছনে ছিল রমনীর হাত। একটু আগে বলা হয়েছে ফাতেমী যুবরাজ ইবনে ফাতিকের কথা। তার মতোই এমন ঘটনা ঘটে খলীল বিন আহমাদের জীবনে। তিনি একটি সুন্দরী দাসী ক্রয় করেছিলেন। দাসী তার উপর মনক্ষুন্ন ছিলো কারন খলিল সারাদিন কিতাবুল আইন পড়তেন। শীঘ্রই বইটি দাসীর চক্ষশূল হয়ে উঠে। একদিন সে বইটি পুড়িয়েই ফেলে। খলীল এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন কারন তার কাছে বইটির আর কোনো কপি ছিল না।

বই পুড়েছে নানা কারনে । সময়টা তখন অস্থির। দফায় দফায় হচ্ছে ক্ষমতার পালাবদল। ক্ষমতার পালাবদল মানেই ইতিহাসেরও পালাবদল। নতুন ভাবে রচিত হচ্ছে ইতিহাস। কখনো কখনো শাসকরা পুরনো বইয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে নিজেদের মনমত তথ্য। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে উস্কে দেয়া হচ্ছে বংশীয় কিংবা আকিদাগত বিরোধ। সচেতন লেখকরা তাই চিন্তাশীল। মৃত্যুর পর লেখাগুলো অবিকৃত থাকবে তো ?? কারো কারো কাছে মনে হলো নিজের লেখা পুড়িয়ে ফেলা বেশ ভালো সমাধান। বিকৃতির পথ চিরতরে রুদ্ধ। এ পথেই হেটেছেন ইবনুল জাআবি (মৃত্যু ৩৫৫ হিজরী/৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেলেছেন নিজের সব বইপত্র। ইমাম দারা কুতনি এ ঘটনার সময় তার পাশেই ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। সিরাফী (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী/৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) তার ছেলেকে অসিয়ত করেছেন তার বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। আবু হাইয়ান তাওহিদি (মৃত্যু ৪০০ হিজরী) ধারনা করেছিলেন তার মৃত্যুর পর তার বইপত্রের মর্ম মানুষ বুঝবে না। তাই সমাধান খুজলেন বই পোড়ানোর পথেই।

৪৪৮ হিজরী তথা ১০৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে শিয়া সুন্নী দাংগায় পুড়ে যায় মুহাম্মদ আবু জাফর তুসির ব্যক্তিগত কুতুবখানা। শাসকের রোষানলেও পুড়েছে বই। ইবনে হাজম আন্দালুসির (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী /১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ) বইপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন ইশবালিয়ার শাসনকর্তা মুতাজিদ বিন আব্বাদ। সুলতান মাহমুদ বিন সুবক্তগীন যখন রায় শহর দখল করলেন ৫৪৮ হিজরীতে তখন শহরের দারুল কুতুব পোড়ানো হলো। বেশিরভাগ ছিল ইলমে কালাম সম্পর্কে লিখিত বিদাতী ও রাফেজিদের বই। ৭৪৪ হিজরীতে (১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদের মাদরাসা আসরুনিয়াতে ইবনুল আরাবির বইপত্র ছিড়ে ফেলা হয়, যার মধ্যে ছিল ফুসুসুল হিকাম বইটিও। ৭৭৩ হিজরীতে (১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ) মোহাম্মদ বিন খতীবের বইপত্র পোড়ানো হয় আন্দালুসে।

দামেশকের জামে উমাভী। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার এক ঐতিহাসিক স্থান। দুবার আগুনে পুড়ে যায় জামে উমাভি। ধবংস হয় মূল্যবান অনেক বই। প্রথমবার আগুন লাগে ৪৬১ হিজরী/১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে । পরেরবার ৭৪০ হিজরী/১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে। বাগদাদে সাবুর বিন আরদশীরের কুতুবখানা পুড়ে গেল ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। তার এই কুতুবখানায় ছিল অনেক দুষ্প্রাপ্য বই। ৪৮৩ হিজরীতে (১০৯০ খ্রিস্টাব্দ) পুড়ে গেল বসরার দারুল কুতুব। ইবনুল আসীর ও ইবনুল জাওযি দুজনেই বর্ননা দিয়েছেন এই অগ্নিকান্ডের। ৪৯৯ হিজরীতে (১১০৫ খ্রিস্টাব্দ) পুড়ে যায় কাজী আবুল ফারাজ বিন আবুল বাকার কুতুবখানা।

কাজী সাদিদুদ্দিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ। আব্বাসী সালতানাতের কাজী। তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রিস্টাব্দ) ,মুস্তানজিদের আমলে। পুড়িয়ে ফেলা হয় তার বইপত্র। তার সংগ্রহে ছিল ইবনে সীনার কিতাবুশ শিফা, এবং ইখওয়ানুস সফার বইপত্র। একই বছর নিশাপুরে আভ্যন্তরীন গোলযোগের কারনে পোড়ানো হয় আকিল মসজিদের পাঠাগারে থাকা বইপত্র। ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) আইয়ুবীরা মিসরে প্রবেশ করে পোড়ালো ফাতেমীদের বইপত্র। খলীফা আজিজ বিল্লাহ প্রতিষ্ঠিত কায়রোর বিখ্যাত খাজানাতুল কুতুবের বইপত্র পোড়ানো হলো, নীলনদে ডোবানো হলো। কিছু বইপত্র মরুভূমিতে ফেলে রাখা হলো। মুরাবিতিনরা আন্দালুস দখলের পর দর্শনের বইপত্র পোড়ানো হয়। এর মধ্যে ইমাম গাজালির বইপত্রও ছিল। পরে আবার ক্ষমতার পালাবদলে মুয়াহহিদিনরা যখন ক্ষমতায় এলো, তারা পোড়ালো মুরাবিতিনদের বই। পরে আবার মুয়াহহিদিনরা হারলে মুরাবিতীনরা তাদের বই

পোড়ালো। মালেকি মাজহাবের বইপত্র নিয়ে যাওয়া হলো ফাস শহরে, পোড়ানো হলো জনসম্মুখে।৫৯৫ হিজরী (১১২১ খ্রিস্টাব্দে) আগুন লাগে ইস্ফাহানের জামে মসজিদে। পুড়ে যায় অনেক বইপত্র। ৫৯৯ হিজরীতে (১১২১ খ্রিস্টাব্দ) ক্রুসেডাররা ইস্তাম্বুল দখল করে। শুরু হয় গনহত্যা। পুড়িয়ে ফেলা হয় দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বিশাল সংগ্রহ।

হিংসার কারনেও পোড়ানো হয়েছে বই। আবদুস সালাম জিলী এমনই এক প্রতিহিংসার শিকার। খলীফা মুস্তানসির পুড়িয়েছেন ইবনুল আবারের বইপত্র। সময়কাল ৬৫৮ হিজরী (১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ) । ৩২২ হিজরীতে (৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদে পৌছান আবু বকর বিন মুকসিম। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে তিনি বিদআতি। পুড়িয়ে ফেলে হয় তার বইগুলো। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মিসরের কেল্লা জাবালের খাজানাতুল কুতুবে আগুন ধরে। পুড়ে যায় হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস , সাহিত্য বিষয়ক প্রচুর বই।

নাজাফের কুতুবখানায় আগুন লাগে ৮২৮ হিজরীতে (১৪২৪খ্রিস্টাব্দ)। পুড়ে যায় হজরত আলী র এর লেখা দুষ্প্রাপ্য একটি পান্ডুলিপি। দামেশকের মাদরাসা আদেলিয়্যাহ ও মাদরাসা কাজাইয়্যাহর কুতুবখানায় আগুন লাগে তৈমুর লঙ্গয়ের আক্রমনে । সময়কাল ৮০২ হিজরী (১৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। ইসমাইল শাহ প্রথম পুড়িয়েছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বইপত্র। সময়কাল ৮৯০-৯৩০ হিজরী (১৪৮৫-১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ)। স্থান পারস্য।

মুসলমানরা স্পেন শাসন করেছে প্রায় আটশো বছর। তারা স্পেনকে গড়ে তুলেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে । সেখান থেকে আলো নিয়েই ইউরোপ হয়েছে সভ্য। এগিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে। ৯০৫ হিজরীতে (১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ) গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। তারপর শুরু হয় মুসলমানদের বই পোড়ানোর মহতসব। আন্দালুসের কুতুবখানাগুলোর করুন পরিনতির কথা ভেবে ইতিহাস আজো কেদে উঠে। গ্রানাডার ময়দানে বার্বাররা একদিনেই পুড়িয়েছিল দশ লক্ষ বই।

কিতাব যেভাবে পুড়েছে , সেভাবে ডুবেছেও। আইয়ুবীরা মিসরে পৌছে ফাতেমীদের কিতাব পুড়িয়েছে, নীলনদেও ডুবিয়েছে। তাতারীরা বাগদাদের কুতুবখানার বইপত্র দজলার পানিতে নিক্ষেপ করেছে ।

বই পানিতে নিক্ষেপ করার প্রথম যে সংবাদ পাওয়া যায় , তা তাজুল উম্মাহ খ্যাত দাউদ তাঈ বিন নাসির আল কুফির (মৃত্যু ১৬৫ হিজরী/৭৮১ খ্রিস্টাব্দ)। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন তার সম্পর্কে , দাউদ তাঈ নিজের বইগুলো ফুরাত নদীতে ডুবিয়ে দেন। আবু উমর হারুরী (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী/৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সফর

করছিলেন পারস্যে, নৌপথে। নিহরাওয়ানে পৌছলে নদীতে প্লাবন আসে। ওজন কমানোর জন্য নদীতে অনেক মালপত্র ফেলে দেন। এর মধ্যে ছিল আবু উমর শায়বানীর (মৃত্যু ২০৮ হিজরী/৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) 'কিতাবুল জীম'। দুর্ঘটনায় পানিতে ডুবে যায় আহমাদ বিন মোহাম্মদ আল বাজ্জাজের (মৃত্যু ৪০৭ হিজরী/১০১৬ খ্রিস্টাব্দ) বইপত্র। আবুল আলা ছয়িদ বিন হাসান বিন ঈসা রিবয়ী মোসুলি (মৃত্যু ৪১৭ হিজরী/১০২৬ খ্রিস্টাব্দ) । মানসুর বিন আবু আমেরের সময় তিনি আন্দালুসে পৌছেন। মানসুর তাকে সম্মান করেন, অভ্যর্থনা জানান। আবুল আলা একটি বইও লেখেন মানসুরের জন্য। একজন গোলামের হাতে বইটি দিয়ে তাকে বলেন বইটি মানসুরের কাছে পৌছাতে। গোলাম হাটছিল কর্ডোভার বিখ্যাত নহরের পাড় ধরে। হঠাত পা পিছলে সে বইসহ নহরে পড়ে যায়। গোলাম অক্ষত উঠতে পারলেও বইটি নষ্ট হয়ে যায়।

আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহ (মৃত্যু ৪১৫ হিজরী/১০২৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ। তিনি প্রচুর বই লিখেছেন। তার মৃত্যুর পর তার বইপত্র ইবনে দীনার ওয়াসেতির হাতে আসে। পরে বন্যার সময় বেশিরভাগ বই পানিতে নষ্ট হয়ে যায় । বাগদাদের বন্যায় নষ্ট হয় ইবনে দুহানের (মৃত্যু ৫৬৯ হিজরী/১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত বই । বই পানিতে ডুবানোর সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে তাতারীদের হাতে বাগদাদ পতনের পর। সময়কাল ৬৫৬ হিজরী তথা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ। তাতারীরা নির্মমভাবে বাগদাদের পাঠাগারগুলো লুন্ঠন করে। বইপত্র নিক্ষেপ করে দজলা নদীতে। দজলা নদীর পানি কালো হয়ে যায় বইয়ের কালি উঠে। ১০৫৫ হিজরী তথা ১৬৪৫ সালে মক্কায় দেখা দেয় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা। বন্যার পানি প্রবেশ করে মসজিদে হারামে। নষ্ট হয় অনেক বইপত্র ।শায়খ আব্দুল আজিজ নাজফী ভারত, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। কেউ তার বইপত্র বিক্রি করে দেয় । আবার কেউ তার বইপত্র ফেলে নজফের নদীতে। তিন নৌকা বোঝাই বই যাচ্ছিল ফাতিকান শহরে । প্রতিটি নৌকায় ছিল ইতিহাস, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের বই। নদীতে ঝড় উঠেলে দুটি নৌকা ডুবে যায়। হারিয়ে যায় অনেক বই।

৭৫০ হিজরীতে (১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ডুবে যায় হজরত উসমান সংকলিত কোরআনের একটি কপি। এটি প্রথমে কর্ডোভার জামে মসজিদে ছিল। সুলতান আব্দুল মুমিন বিন আলীর শাসনামলে সেখান থেকে মারাকেশে আনা হয়। সুলতান আবুল হাসান মারিনী যখন আফ্রিকা জয় করেন তখন তিনি এই কপিটি নিজের

অধিকারে নেন। বরকত হিসেবে যুদ্ধযাত্রা ও সফরে এটি নিজের সাথে রাখতেন। ৭৫০ হিজরীতে তিনি নৌপথে তিউনেসিয়া থেকে মরক্কোর দিকে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। নৌকা ডুবে যায়। সাথে ডুবে যায় হজরত উসমানের স্মৃতিবিজড়িত এই কপিটিও।

তথ্যসূত্র :

১। আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা — ড. ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরী
২। মিন রাওয়াইউ হাদারাতিনা– ড. মোস্তফা আস সিবাঈ
৩। নাফহুত তীব মিন গুসনীল উন্দুলুসির রাতিব — আল্লামা মাক্কারি
৪। আল বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতিসারি আখবারী মুলুকিল উন্দলুস ওয়াল মাগরিব — আহমাদ বিন মুহাম্মদ মারাকেশী
৫। হারকুল কুতুব ফিত তুরাসিল আরাবি– নাসের হাজিমী।

আমাদের কুতুবখানা

মসুলে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আবুল কাসেম জাফর বিন হামদান মোসুলি (মৃত্যু ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। তার লাইব্রেরীতে দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত প্রচুর বই ছিল। লাইব্রেরী প্রতিদিন খোলা হতো।
দূর থেকে আসা লোকদের জন্য ছিল থাকার ব্যবস্থা। একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল, যেখানে আবুল কাসেম জাফর ইমলার দরস দিতেন তার লিখিত বইপত্র (যেমন আল বাহের ফিল আখবার) , ফিকহ, কবিতা ও ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে।
শুধু আবুল কাসেম জাফরই নন, এমন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম শাসক, আমীর ও আলেম-উলামাদের অনেকেই। আব্বাসী খলিফারা বাগদাদে, উমাইয়া খলীফারা আন্দালুসে এবং ফাতেমীরা মিশরে এসব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ, কায়রোর দারুল হিকমাহ, মাগরিব ও আন্দালুসের গ্রন্থাগারগুলো ছিল খলীফাদের প্রতিষ্ঠিত। এসব গ্রন্থাগারের বেশিরভাগই ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ধারা এতটাই ব্যপকতা লাভ করে, পরবর্তী সময়ে জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী নয় এমন আমীর কিংবা উজিররাও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা শুরু করেন। আলেম-উলামাদের খুব কমই এমন ছিলেন , যাদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল না।

উমাইয়া আমলে বড় কোনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত না হলেও আব্বাসীদের অভ্যুদয়ের পর অনুবাদ ও রচনা কর্মকান্ড বিপুল উতসাহে শুরু হয়। আত্মপ্রকাশ ঘটলো ওয়াররাকদের , কাগজও হয়ে উঠলো সহজলভ্য। এসময় থেকেই গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। আব্বাসী যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বৃহত্তম গ্রন্থাগার বাইতুল হিকমাহ বা খাজানাতুল হিকমাহ, যদিও এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের সামনে নেই। বাইতুল হিকমাহর খ্যাতি বিশ্বজুড়ে কিন্তু আজো নিশ্চিতভাবে জানা হয় নি কে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা? খলীফা হারুনুর রশীদ

নাকি খলীফা মামুনুর রশীদ? এই গ্রন্থাগারের অবস্থান কোথায় ছিল সে প্রশ্নের মীমাংসাও এখনো হয় নি। ড. আহমদ আমীন ও অন্যান্য গবেষকদের মতে খলীফা হারুনুর রশীদই এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা। এর স্বপক্ষে মজবুত দলীল হলো ইবনে নাদীমের বক্তব্য। তিনি লিখেছেন, আবু সাহল ফযল বিন নওবখত খলীফা হারুনুর রশীদের বাইতুল হিকমাহতে কর্মরত ছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদের সময়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও মামুনের শাসনামলে এটি সম্প্রসারিত হয়, এর কর্মসূচীও বিস্তৃত হয়। মামুন ছিলেন প্রচন্ড বিদ্যানুরাগী। দর্শনে তার আগ্রহ সর্বজনবিদিত। মামুন একবার রোম সম্রাটের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠান। এই দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে মাতার, ইবনুল বিতরীক ও অন্যান্যরা। তারা রোম থেকে বেছে বেছে বেশকিছু গ্রন্থ নিয়ে আসেন। সাইপ্রাস দ্বীপবাসিদের সাথে সন্ধির পর মামুন তাদের কাছে গ্রীক গ্রন্থভান্ডার চেয়ে পাঠান। সাইপ্রাসের শাসক গ্রন্থগুলো পাঠালে মামুন সাহল বিন হারুনকে ঐ গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বাইতুল হিকমাহর গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ছিলেন বীজগনিতের জনক মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজমীও। বাইতুল হিকমাহর কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল অন্য ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবীতে অনুবাদ করা। হুনাইন ইবনে ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনে মাতার, ইবনুল বিতরিক, আমর ইবনুল ফররুখান, ইসহাক ইবনে হুনাইন প্রমুখ বিভিন্ন সময় বাইতুল হিকমাহতে অনুবাদের দায়িত্বে ছিলেন।

বাইতুল হিকমাহর নাম নিয়েও আছে দ্বিমুখী বর্ননা। ইবনে নাদীম ও আল কুতফী বাইতুল হিকমাহ নামে একে অভিহিত করলেও ইয়াকুত হামাভী একে বলছেন খাজানাতুল হিকমাহ। বাইতুল হিকমাহর অবস্থান সম্পর্কে ড. আহমদ আমীনের বক্তব্য হলো, সম্ভবত এটি খলীফার প্রাসাদ এলাকার ভেতরেই ছিল। ৫৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) তাতারীদের হাতে বাগদাদ পতনের আগ পর্যন্ত বাইতুল হিকমাহ টিকে ছিল এটা বেশ জোরের সাথেই বলা যায়।

আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু হওয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এই ধারা শীঘ্রই বেগবান হয়। মুসলিমবিশ্বের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে গ্রন্থাগার। ড. মোস্তফা আস সিবাঈর মতে , ততকালীন মুসলিমবিশ্বের এমন কোনো গ্রাম পাওয়া মুশকিল ছিল যেখানে কোনো গ্রন্থাগার ছিল না। এ থেকে শহরগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে ছিল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের জন্য নির্মান করা হতো আলাদা ভবন। সেই ভবনে থাকতো বিভিন্ন কক্ষ। একেক কক্ষে একেক বিষয়ের গ্রন্থ। সাহিত্য গ্রন্থের কক্ষ, ফিকহ গ্রন্থের কক্ষ, বিজ্ঞান গ্রন্থের কক্ষ, ইতিহাস গ্রন্থের কক্ষ ইত্যাদী। পাঠকের জন্য থাকতো আলাদা কক্ষ।গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হতো কাগজ কলম। কোনো কোনো গ্রন্থাগারে আবার থাকা খাওয়ার

ব্যবস্থা ছিল। শুরুতে উল্লেখ করা আবুল কাসেম জাফরের গ্রন্থাগারটি এমনই। গ্রন্থাগার দেখভালের দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন যুগের অন্যতম খ্যাতনামা শিক্ষাবীদগন।ইমাম গাজালী কিছুদিনের জন্য জামেয়া নিজামিয়ার গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করছেন। ভারতবর্ষের বিখ্যাত কবি আমীর খসরু প্রথম জীবনে দিল্লীর শাহী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ইবনে সীনা ছিলেন সামানীয় শাসকের শাহী গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নিয়োজিত। পাঠকদের কে বই সরবরাহ করার জন্যেও কিছু লোক নিয়োগ দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো মুতানাবিল। অনুবাদক ও লিপিকাররাও থাকতেন তাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে। ওয়াররাকরা ব্যস্ত থাকতেন বই বাধাইয়ের কাছে। প্রচুর কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন এসব গ্রন্থাগারে। বিজাপুরস্থ আদীল শাহী গ্রন্থগারে কর্মরত ছিলেন ষাট জন কর্মচারী। স্পেনের খলীফা দ্বিতীয় হাকামের গ্রন্থাগারে ৫০০ কর্মী নিয়োজিত ছিল। আব্দুর রহমান খান খানানের গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন ৯৫ জন। ত্রিপোলীর বনু আম্মার গ্রন্থাগারে ১৮০ জন লিপিকার ছিলেন। ছোট বড় সব গ্রন্থাগারেই থাকতো পুস্তক তালিকা বা ক্যাটালগ। ক্যাটালগ দেখে সহজেই যে কোনো বই খুজে বের করা যেতো। প্রতিটি তাকের সাথে একটি ক্যাটালগ থাকতো , যাতে তাকে থাকা বইগুলোর নাম লেখা থাকতো। এসব গ্রন্থাগার থেকে জামানত দিয়ে বই বাইরে নেয়া যেতো, তবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জামানত দেয়ার প্রয়োজন হতো না। এসকল গ্রন্থাগারের আয়ের উতস ছিল নানা ধরনের। অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই নিজস্ব ওয়াকফ থাকতো। অনেক সময় প্রতিষ্ঠাতারা নিজেরাই ব্যায়ভার বহন করতেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক আয যাইয়াত তার গ্রন্থাগারের নকল নবীশ ও লিপিকারদের মাসিক দুই হাজার দিনার ভাতা প্রদান করতেন। হুসাইন বিন ইসহাক ছিলেন খলীফা মামুনের অনুবাদক। খলীফা তার অনূদিত গ্রন্থকে স্বর্ণ দিয়ে ওজন করে তাকে অনুবাদের বিনিময় দান করতেন। ইয়াকুত আল হামাভী হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে মার্ভ ভ্রমন করেন। সেখানে তখন ১২ টি পাবলিক লাইব্রেরী ছিল। এর মধ্যে একটি লাইব্রেরীর সংগ্রহ ছিল ১২ হাজার বই। ইয়াকুত হামাভী সেখান থেকে ২০০ বই ঘরে এনে পড়েছেন। ৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ফাহানে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ৯৬৫ সালে স্থাপিত হয় নিশাপুরের লাইব্রেরী। কাজী আবু আল মুতরিফের ইন্তেকাল হয় ১১০১ খ্রিস্টাব্দে। তার সংগ্রহের বইপত্র বিক্রয় করা হয় চল্লিশ হাজার দিনারে।

পাঠাগারের ইতিহাস বলতে গেলে অবশ্যই আসবে স্পেনের নাম। উমাইয়া শাসকরা স্পেনে প্রচুর পাঠাগার নির্মান করেছেন ও অর্থ বরাদ্দ করেছেন । দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বের শুরুর দিকেই কর্ডোভাতে একটি পাঠাগার নির্মান করা হয় । কালক্রমে এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থাগারে পরিনত হয়। তৃতীয়

আবদুর রহমান এটি আরো সম্প্রসারন করেন। তার পুত্র মুহাম্মদ অনেক বইপত্র সংগ্রহ করেন। খলীফা হাকামের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে ৬০ লাখ বই ছিল। বার্বারদের হাতে এটি ধবংস হয়। আলমেরিয়ার শাসক আবু জাফর ইবনে আব্বাসের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ৪ লক্ষ বই ছিল।

আবুল মোজাফফর ইবনে আফতার । আল মুজাফফারিয়া নামক ৫০ খন্ডের একটি বিশ্বকোষ প্রণেতা। তারও একটি বিশাল কুতুবখানা ছিল। টলেডো ও সারগোসাতে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। গ্রানাডায় বানু যুবাইদি ও ইবনে ফুরকানের গ্রন্থাগারের কথা ইতিহাসবিখ্যাত। শাফি বিন আলী (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী/১৩২৯ খ্রিস্টাব্দ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার গৃহে বিশ সিন্দুক ভর্তি বই পাওয়া যায় । অতিরিক্ত পড়াশোনার কারনে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু বইয়ের সাথে অধিক সম্পর্কের কারনে তিনি যেকোনো বইতে হাত দিয়ে বলতে পারতেন এটি এই বই, আমি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি। তার কাছে কোনো বই চাওয়া হলে তিনি দাঁড়িয়ে তাকে হাত হাত দিতেন এবং বইটি বের করে দিতেন। আল্লমা আলী বিন আহমাদ আল আমাদিও (মৃত্যু ৭১০ হিজরী/১৩১১ খ্রিস্টাব্দ) শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাকের যেকোনো বইতে হাত দিয়ে বইটির মোট খন্ড, তার হাতে থাকা খন্ডের কথা এবং বইটি কোন হস্তলিপিতে লেখা তা বলতে পারতেন। ইবরাহীম বিন ইসহাক হারবির কুতুবখানায় ১২০০০ বই ছিল। ইসরাইল বিন ইউনুস সাবিয়ী মৃত্যুকালে তার গৃহে বই ছাড়া আর কোনো কোনো আসবাব রেখে যান নি। মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন ফুরাতের গৃহে ছিল আঠারো সিন্দুকভর্তি বই। ইবনে উকদাহর (মৃত্যু ৩৩২ হিজরী/৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) সংগ্রহে ছিল প্রচুর বই। কখনো তার বই সরাতে হলে ৬০০ উটের প্রয়োজন হতো।
উলামায়ে কেরাম ইলমের জন্য বিশ্বের নানাপ্রান্তে সফর করতেন। এই সফরেও তাদের সাথে থাকতো নিজস্ব কুতুবখানা। যাহরাভীর (মৃত্যু ৪২৭ হিজরী/১০৩৫ খ্রিস্টাব্দ) বইপত্র আটজন কুলি বহন করতো।ইবনে মানদাহ (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী/১০০৪ খ্রিস্টাব্দ) চল্লিশ উটভর্তি বইপত্র নিয়ে চলাফেরা করতেন। বারকানি, বাগদাদের বিখ্যাত আলেম, সফরে বের হলে তার সাথে থাকত দুই সিন্দুকভর্তি বই।

নিশাপুরে প্রচুর কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মসজিদ ও মাদরাসার জন্য অনেক বইপত্র ওয়াকফ করে দেয়া হতো। স্বয়ং নিজামুল মুলক তার মাদ্রাসার জন্য প্রচুর বই ওয়াকফ করেন, যার মধ্যে ছিল ইবরাহিম হারবির লেখা দশ খন্ডের একটি সংকলনও। আবু হাতেম বিন হিব্বান (মৃত্যু ৩৫৪ হিজরী/৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তার সকল বই আলে যিয়াদের কুতুবখানায় ওয়াকফ করে দেন। মাদরাসা দারুস সুন্নাহর

কুতুবখানার জন্য প্রচুর হাদিসের কিতাব ওয়াকফ করা ছিল। আকিল মসজিদেও বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য বই ওয়াকফ করা ছিল, যা শুধু উলামাদের ব্যবহারের অনুমতি ছিল। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেই এর প্রতিষ্ঠাতারা ক্ষান্ত হতেন না । তারা মনোযোগ দিতেন বই সংগ্রহের প্রতি। মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে ঘুরে তাদের প্রতিনিধিরা সংগ্রহ করতো দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ বই। গড়ে উঠতো বইয়ের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ । কায়রোতে ফাতেমী খলীফারা যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন মাকরেযির মতে ১৬ লাখ বই ছিল। যদিও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সেখানে ২০ লাখ বই ছিল। ত্রিপলীর বনু আম্মার গ্রন্থাগারে দশ লাখ বই ছিল। চলুন, এবার মুসলিমবিশ্বের খ্যাতনামা কিছু গ্রন্থাগারের কথা জেনে আসা যাক।

আদাদ উদ দৌলার কুতুবখানা

আদাদ উদ দৌলা সিরাজে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে তোলেন । ভূগোলবিদ মাকদেসি এই কুতুবখানার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। পাঠাগারের ভবনটি ছিল সুরম্য অট্টালিকা। এর একপাশে ছিল নহর, অন্যপাশে সবুজ উদ্যান। এখানে এলে এক নিমিষেই যে কারো প্রাণ জুড়িয়ে যেতো। অট্টালিকাতে ৩৬০ টি কক্ষ ছিল। এসব কক্ষে আদাদ উদ দৌলা তার খেয়াল খুশিমত অবস্থান করতেন। কুতুবখানাটি ছিল বড় একটি হলঘরে।হলঘরে ছিল তিন গজ চওড়া ও মানুষ সমান উচু মাচান। মাচানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তাক। তাক ভর্তি শুধু বই আর বই। সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের বই সেই কুতুবখানায় ছিল। ছিল সুবিন্যস্ত ক্যাটালগও।

আবুল হাসান মোহাম্মদের কুতুবখানা

৪৫২ হিজরীতে (১০৬০ খ্রিস্টাব্দ) আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন হেলাল বিন মহসিন তার কুতুবখানাটি সর্বসাধারনের জন্য ওয়াকফ করে দেন । সাবুর বিন আরদশীরের কুতুবখানা পুড়ে যাওয়ার সংবাদে তিনি অত্যন্ত পেরেশান হন। ইলম বিলুপ্তির আশংকায় নিজের কুতুবখানা ওয়াকফ করে দেন। বাগদাদের পশ্চিম প্রান্তে ইবনু আবি আউফ সড়কে এটি অবস্থিত ছিল। এই কুতুবখানায় প্রায় চার হাজার বই ছিল। উলামায়ে কেরাম নিয়মিত এখানে আসা যাওয়া করতেন। এখানে বিতর্কের মজলিস বসতো। কুতুবখানাটি অবশ্য বেশিদিন টিকে নি। কোনো এক বিচিত্র কারনে আবুল হাসান এই কুতুবখানার সকল বই বিক্রি করে অর্জিত অর্থ সদকা করে দেন।

ইবনে শাহের কুতুবখানা

আবু মানসুর ইবনে শাহ মারওয়ান ছিলেন বসরার উযির। তিনি একটি কুতুবখানা ওয়াকফ করে দেন। এই কুতুবখানায় উলামায়ে কেরাম ও ছাত্ররা আসতো। এখানে

অনেক মূল্যবান বইপত্র ছিল। ইবনে আসিরের বর্ননামতে ৪৮৩ হিজরিতে এই কুতুবখানা পুড়ে যায়।

জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের কুতুবখানা

নিজামুল মুলক জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ প্রতিষ্ঠার সময় (৪৫৮ হিজরী) মাদ্রাসার জন্য একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবখানাটির অবস্থান ছিল মাদ্রাসার ভবনের এক অংশে। এখানে প্রচুর বই ছিল। নিজামুল মুলক বাগদাদ এলেই এই কুতুবখানায় আসতেন। বই পড়তেন।বিভিন্ন সময় আবু বকর জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আলী তাবরেযী, মুহাম্মদ বিন আহমাদ, আলি বিন আহমাদ বিন বাকেরী প্রমুখ এই কুতুবখানার পরিচালক ছিলেন। ৫৮৯ হিজরীতে খলীফা নাসির লিদিনিল্লাহর প্রাসাদ থেকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই কুতুবখানায় আনা হয়। ইবনুল জাওযি এই কুতুবখানার ক্যাটালগ দেখেছেন। তার মতে সেখানে ৬ হাজার বই ছিল।

মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

জামিয়া নিজামিয়া প্রতিষ্ঠার অর্ধ শতাব্দী পর জামিয়া মুস্তানসিরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহনের দুই বছর পর এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নিজামিয়া বাগদাদে শুধু শাফেয়ী মাজহাবের ফিকহ পড়ানো হতো। শাফেয়ী ছাড়া অন্যদের সেখানে পড়ার সুযোগ ছিল না। মুস্তানসিরিয়াতে চার মাজহাবের ছাত্ররাই পড়তে পারতো। এই মাদ্রাসার অবস্থান ছিল দজলা নদীর উত্তর প্রান্তে , খলীফার প্রাসাদের কাছাকাছি। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময়েই এখানে একটি কুতুবখানা নির্মাণ করে। খলীফা আদেশ দেন শাহী কুতুবখানা থেকে এখানে বইপত্র স্থানান্তর করতে। ২৯০টি ভারবাহী জন্তুতে করে প্রায় ৮০০০ বই আনা হয়। পরে এই কুতুবখানায় অনেক ওয়াররাক, আমীর ও আলেমরা তাদের বই উপহার দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানীগুনিরা এই কুতুবখানা পরিদর্শনে আসতেন। ইবনে বতুতা ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে এই কুতুবখানা পরিদর্শন করেন। তিনি এখানে সংঘটিত একটি মোনাজারার মজলিসেও বসেন। ৬৩৪ হিজরীতে (১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ) নুরুদ্দিন আরসালান শাহ বিন ইমাদুদ্দিন যিংকী এই কুতুবখানায় আসেন। তিনি এখানে এক ঘন্টা অবস্থান করেন। ৬৯৬ হিজরীতে (১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) আসেন পারস্যের আমীর মাহমুদ গাজান তাতারী। সমকালীন আলেমদের অনেকেই এই কুতুবখানা থেকে উপকৃত হয়েছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন, ফকিহ আলাউদ্দিন আলী বিন ইয়াকুব, ফখরুদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মদ, কওয়ামুদ্দিন হিবাতুল্লাহ বিন আহমদ, ঈসা বিন কুসাইস। কুতুবখানার পরিচালককে দৈনিক ১০

রিতল পরিমান রুটি, ৪ রিতল পরিমান গোশত দেয়া হত। মাসিক ভাতা ছিল ১২ দিনার।

ফাদেলিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

আবু আলী আব্দুর রহীম বিন আলী বিন মুহাম্মদ লাখমী আসকালানী (মৃত্যু ৫৯৬ হিজরী/১২০০ খ্রিস্টাব্দ) , যিনি কাজী ফাদেল নামেই অধিক পরিচিত, ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উযির। তিনি ৫৮০ হিজরীতে (১১৮৪ খ্রিস্টাব্দ) কায়রোতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এই মাদ্রাসায় মালেকি ও শাফেয়ী মাজহাবের ছাত্ররা পড়তো। এই মাদ্রাসার নাম ছিল ফাদেলিয়া মাদ্রাসা। কাজি ফাদেল এই মাদ্রাসায় একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী এই মাদ্রাসায় প্রায় এক লাখ বই ছিল। এর মধ্যে হজরত উসমানের রা. যুগে খত্তে কুফিতে লিখিত একটি কুরআনুল কারিমও ছিল। কাজি ফাদেল এটি ৩০ হাজার দিনারে ক্রয় করেন।

মাহমুদিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

৭৯৭ হিজরীতে (১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ) কায়রোতে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন আলী (মৃত্যু ৭৯৯ হিজরী/১৩৯২ খ্রিস্টাব্দ)। এই মাদ্রাসায় একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। কুতুবখানার বইপত্র সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে হিজরী নবম শতাব্দীর শুরুতে মাকরেজি এই কুতুবখানার বর্ননা দিতে গিয়ে লিখেছেন , মিসর ও শামে এর সমতূল্য কোনো কুতুবখানা নেই। মাকরেজি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার’ রচনার সময় এই কুতুবখানার দারস্থ হন।

আদেলিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

দামেশকে এই মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ শুরু করেন নুরুদ্দীন মাহমুদ যিংকী । শেষ করেন আল মালিকুল আদেল। মাদ্রাসাটি তার নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এই মাদ্রাসায় একটি বড় কুতুবখানা ছিল। সেখানে উলামাদের মজলিস বসতো। বিভিন্ন ফতোয়া দেয়া হতো। মূলত এই কুতুবখানার বেশিরভাগ বইয়ের মালিক ছিলেন কুতুবুদ্দীন নিশাপুরী (মৃত্যু ৫৭৮ হিজরী/১১৮২ খ্রিস্টাব্দ)। মাদ্রাসার নির্মাণকাজ শেষ হলে তার বইপত্র এই কুতুবখানায় নিয়ে আসা হয় । পরে বিভিন্ন সময় আরো বই বৃদ্ধি করা হয়। এই কুতুবখানার কিছু কিছু বই আজো দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

নুরিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

৫৪৩ হিজরীতে (১১৪২ খ্রিস্টাব্দ) নুরুদ্দীন যিংকী হালাবে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসা তার নামে প্রসিদ্ধি পায়। মাদ্রাসার একটি নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। উলামাদের অনেকে তাদের বইপত্র এই মাদ্রাসায় ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এমন কয়েকজন হলেন, ফকীহ আবু বকর ইবনে আহমাদ আয যাহের (মৃত্যু ৫৫৩ হিজরী/ ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ), মুহাদ্দিস আবু বকর রায়িনি মুহাম্মদ বিন শারিহ (মৃত্যু ৫৬৩ হিজরী/১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ) ও মুহাদ্দিস আহমদ বিন মাহমুদ বিন ইবরাহিম জাওহারি (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী/১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

শরফিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানা

হালাবে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন শরফুদ্দিন আব্দুর রহমান আজমি (মৃত্যু ৬৫৮ হিজরী/ ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ) । এই মাদ্রাসায় শাফেয়ী মাজহাবের ছাত্ররা পড়তে পারতো। এখানে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। এই কুতুবখানায় হাদিস, তাফসীর, ফিকহ, নাহু, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদী বষয়ের বই ছিল। ৬৫৮ হিজরীতে তাতারীরা হালাবে প্রবেশ করলে এই মাদ্রাসা ধবংস করে দেয়।
হিজরী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত মসজিদই ছিল মুসলমানদের শিক্ষালয়। সেখানেই পড়াশোনা হতো। দামেশকের জামে উমাভী, কায়রোর জামে আজহার , বাগদাদের জামে মানসুর কিংবা কর্ডোভার জামে কর্ডোভা, প্রত্যেকটি মসজিদই ছিল অনুপম শিক্ষা নিকেতন। কর্ডোভার মসজিদে ইউরোপ থেকে আসা অমুসলিম ছাত্ররাও পড়তো। তখনো মাদ্রাসার আলাদা কাঠামো গড়ে উঠে নি। এ কারনে মসজিদগুলোতেও গড়ে উঠে কুতুবখানা ।

জামে উমাভীর কুতুবখানা

জামে উমাভীতে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। এখানে প্রচুর বই ওয়াকফ করা হয়। ৪৬১ হিজরী (১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ) আগুন লেগে এই কুতুবখানা পুড়ে যায় । হারিয়ে যায় অমূল্য সব গ্রন্থরাজী। তবে এখান থেকে উদ্ধারকৃত কিছু গ্রন্থ বর্তমানে দামেশক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। একটি গ্রন্থে লেখা আছে ‘তিন খন্ডের এই বইটি সওাব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় জামে উমাভীতে ওয়াকফ করলাম। আব্দুল মুনইম বিন আহমদ । জিলকদ ২৯৮ হিজরী। অগ্নিকান্ডের পরেও এখানে অনেক বই ওয়াকফ করা হয়েছে। এমনই একজন আহমদ বিন আলী বিন ফজল বিন ফুরাত (মৃত্যু ৪৯৪ হিজরী/ ১১০০ খ্রিস্টাব্দ)। তার সম্পর্কে ইবনে আসাকির লিখেছেন , ‘তিনি তার ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ জামে উমাভিতে ওয়াকফ করে দেন।

জামে কাইরাওয়ানের কুতুবখানা

উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত মসজিদ জামে কাইরাওয়ান। এখানে গড়ে উঠে শিক্ষালয়। শিক্ষার জন্য বই প্রয়োজন। মসজিদেই গড়ে উঠে বড় একটি কুতুবখানা। বিভিন্ন বিষয়ের প্রচুর বই ছিল এই কুতুবখানায়। ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দিমার একটি কপি এই কুতুবখানায় ওয়াকফ করে দেন। সুলতান আহমদ মানসুর সাদী তার শাসনামলে এই কুতুবখানাকে আরো প্রসারিত করেন।

ইমাম ওয়াকেদীর পাঠাগার

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর বিন ওয়াকেদ আল আসলামী (১৩০-২০৭ হিজরী/ ৭৪৭-৮২৩ খ্রিস্টাব্দ), ইমাম ওয়াকেদী নামেই যিনি সুপরিচিত, তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস, সিয়ার ও মাগাজির আলেম। তার ছিল নিজস্ব পাঠাগার। ইবনে নাদীম লিখেছেন, ইমাম ওয়াকেদীর মৃত্যুর পর দেখা যায় তার সংগ্রহে ৬০০ সিন্দুক ভর্তি বই ছিল। প্রতিটি সিন্দুক বহন করতে দুইজন লোক লাগতো। তিনি বেচে থাকতে দুজন মামলুক নিয়োগ দিয়েছিলেন যারা দিন-রাত বইয়ের অনুলিপি তৈরী করতো।

আবিল বাকার কুতুবখানা

কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে এটিই মুসলিমবিশ্বের প্রথম কুতুবখানা, যা জনসাধারনের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হয়। বসরায় এই কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন আবুল ফারাজ বিন আবিল বাকা (মৃত্যু ৪৯৯ হিজরী/১১০৫ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় পন্ডিত। তিনি এই কুতুবখানা ওয়াকফ করে দেন। হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাভীর ভাষ্যমতে এই কুতুবখানায় ১২ হাজার বই ছিল।

উবাইদুল্লাহ বিন আলীর কুতুবখানা

উবাইদুল্লাহ বিন আলী বিন নসর (মৃত্যু ৫৪১ হিজরী/৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের একজন বিখ্যাত ফকিহ। সাহিত্য, চিকিতসাবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন এসব বিষয়ে তার প্রচুর পড়াশোনা ছিলো। তার সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল। তিনি বাগদাদে একটি কুতুবখানা নির্মাণ করেন এবং ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। রাজনৈতিক কারনে তাকে গ্রেফতার করা হলে এই কুতুবখানার বইপত্র নিলামে বিক্রি করে দেয়া হয়।

ফাতাহ বিন খাকানের কুতুবখানা

ফাতাহ বিন খাকান ছিলেন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মন্ত্রী। ২৪৭ হিজরীতে (৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) খলীফার সাথেই নিহত হন। তিনি উচুমাপের আলেম ছিলেন। তার নিজস্ব কুতুবখানাতে প্রচুর বই ছিল। তিনি লোক নিয়োগ করে এই কুতুবখানার জন্য বই

লেখাতেন, অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। তার এই কুতুবখানার জন্যই আবু উসমান বিন আমর বিন মাহবুব জাহেজ " আত তাজ ফি আখলাকিল মুলুক' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই কুতুবখানায় মাহবুব বিন হারেস তাগলবী ও মুহাম্মদ বিন হাবিব প্রমুখ লেখালেখির কাজ করতেন, যদিও তাদের গ্রন্থাবলীর নাম জানা যায় নি।

ইবনুল আমিদের কুতুবখানা

ইবনুল আমিদ ছিলেন বুয়াইহিদের উযির। জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে একশো সিন্দুক ভর্তি বই ছিল। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তিনি বই সংগ্রহ করতেন।

সাহেব বিন আব্বাদের কুতুবখানা

সাহেব বিন আব্বাদ ছিলেন ইবনুল আমিদের ছাত্র। তিনিও প্রচন্ড জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনিও উযির হয়েছিলেন। ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাকেই সাহেব উপাধী দেয়া হয়। তার নিজস্ব কুতুবখানার বই চারশো উটে বহন করতে হতো। সফরে গেলে তিনি ত্রিশ উট বোঝাই বই নিয়ে যেতেন। তার এই কুতুবখানার ক্যাটালগ ছিল দশ খন্ডে বিভক্ত। উইল ড্যুরান্ট তার দি স্টোরি অব সিভিলাইজেশন বইতে এই কুতুবখানার কথা উল্লেখ করেছেন।

হুনাইন বিন ইসহাকের কুতুবখানা

হুনাইন বিন ইসহাক ছিলেন একজন বিখ্যাত অনুবাদক। তিনি গ্রীক, সুরিয়ানি, ফার্সী ইত্যাদী ভাষা থেকে বইপত্র আরবীতে অনুবাদ করতেন। তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করে বইপত্র সংগ্রহ করতেন। তার নিজস্ব একটি কুতুবখানা ছিল। এই কুতুবখানায় চিকিতসাবিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শনের প্রচুর বই ছিল।

ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানীর কুতুবখানা

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইস্ফাহানীর (মৃত্যু ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) জন্ম ইস্ফাহানে। বেড়ে উঠেছেন দামেশকে, পড়াশোনা বাগদাদে। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দরবারে পৌছান এবং তার সাথে মিসর সফর করেন। আইয়ুবীদের হাতে ফাতেমী সাম্রাজ্যের পতন হলে ফাতেমীদের বইপত্র বিক্রির ঘোষণা দেয়া হয়। তখন সপ্তাহে দুদিন ফাতেমীদের বইপত্র বিক্রি করা হতো। এই সুযোগে ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানি স্বল্পমূল্যে প্রচুর বই সংগ্রহ করেন। এছাড়া সালাহউদ্দীন আইয়ুবী তাকে প্রচুর বই উপহার দেন। এভাবে তার একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা হয়ে যায়।

ইবনে যিয়াতের পাঠাগার

ইবনে যিয়াত ছিলেন মু'তাসিম ও ওয়াসিকের যুগে আব্বাসী সাম্রাজ্যের উযির। পুরো নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক বিন আবান বিন হামযাহ (১৭৩-২৩৩ হিজরী/৭৮৯-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের খুব উচুস্তরের পন্ডিত। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে ছিল বিভিন্ন বিষয়ের বইপত্রের এক বিশাল সংগ্রহ। সেই পাঠাগারে কয়েকজন অনুবাদক ছিলেন যারা গ্রীক ও অন্যান্য ভাষা থেকে বইপত্র আরবীতে অনুবাদ করতেন। তাদের মাসিক ভাতা ছিল এক হাজার দিরহাম। বইপত্র সংগ্রহে তার ছিল অদম্য নেশা। জাহেয বলেন, আমি ইবনে যিয়াতের সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম তার জন্য কিছু উপহার নিয়ে যাই। তাকে উপহার দেয়ার জন্য সিবাওয়াইয়ের বইয়ের চেয়ে উত্তম কিছু পেলাম না। ইবনে যিয়াতের কাছে পৌছে তাকে বললাম, আপনাকে উপহার দেয়ার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো বই পাই নি। ইবনে যিয়াত বললেন, তুমি কী করে ভাবলে আমার পাঠাগারে এই বইটি নেই? আমি বললাম, আমি মোটেও এমন ভাবি নি। তবে এটি স্বয়ং ফাররার হাতে লেখা। আমি ফাররার মিরাছ থেকে এটি কিনেছি। একথা শুনে ইবনে যিয়াত প্রচন্ড খুশী হন।

কাজী ফাযেলের পাঠাগার

আব্দুর রহীম বিন আলী বিন সাঈদ আল লাখমী (৫২৯-৫৯৬ হিজরী/১১৩৫-১২০০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মন্ত্রী। প্রসিদ্ধি পেয়েছেন কাজী ফাযেল নামে। তার সম্পর্কে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বলেছিলেন, ভেবো না আমি তলোয়ার দ্বারা দেশ শাসন করি, আসলে আমি ফাযেলের কলম দ্বারা শাসন করি। কাজী ফাজেল কায়রোতে একটি মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পরিচিত ছিল ফাজেলিয়া নামে। এটি ছিল তার সময়ের সেরা পাঠাগার। এখানে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বিশাল সংগ্রহ ছিল।

ইবনুল জাওযির পাঠাগার

জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন মোহাম্মদ আল জাওযি (৫০৮-৫৯৭ হিজরী/১১১৪-১২০১ খ্রিস্টাব্দ) সেসকল আলেমদের একজন যারা অধিক লেখালেখির জন্য বিখ্যাত। তিনি হাদীস, তাফসির, ফিকহ, সীরাত, মানাকিব, ইতিহাস, কবিতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারটিও ইতিহাসে বিখ্যাত।

নিজামুল মুলক তুসীর পাঠাগার

জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাসান নাসিরুদ্দীন তুসী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী), নিজামুল মুলক তুসি নামেই যিনি প্রসিদ্ধ, তার ছিল সুসজ্জিত একটি পাঠাগার। শাম, বাগদাদ ও জাযিরা থেকে তিনি প্রচুর বই সংগ্রহ করেন। তার সংগ্রহে প্রায় চার লাখ বই ছিল।

ইবনে ফুরাতের পাঠাগার

আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন ফুরাত (৩১৯-৩৮৪ হিজরী/৯৩১-৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদের মুহাদ্দিসদের অন্যতম। আবুল কাসেম আজহারী লিখেছেন, তার মৃত্যুর পর তার ঘরে ১৮ টি বাক্সভর্তি বই পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য বইগুলো চুরী হয়ে যায়।

মিসরে ফাতেমীরা যেসকল পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মিসরে ফাতেমীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরে আইয়ুবী ও মামলুকদের শাসনকালে প্রচুর কুতুবখানা গড়ে উঠে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও আলেমদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর কুফীর (মৃত্যু ৬৬৭ হিজরী/১২৬৭ খ্রিস্টাব্দ) ব্যক্তিগত কুতুবখানায় প্রচুর বই ছিল। তিনি সব বই ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। শায়খ জালালুদ্দিন কুনুভী (মৃত্যু ৬৭২ হিজরী/১২৭২ খ্রিস্টাব্দ) যখন দরস নিতে বসতেন তখন তার চারপাশে থাকতো কিতাব আর কিতাব । শায়খ ইয়াহইয়া বিন আব্দুল ওয়াহহাব শাফেয়ীর (মৃত্যু ৭২১ হিজরী/১৩২১ খ্রিস্টাব্দ) সংগ্রহেও প্রচুর বই ছিল। তিনি তার সব বই জহির মসজিদের কুতুবখানায় দান করে দেন।

জামে ইবনে তুলুনের কুতুবখানা

মিসরের বিখ্যাত মসজিদ জামে ইবনে তুলুন। ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন মিসরের অধিপতি আহমাদ ইবনে তুলুন। মসজিদের জন্য প্রচুর ওয়াকফ বরাদ্দ করা হয়। মসজিদের ভেতরেই প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি কুতুবখানা । পরবর্তী শাসকরাও এই কুতুবখানায় বইপত্র দান করেছেন। মাকরেজির ভাষ্যানুসারে হাকেম বি আমরিল্লাহ যখন জামে আহমাদ বিন তুলুনে আসেন তখন তিনি ৮১৪ কপি কোরআন শরিফ ওয়াকফ করেন । এই কুতুবখানায় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিতসাবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদী বিষয়ে প্রচুর বই ছিল।

দারুল হিকমাহ

এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন হাকেম বি আমরিল্লাহ। ৩৯৫ হিজরীর ১০ জমাদাল উখরা পাঠাগারটি উদ্বোধন করা হয়। ততকালে এতবড় সংগ্রহ আর কোথাও ছিল

না। বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রাচীন ১৮০০০ বই সংগ্রহ করা হয় এই পাঠাগারে। লোকেরা এখানে আসতো বই পড়তে, ওয়াররাকরা আসতো অনুলিপি প্রস্তুত করতে।

হাকামের পাঠাগার

স্পেনে খলীফা হাকাম একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ মত অনুসারে এই পাঠাগারে বিভিন্ন শাস্ত্রের চার লক্ষ বই ছিল। পাঠাগারের পুস্তক তালিকা ছিল ৪৪ খন্ডে বিভক্ত। প্রতি খন্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

ইবনে খশাবের পাঠাগার

ইবনে খশাব (মৃত্যু ৫৬৭ হিজরী) ছিলেন নাহু শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ আলেম। এছাড়া তাফসীর, হাদীস, মানতেক ও দর্শনেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি বই সংগ্রহ করতে ভালোবাসতেন। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও প্রচুর বই ছিল।

আমীর আবুল ফজলের কুতুবখানা

নিশাপুরের আমীর আবুল ফজল উবাইদুল্লাহ বিন আহমদ (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী/১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তার গৃহে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে তোলেন। এই কুতুবখানায় অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ছিল। বিখ্যাত লেখক সাআলাবি তার বিভিন্ন গ্রন্থ লেখার সময় এই কুতুবখানা থেকে উপকৃত হন। পরে সাআলাবি তার ফিকহুল লুগাহ ও অন্যান্য গ্রন্থের একটি কপি এই কুতুবখানায় প্রেরণ করেন।

জামিয়া নিজামিয়া নিশাপুরের কুতুবখানা

নিশাপুরের সবচেয়ে বড় কুতুবখানা ছিল জামিয়া নিজামিয়া নিশাপুরের কুতুবখানা। নিজামুল মুলক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নিজামিয়ার (সংখ্যা নিয়ে খানিকটা মতভেদ আছে। আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকির মতে নিজামিয়া ছিল ৯ টি। আর ড নাজি মারুফের মতে ১০ টি) মধ্যে নিজামিয়া নিশাপুরের অবস্থান ছিল বাগদাদের নিজামিয়ার পরেই। অবশ্য এটি বাগদাদের নিজামিয়ার কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদরাসার কুতুবখানায় সকল শাস্ত্রের বইপত্র ছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল শাফেয়ী মাজহাবের বইপত্র। এই কুতুবখানায় এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য বই ছিল যা তখন অন্য কোনো কুতুবখানায় ছিল না। যেমন : হাকিম আবু উবাইদ আব্দুল ওয়াহেদের লিখিত কিতাবুল হায়াওয়ান, এবং আবু আব্দুল্লাহ মাসুমি রচিত দর্শনের বইপত্র।

মোহাম্মদ বিন ফজলের কুতুবখানা

মোহাম্মদ বিন ফজল মুফিদ ইবনে খুজাইমা (মৃত্যু ৩৮৭ হিজরী/৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন নিশাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল। এর অধিকাংশই তিনি তার দাদার উত্তরাধিকার থেকে পেয়েছিলেন। হাকেম আবু

আব্দুল্লাহ নিশাপুরি তার বইপত্র রচনায় এই কুতুবখানা থেকে প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন।
নিশাপুরে এধরনের আরো কিছু ব্যক্তিগত কুতুবখানা ছিল আলেমদের। যেমন ; উমর বিন আহমদ বিন ইবরাহিমের (মৃত্যু ৪১৭ হিজরী/ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ) কুতুবখানা, আবু আব্দুর রহমান সালেমির (মৃত্যু ৪১২ হিজরী/১০২১ খ্রিস্টাব্দ) কুতুবখানা, যাইনুল ইসলাম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজিন আবুল কাসেম কুশাইরির (মৃত্যু ৪৬৫ হিজরী/১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ) কুতুবখানা , ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনির (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী/১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ) কুতুবখানা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটা সময় পর্যন্ত পড়ালেখার অধিকার একচেটিয়াভাবে ব্রাক্ষ্মনদের ছিল। এই পড়ালেখা হতো মন্দীর কিংবা মন্দীর সংলগ্ন ভবনে। তাদের লিখিত বইপত্রও এসব স্থানেই থাকতো। বৌদ্ধ ধর্মের উথানের পর মন্দীর ছাড়াও পৃথক শিক্ষালয় গড়ে উঠে। তৈরী হয় বড় বড় ছাত্রাবাস। এসব শিক্ষালয়ে স্বতন্ত্র লাইব্রেরী বা পাঠাগার থাকতো যাকে পুস্তক ভান্ডার বলা হতো। বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও বড় একটি পাঠাগার ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এই পাঠাগার থেকে অনেক বইয়ের প্রতিলিপি তৈরী করেন। এছাড়া পাটালীপুত্র, গুজরাট, মালোয়াহ ইত্যাদী অঞ্চলের বৌদ্ধ শিক্ষালয়গুলোতেও অনেক পাঠাগার ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে যুদ্ধবিজয়ের ফলে এসব মন্দীর ও শিক্ষালয় থেকে অনেক বই মুসলমানদের হাতে আসে।কেউ কেউ মনে করেন মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে বইপত্র অপ্রতুল ছিল। যারা এই মত প্রকাশ করেন তারা দলীল হিসেবে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভীর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি যখন ফার্সী ভাষায় ‘তাফসিরে ফাতহুল আযিয’ লিখছিলেন তখন অনেক খোজাখুজি করেও তাফসীরে কাবির পান নি। পরে শাহী কুতুবখানা থেকে কয়েকদিনের জন্য তাফসিরে কাবির ধার এনেছিলেন। যদিও ঘটনাটি সত্য এবং এর ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে তবু এই একটি ঘটনা দ্বারা কোনো সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নেয়া বোকামি। সে যুগের অন্যান্য আলেমদের লেখা থেকেই বোঝা যায় তখন ভারতবর্ষে কী পরিমান বইপত্র পাওয়া যেতো। স্বয়ং শাহ আব্দুল আযিযের বইপত্র ও ফতোয়াতে তিনি যেসব কিতাব থেকে রেফারেন্স দিয়েছেন তা দেখলেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমান হয়। তার এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেলভীর বইপত্রে যেভাবে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ফকিহদের বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছেন সেভাবে ইবনে তাইমিয়া কিংবা ইবনে হাযম আন্দালুসির বইপত্র থেকেও প্রচুর রেফারেন্স দিয়েছেন, যা দ্বারা বুঝা যায় ভারতবর্ষে তখন তাদের বইপত্র সহজলভ্য ছিল। হাদীসের যেসকল অপ্রকাশিত

পান্ডুলিপি থেকে তারা রেফারেন্স দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী, যাকে শাহ্ আব্দুল আযিয ‘ভারতবর্ষের বায়হাকি’ বলতেন, তিনিও তার তাফসীরে মাজহারীতে প্রচুর হাদিস এনেছেন। যা থেকে বুঝা যায় তখন হাদিসের কিতাবগুলোও বেশ সহজলভ্য ছিল ভারতবর্ষে। মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী তার রচিত মুসাল্লামুস সুবুত কিতাবের শেষে যেসকল কিতাবের তালিকা দিয়েছেন তাতে- শরহে বাযদাবী, উসুলে সারাখসি, কাশফে বাযদাবী, কাশফুল মানার, তাওজিহুত তালবি, ইবনে হুমামের রচনাবলী, কাজী বায়যাভী ও তাফতাজানীর বইপত্র এবং শাফেয়ি ফিকহের বিভিন্ন বইপত্রের নাম আছে। এ থেকেও সেকালের উলামায়ে কেরামের কাছে থাকা বইপত্র সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ফতোয়ায়ে আলমগিরী, যা সম্রাট মহিউদ্দীন আলমগীরের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে, তার শেষে ফিকহের যেসব কিতাবাদির নাম দেয়া হয়েছে, তাতেও ‘সেকালে বইপত্র ছিল না’ এই ধারনার অপনোদন হয়। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর ছেলে শাহ নুরুল হক দেহলভী ফার্সী ভাষায় বুখারী শরীফের একটি ব্যখ্যাগ্রন্থ লেখেন। তাতে তিনি ফতহুল বারি, উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারি ইত্যাদী গ্রন্থের সাহায্য নেন। এসব ঘটনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় সেযুগেও প্রচুর বইপত্র পাওয়া যেত। এছাড়া ইতিহাসের পাতা ঘেটে সেকালের যেসব কুতুবখানার সন্ধান মিলেছে তাতে এই মত আরো শক্তিশালী হয়। মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কিছু পাঠাগারের আলোচনা করা যাক :

তাতারখানের কুতুবখানা

তাতারখান। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়কালের বিখ্যাত আলেম। ফতোয়া তাতারখানিয়ার লেখক। তার নিজস্ব সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। তারীখে ফিরোজশাহির ভাষ্যমতে , তার কাছে সবসময় আলেম উলামাদের ভীড় লেগেই থাকতো। তিনি একটি তাফসীরও রচনা করেন। এই তাফসীর রচনার জন্য তিনি প্রচুর তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

গাজীখানের কুতুবখানা

গাজী খান ছিলেন সুলতান ইবরাহীম লোদীর দরবারের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত আমীর। কেল্লার ভেতরে তার নিজস্ব সমৃদ্ধ একটি কুতুবখানা ছিল। ৯৩২ হিজরীতে বাবরের হাতে কেল্লার পতন হলে এই কুতুবখানাও বাবরের হাতে আসে। তুজুকে বাবরীতে বাবর লিখেছেন , ‘সোমবার কেল্লায় ঘুরে বেড়ানোর সময় গাজী খানের কুতুবখানা দেখতে যাই। চমৎকার কিছু কিতাব হাতে পাই। কিছু হুমায়ুনকে দেই বাকিগুলো কামরান মির্জার কাছে কাবুলে পাঠাই। বেশিরভাগই ছিল ধর্মীয় বইপত্র’।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার পাঠাগার

দিল্লীর বিখ্যাত বুজুর্গ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার খানকাহে একটি বড় পাঠাগার ছিল। সেই পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পান্ডুয়ার খানকাহর প্রতিষ্ঠাতা আখি সিরাজ সেই পাঠাগারে পড়াশোনা করেন এবং সেখান থেকে অনেক বই পান্ডুয়া নিয়ে আসেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আখি সিরাজের খানকাহতেই বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার গড়ে উঠে।

উসমানপুরের পাঠাগার

আহমেদাবাদে একজন বুজুর্গ ছিলেন শায়খ উসমান (মৃত্যু ৮৫৭ হিজরী) নামে। তিনি সাবেরী নদীর পাড়ে উসমানপুর নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মুহাম্মদ শাহ গুজরাটির মাধ্যমে তিনি সেখানে একটি মসজিদ ও মাদরাসা নির্মান করেন। মাদরাসার পাশের ভবনে একটি পাঠাগার ছিল যাতে অনেক বইপত্র থাকতো। এই পাঠাগার অনেকদিন টিকে ছিল। পরে মারাঠা হামলায় পাঠাগারটি ধবংস হয়।

বাবরের পাঠাগার

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন কবি। সাহিত্যচর্চায় তার প্রচুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে। থিতু হয়ে বসার সুযোগ পেয়েছেন কম। জীবনের শেষদিকে কাবুল ও দিল্লীর নিয়ন্ত্রন নেয়ার পর যখনই অবসর হতেন জ্ঞানচর্চায় মগ্ন হতেন। তার নিজস্ব পাঠাগার ছিল।

হুমায়ুনের কুতুবখানা

হুমায়ুন ছিলেন পিতার মতো সাহিত্যবোদ্ধা, কবি । নানাস্থান থেকে আগত কবি সাহিত্যিকদের ভীড় জমেছিল তার দরবারে। প্রায়ই বসতো সাহিত্যের মজলিস। বিখ্যাত তুর্কী এডমিরাল সাইয়েদ আলী রইস তার সফরনামায় বেশ কয়েকবার এসব মজলিসের কথা বলেছেন। হুমায়ুনের নিজস্ব শাহী কুতুবখানা ছিল। তবাকাতে আকবরীর ভাষ্যমতে, ৮ রবিউল আউয়াল সন্ধ্যায় হুমায়ুন শাহী কুতুবখানা থেকে বের হয়ে নিচে নামছিলেন। সিড়িতে তিনি পা পিছলে পড়ে যান। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়।

আকবরের কুতুবখানা

আকবর যদিও খুব বেশি লেখাপড়া করে নি, তবুও তার জ্ঞানপিপাসা ছিল তীব্র। তার দরবারে ভারতবর্ষের সেরা জ্ঞানীগুনিদের সমাবেশ ঘটেছিল। তার শাসনকালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষে প্রচুর উন্নতি সাধন করে। আকবর অনুবাদক নিযুক্ত করে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বইপত্র ফার্সীতে অনুবাদ করা শুরু

করেন। আকবরের ছিল তীব্র বইয়ের নেশা। নতুন কোনো বইয়ের সন্ধান পেলেই তা সংগ্রহ করতেন। প্রতিরাতে তাকে কেউ একজন বই পড়ে শোনাতে হতো। যতটুকু শুনতেন সেখানে দাগ দিয়ে রাখতেন। পরেরদিন এর পর থেকে শুনতেন। আকবর পৈত্রিক সুত্রেই একটই কুতুবখানা পেয়েছিলেন। এছাড়া গুজরাট, জৈনপুর, বিহার, কাশ্মীর, বাংলা বিজয়ের পর তার হাতে যেসকল বই আসে তাও তিনি এই কুতুবখানায় সংযুক্ত করেন। তার এই কুতুবখানা ছিল আগ্রার কেল্লায়।

জাহাংগীরের কুতুবখানা

অন্যান্য মুঘল সম্রাটদের মতো জাহাংগীরও ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তার আত্মজীবনি পড়লে এ ব্যাপারে পরিস্কার ধারনা পাওয়া যায়। শাহী কুতুবখানা ছাড়াও তার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। এর দায়িত্বে ছিলেন মাকতুব খান। জাহাংগীর কোথাও সফর করার সময়ও এই কুতুবখানা তার সাথে রাখতেন। তিনি যখন গুজরাট যান তখন সেখানকার উলামায়ে কেরাম তার সাথে দেখা করতে আসেন। তুজুকে জাহাংগীরিতে জাহাংগির লিখেছেন তিনি তাদের সবাইকে এই কুতুবখানা থেকে বিভিন্ন বই, যেমন, তাফসিরে কাশশাফ, তাফসীরে হুসাইনি, রওজাতুল আহবাব ইত্যাদী উপহার দেন।

শাহজাহানের কুতুবখানা

শাহজাহানের একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। একজন জার্মান পর্যটক ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুরাট ভ্রমন করেন। তিনি তার ভ্রমনকাহিনীতে লিখেছেন শাহজাহানের কুতুবখানায় ২৪ হাজার বই ছিল। ১৬৫৮ সালের পর এই কুতুবখানার বইগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা এক বিরাট অংশ নিয়ে যায় লন্ডনে, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এই কুতুবখানার প্রচুর বই ভারতের বিভিন্ন কুতুবখানায় আজো সংরক্ষিত আছে।

আলমগীরের কুতুবখানা

আলমগীরের আমলেও সম্রাটের নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। এই কুতুবখানার দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মদ সালেহ। এই কুতুবখানার একটি কোরআন বর্তমানে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে।

খানে খানানের কুতুবখানা

খানে খানান মির্জা আব্দুর রহীম ছিলেন বৈরাম খার ছেলে। তিনিও ছিলেন বইপ্রেমিক। তিনি আহমেদাবাদের শাসক থাকাকালীন সেখানে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে তোলেন। বইপত্রের দেখাশোনা, অনুলিপি তৈরী করা , বাধাই করা ইত্যাদী কাজের জন্য প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ দেন। মাওলানা ইবরাহীম নুক্কাশ

এই কুতুবখানাতেই কর্মরত ছিলেন। সমকালীন সকল লেখকদের বইপত্র এই কুতুবখানায় ছিল। এছাড়াও অনেক দুষ্প্রাপ্য বইপত্র যেমন খাজা হুসাইন সুনায়ির কালাম, দিওয়ানে নাজিরি, দিওয়ানে উরফি সিরাজি, মোল্লা নুরুদ্দীন যহুরির হাতে লেখা কবিতাসমগ্র, মোহাম্মদ ওকুয়ি নিশাপুরীর হাতে লেখা কাসিদার পান্ডুলিপি ইত্যাদিও ছিল। সুলতান হুসাইন লিখিত তাসাউফের বিখ্যাত গ্রন্থ মাজালিসুল উশশাক ৯৯৯ হিজরীতে এই কুতুবখানায় আনা হয়। এই বইতে ১৫২ টি ইরানী চিত্রকলার ছবি আছে। বর্তমানে এই বইটি রামপুরের কুতুবখানায় আছে। আকবর তার সিংহাসনে আরোহনের ২৪ বছর পূর্তিতে খানে খানানকে তাবিরুর রু'ইয়া নামক একটি বই উপহার দেন। সেটিও এই কুতুবখানায় ছিল। বর্তমানে এটি হায়দারাবাদের কুতুবখানা আসফিয়া তে আছে। ৯৩০ হিজরীতে হেরাতের মীর আলী ইউসুফ জুলেখা নামে একটি বই লিখেন। এটিও খানে খানানের কুতুবখানায় ছিল। পরে এটি তিনি জাহাংগীরকে উপহার দেন। জাহাংগির এই বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় কিছু টীকা লেখেন। বর্তমানে বইটি পাটনার বাংকীপুর কুতুবখানায় আছে।

নুরজাহানের কুতুবখানা

নুরজাহানও বই ভালোবাসতেন। তার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। তিনি প্রায়ই বইপত্র কিনে এটি সমৃদ্ধ করতেন। নুরজাহান ৩ মোহর দিয়ে মির্জা কামরানের দেওয়ান সংগ্রহ করেন। এর প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন , 'মূল্য ৩ মোহর। নুরুন নেসা বেগম'। এই লেখা থেকে বোঝা যায় বইটি তিনি নুরজাহান উপাধী পাওয়ার আগে সংগ্রহ করেছেন। বইটি বর্তমানে পাটনার বাংকিপুর কুতুবখানায় আছে।

মুনইম খানের পাঠাগার

ইনি সম্রাট আকবরের শাসনামলে জৌনপুরের শাসক ছিলেন। বই সংগ্রহের নেশা ছিল। গোমতী নদীর উপর একটি সেতু নির্মান করেন। এর পাশেই ছিল তার কুতুবখানা। যখনই কোনো বইয়ের সংবাদ পেতেন, দ্রæত সংগ্রহের চেষ্টা চালাতেন। তার সংগ্রহে মির্জা কামরানের দুষ্প্রাপ্য দিওয়ান এবং কুল্লিয়াতে সাদির একটি কপি ছিল।

ফয়েজির কুতুবখানা

ফয়েজি ছিলেন আবুল ফজলের ভাই এবং মোল্লা মোবারক নাগোরির পুত্র । পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী। তার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুষ্প্রাপ্য বইপত্র সংগ্রহ করেন। এই কুতুবখানার বেশিরভাগ বইপত্রই ছিল লেখকদের হাতে লেখা। সাহিত্য, চিকিতসা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, তাসাউফ, হাদিস, তাফসীর, ফিকহ

ইত্যাদী বিষয়ের বইপত্র ছিল এই কুতুবখানায়। মুনতাখাবুত তাওয়ারিখের বর্ননানুযায়ী মোট বইয়ের সংগ্রহ ছিল ৪৬০০। ফয়েজির মৃত্যুর পর সব বই শাহী কুতুবখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

শেখ ফরীদের পাঠাগার

শেখ ফরীদ বুখারী ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন আমীর। নিজস্ব একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে অনেক বইপত্র সংগ্রহ করেন। দিওয়ানে হাসান দেহলভীর একটি দুষ্প্রাপ্য কপি তার পাঠাগারে ছিল।

কুতুবুল মুলকের কুতুবখানা

শুধু সম্রাট নয় আমীর কিংবা সভাসদরাও ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। তারাও নিজ নিজ গৃহে গড়ে তুলেছিলেন সমৃদ্ধ কুতুবখানা। কুতুবুল মুলক এমনই একজন। নিজের কুতুবখানার জন্য তিনি প্রচুর পরিমান বই সংগ্রহ করেন। সেকালে তুজুকে জাহাংগিরী খুব একটা পাওয়া যেতো না। তিনি নিজের কুতুবখানার জন্য অনেক কষ্টে এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। পরে শাহজাদা সুলতান মুহাম্মদ বিন আলমগীর এই কপিটি নিয়ে যান। বর্তমানে এটি পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরীতে আছে।

নবাব লোহারুর কুতুবখানা

মুঘল শাসনামলের শেষদিকে নবাব লোহারু ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তার দরবারেও ঘটেছিল জ্ঞানীগুনিদের সমাবেশ। দিল্লীর বিখ্যাত কবি গালিবের সাথে ছিল তার সুসম্পর্ক। তার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল, যাতে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ ছিল। দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা ছিল তার শখ। গালিবের ভাষ্যমতে তাতে বিশ হাজার বই ছিল। ১৮৫৭ সালে আজাদী আন্দোলনের সময় এই কুতুবখানা লুণ্ঠন হয়।

গুজরাটের শাহী কুতুবখানা

গুজরাটে যখন স্বাধীন সালতানাত গড়ে উঠলে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত প্রচার প্রাসার হয়। সুলতান আহমদের (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী) শাসনকালে এই ধারা আরো বেগবান হয়। প্রচুর মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ নির্মান করা হয়। সুলতান নিজে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে তোলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে সুলতান মুহাম্মদ শাহ (মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী) এই কুতুবখানার বইপত্র শময়ে বুরহানির ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। এই কুতুবখানা ৯৮০ হিজরী পর্যন্ত টিকে ছিল। আকবর যখন গুজরাট বিজয় করেন তখন এই কুতুবখানার বইপত্র ভাগ করে

দেন। এর কিছু অংশ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ুনী, ফয়েজি, ইনারা পান। বাকি বইপত্র শাহী কুতুবখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

খানকাহ সারখিয়ের কুতুবখানা

শায়খ আহমদ কাঠোরি (মৃত্যু ৮৪৯ হিজরী) আহমেদাবাদে একটি মসজিদ ও খানকাহ নির্মান করেন। তার খানকাহতে একটি কুতুবখানা ছিল। একবার তিনি সেই কুতুবখানা থেকে মাসাবিহুস সুন্নাহ বের করে উপস্থিত লোকদের পড়ে শুনান।

শাহ আলমের কুতুবখানা

গুজরাটের বিখ্যাত বুজুর্গ সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ আলম (মৃত্যু ৮৮০ হিজিরী) একজন উচুমাপের আলেম ছিলেন। অধ্যয়নের প্রচন্ড নেশা ছিল। তার সংগ্রহে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই ছিল। মাওলানা সদরে জাহান যখন তার সাথে সাক্ষাত করতে যান তখন তিনি ইমাম রাযীর একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখান, ইতিপূর্বে মাওলানা সদরে জাহান যার নামও শোনেন নি। শাহ আলমের উত্তরসুরীরা এই কুতুবখানা আরো স¤প্রসারিত করেন। সাইয়েদ জাফর বদরে আলমের সময়কাল ছিল এই কুতুবখানার স্বর্ণযুগ। তিনি নিজের হাতে প্রচুর বইয়ের অনুলিপি তৈরী করে এই কুতুবখানায় যোগ করেন। মারাঠাদের আক্রমনের সময় এই কুতুবখানার প্রচুর বই নষ্ট হয়। কিছু কিছু বই উত্তরাধীকারিদের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লামা তাহের পাটনীর কুতুবখানা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তাহের পাটনীর গৃহে তার নিজস্ব একটি কুতুবখানা ছিল। তিনি আরব ও আজম থেকে প্রচুর বই সংগ্রহ করেছিলেন। কালের আবর্তে সেসব বই হারিয়ে যায়। ১৯৩২ সালেও শায়খ আবু জাফর নদভী সেই কুতুবখানার কিছু বই আল্লামা তাহের পাটনীর বংশধরদের কাছে দেখেছিলেন।

শাহ ওয়াজিহুদ্দীনের কুতুবখানা

আল্লামা শাহ ওয়াজিহুদ্দীন গুজিরাটি (মৃত্যু ৯৯৮ হিজরী) আহমেদাবাদের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের একজন। ৯৩৪ হিজরীতে তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসা ১২৩৬ হিজরী পর্যন্ত টিকে ছিল। মাদ্রাসার সাথেই একটি কুতুবখানা ছিল। দুইটি বড় কক্ষে বইপত্র রাখা ছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রচুর বইপত্র ছিল। সময়ের আবর্তন ও গোমতী নদীর ভাংগনে এই কুতুবখানার বইপত্র হারিয়ে যায়।

সালিমা সুলতানার পাঠাগার

ইনি সম্রাট হুমায়ুনের ভাগ্নি। কবি ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তুজুকে জাহাঙ্গীরিতে তার যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন। বই সংগ্রহের নেশা ছিল। নিজস্ব পাঠাগার ছিল।

মাখদুম ইবরাহীমের কুতুবখানা

কাঠিওয়ারে ১০৯৯ হিজরীতে (১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ) একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ মাখদুম ইবরাহীম বিন সুলাইমান। এই মাদরাসা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। মাদরাসার সাথেই একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদরাসা বন্ধের পর গত শতাব্দী পর্যন্ত এই কুতুবখানা টিকে ছিল।

মাদরাসা হেদায়েত বখশের কুতুবখানা

আহমেদাবাদে হেদায়েত বখশ নামে একটি মাদরাসা নির্মান করা হয়। মাদরাসার ভেতরে একটি বড় কুতুবখানা গড়ে উঠে, এই কুতুবখানায় সকল শাস্ত্রের বইপত্র ছিল। আলেম উলামা ছাড়া সাধারন মানুষও এই কুতুবখানা থেকে উপকৃত হতো। মারাঠা আক্রমনে এই কুতুবখানার বেশিরভাগ বই নষ্ট হয়। অল্পকিছু বই হায়দরাবাদের পীর মুহাম্মদ শাহ খানকায় সংরক্ষিত আছে।

শায়খ হাযরামীর কুতুবখানা

শায়খ হাযরামী (মৃত্যু ১০৩৮ হিজরী) ছিলেন আহমেদাবাদের বিখ্যাত বুজুর্গ। বিখ্যাত গ্রন্থ 'আন নুরুস সাফির ফি আইয়ানিল করনিল আশির' এর রচয়িতা তিনি। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল।

মহিসুরের শাহী কুতুবখানা

নওয়াব হায়দার আলী যখন মহিসুরে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন , তখন সেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি পায়। তার পুত্র টিপু সুলতানও ছিলেন পিতার মতো বিদ্যানুরাগী। তিনি মহিসুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বড় একটি কুতুবখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতান যখন শহীদ হন এবং শ্রীরংগাপত্তম ইংরেজদের দখলে আসে তখন শাহী মহলের অন্য সবকিছুর মতো এই কুতুবখানাও ইংরেজরা লুন্ঠন করে। বেশিরভাগ বইপত্র লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট অবশিষ্ট বইপত্রের তালিকা প্রকাশ করেন। তা নিম্মরুপ :

- কুরআনুল কারীম — ৪৪ টি
- হাদিস গ্রন্থ — ৪২ টি
- গনিত– ৭৫ টি
- তাসাউফ — ৫২ টি
- হিন্দী কবিতার বই– ২৩ টি
- চিত্রকলা — ১৯ টি
- জ্যোতির্বিদ্যা –২০ টি
- ভাষা সংক্রান্ত — ৪৫ টি
- কবিতা — ১৯ টি

- ফিকহ — ৯৫ টি
- তাফসীর– ৪১ টি
- চিকিতসা শাস্ত্র– ৬২ টি
- আখলাক সংক্রান্ত — ২৪ টি
- দর্শন– ৫৪ টি
- সাহিত্য — ১৮ টি
- অভিধান — ২৯

মাদরাসা আরাবিয়ার কুতুবখানা

বিহারের অন্তর্গত সাসারাম একটি বিখ্যাত জায়গা। শেরশাহ এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে শাহ কবীর দরবেশ নামে একজন বুজুর্গ এখানে একটি খানকাহ ও মাদরাসা নির্মান করেন। মাদরাসার নাম মাদরাসা আরাবিয়্যা। এই মাদরাসায় একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল। এই কুতুবখানা '৪৭ এর দেশভাগের সময় লুণ্ঠিত হয়।

সাদেকপুরের কুতুবখানা

মৌলভী আহমদ উল্লাহ সাহেব পাটনার সাদেকপুরে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এই কুতুবখানার বেশিরভাগ বইপত্র লন্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। অল্পকিছু বইপত্র বর্তমানে পাটনার খোদা বখশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

ফারুকীদের শাহী কুতুবখানা

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালের শেষদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন সালতানাত গড়ে উঠে। এমনই একটি সালতানাত ফারুকী সালতানাত। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে এই সালতানাত গড়ে উঠে। ১০০৫ হিজরীতে আকবরের হাতে এই সালতানাতের পতন হয়। ফারুকিরাও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে ছিল। তাদেরও ছিল সমৃদ্ধ কুতুবখানা। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফেরশতা ১০১৩ হিজরীতে এই কুতুবখানা সফর করেন এবং বইয়ের সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন।

লখনৌর কুতুবখানা

মুঘলদের সূর্য অস্তমিত হলে লখনৌতে গড়ে উঠে নবাবদের শাসন। তাদের হেরেমে উপড়ে পড়ে জীবনের হাসি-কান্না। তাদের দরবারের ভীড় করতে থাকে কবি সাহিত্যিকরা। লখনৌ হয়ে উঠে কবিদের শহর, কবিতার শহর। এ সময় লখনৌতে প্রচুর মাদরাসা গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রচুর কুতুবখানা। শাহী কুতুবখানা ছিল গোমতি নদীর তীরে, রোমি দরজার পাশে। ১৮৫৭ সালে একজন ইংরেজ অফিসার এই কুতুবখানা দেখেছিলেন। পরে অবশ্য এটি লুট করা হয়। মোতীবাগ

মহলে ছিল আরেকটি কুতুবখানা। এখানে বেশিরভাগই ছিল সাহিত্যের বইপত্র। এখানে তিন হাজারের বেশি বই ছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কুতুবখানা ছিল ফররুখ বখশ মহলে। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর আদেশে শাহী কুতুবখানার বাইরে এই কুতুবখানা গড়ে তোলা হয়। এইসব কুতুবখানায় আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, তুর্কী এবং পশতু ভাষার বইপত্র ছিল। সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, তাসাউফ ও জীবনিগ্রন্থ ছিল। লখনৌর বিখ্যাত এলাকা কাকোরিতেও অনেক কুতুবখানা গড়ে উঠে। একটি কুতুবখানা ছিল আমীর মহলে ।আউধের বিখ্যাত শহর ফিরিংগী মহল। এখানেই জন্ম নিয়েছেন মোল্লা নিজামুদ্দীন ফিরিংগি মহল্লী, যার নামে প্রবর্তিত হয়েছে দরসে নেজামি। এখানে জন্মেছেন প্রচুর উলামায়ে কেরাম। ইতিহাস যাদের স্মরণ করে ‘উলামায়ে ফিরিংগী মহল’ নামে । মোল্লা নিজামুদ্দিন এখানে একটি মাদরাসা ও বড় কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ফিকহের প্রচুর বই ছিল। লখনৌর কাছাকাছি একটি শহর সলীমগড়। এখানের শাসনকর্তাকে রাজা নামে ডাকা হতো। সলীমগড়ের রাজা একটি বড় কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন যাতে প্রায় সকল শাস্ত্রের বইপত্র ছিল। এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য বইপত্র ছিল। ফেরদৌসির শাহনামার একটি কপি ছিল যার ততকালীন মূল্য ছিল ১০ হাজার

বিলগ্রামের কুতুবখানা

শুরু থেকেই বিলগ্রামে প্রচুর আলেম উলামা জন্মগ্রহন করেছেন। ইলমের আলোয় আলকিত করেছেন চারপাশ। শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ, শায়খ নিজাম, কাজী মাহমুদ, কাজী কামাল, মীর আব্দুল ওয়াহেদ, মুফতী আমীর হায়দার, সাইয়েদ গোলাম আলী আজাদ প্রমুখ ছিলেন বিলগ্রামেরই বাসিন্দা। ইলমচর্চার প্রচার প্রসারের কারনে বিলগ্রামেও গড়ে উঠেছিল প্রচুর কুতুবখানা। কাজী আবুল ফাতাহ শায়খ কামাল ছিলেন আকবরের শাসনকালে বিলগ্রামের কাজী। তার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল । সেখানে সরফ, নাহু, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, তাফসির, অলংকার শাস্ত্রের প্রচুর বই ছিল। কাজী সাহেবের হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। তিনি নিজের হাতের প্রচুর বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। আব্দুল ওয়াহেদ বিলগ্রামীর সংগ্রহেও প্রচুর বই ছিল। সাইয়েদ আব্দুল্লাহ বিলগ্রামী তার ব্যক্তিগত কুতুবখানায় প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করেছিলেন। শাহ তৈয়ব নামক একজন আলেমের কুতুবখানাতেও প্রচুর বই ছিল। নবাব মীর আলমগীরের সংগ্রহেও একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা ছিল।

রামপুরের কুতুবখানা

মুঘল সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হলে রোহিলাখণ্ডে কয়েকটি স্বাধীন রিয়াসত প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনই একটি রিয়াসত রামপুরের রিয়াসত। নবাব ফয়জুল্লাহ খানের সময়ে এখানে একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় বইপত্রের অনুবাদ ও অনিলিপি প্রস্তুতের কাজ। নবাব সাইয়েদ মুহাম্মদ সাইদ খানের সময় এই কুতুবখানার জন্য এক হাজার চারশো স্বর্নমুদ্রার বই ক্রয় করা হয়। এই সময় হুমায়ুন নামা, আকবরনামা, খাজানাতুল আলম, তারীখে নাদেরী, খুলাসাতুত তাওয়ারিখ, তারীখে জাহান খফী, তারীখে মজমায়ে মাহফিল, ইত্যাদী ইতিহাস গ্রন্থ ঐ কুতুবখানায় ছিল। নবাব সাইয়েদ মুহাম্মদ ইউসুফের সময় এই কুতুবখানার জন্য দুই হাজার সাতশো রুপী সমমূল্যের বই ক্রয় করা হয়। নবাব কলব আলী খানের সময় ৪৩ হাজার ছয়শো আট রুপীর বই কেনা হয়। তাফসীর, হাদিস, আসমাউর রিজাল, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, ইলমুল কালাম, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, রসায়ন, চিকিতসাবিদ্যা, সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র, অভিধান, নাহু, সুরফ এসব বিষয়ে প্রচুর বই ছিল এই কুতুবখানায়। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী এই কুতুবখানায় ২৪১১৫ টি বই ছিল।

জৌনপুরের কুতুবখানা

তুঘলকদের রাজত্ব শেষ হলে জৌনপুরে গড়ে উঠে স্বাধীন শর্কী সালতানাত। শর্কীরা কনৌজ থেকে বাংলা পর্যন্ত খাজনা আদায় করতেন। এই সালতানাত খুব দ্রæতই সমৃদ্ধ হতে থাকে। এখানে গড়ে উঠে প্রচুর মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ। এই সময়ে জৌনপুরে অন্তত ১৪ টি মাদরাসা গড়ে উঠে। যেখানে সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমরা পড়াতেন। এখানেও প্রচুর কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মৌলভী মাশুক আলীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ৫ হাজার বই ছিল। শাহজাহানের সময় জৌনপুরের মুফতী ছিলেন মুফতী সাইয়েদ আবুল বাকা। তিনি ছিলেন তার যুগে স্মরনশক্তির জন্য বিখ্যাত। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও প্রচুর বই ছিল।

আদীল শাহী কুতুবখানা

বাহামনি সাম্রাজ্যের পতন হলে দক্ষিনাত্যে ৫ টি নতুন সালতানাত গড়ে উঠে। বারিদ শাহী, কুতুব শাহী, নিজাম শাহী , আদিল শাহী ও ইমাদ শাহী সালতানাত। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল আদিল শাহী সালতানাত। ইরানের শাসকদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। ইরাক, পারস্য ও আজারবাইজান থেকে প্রচুর জ্ঞানিগুনি বিজাপুর আগমন করেন। এখানেও অন্যান্য অঞ্চলের মতো প্রচুর মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মান করা হয়। বিজাপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয় শাহী কুতুবখানা।এই কুতুবখানায় ৬০ জন কর্মচারী ছিল। স্বয়ং আদীল শাহের নিজস্ব

একটি কুতুবখানা ছিল যা তিনি সফরের সময়েও তার সাথে রাখতেন। সেখানে বড় বড় চারটি সিন্দুকে বইপত্র ছিল।

সেকালেও কুতুবখানা পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ দেয়া হতো। একজন লাইব্রেরিয়ানের অধিনে থাকতো আরো কিছু পদ। মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহের বাইরে সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে যেসব কুতুবখানা নির্মান করা হতো তার জন্য আলাদা ভবন নির্ধারন করা হতো। ভবন নির্মানের সময় আলোবাতাসের প্রতি খেয়াল রাখা হতো। কুতুবখানার সর্বোচ্চ পরিচালককে বলা হতো নাজেম। তাকে কখনো কখনো মুতামিদও বলা হতো। এর পরের পদটি ছিল মুহতামিমের । তার কাজ ছিল নাজেমের তত্তাবধানে কুতুবখানার দেখভাল করা। এই পদের অধিকারী হতে যোগ্যতার প্রয়োজন হতো। বিভিন্ন শাস্ত্রের বইপত্র ও লেখক সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো। মুহতামিমের একজন সহকারী থাকত, যাকে নায়েব বলা হতো। কুতুবখানা দেখভাল করা ছাড়াও বইপত্র নির্বাচন করা, ক্রয় করা এবং শাস্ত্রীয় বিচারে সেগুলো বন্টন করা এসব মুহতামিমের দায়িত্বে ছিল। মুহতামিমের অধিনে কয়েকজন মুন্সী বা ক্লার্ক থাকতো, যাদের কাজ ছিল রেজিস্টার বইতে বইপত্রের নাম তালিকা করা, বইতে নাম্বার লাগানো ইত্যাদী। আরো কিছু কর্মচারি থাকতো যাদেরকে সাহহাফ বলা হতো। এদের কাজ ছিল তাক থেকে বই বের করা, ধুলোবালু পরিস্কার করা, বইয়ের কোনো পাতা নষ্ট হলে সেটা আলাদা করা। বই বাধাইয়ের কাজেও কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। আরো থাকতো মুসাওইয়ির বা চিত্রশিল্পী, যারা বইয়ের প্রচ্ছদে সুন্দর সুন্দর ছবি একে দিতেন। আরেকটি পদ ছিলো লিপিকারকদের । প্রতিটি কুতুবখানাতেই কয়েকজন লিপিকারক থাকতো যাদের কাজ হতো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করা। তাদের অনুলিপি সমাপ্ত হলে বইটি পাঠানো হতো মুসাহহির কাছে। তিনি মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতেন কোথাও কোনো ভুল হয়েছে কিনা। কিছু কিছু কুতুবখানায় আরেকটি পদ ছিল জাদওয়াল সাজ। যারা বইয়ের সূচীপত্রে বিভিন্ন ডিজাইন করতেন। বেতনের বিচার করলে নাজেমের পর সবচেয়ে বেশি বেতন পেতেন মুহতামিম। তারপর নায়েবে মুহতামিম ও অন্যান্যরা।

তথ্যসূত্র :

১। মিন রাওয়াউই হাদারাতিনা– ড. মোস্তফা আস সিবাঈ
২। মাশরেকি কুতুবখানা — আব্দুস সালাম নদভী
৩। আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়া– ড ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরী
৪। হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ কে তামাদ্দুনি কারনামে — দারুল মুসান্নেফিন , আযমগড়
৫। তারিখুস সাক্বাফাতুল ইসলামিয়া — ওয়াজেহ রশীদ নদভী
৬। আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, — আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ মাকদিসী।
৭। হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত– সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী।
৮। ওয়াররাকু বাগদাদ ফিল আসরিল আব্বাসি – ড খাইরুলাহ সাইদ
৯। মাওসুআতুল ওয়াররাকাহ ওয়াল ওয়াররাকিন- – ড খাইরুল্লাহ সাইদ
১০। দুহাল ইসলাম– ড. আহমদ আমিন।
১১। কিসসাতু আন্দালুস– ড. রাগেব সিরজানি
১২। মা যা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলম– ড. রাগেব সিরজানি
১৩। জামিয়া নিজামিয়া বাগদাদ কা ইলমি ওয়া ফিকরি কিরদার, এক তাহকিকি জায়েযা – ড. সুহাইল শফীক

ভারতবর্ষে মুসলমানদের পাঠ্যক্রম

মূল : শায়খ আব্দুল হাই হাসানী নদভী র.

এটা অত্যন্ত হতাশার বিষয় যে, ভারতবর্ষে ইলমের ইতিহাস এখনো অন্ধকারেই আছে। এখনো আমরা সঠিকভাবে নির্নয় করতে পারি নি, বিভিন্ন সময়ে এখানকার পাঠ্যক্রমে কী কী পরিবর্তন এসেছে। ইতিহাস থেকে এটুকু নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, ভারত বিজেতাদের সাথে ইলম এ অঞ্চলে এসেছে এবং ইরাক ও মা ওয়ারাউন্নাহার অঞ্চলের পাঠ্যক্রমে যেসকল পরিবর্তন এসেছে তার প্রভাব এ অঞ্চলের পাঠ্যক্রমেও পড়েছে।

সর্বপ্রথম সিন্ধ ও মুলতানের বালূকাময় প্রান্তরে ইলমের প্রদীপ জ্বলে উঠে। তারপর এই প্রদীপের আলো বাড়তে থাকে এবং একসময় গোটা ভারতবর্ষে এই আলো ছড়িয়ে পড়ে। গজনবীরা যখন লাহোরকে তাদের রাজধানী বানান তখন ঐ শহর এই ইলমের দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। দিল্লী বিজয়ের পর সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় যোগ্য যোগ্য উলামাগন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমন করে দিল্লী একত্রিত হন। তাদের প্রসিদ্ধির কারনে দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাদের কাছে পড়তে আসা শুরু করে। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের সময়কালে শামসুদ্দীন খাওয়ারেজমী , শামসুদ্দীন কোশজি, বোরহানুদ্দীন বলখী, বোরহানুদ্দীন বাজ্জাজ, নাজমুদ্দীন দিমাশকি, কামালুদ্দীন যাহেদ, এমন প্রসিদ্ধ অন্তত বিশজন আলেম দিল্লীতে বসবয়াস করতেন। তাদের ইলম ও খ্যাতিতে দিল্লী তখন বাগদাদ ও কর্ডোভার আরেক নমুনা হয়ে যায়। আলাউদ্দীন খিলজির শাসনকালে জহিরুদ্দীন বাখরী, ফরিদুদ্দীন শাফেয়ি, হামিদুদ্দীন মোখলেস, শামসুদ্দীন নাজী, মহিউদ্দীন কাশানি, ফখরুদ্দীন হানুসী, ওয়াজিহুদ্দিন রাজী, তাজুদ্দিন মিকদাম, এমন অন্তত ৪৬ জন আলেমের নাম জানা যায়, যাদের ব্যাপারে জিয়াউদ্দীন বারনীর মন্তব্য হলো, তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না ।

মুহাম্মদ শাহ তুঘলকের শাসনামলে মুইনুদ্দীন ইমরানী, কাজী আব্দুল মুকতাদির, শেখ আহমদ থানেশ্বরীর মতো আলেমরা ছিলেন, যাদের সংস্পর্শে শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর মতো আলেম তৈরী হয়েছেন, ইতিহাস যার যোগ্যতার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালে জালালুদ্দীন রুমী দিল্লী আসেন। তাকে শাহী মাদরাসার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। একই সময়ে নাজমুদ্দীন সমরকন্দীও দিল্লী আসেন এবং নিজের ইলম দ্বারা ইলম পিপাসুদের তৃষনা নিবারণ করেন। সিকান্দার লোদীর শাসনামলে শেখ আব্দুল্লাহ ও শেখ আজিজুল্লাহ নামে দুজন আলেম মুলতান থেকে দিল্লী আসেন। তারা পাঠ্যক্রমে মানতেক এবং হেকমতের পরিমান বৃদ্ধি করেন। আকবরের শাসনামলে শাহ ফতহুল্লাহ সিরাজী ইরান থেকে ভারতে আসেন । তাকে আযদুল মুলক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পুরো ভারতবর্ষে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময়ে হাকীম শামসুদ্দীন আওরানের ভাগনে হাকীম আলী গিলানী চিকিতসাবিদ্যায় অবদান রাখেন এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী হাদীসের খেদমত করেন। শাহজাহান এবং আলমগীরের আমলে মীর যাহেদের খ্যাতির সূর্য আলো ছড়ায় । বলতে গেলে দরসে নিজামির বুনিয়াদ তার হাতেই রাখা হয়। তার ছাত্রদের মধ্যে শাহ্ আব্দুল আজিজ, শাহ্ রফিউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদের, মৌলভী আবদুল হাই, শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক, মৌলভী রশীদুদ্দীন খান, মুফতী সদরুদ্দীন খান, মৌলভী মামলুক আলী প্রমুখ আলেমরা ছিলেন।

লাহোরে ইলমের প্রচার প্রসার শুরু হয়েছিল দিল্লির আগে কিন্তু দিল্লী অল্পসময়েই খ্যাতির শীর্ষে পৌছে যায় , ফলে ইলমের ময়দানে লাহোর তার জৌলুস হারায়। পরে জামালুদ্দিন তালাহ, কামালুদ্দীন কাশ্মিরী, মুফতী আবদুস সালাম, মোল্লা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি প্রমুখ বরেন্য আলেমরা লাহোরে ইলমের প্রচার প্রসারের কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে লাহোর তার হারানো রওনক ফিরে পায়।

জৌনপুরে শর্কি সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় শেখ আবুল ফাতাহ শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী, উস্তাযুল মুলক মুহাম্মদ আফজাল, শামসে বাযেগার লেখক মোল্লা মাহমুদ, দেওয়ান আব্দুর রশীদ, মুফতী আবদুল বাকী, মোল্লা নুরুদ্দীনের মতো আলেমরা ইলম প্রচার প্রসারে অবদান রেখেছেন। তাদের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ভারতবর্ষে।

গুজরাটের বাসিন্দারাও ইলম চর্চায় অসামান্য বদান রেখেছেন। শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন গুজরাটি, মোল্লা নুরুদ্দীন প্রমুখ বরেণ্য আলেমরা গুজরাটে ইলমের প্রদীপ জ্বেলেছেন। সে প্রদীপ থেকে আলো নিতে দূরদুরান্ত থেকে ছুটে এসেছে শিক্ষার্থীরা। কাজী জিয়াউদ্দীন এসেছিলেন শায়খ ওয়াজিহুদ্দীনের কাছে। তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করে নিজের এলাকায় ফিরে ইলমের প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তার

ছাত্রদের মধ্যে শেখ জামাল অন্যতম। শেখ জামালের ছাত্র মোল্লা লুতফুল্লাহ । মোল্লা লুতফুল্লাহর ছাত্র নুরুল আনোয়ার প্রণেতা মোল্লা জিয়ুন, মোল্লা আলী আসগর, মোল্লা মুহাম্মদ আমান, কাজী আলিমুল্লাহ। তারা সবাই ছিলেন স্বীয় যুগের খ্যাতনামা আলেম। এলাহাবাদের আলেমদের মধ্যে শায়খ মুহিব্বুল্লাহ, কাজী মোহাম্মদ আসফ, শেখ মুহাম্মদ তাহের , মৌলভী বরকত, মউলভী জারুল্লাহ, প্রমুখ আলেম উল্লেখযোগ্য। তারা দীর্ঘদিন দরস তাদরিসের সাথে জড়িত থেকে নিজ নিজ এলাকাকে ইলমের আলোয় আলোকিত করেছেন। লখনউতে সর্বপ্রথম শায়খে আজম জৌনপুর থেকে ইলমের এই ধারা নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে শাহ্ পির মুহাম্মদ এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেন। তার শিষ্যদের কেউ কেউ যেমন মোল্লা গোলাম নকশবন্দী এই পাঠ্যক্রমকে সামনে অগ্রসর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এই সময়ে শায়খ কুতুবুদ্দীন সহালভীও দরস তাদরিসের সাথে যুক্ত হন, শীঘ্রই তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। বংশীয় কোন্দলের কারনে তিনি নিহত হলে তার সন্তান মোল্লা নিজামুদ্দিন পিতার মসনদে আসিন হন। শীঘ্রই লখনৌ পরিচিতি পায় ইলমের মারকাজ হিসেবে। মোল্লা নিজামুদ্দীন যে পাঠ্যক্রম প্রনয়ন করেন তা সর্বত্র গ্রহনযোগ্যতা পায়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি দরসগাহে এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হতে থাকে। এই বংশেই মোল্লা হাসান, বাহরুল উলুম মোল্লা মুবিন, মৌলভী আবদুল হাকীম, মুফতি জহুরুল্লাহ, মৌলভী ওয়ালিউল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ আসগর, মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ, মৌলভী আবদুল হাই, মউলভী আবদুল হালীম, মৌলভী নুরুল্লাহ প্রমুখ আলেম জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের সন্তানরা এবং তাদের ছাত্ররা ভারতবর্ষের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েন।

আউধের ছোট ছোট গ্রামগুলো হয়ে উঠে ইলমের কেন্দ্রবিন্দু । খুব কম এলাকাই এমন ছিল যেখানে ইলমের চর্চা হচ্ছিল না । ঝাইস, বিলগ্রাম, কাকোরি, হারগ্রাম, আমিঠি প্রতিটি এলাকাতেই তখন বইছে ইলমের ঝর্নাধারা। সহজবোধ্যতার জন্য আমরা ভারতবর্ষের পাঠ্যক্রমের ইতিহাসকে চার যুগে ভাগ করেছি। প্রত্যেক যুগে কী কী কিতাব পড়ানো হতো তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসবে। এ কাজে তথ্য সংগ্রহ করেছি ইতিহাসের বই থেকে , মাশায়েখদের মালফুজাত ও মাকতুবাত থেকে এবং তবাকাত ও কবিদের তাজকিরা থেকে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটাকে ছোট কাজ মনে হবে কিন্তু বাস্তবতা হলো বিভিন্ন ধরনের বইপত্রের হাজার পৃষ্ঠা উল্টানোর পরেই এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে ।

প্রথম যুগ

এই যুগের শুরু হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে। সমাপ্তিকাল হিজরী দশম শতাব্দী। প্রায় দুইশ বছরের বেশি সময়কাল এই পাঠ্যক্রম চালু ছিল। এ সময় যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো তা হলো, নাহু, সরফ, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতেক, ইলমুল কালাম, তাসাউফ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদী। নাহুর জন্য পড়ানো হতো মিসবাহ, কাফিয়া এবং কাজী নাসিরুদ্দীন বায়জাভির লুব্বুল আলবাব। পরে কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর ইরশাদ ও পড়ানো হতো।

ফিকহ = হেদায়া

উসুলে ফিকহ = মানার এবং তার শরাহ, উসুলে বাযদাভী

তাফসীর = মাদারেক, বায়জাভী, কাশশাফ

তাসাউফ = আওয়ারেফ, ফুসুস। (পরবর্তীকালে খানকাহ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলোতে নকদুন নুসুস পড়ানো হতো)

হাদীস = মাশারিকুল আনোয়ার, মাসাবিহুস সুন্নাহ

আদব = মাকামাতে হারিরি। এর মাকামাতগুলো মুখস্থ করানো হতো। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মালফুজাত থেকে জানা যায় তিনি তার উস্তাদ শামসুদ্দীন খাওয়ারেজমীর কাছে মাকামাত পড়েছিলেন এবং এর চল্লিশটি মাকামাত মুখস্থ করেছেন।

মানতেক = শরহে শামসিয়্যাহ

ইলমুল কালাম = শরহে সহায়েফ, কোথাও কোথাও আবু শাকুর সালেমির তামহিদ।

সেই সময়ের আলেমদের জীবনি থেকে বোঝা যায় তখন উসুলে ফিকহের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। হাদীস শাস্ত্রে শুধু মাশারিকুল আনোয়ার পড়াকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। যদি কেউ মাসাবিহুস সুন্নাহ পড়তেন তাহলে তাকে ইমামুদ দুনিয়া ফিল হাদীস উপাধি দেয়া হতো। সে যুগে হাদীসের সাথে সম্পর্কহীনতার একটি প্রমান পাওয়া যায় শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ঘটনা থেকে। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সময়কালে দিল্লীতে সামা বিষয়ক একটি বিতর্কের আয়োজন করা হয়। এক পক্ষে ছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া। অন্য পক্ষে দিল্লীর অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। নিজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন, আমি যখনই তাদের সামনে কোনো হাদীস পেশ করি তখনই তারা বলে, আমাদের এই শহরে হাদীসের চেয়ে ফিকহের গুরুত্ব বেশি । এখানে ফিকহের অগ্রাধিকার। আবার কখনো তারা বলে এই হাদীস ত শাফেয়ীদের। আর ইমাম শাফেয়ী আমাদের উলামাদের দুশমন। শায়খ বলেন যে শহরের উলামাদের আত্যম্ভরিতা এতো বেশি সে শহর কীভাবে টিকে থাকবে। এই

শহর ধবংস হয়ে যাওয়াই ভালো। *(এর কিছুকাল পরেই মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে দেবগিরিতে নিয়ে যান। দিল্লী হয়ে যায় বিরান। —- ই.রা)*

আলাউদ্দীন খিলজির শাসনামলে মাওলানা শামসুদ্দীন তুর্ক নামে একজন মিসরী মুহাদ্দিস মুলতান পর্যন্ত এসে ফেরত যান। তিনি যাওয়ার আগে বাদশাহর কাছে একটি পত্র লেখেন। সেখানে তিনি বাদশাহকে জানান ভারতবর্ষে হাদীসচর্চার প্রতি মৌলভীদের আগ্রহ নেই। দরবারী আলেমরা তার এই পত্র বাদশাহ পর্যন্ত পৌছতে দেয় নি। জিয়াউদ্দীন বারনী তারিখে ফিরোজশাহীতে এ ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় যুগ

হিজরী নবম শতাব্দীর শেষভাগে মুলতান থেকে শেখ আবদুল্লাহ ও শেখ আজিজুল্লাহ নাম দুজন আলেম আসেন। শেখ আবদুল্লাহ দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং শেখ আজিজুল্লাহ সাম্বলে অবস্থান নেন। সিকান্দার লোদী তাদের কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বিভিন্ন সময় তাদের দরসেও উপস্থিত হতেন। তার আগমনে যেন দরসে ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য তিনি সরাসরি দরসে না বসে মসজীদের এক কোনে বসে পড়তেন। পরে দরস শেষ হলে শেখ আব্দুল্লাহর সাথে গিয়ে দেখা করতেন। এই দুই আলেম নিজেদের যোগ্যতাবলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় শীঘ্রই পুরো ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে তারা পাঠ্যক্রমে কাজী ইযদের আল মাওয়াকিফ এবং সাক্কাকীর মিফতাহুল উলুম অন্তর্ভুক্ত করেন।

মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ূনী মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখে লিখেছেন, 'সুলতান সিকান্দার লোদীর যুগে শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর শায়খ আব্দুল্লাহ তালবানী এবং সাম্ভলের শেখ আজিজুল্লাহ তালবানী । এই দুজন মুলতানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে হিন্দুস্তানে এসে ইলমে মাকুল কে এদেশে প্রসারিত করে ছিলেন। এ দুজনের পূর্বে শরহে শামসিয়া এবং শারহে সাহায়েফ ব্যতিত ইলমে মানতেক এবং কালামের অন্য কোন কিতাব ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না'।

এ সময় মীর সাইয়েদ শরীফের ছাত্ররা শহরে মাতালি ও শরহে মাওয়াকিফ এবং তাফতাজানির শিষ্যরা মুখতাসারুল মা'আনি ও শরহে আকাইদে নাসাফী পড়ানো শুরু করেন। শরহে জামী ও শরহে বেকায়াও এ সময় ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রমে প্রবেশ করতে থাকে। এই যুগের শেষদিকের একজন আলেম যিনি তার সময়কালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বও বটে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী আরবে যান এবং সেখানে তিন বছর অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি এবং তার সন্তানরা হাদীসের এই বরকতময় সিলসিলার প্রচার প্রসারে

মনোযোগী হন কিন্তু তাদের এই ধারা বেশিদিন সচল থাকে নি। এই সৌভাগ্য অর্জন করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। সে যুগের উলামায়ে কেরামের জীবনি পড়লে এটা পরিস্কার হয়, সেকালে মিফতাহুল উলুম ও মাওয়াকিফকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। মুফতী জামাল খানের জীবনিতে বাদায়ুনী লিখেছেন, 'তিনি দরসে বসে মিফতাহুল উলুম ও মাওয়াকিফ আগাগোড়া চারবার পড়েছেন'।

তৃতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যক্রমে যেসকল পরিবর্তন , পরিবর্ধন এসেছে তার ফলে আলেমরা আরো আশাবাদী হন এবং পাঠ্যক্রমে যে কোনো পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। এ কারনেই আকবরের শাসনামলে যখন শেখ ফতহুল্লাহ সিরাজী আসেন এবং পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন আনেন , তা সর্বত্র সমাদৃত হয়। মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী 'মাআছিরুল কিরামে' লিখেছেন, 'পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে মীর সদরুদ্দীন, মীর গিয়াসুদ্দিন মানসুর, মীর্জা জান প্রমুখ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দরসদানে মনোযোগী হন'। এই আলোচনায় অবশ্যই শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন গুজরাটির নাম নিতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম মুতাআক্ষেরিন উলামায়ে কেরামের বইপত্র পড়ানো শুরু করেন। তার এই ধারা গুজরাটের বাইরেও জনপ্রিয়তা পায়। তার ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ইলমের প্রদীপ জ্বেলেছেন। মুফতী আব্দুস সালাম ছিলেন ফতহুল্লাহ সিরাজীর ছাত্র। তিনি চল্লিশ বছর লাহোরে বসে দরস দেন। হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে পড়তো। অবশ্য তিনি খুব কম ছাত্রকেই সনদ দিতেন। দেওয়াহর মুফতী আব্দুস সালাম এবং এলাহাবাদের শায়খ মুহিব্বুল্লাহ এমনই দুই ভাগ্যবান যারা লাহোরে পড়াশুনা করেন এবং সনদ অর্জন করেন। তাদেরই ছাত্র শায়খ কুতুবুদ্দীন সাহালভি, যিনি দরসে নিজামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীনের পিতা। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত্যু ১১৭৪ হিজরী), যিনি এই পাঠ্যক্রমের সবচেয়ে বিখ্যাত আলেম, তিনি নিজের ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন। তা নিম্নরূপ :

নাহু = কাফিয়া, শরহে জামী।
মানতেক = শরহে শামসিয়া, শরহে মাতালি।
দর্শন = শরহে হেদায়াতুল হিকমাহ।
কালাম = শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহে মাওয়াকিফ।
ফিকহ = শরহে বেকায়া, হেদায়া।
উসুলে ফিকহ =হুসামি এবং তালবি আলাত তাওজি এর কিছু অংশ।
বালাগাত = মুখতাসারুল মাআনি , মুতাওয়াল।

গনিত = নির্বাচিত কিছু পুস্তিকা।
চিকিৎসা বিজ্ঞান = মুজিজুল কানুন।
হাদীস = মিশকাতুল মাসাবিহ (সম্পূর্ণ), শামায়েলে তিরমিযি (সম্পূর্ণ), সহীহ বুখারীর কিছু অংশ।
তাফসীর = তাফসীরে মাদারেক, বায়যাভী।
তাসাউফ = আওয়ারেফ, রাসায়েলে নকশেবন্দীয়া, শরহে রুবাইয়াতে জামী, মুকাদ্দিমা নাকদুন নুসুস।

এসব পড়া শেষে শাহ সাহেব আরবে যান। সেখানে তিনি শায়খ আবু তাহের মাদানীর কাছে অবস্থান করে ইলমে হাদীস চর্চা করেন এবং এই উপহার নিয়ে দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে তিনি হাদীস চর্চার যে মশাল জ্বেলেছেন তার আলো আজো জ্বলছে। মূলত শাহ সাহেবের সময়কাল থেকেই ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সিহাহ সিত্তার পঠনপাঠন শুরু হয়। শাহ সাহেব এ সময় নতুন একটি পাঠ্যক্রম প্রনয়ণ করেন। কিন্তু ততোদিনে ইলমের কেন্দ্র দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে লখনৌতে চলে গেছে। ফলে শাহ সাহেবের এই পাঠ্যক্রম খুব একটা কার্যকরী হয় নি এবং শাহ সাহেবের সন্তানরাও এই পাঠ্যক্রমকে প্রচার করার আগ্রহ দেখান নি।

চতুর্থ যুগ

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে এই যুগের শুরু। এই সময়ে মোল্লা নিজামুদ্দিন ফিরিংগী মহল্লী একটি পাঠ্যক্রম প্রনয়ন করেন, পরবর্তীকালে যা দরসে নেজামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোল্লা নিজামুদ্দিন ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর সমসাময়িক। তার প্রনীত পাঠ্যক্রম ছিল নিম্নরুপ :
ইলমুস সরফ (শব্দ ও তার রুপান্তর শাস্ত্র) = মীযানুস সরফ , মুনশায়িব, পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুস সীগাহ (মুফতী ইনায়েত আহমাদ কাকুরী প্রনীত), ফুসুলে আকবরী, শাফিয়া।
নাহু (ব্যাকরণ) =নাহবেমীর, মিয়াতে আমেল (আব্দুল কাহির জুরজানির ব্যখ্যাসহ), আবু হাইয়ান আন্দালুসীর হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে জামী।
মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) =সুগরা-কুবরা, মুখতাসার ঈসাগুজি, তাহযিবুল মানতিক ওয়াল কালাম, শরহে তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, সুল্লামুল উলুম।
হিকমত ও ফালসাফা (দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান)=হিদায়াতুল হিকমাহ ব্যখ্যাগ্রন্থ মারযুবী, সদরা, শামসে বাযেগা।
গণিত =খুলাসাতুল হিসাব ওয়াল হানদাসা, উসুলুল হানদাসাতিল ইকলীদাস, তাশরিহুল আফলাক, রিসালাতু কুশজিয়া, শরহে চুগমীনী (প্রথম অধ্যায়)।

বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) =মুখতাসারুল মাআনি, মুতাওয়াল।
ফিকহ =শরহে বেকায়া, হেদায়া।
উসুলে ফিকহ =নুরুল আনোয়ার, আত তাওহীদ ফী হাললি গাওয়ামিদিত তানকীহ, আত তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবুত।
ইলমে কালাম =শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহুল আকাইদিল আদদিয়া, মীর যাহেদ।
তাফসীর =তাফসীরে জালালাইন, বায়জাভী।
হাদীস =মিশকাতুল মাসাবিহ।

এই পাঠ্যক্রমের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাতে ছাত্রদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রখর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে বই পাঠ্য ছিল কিন্তু মূলত ছাত্রদের কে শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী করানোর দিকেই বেশি জোর দেয়া হতো। পাঠ্যক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে সকল বিষয়কে রাখা হয়েছিল যেন একজন ছাত্র ষোলো সতেরো বছর বয়সেই পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করতে পারে। *(ফিরিংগী মহলের উলামায়ে কেরামের জীবনি পড়লে দেখা যায় তাদের অধিকাংশ এ বয়সেই নেসাব বা পাঠ্যক্রম শেষ করেছেন। —- ই.রা)*

সুলতানি আমলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা

সুলতানি আমলে বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ছিল। শিক্ষা ছিল সামাজিক সম্মান অর্জনের মাধ্যম। বাংলার সুলতানরা তাই শুরু থেকেই শিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিয়েছেন। এমনকি ধনাঢ্যরাও পিছিয়ে থাকেননি।

প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে। প্রায় প্রতিটি মসজিদে এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির সামনে থাকত মক্তব। বাংলায় এসব মক্তবকে পাঠশালাও বলা হতো। সাধারণত চার বা পাঁচ বছর বয়সে শিশুদেরকে মক্তবে পাঠানো হতো।

ভারতবর্ষে সাধারণত বছর ও মাসের মিল রাখা হতো, যেমন চার বছর চার মাস বয়সে কিংবা পাঁচ বছর পাঁচ মাস বয়সে শিশুদেরকে মক্তবে পাঠানো হতো। শিক্ষক কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করতেন, শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এভাবেই শুরু হতো শিশুর শিক্ষাজীবন। ধনীরা এই উপলক্ষে খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো বিসমিল্লাহ-খানি। সেসময় ফার্সি ছিল রাজভাষা। ফলে সালতানাতের চাকরি পেতে হলে ফার্সি ভাষা জানা লাগত। মক্তবে আরবি ও ফার্সি পড়ানো হতো। হিন্দু শিশুরাও তাই মক্তবে পড়ত। সুলতানি আমলে অনেক হিন্দু কর্মকর্তা সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। সাইয়েদ সোলাইমান নদভি তাঁর 'হিন্দুয়ো কি তালিমি তরক্কি মে মুসলমান হুকুমরানো কি কোশিশে' গ্রন্থে এমন অনেক হিন্দু কর্মকর্তার পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা বাল্যকালে মক্তবে মুসলিম শিশুদের সাথে পড়াশোনা করেছেন।

সেকালে প্রতিটি মসজিদের জন্য লা খেরাজ ভূমির ব্যবস্থা ছিল। এই জমির আয় থেকে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সাধারণত মসজিদের ইমামই মক্তবে পড়াতেন। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল মূল পাঠ্যক্রম। কবি বিপ্রদাস লিখেছেন, মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে মক্তবে ওজু করা ও নামাজ পড়ার পদ্ধতি শেখানো হতো। এসময় হস্তলিপিও শেখানো হত।

প্রাথমিক শিক্ষার পরের ধাপটি ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার। মাদরাসাসমূহে এই স্তরের পাঠ দেয়া হতো। সুলতানি আমলের শুরু থেকেই এই অঞ্চলে প্রচুর মাদরাসা

প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখেছেন, বখতিয়ার খলজি লখনৌতি জয়ের পর সেখানে মসজিদ মাদরাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন।

সুলতানি আমলের অন্য সুলতানরাও এই ধারা অব্যাহত রাখেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য লা খেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হত। শিক্ষকদের জন্যও ভাতা নির্ধারণ করা হত। সুলতানি আমলে শিক্ষকদের এই ধরনের ভাতাকে বলা হতো মদদ-ই-মাআশ। সদরুস সুদুর ও শায়খুল ইসলাম নামে দুটি পদ ছিল। এই দুই পদে আসীন কর্মকর্তারা এসব মাদরাসা ও শিক্ষকদের দেখভাল করতেন। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর লা খেরাজ জমি ওয়াকফ করে দেয়া হতো। নওগাঁর মহিসন্তোষে তকিউদ্দিন আরাবি প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার জন্য বরাদ্দ জমির পরিমাণ ছিল ২৭০০ একর। রাজশাহীর বাঘাতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। এসব মাদরাসায় ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, পোষাক, তেল, প্রসাধনী, পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্য কাগজ-কলম–সবই পেত।

সেসময় ধনাঢ্যরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ দিতেন। এলাকার দরিদ্র ছাত্ররাও এই শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ পেত। সুলতানি আমলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তবে এখনো দুয়েকটি মাদরাসার নিদর্শন টিকে আছে। এর মধ্যে নওগাঁর মহিসুনে তকিউদ্দিন আরাবির মাদরাসার কথা বলা যায়। এই মাদরাসায় পড়েছিলেন বিহারের বিখ্যাত সুফি শারফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরির পিতা ইয়াহইয়া মানেরি। এই মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যামিতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় পাঠ্য ছিল। সেসময় মহিসুন ছিল সোহরাওয়ার্দি তরিকার সুফিদের আবাসভূমি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে শায়খ শারফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক তথ্যমতে বাংলায় সর্বপ্রথম এখানেই হাদিসের দরস দেয়া হয়। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ দরসবাড়ি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চাপাইনবাবগঞ্জে এখনো এই মাদরাসার অবকাঠামো টিকে আছে।

আবদুল করিম লিখেছেন, সুলতানি আমলে যেখানেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হত সেখানেই একটা religious complex গড়ে উঠতো। মাদরাসার সাথে মসজিদ, খানকা, মাজার ও সরাইখানাও নির্মাণ করা হতো। কখনো কখনো শুধু মসজিদ ও মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করা হতো। সুফিরা মাদরাসা নির্মাণ করলে সাথে তাঁরা খানকাহও নির্মাণ করতেন।

এই মাদরাসাগুলো ছিল আবাসিক। ছাত্র-শিক্ষক সবাই-ই মাদরাসায় অবস্থান করতেন। জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের শিলালিপিতে তালিবুল ইলমদের জন্য

ব্যয় করার কথা আছে। বিভিন্ন শিলালিপিতে মাদরাসাকে দারুল খাইরাত বা বিনাউল খাইরাত বলা হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায়, সুলতান ও আমিরদের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও মাদরাসা ও ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য ব্যয় করতেন। জাফর খানের মাদরাসার শিলালিপিতে দেখা যায় কাজি নাসির তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ থেকে এই মাদরাসায় দান করেছিলেন।

এইসব মাদরাসায় সাধারণত কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, তাসাউফ, নাহু-সরফ, ফিকহ, আদব ও অন্যান্য ইসলামী বিষয় পাঠ্য ছিল। এর পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি ও অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হতো। এই অঞ্চলে গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন করানো হতো। শরফনামা গ্রন্থে আমির সাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানি নামে চতুর্দশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতান জামালউদ্দিন ফতেহ শাহ চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মুহাম্মদ বুদাই লিখিত হিদায়াতুর রমি বা তীর চালনার নির্দেশিকা বইটি অনেক মাদরাসায় পাঠ্য ছিল। এ থেকে বুঝা যায় কোথাও কোথাও প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হতো। অনেক মাদরাসায় ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা শেখানো হতো।

সুলতানি আমলে মেয়েদের পর্দার কারণে সাধারণত তাদের পড়াশোনা প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। বালিকাদেরও বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠান করা হতো। তারা বালকদের সাথে একত্রে মক্তবে পড়াশোনা শুরু করত। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তাদের ঘরেই কোনো শিক্ষকের কাছে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতেন। আলেমগণ অবসরে তাদের কন্যাদেরকে শিক্ষা দিতেন।

সেকালে শিক্ষকরা সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষকের হাতে সন্তানকে তুলে দিয়ে পিতামাতা নিশ্চিন্ত হতেন। ছাত্ররাও শিক্ষকের প্রতি প্রচণ্ড ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনুভব করত।

রাজদরবারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের লা খেরাজ জমি ও ভাতা দেয়া হতো। ছাত্ররা শিক্ষকদের সাংসারিক কাজকর্মেও সাহায্য করত। মাদরাসার শিক্ষকরা সামাজিক বিভিন্ন বিষয়েও জড়িয়ে যেতেন। যেমন বিয়েশাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিচালনা।

ছাত্রদের অনুপস্থিতি, পাঠে অমনোযোগ, বেয়াদবি ইত্যাদিকে দোষ হিসেবে গণ্য করা হতো। এজন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া হত। কখনো বেত্রাঘাত করা হত, কখনো অন্য শারিরিক শাস্তি দেয়া হতো।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মেঝেতে খড়িমাটি দিয়ে লিখত। এরপর তারা কলাপাতা, তালপাতা এসবে লিখত। কলম হিসেবে ব্যবহার করত বাঁশের কঞ্চি, পাখির পালক বা নলখাগড়ার টুকরো। ছাত্ররা বসত মেঝেতে বা ঘর থেকে নিয়ে

আসা মাদুরে। ছাত্ররা নিজেরাই লেখার কালি তৈরি করত। হরিতকি ও প্রদীপের নির্বাপিত ফুলকা দ্বারা তারা যে কালি তৈরী করত তা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকত।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস- ডক্টর এম এ রহিম। বাংলা একাডেমী।
২. মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য- আবদুল করিম। কাকলী প্রকাশনী।
৩. মহিসন্তোষ-সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী- মো আবদুল করিম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

সুলতানি আমলে বাংলা সাহিত্য

বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরুতে মুসলিমরা ছিল বহিরাগত। মুসলিম সুলতানদের মুখের ভাষা ছিল তুর্কি, রাজভাষা ছিল ফার্সি। কিন্তু মুসলিম শাসকরা দ্রুতই এখানকার মানুষের জীবনের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন। ইতিপূর্বে বহিরাগত আর্যরা অনার্যদের সাথে যে বৈষম্যের দেয়াল তুলে রেখেছিল মুসলিমরা সে দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তারা ইসলামের সাম্যবাদ ঘোষণা করেন। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সকল পক্ষপাতমূলক আচরণ তারা পরিহার করেন। এই অঞ্চলে তারা স্থায়ী হয়ে যান। এখানকার জনসাধারণের যাপিত জীবনকে আপন করে নেন। জনসাধারণও মুসলিম শাসনকে নিজেদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করে।

মুসলিমরা বাংলা কেড়ে নিয়েছিল সেন রাজাদের হাত থেকে। লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মাধ্যমে হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে রাজদন্ড স্থানান্তরিত হয়। এটি ছিল একটি বড় ঘটনা। স্থানীয়দের মনে অবশ্যই এর প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'এতবড় ঘটনাতে প্রজাদের হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিবার কথা অথচ তাহারা তাহাদের চিরাগত অভ্যাসানুযায়ী এই মর্মন্তুদ ঘটনার অভিব্যক্তি-স্বরূপ কোনো গীতিকা রচনা করে নাই। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, সেই রাজত্বের লোপে জনসাধারণের মনে তেমন আঘাত লাগে নাই'।[৮২]

---

[৮২] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, পৃ-৩৯ – দীনেশচন্দ্র সেন। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

ব্রাহ্মণ-অনুশাসনের যুগে প্রজাদের বড় অংশই ছিল অবহেলিত। উচু-নিচু বর্ণের ভেদাভেদ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের মাঝে তুলে দিয়েছিল বাধার প্রাচীর। নাপিত, ধোপা, ডোম, চন্ডাল ইত্যাদি পেশার লোকজন ছিল চরম ঘৃণিত। তাদের দেখলে অন্যদের যাত্রাভঙ্গ করতে হত। 'ছি ছি' 'ধুর ধুর' এই ছিল তাদের প্রতি সম্বোধনের ভাষা। সে সময় ছিল সংস্কৃত ভাষার জয়জয়কার। বাংলা ছিল অবহেলিত। প্রচার করা হয়েছিল, যদি কেউ রামায়ণ ও পুরাণের কথা বাংলায় প্রচার করে তাহলে সে রৌরব নরকে পতিত হবে। রামায়নের অনুবাদক কৃত্তিবাস এবং মহাভারতের অনুবাদক কাশীদাসের নিন্দা করে ভট্টাচার্যরা প্রবাদ রচনা করেছিলেন, 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেষে, এই তিন সর্ব্বনেশে'।[৮৩]
ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম বাংলা কাব্য চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' রচিত হয় এর প্রায় দুইশো বছর পরে। এর কারণ হলো ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। ফলে এই সময় সাহিত্যচর্চার অনুকুল ছিল না। এই সময়ের কোনো সাহিত্য এখনো পাওয়া যায়নি। ফলে ১২০১-১৩৫২ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বলা হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসন থিতু হতেই বাংলাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজদরবারে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) শিক্ষানুরাগী হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহাম্মদ সগীর রচনা করেন বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ জোলেখা'[৮৪]। এই ধর্মীয় ও রম্য উপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে নব দিগন্তের সূচনা করে। সুলতানের এই পৃষ্ঠপোষকতা অন্য কবিদের জন্য ছিল আশার বাণী, কারণ সে সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সাহিত্য-সাধনার কাজটি ছিল বেশ কঠিন।

সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে ভগবতের বাংলা অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন। পরে কবিকে তিনি গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন।
সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়কালকে ধরা হয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে। এই আমলের ৪৫ বছর সময়ে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। ফলে এই সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগ বলা হয়। এই সময়ে কবি-সাহিত্যিকরা ব্যাপকহারে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সুলতান ও তার

---

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৪০

[৮৪] ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর এম এ রহিম এই মত দিয়েছেন। তবে আবদুল করিমের মতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে ইউসুফ জোলেখা রচিত হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল, পৃ-৪৫৮- আবদুল করিম। জাতিয় সাহিত্য প্রকাশ।

দরবারের সভাসদরা সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। সেকালের কবি-সাহিত্যিকদের লিখিত গ্রন্থে এর প্রমাণ মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থের লেখক যশোরাজ খান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারের কর্মচারী। যশোরাজ খান তার গ্রন্থে সুলতানকে 'শাহ হুসেন জগত-ভূষণ' বলে সম্বোধন করেন। কবিন্দ্র পরমেশ্বর 'কলিকালে হরি হৈল কৃষ্ণ অবতার' বলে সুলতানের বন্দনা করেছেন। তার আমলেই বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস রচনা করেন 'মনসামঙ্গল' ও 'মনসাবিজয়' গ্রন্থদুটি। বিজয়গুপ্ত তার লেখায় সুলতানের প্রশংসা করেছিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ছেলে নসরত শাহও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবদুল করিম লিখেছেন, হোসেন শাহী বংশে চারজন রাজা রাজত্ব করেন, এই চারজনই কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন কবি পরমেশ্বরকে। পরমেশ্বের মহাভারতের বিশাল অংশ অনুবাদ করেন। পরে পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে বাকি অংশ অনুবাদ করেন সভাকবি শ্রীকর নন্দী।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ দশকে অনেক মুসলমান কবি প্রেমকাব্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন, 'হানিফা ও কায়রা পরী' গ্রন্থের লেখক কবি সাবিরিদ খান, 'সয়ফুল মুলক' কাব্যের রচয়িতা দোনাগাজি এবং 'লাইলি মজনু'র লেখক দৌলত উজির বাহরাম খান। সে সময় মুসলমান কবিরা আরবী ও ফারসি সাহিত্যের রম্য উপাখ্যান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করছিলেন। এভাবে তারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। মুসলিম লেখকরা তাদের লেখায় নায়ক-নায়িকার নৈতিকতা, মানবীয় গুণাবলী, ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার দিকে জোর দেন। মূলত মুসলমান লেখকদের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক রচনার সংযোজন হয়। তারা ইতিহাসের সাথে কল্পনা মিশিয়ে ইসলামের প্রথম যুগের বীরদের বীরত্বগাথা রচনা করেন। এসব রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের গৌরবগাথা প্রচার করা এবং মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগের উন্মেষ ঘটানো। সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮১) সভাকবি শেখ জৈনুদ্দিন রচনা করেন 'রাসুল বিজয়'। এ গ্রন্থের উপাদান তিনি নিয়েছিলেন একটি ফার্সি গ্রন্থ থেকে। এ ধরনের আরেকটি রচনা হলো শেখ ফয়জুল্লাহ লিখিত 'গাজি বিজয়'। তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সুলতান বারবক শাহের সেনাপতি বিখ্যাত দরবেশ শেখ ইসমাইল গাজির জীবনী অবলম্বনে। অবশ্য এটি নিরেট ইতিহাস ছিল না। বরং ইতিহাসের সাথে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

মুসলিম কবিগণ বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের দাবিদার। পারস্যের জালালুদ্দিন রুমি ও অন্যান্য সুফি কবিদের গজলিয়াত-এর অনুসরণে তারা পদাবলী নামে পরিচিত মরমী ভাবধারার কবিতা রচনা করেন। এই পদাবলী মূলত ফারসি সাহিত্যের মসনবী। সুলতান হোসেন শাহের অধীনে চাঁদ কাজী নামে নবদ্বীপের একজন কাজী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এই ভাবমূলক গীতি-কবিতা রচনার প্রথম খ্যাতনামা কবি।

মুসলিম কবিদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল সত্যপীরের কাহিনী। এটি মূলত মুসলিম মানসের ভক্তি ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাবে তৈরী হয়। মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি ভক্তির ফলে হিন্দুরাও সত্যপীরের কাহিনী রচনা করতে থাকে। শেখ ফয়জুল্লাহ ছিলেন সত্যপীর বিষয়ক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথম বাঙ্গালি কবি। এ জাতীয় কাব্য ১৫৪৫-১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। পরে হিন্দু-মুসলমান দুই ঘরানাতেই এই সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ জাতীয় কাব্য-সাহিত্য বাঙ্গালি সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল।
মুসলিম কবিরা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আরবী ও ফারসি ভাষা থেকে বহু শব্দ আমদানি করেন, এবং বাংলা ভাষার জীবনী-শক্তি সঞ্চার করেন। সুলতান নুসরত শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় আফজল আলি নামক একজন মুসলমান কবি বেশকিছু কবিতা রচনা করেন। তার কবিতাগুলো মুসলমানদের ভাষা-বিষয়ক ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত বহন করে। তিনি তার নসিহতনামায় লিখেছেন –

উপহাস্য করে বুলি মুনাফিকগণ,
আয়ত হাদিস লেখিয়াছি তেকারণ।
খোয়াব বলিয়া শাহা রুস্তমে কহিল,
অলগণ পদে প্রণোমিয়ে পুনি পুনি,
ভাবে ডুবি যেবা পড়ে ছাড়ে কুফরানি।
খোয়াব যে, নসিহতনামা তার নাম।

কবি আলাওলের সময় বাংলা ভাষার ইসলামি ঐতিহ্য উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। মুসলিম কবিদের লেখনি হিন্দু কবিদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। ফলে গোঁড়া হিন্দু কবিরাও তাদের কাব্যে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার না করে পারছিলেন না। বিজয়গুপ্ত তার মনসামঙ্গলে লিখেছেন –

তকাই নামে মুল্লা কিতাব ভাল জানে
কাজির মেজবান হৈলে আগে তারে আনে
কাছ খুলিয়া মুল্লা ফরমায় অনেক।
কাজি বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম।
পীর থাকিতে কেন ভূতেরে সালাম।
কাজী বলে আহম্মক জোয়াব দাও কেনে।

(তকী নামে একজন মোল্লা বা শিক্ষিত লোক ধর্মীয় গ্রন্থাদি ভালো জানেন। কাজী কোনো ভোজের আয়োজন করলে তিনি সকলের আগে মোল্লাকে নিমন্ত্রণ করেন। মোল্লা তার পোষাকের প্রান্ত আলগা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। কাজী কাউকে বলেছিলেন, ব্যাটা ভূতের গোলাম কোথাকার। মোল্লা থাকতে তুমি কেন ভূতের ভয় পাও। কাজী লোকটিকে আহম্মক বলে অভিহিত করেন এবং তাকে তর্ক করতে নিষেধ করেন।)

এই প্রভাব দেখা যায় বংশীবদনের কাব্যেও। তিনি লিখেছেন–

পায়জামা, নিমা টুপি পরি কটিবন্ধ,
হাসান সাইদের সাজে সাত ফরজন্দ।
আওখন্দ হাসান কাজী হৈলা আগুয়ান,
তালিপ মুর্শিদী তার ধরিছে জোগান।

হিন্দু কবিরা তাদের কাব্যে দেব-দেবীর বন্দনা দিয়ে শুরু করতেন। মুসলিম কবিগণ যথাক্রমে আল্লাহ ও নবিজির প্রতি হামদ ও নাত দিয়ে তাদের রচনা শুরু করতেন। এরপর তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বন্দনা করতেন। নানা উপাধিতে তাদের ভূষিত করতেন। তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। কৃতজ্ঞতার কারণও স্পষ্ট। আর্থিক সহায়তা না পেলে সাহিত্যচর্চা করা ছিল কঠিন। সেকালে লেখার উপায়-উপকরণও ছিল সীমিত। ফলে সুলতান ও সভাসদদের সাহায্য তাদের সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করতো। জীবিকার চিন্তাও দূর হতো।

সুলতানরা এই বাস্তবতা জানতেন। ফলে রাজসভা থেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। এভাবেই সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ঘটে, পরবর্তীতে যাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন অন্যরা।

দরসবাড়ি মাদরাসায় নেমে আসা সোনালি রোদ

আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে হাটা পথ চলে গেছে । তালহা ভাই বললেন, মাদরাসাটা এদিকেই। আমরা বাগানের ভেতর ঢুকি। এখন আমের মৌসুম। প্রচুর আম ধরেছে। বাতাসে কেমন একটা অচেনা সুবাস। বাতাস স্থির হয়ে আছে। আজ খুব গরম পড়ছে, দরদর করে ঘামছি সবাই, ঘামের স্রোত গলা থেকে বুকের দিকে নেমে যায়, মনে হচ্ছে জামার ভেতর তেলাপোকা হাটছে। জায়গাটা নির্জন, আশপাশে বাড়িঘরও নেই, দূরে মাঠে একজন কৃষককে কাজ করতে দেখা যায়, তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় শালিক পাখি। একটু দূরে, গাছের ফাক দিয়ে একটা কাঠামো দেখা যায়, তালহা ভাইয়ের দিকে তাকাতেই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দেন। বুঝতে পারি ওটাই দরসবাড়ি মাদরাসার ধ্বংসাবশেষ। বুকের ভেতর একটা শিহরণ খেলা করে।

হেটে মাদরাসার সামনে চলে আসি। ছোট একটা লোহার গেট। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকি। চোখে পড়ে মাদরাসার বিশাল অবকাঠামো। ছবিতে অনেকবার দেখেছি, তবে সামনাসামনি এই প্রথম। রোদের তীব্রতায় চোখ মেলা কঠিন, আমরা হেটে মাদরাসার অবকাঠামোর ভেতর প্রবেশ করি। মাদরাসার গঠন বর্গাকৃতির। চারপাশে ছোট ছোট কক্ষ। কেমন আনমনা হয়ে যাই। আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, একদিন এখানে কোলাহল ছিল, হাদিসে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শব্দাবলী উচ্চারিত হতো, আর আজ তা নীরব, নির্জন।

একটা কক্ষে প্রবেশ করি। কক্ষের প্রবেশমুখে সরু গলির মত। ভেতরে প্রশস্ত কক্ষ। ছাদ ক্ষয়ে গেছে অনেক আগেই, দেয়ালের উচ্চতাও নেমে এসেছে অর্ধেকে। ভেতরে ঘাস জন্মেছে। কল্পনার চোখে দেখি, কুপি জ্বালিয়ে এই কক্ষে কিতাব পড়ছে

ছাত্ররা। বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠে। কেমন ছিল এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সময়টা। এখানে কারা পড়তেন? কারা পড়াতেন?

আফসোস, এই মাদরাসা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য এখনো আমাদের হাতে আসেনি। এতটুকু নিশ্চিত হওয়া গেছে এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)। এখন যদিও এ মাদরাসার অবস্থান চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থালবন্দরের কাছে, কিন্তু সুলতানী আমলে এই মাদরাসা ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য আধুনিক গবেষকদের কারো কারো মতে এই মাদরাসা মূল শহরের বাইরে ছিল। উদ্ধারকৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয় ৯০৯ হিজরী তথা ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে। শিলালিপিটির ভাষ্য নিম্মরুপ-

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আলিমদের আশ্রয়দানকারীদের সৌভাগ্য দান করেন, যারা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাদের অনুগ্রহ করেন, তাদের সম্মানকারীদের সম্মান দেন, এবং তাদের সাহায্যকারীদের উচ্চ মর্যাদা দেন। আল্লাহর রাসুলের প্রতি দরুদ যিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আলিমদের আশ্রয়দান করবে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন আশ্রয়দান করবেন এবং তার সহচর ও বংশধররা নিরাপদ মর্যাদা লাভ করবে। সুলতান আলাউদ্দিন আবুল মুজাফফর হোসেন শাহ বিন সাইয়েদ আশরাফ আল হুসেন ও তার বংশধরদের রাজত্ব আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন। এই বৃহৎ ও মনোরম মাদরাসা তিনি ৯০৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৫]

এই মাদরাসার উস্তাদ শাগরেদদের বিষয়ে ইতিহাস নীরব। জানা যায়নি কত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে পঠন পাঠনের কাজ চলেছে? এখানের পাঠ্যক্রমই বা কী ছিল। বুকের ভেতর একটা কষ্ট দোলা দেয়। কত কত মাদরাসার ইতিহাস আমরা জানি, ছাত্র শিক্ষকদের জীবনি পড়ি, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে জানি কিন্তু নিজের দেশের এই মাদরাসাটি সম্পর্কে কেউ আমাদের তেমন কিছু জানায়নি। আবদুল কাদের নাইমি দিমাশকির 'আদ দারিস ফি তারিখিল মাদারিস' গ্রন্থে অন্তত মাদরাসাটির কথা আসতে পারতো। যেহেতু লেখকের জীবদ্দশাতেই এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা। সেখানে এই মাদরাসার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই আবুল হাসানাত নদভীর 'হিন্দুস্তান কি কদিম ইসলামী দরসগাহে' গ্রন্থেও। অথচ সেখানে উল্লেখ আছে গিলানের এক মাদরাসার কথা, যার সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য মাদরাসার ভবন

---

[৮৫] সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উতপত্তি ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ২৯- আবদুল করিম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ছিল বৃহদাকার একটি অট্টালিকা। আর মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী জানাচ্ছেন, বৃহদাকার সেই ভবনের অবস্থা। সেখানে একসাথে বিশজনের বেশি অবস্থান করার সুযোগ ছিল না। 'আল হিন্দ ফি আহদিল ইসলামী' গ্রন্থে আবদুল হাই হাসানি ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন মাদরাসার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেখানেও অনুপস্থিত দরসবাড়ি মাদরাসার কথা। গোলাম হুসেন সলিমের 'রিয়াজুস সালাতিনে' আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও, নেই এই মাদরাসা সম্পর্কে আলোচনা। এজন্য ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় অধ্যায় আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে গেছে।

তবে ইতিহাসের নানা বিবরণ থেকে এই মাদরাসার পাঠ্যক্রম অনুমান করা যায়। আবুল ফজল ও অন্যান্যদের বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলার মাদরাসাসমূহে কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদী পড়ানো হতে। মানাজির আহসান গিলানী ও আবদুল হাই হাসানী নদভীর লেখা থেকে যেমনটা জানা যায়, সেসময় হাদিসের উচ্চতর পাঠ কেবল মাশারিকুল আনোয়ার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার মাদরাসাসমূহে যুদ্ধবিদ্যার পাঠও দেয়া হতো। এখানে 'হেদায়াতুর রমি' নামে একটি পুস্তিকা পাঠ্য ছিল, যা তীরন্দাজি শেখানোর জন্য পড়ানো হত। মাদরাসা ও অন্যান্য স্থাপত্যের দেয়ালে যে ক্যালিগ্রাফি দেখা যায় তা থেকে অনুমান করা যায় ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলাও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মাদরাসায় পাঠ্য ছিল।[৮৬]
'ইমরান, এদিকে আসো' আজমল ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে সম্বিত ফিরে পাই। আজমল ভাই, তালহা ভাই আর দাদা ইসহাক এক কোনে বসেছেন। আমি হাটতে হাটতে অনেকটা মাঝে চলে এসেছি। এখানে একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। এটি সম্পর্কে গবেষকরা স্থির কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। কারো মতে এটি ছিল লাইব্রেরী, কারো মতে হলরুম কিংবা জলাধার।
মাদরাসার কক্ষগুলো হেটে দেখা শেষ। সবগুলো একরকম। বড় অনাদরে পড়ে আছে। এসব কক্ষে বসেই ছাত্রদের কেউ কেউ মীর সাইয়েদ শরিফ জুরজানির মত দেয়ালের সাথে তাকরার করতো, ভাবতেই বিষণ্ণ লাগে।
আজমল ভাইয়েরা বসেছেন মাদরাসার উত্তর-পূর্ব কোনে। দেয়ালের উপর। পাশে একটা আমগাছ ঠায় দাঁড়িয়ে ছায়া দিচ্ছে। বসি, একটা শীতল বাতাস শরীর ছুয়ে যায়। এখান থেকে পুরো মাদরাসার কাঠামো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারপাশে মোট

---

[86] বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, ১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠা– ড এম এ রহিম। বাংলা একাডেমী।

কক্ষের সংখ্যা ৪০ টি। কক্ষগুলো বর্গাকার। প্রতিপার্শ্বের পরিমাপ ৩ মিটার করে। মাদরাসার কাঠামোটিও বর্গাকার। প্রতিপার্শ্বের পরিমাপ ৫৫.৫০ মিটার। পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষগুলোর সাথে তিনটি মেহরাব দেখা যায়। ওখানেই ছিল মাদরাসার মসজিদ। কালের আবর্তনে মাদরাসাটি হাড়িয়ে গিয়েছিল মাটির নিচে। ১৯৭৩-৭৫ খ্রিস্টাব্দে মাটি খনন করে এই মাদরাসা আবিস্কার করা হয়। রোদের তেজ কমে গেছে। গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। আমরা চুপচাপ বসে আছি। কারো মুখে রা নেই।

'এবার মনে হয় উঠা যায়' অনেকক্ষণ পর তালহা ভাই মুখ খোলেন। 'চলেন' আজমল ভাই সায় দেন।

আমরা উঠে দাড়াই। শেষবারের মত মাদরাসার দিকে ফিরে তাকাই। মাদরাসার কাঠামো দেখে বুকের ভেতর শূন্যতা জাগে।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে আসার সময় ভাবি, কোনো একদিন হয়তো খোদা বক্স লাইব্রেরী কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটির বইয়ের তাকে খুজে পাওয়া যাবে প্রাচীন কোনো পান্ডুলিপি, যেখানে মিলবে এই মাদরাসার সবিস্তার ইতিহাস।

যাতায়াত

ঢাকা থেকে বাসে চাপাইনবাবগঞ্জ শহর। চাপাইনবাবগঞ্জ শহর থেকে বাস, সি এন জি বা অটোরিক্সায় ছোট সোনা মসজিদ। ছোট সোনা মসজিদ থেকে ভ্যান বা রিকসায় দরসবাড়ি মাদরাসা।

নায়ক ও খলনায়কদের
জীবনি,জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস

কুতাইবা বিন মুসলিমের দৃঢ়তা

৯৬ হিজরীতে কুতাইবা বিন মুসলিম সিদ্ধান্ত নেন তিনি চীনে হামলা করবেন। তিনি মার্ভ থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হন। ফারগানা পৌছে তিনি সেখান থেকে কাশগড় পর্যন্ত পাহাড়ি পথ সমতল করেন। অভিজ্ঞ সেনাপতি কাসিরকে পাঠান কাশগড়ে হামলা করার জন্য। কাশগড় চীনের সীমান্ত শহর।কাসির এই শহর জয় করেন। এরপর তিনি চীনের ভেতরে প্রবেশ করেন। চীনের সম্রাট মুসলমানদের লাগাতার হামলায় ভয় পেয়ে যায়। তিনি কুতাইবার কাছে পত্র লিখে বলেন , আমার কাছে আপনাদের কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যেন আপনাদের উদ্দেশ্য ও আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। কুতাইবা তখন হুবাইরা ইবনুল মুশামরাজ কিলাবি ও কয়েকজন সুবক্তাকে চীন সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। তাদের প্রেরণ করার সময় কুতাইবা বলেন, তোমরা সম্রাটকে জানিয়ে দিয়ো আমি শপথ করেছি, হয় তারা ইসলামে প্রবেশ করবে অথবা আমি তাদের থেকে জিযিয়া নিব, আমি চীনের মাটি মাড়াবো, এবং তাদের শাহজাদাদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিব। অন্যথায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাক।

হুবাইরা উপস্থিত হলেন সম্রাটের রাজধানীতে। ইবনে কাসীর লিখেছেন, এটি ছিল অত্যন্ত মনোরম একটি শহর। শহরের ফটক ছিল ৯৯ টি।

প্রথমদিন সম্রাটের সাথে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা পরেছিল সাদা পোষাক। ভেতরে ছিল পাতলা গাউন। শরীরে মেখেছিল সুগন্ধী। পায়ে ছিল জুতো। পরদিন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সম্রাটের সামনে এলো নকশা করা পোষাক পরে। তাদের মাথায় ছিল পাগড়ি। তৃতীয়দিন তারা পরলেন সাদা পোষাক। মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। হাতে বর্শা ও তরবারী। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, তিনদিন তোমরা তিন রকমের পোষাক পরলে কেন?

হুবাইরা বললেন, প্রথম দিন যে পোষাক পরেছি তা পরে আমরা আমাদের পরিবারের কাছে যাই। দ্বিতীয় দিন যা পরেছি তা পরে আমরা আমাদের আমীরের সামনে যাই। আর আজ যা পরেছি তা পরে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হই।
চীন সম্রাট নানা বিষয়ে কথা বলেন। শেষে তিনি বলেন, তোমাদেরকে তো জ্ঞানীই মনে হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি তোমাদের সেনাসংখ্যা অনেক কম। আমার সেনারা তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে। তোমাদের সেনাপতিকে বলে দিয়ো, এখন ফিরে যাওয়াতেই তোমাদের কল্যান নিহিত।
হুবাইরা সম্রাটকে জবাব দিলেন, হে সম্রাট, কে এই বাহিনীকে অল্প বলতে পারে, যার একমাথা রয়েছে আপনার সীমান্তে, আর অন্য মাথা যায়তুনের বাগানে (এখানে দারুল খিলাফাহ দামেশকের দিকে ইংগিত করেছেন)। আপনি হত্যার হুমকি দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। যখন তা আসবে আমরা তাকে বরণ করে নিব। আমরা মৃত্যুকে ভয় করিনা।

হুবাইরার জবাব শুনে চীন সম্রাট ঘাবড়ে যান। তিনি বলেন, কী করলে তোমাদের সেনাপতি ফিরে যাবেন?
হুবাইরা বললেন, তিনি শপথ করেছিলেন, হয় আপনারা ইসলাম গ্রহণ করবেন অথবা জিযিয়া দিবেন। এরপর তিনি আপনাদের মাটি মাড়াবেন এবং শাহজাদাদের নিজের আয়ত্তে নিবেন। সম্রাট বললেন, ঠিক আছে আমি তার শপথ পূরণ করবো। এরপর সম্রাট কয়েকটি স্বর্ণের পাত্রে কিছু মাটি, জিযিয়া হিসেবে প্রচুর নগদ অর্থ আর চারজন শাহজাদাকে কুতাইবার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।
*অভিযান চলাকালেই কুতাইবার কাছে সংবাদ আসে খলিফা ওলিদ বিন আব্দুল মালিক ইন্তেকাল করেছেন। পরবর্তী খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহন করেছেন, ইতিপূর্বে কুতাইবা যাকে খেলাফত থেকে দূরে সরানোর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। চিন্তিত কুতাইবা তাই মার্ভে ফিরে যান।

তথ্যসূত্রঃ

১। আল কামিল ফিত তারিখ, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা– ইবনে আসির।
২। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২শ খন্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা– ইবনে কাসির।

সমরকন্দ বিজেতা কুতাইবা বিন মুসলিম

কুতাইবা বিন মুসলিমের জন্ম ৪৯ হিজরিতে, হজরত মুয়াবিয়ার শাসনকালে। কুতাইবার পিতা মুসলিম ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বন্ধু। বসরায় কুতাইবার পরিবারের বেশ প্রভাব ছিল। কুতাইবার পিতা ছিলেন বসরার কারাগারের দায়িত্বে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরিতে কুতাইবাকে মুফাজজাল ইবনু মুহাল্লাবের পরিবর্তে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুতাইবা খোরাসানে এসে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য জিহাদকে বৈধ করেছেন তার দীনকে সমুন্নত করার জন্য। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

“মদিনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনদের জন্য উচিত নয় আল্লাহর রসুলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসুলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে থাকে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না”

“আর তারা কম বা বেশী যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন”। *সুরা তওবা ১২০, ১২১*

তাঁর এই ভাষণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে ঈমানি চেতনা জাগ্রত হয়। প্রচুর মানুষ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কুতাইবা এই বাহিনী নিয়ে তুর্কিস্তানের পথ ধরেন। সেখানে বেশকিছু গোত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। পথে কুতাইবার

সাথে বলখের সরদারও একত্রিত হন। কুতাইবা তাঁর বাহিনী নিয়ে আমু দরিয়া অতিক্রম করেন। তিনি আখরুন ও শোমান অঞ্চলে পৌঁছতেই এই এলাকার রাজারা আনুগত্যের বিনিময়ে সন্ধি করে নেয়। কুতাইবা এরপর মার্ভে ফিরে আসেন। ৮৭ হিজরিতে কুতাইবা বোখারার বেকন্দ শহরে হামলা করেন। বেকন্দিরা পাশের এলাকার লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাদের সাহায্যে এক বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসে। এই বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে।
প্রায় দুই মাস এই অবরোধ টিকে থাকে। এই সময়ে কুতাইবা কোথাও দূত প্রেরণ করতে পারেননি, কিংবা তাঁর কাছেও কোনো দূত আসতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ চিন্তায় পড়ে যান। কুতাইবার সাফল্যের জন্য মসজিদে মসজিদে দোয়া করা হয়। অবশেষে একদিন মুসলমানরা প্রচণ্ড হামলা চালায়। আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুদের পা টলে যায়, তারা শহরের দিকে পালাতে থাকে। মুসলিম বাহিনী তাদের ধাওয়া করে। শত্রুদলের অনেককে হত্যা করা হয়। অনেকে বন্দী হয়।
অল্পকিছু সেনা শহরে প্রবেশ করে শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। কুতাইবা আদেশ দেন শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে। বেকন্দিরা বুঝলো আর টিকে থাকার আশা নাই। তারা এবার সন্ধির আহ্বান জানায়। কুতাইবা এ আবেদন কবুল করেন। একজন প্রশাসক নিয়োগ করে ফিরে আসেন। কুতাইবা মাত্র পাঁচ ক্রোশ দুরত্বে গিয়েই জানতে পারলেন বেকন্দিরা বিদ্রোহ করেছে এবং শহরের প্রশাসককে হত্যা করেছে। কুতাইবা দ্রুত ফিরে আসেন। তিনি শহরের প্রাচীর ধ্বংস করার আদেশ দেন। শহরবাসী আবারও সন্ধি করার আহ্বান জানায়। কিন্তু কুতাইবা এবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জোর করে শহরে প্রবেশ করেন। বেছে বেছে উস্কানিদাতাদের হত্যা করা হয়।
একজন অন্ধ ব্যক্তি এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল। তাকে কুতাইবার সামনে আনা হয়। সে ব্যক্তি বলে, আমার জীবনের বিনিময়ে পাঁচ হাজার রেশমি থান দেব। কুতাইবা বলেন, এখন আর আমরা তোমাদের প্রতারণার শিকার হবো না। তিনি আদেশ দেন এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে। বেকন্দ জয়ের ফলে এখান থেকে প্রচুর অস্ত্র, স্বর্ণ ও রূপার পাত্র মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে। ৮৮ হিজরিতে কুতাইবা মার্ভ থেকে তাশখন্দের পথ ধরেন। এখানকার বাসিন্দারা সন্ধি করার আবেদন জানালে তা কবুল করে নেয়া হয়। এদিকে কুতাইবার বিজয়াভিযান শাসকদের চিন্তিত করে তুলছিল। চীন সম্রাটের ভাই কোরলগাবুল দুই লক্ষ সেনা নিয়ে

কুতাইবার উপর হামলা করে বসে। প্রচণ্ড লড়াই হয়। লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।[৮৭]

৮৯ হিজরিতে কুতাইবা বোখারার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি আমুদরিয়া অতিক্রম করেন। সিফলি অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর সাথে তাঁর লড়াই হয়। কুতাইবা এই বাহিনীকে পরাজিত করে বোখারায় পৌঁছেন। বোখারার শাসক দরওয়ান কুতাইবার আগমনের সংবাদ আগেই জেনেছিল। সে প্রস্তুত ছিল। তার শৃংখল বাহিনী নিয়ে সে কুতাইবার মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে কুতায়বা বেশ নাজেহাল হন। তিনি বোখারা জয় না করেই মার্ভে ফিরে আসেন।

হাজ্জাজ এই সংবাদে বেশ ক্রোধান্বিত হন। এক পত্রে তিনি কুতাইবাকে বলেন, তুমি এই ব্যর্থতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আমি পরিকল্পনা বাতলে দিচ্ছি, সেমতে বোখারায় হামলা করো। পরের বছর কুতাইবা আবার বোখারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বোখারার রাজা সুগদের রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সাহায্য আসার আগেই কুতাইবা বোখারা অবরোধ করে ফেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহিলারাও ছিলেন। একদিন আক্রমণের তীব্রতায় মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে চাইলে মহিলারা তাদেরকে সামনে ঠেলে দেন। মহিলারা কাঁদতে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে পুরুষরা উজ্জীবিত হন। তাঁরা আবার সাহসিকতার সাথে লড়তে থাকেন। আবারও তীব্র লড়াই শুরু হয়। এবার মুসলমানদের জয় হয়। বোখারার পতন হয়। সুগদের রাজা এই যুদ্ধে ভীত হয়ে কুতাইবার সাথে সন্ধি করে নেয়। কুতাইবা মার্ভে ফিরে এসে হাজ্জাজকে পত্র লিখে বিস্তারিত জানান। হাজ্জাজ খুশি হন।

৯৩ হিজরিতে কুতাইবা খা ওয়ারেজম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে এর শাসক সন্ধি করে নেয়। যুদ্ধ ছাড়াই এ অঞ্চল মুসলমানদের হাতে আসে। এরপর কুতাইবা সমরকন্দ বিজয়ের ইচ্ছা করেন। প্রথমে তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে সমরকন্দে প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পর একটি বাহিনী নিয়ে তিনিও সমরকন্দের পথে রওনা হন। শহরবাসী মুসলিম বাহিনীর দেখা পেয়ে শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। তারা কেল্লাবন্দী হয়ে বসে থাকে। মুসলিম বাহিনী প্রায় এক মাস শহর অবরোধ করে রাখে। শহরবাসী পত্র মারফত চীন ও ফারগানার শাসকের সাহায্য কামনা করে। পত্রে তারা লিখেছিল, আজ আমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে আগামীকাল তা তোমাদের দিকে যাবে। এখন আমাদেরকে সাহায্য না করলে আগামীকাল আরবের এই ঝড় তোমাদের দিকে ধেয়ে যাবে।

---

[৮৭] খাত্তাব, মাহমুদ শীত (মৃত্যু ১৪১৯ হিজরি), কদাতুল ফাতহিল ইসলামি ফি বিলাদি মাওয়াউন্নাহার, পৃ-৩৮৫ (বৈরুত, দার ইবনি হাজম, ১৪১৮ হিজরি)

এই পত্র নিয়ে আশপাশের শাসকরা চিন্তা করতে থাকে। তারা নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ে। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় সমরকন্দের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। চীন সম্রাট তাঁর পুত্রকে বিশাল বাহিনী দিয়ে কুতাইবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুতাইবা এই বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সালেহ ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে ৬০০ সেনার একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মধ্যরাতে এই বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর গেরিলা হামলা চালায়। আচমকা আক্রমণের জন্য শত্রুরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রাতের আচমকা হামলার ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পালাতে থাকে। অনেক রাজকুমার বন্দী হয়। অনেকে নিহত হয়। সাহায্যে এগিয়ে আসা এই বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে সমরকন্দবাসীর মনোবল ভেঙে যায়। এদিকে কুতাইবা তখন মিনজানিকের মাধ্যমে শহরের প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করছিলেন। শহরের প্রাচীরের একাংশ ভেঙে যায়। মুসলিম বাহিনী প্রাচীরের কাছে চলে যায়। বাধ্য হয়ে শহরের বাসিন্দারা আত্মসমর্পণ করে। শর্ত ছিল–১. তারা বার্ষিক ২২ লাখ দিরহাম কর দেবে। ২. মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ করে নামাজ আদায় করবে। ৩. মূর্তিগুলো মুসলামানদের অধিকারে থাকবে।

মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করে। কুতাইবা আদেশ দেন মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলতে। শহরের শাসনকর্তা গোজাক বলে, এই কাজ করবেন না। এই মূর্তি ভাঙলে আপনিও ধ্বংস হয়ে যাবেন। কুতাইবা বলেন, তুমি যদি এমনটা ভেবে থাকো, তাহলে আমি নিজেই এসব জ্বালিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমার কী হয়। মূর্তি পুড়িয়ে ফেলা হয়। তা থেকে ৫০ হাজার মিসকাল স্বর্ণ বের হয়। মূর্তির দূরবস্থা দেখে শহরের বাসিন্দাদের এক বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে। কুতাইবা সমরকন্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে খুতবা দেন।

কুতাইবা এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিমকে শহরের শাসক নিযুক্ত করে মার্ভে ফিরে আসেন। ৯৪ হিজরিতে কুতাইবা বিন মুসলিম আবার আমু দরিয়া অতিক্রম করেন। তিনি ২০ হাজার সেনাকে চেচনিয়া প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর হাতে চেচনিয়া বিজয় হয়। কুতাইবা এগিয়ে যান ফারগানার দিকে। তিনি ফারগানা জয় করে কাশান পৌঁছেন এবং কাশান জয় করেন। এরপর তিনি মার্ভে ফিরে আসেন। ৯৬ হিজরিতে কুতাইবা বিন মুসলিম সিদ্ধান্ত নেন তিনি চীনে হামলা করবেন। মার্ভ থেকে তাই সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হন। ফারগানা পৌঁছে তিনি সেখান থেকে কাশগড় পর্যন্ত পাহাড়ি পথ সমতল করেন। অভিজ্ঞ সেনাপতি কাসিরকে পাঠান কাশগড়ে হামলা করার জন্য। কাশগড় চীনের সীমান্ত শহর। কাসির এই শহর জয়

করেন। এরপর তিনি চীনের ভেতরে প্রবেশ করেন। চীনের সম্রাট মুসলমানদের লাগাতার হামলায় ভয় পেয়ে যায়। সে কুতাইবার কাছে পত্র লিখে বলে, আমার কাছে আপনাদের কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যেন আপনাদের উদ্দেশ্য ও আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। কুতাইবা তখন হুবাইরা ইবনুল মুশামরাজ কিলাবি ও কয়েকজন সুবক্তাকে চীন সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রেরণ করার সময় কুতাইবা বলে দেন, তোমরা সম্রাটকে জানিয়ে দিয়ো আমি শপথ করেছি, হয় তারা ইসলামে প্রবেশ করবে অথবা আমি তাদের থেকে জিজিয়া নেব, আমি চীনের মাটি মাড়াবো, এবং তাদের শাহজাদাদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসব।

হুবাইরা উপস্থিত হলেন সম্রাটের রাজধানীতে। ইবনে কাসির লিখেছেন, এটি ছিল অত্যন্ত মনোরম একটি শহর। শহরের ফটক ছিল ৯৯ টি।
প্রথমদিন সম্রাটের সাথে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা পরেছিলেন সাদা পোষাক। ভেতরে ছিল পাতলা গাউন। শরীরে সুগন্ধী। পায়ে ছিল জুতো। তার পরদিন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সম্রাটের সামনে এলেন নকশা করা পোষাক পরে। তাঁদের মাথায় ছিল পাগড়ি। তৃতীয়দিন তাঁরা পরলেন সাদা পোষাক। মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। হাতে বর্শা ও তরবারি। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, তিনদিন তোমরা তিন রকমের পোষাক পরলে কেন?

হুবাইরা বললেন, প্রথম দিন যে পোষাক পরেছি তা পরে আমরা আমাদের পরিবারের কাছে যাই। দ্বিতীয় দিন যা পরেছি তা পরে আমরা আমাদের আমিরের সামনে যাই। আর আজ যা পরেছি তা পরে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হই।
চীন সম্রাট নানা বিষয়ে কথা বলেন। শেষে তিনি বলেন, তোমাদেরকে তো জ্ঞানীই মনে হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি তোমাদের সেনাসংখ্যা অনেক কম। আমার সেনারা তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে। তোমাদের সেনাপতিকে বলে দিয়ো, এখন ফিরে যাওয়াতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।
হুবায়রা সম্রাটকে জবাব দিলেন, হে সম্রাট, কে এই বাহিনীকে অল্প বলতে পারে, যার একমাথা রয়েছে আপনার সীমান্তে, আর অন্য মাথা জায়তুনের বাগানে (এখানে দারুল খিলাফাহ দামেশকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন)। আপনি হত্যার হুমকি দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। যখন তা আসবে আমরা তাকে বরণ করে নেব। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না।
হুবায়রার জবাব শুনে চীন সম্রাট ঘাবড়ে যান। তিনি বলেন, কী করলে তোমাদের সেনাপতি ফিরে যাবেন?

হুবায়রা বললেন, তিনি শপথ করেছিলেন, হয় আপনারা ইসলাম গ্রহণ করবেন অথবা জিজিয়া দেবেন। এরপর তিনি আপনাদের মাটি মাড়াবেন এবং শাহজাদাদের নিজের আয়ত্তে নেবেন।
সম্রাট বললেন, ঠিক আছে আমি তাঁর শপথ পূরণ করবো।
এরপর সম্রাট কয়েকটি স্বর্ণের পাত্রে কিছু মাটি, জিযিয়া হিসেবে প্রচুর নগদ অর্থ আর চারজন শাহজাদাকে কুতাইবার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৮৮]
এভাবে চীন সম্রাটের সাথে তাঁর সন্ধি হলো। এরপর তিনি মার্ভে ফিরে আসেন। এই অভিযানের শুরুতেই কুতাইবার কাছে সংবাদ আসে খলিফা অলিদ বিন আবদুল মালিক ইন্তেকাল করেছেন। পরবর্তী খলিফা হিসেবে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

কুতাইবা চিন্তিত ছিলেন। ইতিপূর্বে অলিদ বিন আবদুল মালিক সুলাইমানকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে কুতাইবাও এই পরিকল্পনায় সায় দিয়েছিলেন। কুতাইবা আশংকা করছিলেন সুলাইমান তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবেন। কুতাইবা তাই শুরুতেই সুলাইমানের কাছে তিনটি পত্র লিখলেন। প্রথম পত্রে তিনি সুলাইমানকে অভিষেকের অভিনন্দন জানালেন, তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘোষণা দিলেন। দ্বিতীয় পত্রে তিনি খোরাসান ও তুর্কিস্তানে নিজের বিজয়সমূহের বর্ণনা দিলেন। এখানকার সরদারদের মনে নিজের প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করলেন। তৃতীয় পত্রে তিনি লিখলেন যদি তাঁকে খোরাসান থেকে বরখাস্ত করে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে তাঁর স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা হয় তাহলে তিনি খলিফার বায়াত প্রত্যাহার করবেন।
কুতাইবা একজন দূতকে পত্র তিনটি দিয়ে বললেন, তুমি খলিফাকে প্রথম পত্রটি দেবে। যদি তিনি তা পাঠ করে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের দিকে এগিয়ে দেন তাহলে তাঁকে দ্বিতীয় পত্রটি দেবে। যদি এটিও তিনি ইয়াজিদের হাতে দেন তাহলে তৃতীয় পত্রটি দেবে।

তিন পত্র নিয়ে দূত এলো দারুল খিলাফাহ দামেশকে। দূত যখন সুলাইমানের দরবারে উপস্থিত হলো, তখন ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবও দরবারে উপস্থিত ছিল। সুলাইমান প্রথম পত্র পড়ে ইয়াজিদের হাতে তুলে দিলেন। দূত এবার খলিফাকে দ্বিতীয় পত্র দিল। সুলাইমান এটিও পড়ে ইয়াজিদের হাতে তুলে দিলেন। দূত এবার

---

[৮৮] ইবনুল আসির, আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৬৩০ হিজরি), আল-কামিল ফিত তারিখ, ৪/২৮৯ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৭ হিজরি)

খলিফার হাতে কুতাইবার তৃতীয় পত্র তুলে দিল। পত্র পড়ে সুলাইমানের চেহারা রাগে লাল হয়ে যায়। তবুও তিনি চুপ থাকেন। দূতকে অনেক যত্ন করেন। কুতাইবাকে খোরাসানের ওয়ালি দায়িত্বে বহাল রাখার ঘোষণা দেন। বাহ্যত খলিফা কুতাইবার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেননি।
কিন্তু কুতাইবা আতংকে ছিলেন। এই আতংক তাঁকে বাধ্য করে অপরিণামদর্শী একটি সিদ্ধান্ত নিতে। তিনি দূতের কাছ থেকে কোনো সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই বিদ্রোহ করে বসেন। তিনি ভেবেছিলেন এই বিদ্রোহে সরদাররা তাঁর পাশে থাকবে। কিন্তু কেউই এই বিদ্রোহে তাঁকে সঙ্গ দিল না। সবাই মিলে বনু তামিমের সরদার ওকিকে সিপাহসালার মনোনীত করে। এক লড়াইয়ে কুতাইবাকে হত্যা করা হয়।[৮৯]
কুতাইবার মৃত্যুর সংবাদে এক খোরাসানি বলেছিল, কুতাইবার মতো কোনো বিজেতা যদি আমাদের মধ্যে থাকতেন তাহলে আমরা তাঁর মরদেহ মমি করে রাখতাম, দুশমনের সাথে লড়াইয়ের সময় তাঁর আশির্বাদ কামনা করতাম।

---

[৮৯] ইবনু কাসির, ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনু উমর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১২/৬১৫ (মারকাজুল বুহুস লিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৮ হিজরি)

খাওয়ারেজমের বীর

বাগ নিলাব। পাঞ্জাবের আটক জেলার ছোট একটি গ্রাম। সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রাম স্থানীয় পর্যটকদের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান। পুরো এলাকাটি সবুজ শ্যামল। বিস্তৃর্ণ মাঠ। স্থানীয় কিশোররা এখানে প্রায়ই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলে। কিন্তু তাদের অনেকের জানা নেই, আটশো বছর আগে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ।

বাগ নিলাব বরাবর সিন্ধু নদীর অপরপ্রান্তে , ৬১৮ হিজরীর ৬ শাউয়ালে (২৪ নভেম্বর, ১২২১ খ্রিস্টাব্দ) চেঙ্গিজ খানের মুখোমুখি হন সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ। সুলতান গজনী থেকে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ইচ্ছা ছিল সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাশের সাহায্য নিয়ে নতুন করে বাহিনী গড়ে তুলবেন। পিছু ধাওয়া করছিল চেঙ্গিজ খানের বাহিনী। কদিন আগেই বামিয়ান দখল করে এসেছিল সে। সিন্ধু নদীর তীরে এসে সুলতান দেখলেন বর্ষাকাল চলছে। নদীতে উত্তাল ঢেউ। পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই। একটি মাত্র নৌকা মিললো। মহিলাদের পারাপার করানোর সময় সেটিও ফুটো হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সুলতানকে জড়িয়ে পড়তে হলো এক অসম যুদ্ধে। তার সাথে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য। আর তাতারীদের সেনাসংখ্যা ছিল তার দশগুন। প্রথম দিন প্রচন্ড যুদ্ধ হলো।

যুদ্ধে বারবার তাতারীরা এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার মুসলমানরা। দিনশেষে কোনো ফলাফল ছাড়াই দুই বাহিনী নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসে। দ্বিতীয় দিনও মরনপন লড়াই হয় কিন্তু কেউই জ্যী হতে পারেনি। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল অল্প, দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত, রসদও ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল, তবুও তারা দৃঢ় মনোবলের সাথে লড়তে থাকে। তৃতীয় দিন আবার দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। এদিন তাতারী বাহিনীর সাহায্যে নতুন দুটি বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। এতে তাতারীদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। আগের দুদিনের যুদ্ধে তাতারিদের পাশাপাশি অনেক মুসলমান সেনাও নিহত হয়েছিল। ফলে মুসলমানদের সেনাসংখ্যাও কমে যায়। সুলতান অনুভব করছিলেন ক্রমেই তার শক্তি কমে আসছে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নেন চূড়ান্ত আঘাত হানার। তিনি সিদ্ধান্ত নেন চেঙ্গিজ খানকে যদি কোনোভাবে হত্যা করা যায় তাহলে তাতারীদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। চেঙ্গিজ খান

অবস্থান করছিল বাহিনীর মধ্যভাগে। তার প্রহরায় নিযুক্ত ছিল অন্তত দশ হাজার সেনা। সুলতান বুঝতে পারলেন প্রথমে এই সেনাদেরকে মূল বাহিনী থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নিলেন তাতারীদের বাহিনীর বামপার্শ্বে প্রথমে হামলা করবেন। জোরদার হামলার কারনে অন্যপ্রান্তের সেনারা এদিকে এগিয়ে আসবে। তখন আগ থেকে প্রস্তুত থাকা সুলতানের সেনারা এগিয়ে চেঙ্গিজ খানের উপর মরনপন হামলা করবে। খুবই বিপদজনক একটি পরিকল্পনা। কিন্তু এছাড়া সুলতানের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

দিনের শুরুতেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। আমিনুল মুলকের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর একাংশ ঝাপিয়ে পড়ে তাতারী বাহিনীর বাম শিবিরের উপর। আক্রমনের তীব্রতায় তাতারীদের পা টলে যায়। এমনকি তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ধাওয়া পালটা ধাওয়া চলতে থাকে। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন এখনই তিনি চেঙ্গিজ খানের উপর হামলা করবেন। তিনি নিজের অল্পকিছু সেনা নিয়ে চিতার ন্যায় ঝাপিয়ে পড়েন চেঙ্গিজ খানকে ঘিরে রাখা বাহিনীর উপর। প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের একফাকে সুলতান দেখলেন চেঙ্গিজ খান দূরে ঘোড়ার উপর বসে আছে। তার সাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। এই সেই চেঙ্গিজ খান যার হাতে পতন ঘটেছে বুখারা, সমরকন্দের মত সমৃদ্ধ শহরের । চলেছে গনহত্যা। রেহাই দেয়া হয়নি নারী ও শিশুদেরকেও। সুলতান প্রচন্ড রাগে তেড়ে যান চেঙ্গিজ খানের দিকে। মুহূর্তে তার বাহিনীর রক্ষনভাগ ভেদ করে চেঙ্গিজ খানের সামনে চলে যান। এই প্রথম মুখোমুখি হলেন দুই সেনাপতি। সুলতানের আক্রমনে চেঙ্গিজ খানের ঘোড়া মারা যায়। চেঙ্গিজ খান দ্রুত আরেকটি ঘোড়ায় উঠেই একদিকে ছুট দেয়। নিমিষেই সে তাতারীদের মাঝে মিশে যায়। চেংগিজ খান যদিও বীরযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু এই লড়াইতে সে সুলতানের সাথে লড়ার পরিবর্তে পালানোকেই নিরাপদ মনে করলো।

চেঙ্গিজ খান দ্রুত সরে গেল। এদিকে সুলতান তার বাহিনীর মাঝখানে আটকা পড়েছেন। তিনি বীরত্বের সাথে লড়ছিলেন। কিন্তু তাতারীরা ময়দানে এসেছে তাদের সকল শক্তি নিয়ে। সুতরাং আবারও যুদ্ধের গতি পালটে যায়। তাতারীদের উপর্যুপরি আক্রমনে মুসলিম বাহিনী এলোমেলো হয়ে যায়। এই আক্রমনের এক পর্যায়ে সুলতানের সাত বছর বয়সী ছেলেও নিহত হয়। সুলতান তার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি একা একাই লড়ছিলেন তাতারীদের সাথে। চেঙ্গিজ খান সুলতানকে দেখে তাতারীদের নির্দেশ দিল তাকে হত্যা করা যাবে না। জীবিত ধরতে হবে। চেঙ্গিজ খান জানতো সুলতান যতই বীর হন এক সময় তিনি ক্লান্ত হবেনই। সুলতান লড়ছিলেন, তার হাতে তাতারী সেনারা মারা যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও তারা

সুলতানের উপর প্রানঘাতি আক্রমন করছিল না। সুলতান বুঝে ফেলেন তাদের মতলব। তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেন । চেঙ্গিজ খানের হাতে বন্দী হয়ে অপমানের মৃত্যু চান না। সুলতান যুদ্ধের একফাকে একটি তাজাদম ঘোড়া দখল করেন। তিনি একপাশে ছুটে যান।সিন্ধু নদীর পাশের একটি ছোট পাহাড়ে উঠেন। তারীখে খাওয়ারেজমশাহীর বর্ননা অনুসারে, এই পাহাড়ের উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০ ফুট। এখান থেকে কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি নদীতে ঝাপ দেন। নদীতে পানির তীব্র স্রোত। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দ্রুতই সুলতান অপরপার্শ্বে পৌছে যান। চেঙ্গিজ খান এগিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই পাহাড়ে, যেখান থেকে সুলতান লাফ দিয়েছেন। সুলতান চেঙ্গিজ খানকে দেখে নিজের অভ্যাসের বিপরীতে (ইমাম যাহাবী লিখেছেন সুলতান সবসময় মুচকি হাসতেন। কখনো অট্টহাসি দিতেন না) অট্টহাসি দিলেন। এই হাসি চেঙ্গিজ খানের গায়ে পরাজয়ের অপমানের চেয়ে বেশি বিধে। কয়েকজন সর্দার অনুমতি চায় নদী পার হয়ে সুলতানকে ধাওয়া করতে। চেঙ্গিজ খান অনুমতি দেয়নি। সে জানতো এই প্রমত্তা নদী অতিক্রম করা তাতারীদের সাধ্যে নেই।

এই যুদ্ধে তাতারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এসেছিল। তবুও মুসলিম বাহিনী তিনদিন তাদের মোকাবেলা করেছে। এমনকি ইবনুল আসির লিখেছেন, এই যুদ্ধে মুসলমানদের চেয়ে তাতারীদের হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। *(আল কামিল ফিত তারিখ)*

এই যুদ্ধের ফলে তাতাররীদের মনোবলেও ভাটা পড়ে। চেঙ্গিজ খান আর ভারতবর্ষের দিকে এগুতে সাহস করেনি। ইমাম যাহাবীর ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ঐতিহাসিকও লিখেছেন, যদি জালালুদ্দিন না থাকতেন তাহলে তাতারীরা পুরো বিশ্ব পদদলিত করে ফেলতো। *(সিয়ারু আলামিন নুবালা)*

শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা

৬১৮ হিজরী।
সমরকন্দ থেকে ধেয়ে আসছে চেঙ্গিজ খানের বাহিনী। উদ্দেশ্য খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যের রাজধানী (বর্তমান উজবেকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আরজেঞ্চ শহর) আক্রমন করা। সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ জিহাদের ডাক দেন। অল্পদিনেই একটি বাহিনী গঠিত হয়ে যায়।
যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল, এই সময়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। কুতলুগ খান নামে একজন আমির সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। সে সুলতানের ভাই কুতবুদ্দিনকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, আপনিই এই সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। জালালুদ্দিন অন্যায়ভাবে আপনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। আপনি নিজের সম্মান বুঝে নিন। পুরো শহরে এই প্রচারনা চলে। এভাবে কুতলুগ খান নিজের পক্ষে একটি দল বানিয়ে ফেলে। এই দলটি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সংবাদ সুলতানের কানেও আসে। এখন তার সামনে দুটি পথ খোলা। হয় তিনি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন অথবা কোন সমাধান বের করে তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে যাবেন। চাইলে সুলতান প্রথম পথ অবলম্বন করে বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন, তখন তার সেই সামর্থ্য ছিল। কিন্তু সুলতান নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাইছিলেন না। আবার একইসাথে রাজধানীর প্রতিরক্ষাও ছিল গুরুত্বপূর্ন। সবদিক বিবেচনায় তিনি এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নিলেন, ইতিহাসে যার নজির বিরল। তিনি ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে রাতের আধারে মাত্র তিনশো সৈন্য নিয়ে গোপনে শহর ছেড়ে পূর্বদিকে নাসা শহরের পথ ধরলেন। তার বাহিনী পড়ে রইলো রাজধানীতেই , তাতারীদের প্রতিরোধ করার জন্য। একইসাথে তিনি নিজের ভাইয়ের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত রইলেন, আবার একইসাথে রাজধানীর প্রতিরক্ষার জন্য নিজের বাহিনীও দিয়ে আসলেন। পথে পদে পদে বিপদের আশংকা ছিল, কারন তাতারীদের ছোট ছোট দল তখন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব দলের মুখোমুখি হলে সুলতানের এই ছোট দলটি টিকতেই পারবে না, কিন্তু তিনি এসবের পরোয়া করলেন না।
সুলতান শহর ছেড়ে দিলেন। শহরে রইলেন তার ভাই কুতবুদ্দিন। এদিকে এগিয়ে আসছে তাতারী বাহিনী। কুতুবুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব সুলতান জালালুদ্দিনের ধারেকাছেও ছিল না। সমরবিদ্যায়ও তিনি ছিলেন অপটু। তাতারী বাহিনী যতই কাছে আসছিল তিনি ততই আতংকিত হচ্ছিলেন। শেষমেশ তিনি পরিবার ও গয়নাগাটি নিয়ে শহর ছেড়ে নাসার পথ ধরলেন। কুতবুদ্দিন শহর ত্যাগের তিনদিন পর তাতারী বাহিনী

শহর অবরোধ করে। শহরে তখন সুলতান আলাউদ্দিনের দুই পুত্রের কেউই নেই। আছেন কয়েক হাজার জানবাজ মুজাহিদ। যাদের ভেতরে সুলতান জালালুদ্দিন জিহাদের স্পৃহা জাগ্রত করে দিয়েছেন। এই মুজাহিদরা তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত তাতারীরা এই শহরে প্রবেশ করতেই পারেনি।

আরজেন্স শহরে তখন বসবাস করতেন শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা রহিমাহুল্লাহ। বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ। তাতারী হামলা শুরুর কিছুদিন আগে তিনি তার মুরিদদেরকে বলেছিলেন, পুর্ব দিক থেকে আগুন আসছে। মুসলিম উম্মাহর উপর এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর আসেনি।

চেঙ্গিজ খানের কানে শায়খের সুনাম সুখ্যাতি পৌছেছিল। সে শায়খকে একটি আশ্চর্য পত্র লিখে। সে শায়খকে বলে, আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমি আপনাকে সম্মান করি। আপনি আপনার দশজন মুরিদ নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারেন। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিলাম। জবাবে শায়খ বলেন, এখানে আমার মুরিদরা থাকে। তাদের ছেড়ে গেলে আমি আল্লাহর কাছে কী বিচার দিব? এরপর চেঙ্গিজ খান এক হাজার লোকের নিরাপত্তা দিতে চায়। শায়খ এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমি এখানেই থাকছি। আমি তোমাদের সাথে লড়বো।

চেঙ্গিজ খানের অবরোধ পাঁচ মাস দীর্ঘ হয়েছিল। এরপর তাতারীরা শহরে প্রবেশ করতে থাকে। শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা তার মুরিদদের ডেকে বলেন, সবাই চলো। তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ো। শায়খ তার কক্ষে যান। তার পীরের দেয়া খিরকাহ পরে নেন। এক হাতে নেন পাথরভর্তি থলে। অন্য হাতে তীর। শায়খ বাইরে এসে তাতারীদের বিরুদ্ধে তীর ছুড়তে থাকেন। আবার কখনো তিনি পাথর নিক্ষেপ করছিলেন। তার তীরের আঘাতে কয়েকজন তাতারী সেনা নিহত হয়। হঠাত একটি তীর এসে শায়খের বুকে লাগে। শায়খ মাটিতে পড়ে যান। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, আল্লাহ আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট।

তাতারীদের পতাকাবাহী এক সেনা শায়খের দিকে এগিয়ে আসে। শায়খ আচমকা উঠে তার উপর হামলা পড়েন। তার পতাকা টেনে নেন। তাতারী অনেক চেষ্টা করেও পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় শায়খ ইন্তেকাল করেন। শায়খের ইন্তেকালের পরেও তার হাত থেকে পতাকা টেনে নেয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে তাতারীরা পতাকাটি কেটে ফেলে। শায়খকে রিবাতাহ এলাকায় দাফন করা হয়।[৯০]

---

[৯০] শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব, ৭ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা– ইবনুল ইমাদ।

মৃত্যুকালে শায়খের বয়স ছিল ৭৮ বছর। তিনি ৫৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি ইস্কান্দারিয়া, নিশাপুর ও হামাদান সফর করে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সত্য প্রকাশে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পেতেন না। তিনি শাফেয়ী ফিকহের অনুসারী ছিলেন। বারো খন্ডে কুরআনুল কারিমের তাফসির করেছেন।[৯১]

---

[91] তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম, ৪৪ খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

ইউসুফ বিন তাশফীন

১২ রজব ৪৭৯ হিজরী।
২৩ অক্টোবর, ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দ। শুক্রবার। বাদ ফজর। যাল্লাকা ময়দান।
বাতাস এখানে স্থির হয়ে আছে। ভ্যপসা গরম লাগছে। ইউসুফ বিন তাশফিন, মুরাবিতীনদের আমীর, কপালের ঘাম মুছলেন। ঘামের সাথে ধূলি মিশে চটচটে হয়ে গেছে। টিলার ওপাড়ে ধূলি উড়ছে। এতদূর থেকে শব্দ শোনা যাওয়ার কথা নয়, তবু ভালোভাবে কান পাতলে অস্ত্রের ঝনঝনানি ও যোদ্ধাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। টিলার ওপাড়ে, মুতামিদ বিন আব্বাদের বাহিনী লড়ছে ষষ্ঠ আলফোন্সোর বিরুদ্ধে।
মুতামিদ বিন আব্বাদের বাহিনীর সাথে আছে ছোট একটি মুরাবিত বাহিনী। মুরাবিতদের মূল দল নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন অপেক্ষা করছেন টিলার এপাশে। তিনি মাঠে নামবেন, যখন দুই বাহিনী লড়াই করে ক্লান্তির সীমানায় পৌছে যাবে তখন। তার বাহিনী পূর্ণ উদ্যমে হামলা চালাবে ষষ্ঠ আলফোন্সোর বাহিনীর উপর।
ইউসুফ বিন তাশফিন নিজের বাহিনীর দিকে তাকালেন। সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। দুয়েকজন একত্র হয়ে গল্প করছে কিংবা অলস দৃষ্টিতে টিলার ওপাড়ে তাকিয়ে আছে। ইউসুফ বিন তাশফিন জানেন সামান্য ইংগিতে এই সৈন্যরা ক্ষিপ্র চিতার মত হামলে পড়বে শত্রুর ওপর। নাকে বসা একটা মাছি তাড়াতে গিয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন আনমনা হয়ে গেলেন।
বড় ছেলের কথা মনে পড়লো। আসার সময় দেখেছিলেন ছেলে অসুস্থ, শয্যাশায়ী। জানা নেই ছেলে এখন কেমন আছে। টিলার ওপাশে তাকাতে তাকাতে ইউসুফ বিন তাশফিন ভাবলেন, চাইলে তিনি এখন মরক্কো থাকতেন। দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অচেনা দেশে নিজের সৈন্যদের ঝুকিতে ফেলার কোনো দরকারই ছিল না। কিন্তু চাইলেই কী তিনি এ যাত্রা এড়িয়ে যেতে পারতেন? তাকে তো আসতেই হতো আন্দালুসে। মুসলিম ভাইদের আহবানে সাড়া দিতেই হতো। এছাড়া উপায় ছিল না।

—

ইউসুফ বিন তাশফিনের মনে পড়ে ৫ বছর আগের কথা। ৪৭৪ হিজরীতে প্রথম আন্দালুস থেকে আগত একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাত করে আন্দালুসের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানায়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলিম আন্দালুসে হামলা ও নির্যাতনের কথা। ইউসুফ বিন তাশফিন আগ থেকেই আন্দালুসের খোজখবর রাখছিলেন।

তিনি জানতেন ৪২২ হিজরীতে কর্ডোভায় খেলাফতে উমাইয়ার পতনের পর থেকে আন্দালুস হয়ে উঠেছে বিভক্ত কিছু রাজ্যের সমষ্টি। রাজত্ব আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে মুসলিমরা লড়ছে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রঞ্জিত হচ্ছে। আর এই সুযোগ নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য। খ্রিস্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড কয়েকটি মুসলিম রাজ্য দখল করেন। তারপর ক্ষমতায় আসে ষষ্ঠ আলফোন্সো।

৪৭৮ হিজরীতে ষষ্ঠ আলফোন্সোর হাতে পতন হয় টলেডোর। এরপর আর কখনই টলেডো ইসলামী সাম্রাজ্যের আওতায় আসেনি। টলেডোর পর আলফোন্সো সেভিল অবরোধ করেন। এ সময় সেভিলের শাসক মুতামিদের সাথে তার পত্র চালাচালি হয়। মুতামিদ ছিলেন আত্মমর্যাদায় বলিয়ান একজন শাসক। চাইলেই তিনি অন্য মুসলিম রাজ্যগুলোর মত কর দিয়ে আলফোন্সোর বশ্যতা স্বীকার করতে পারতেন।

কিন্তু তিনি আলফোন্সোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। অবরোধ চলতে থাকে। আলফোন্সো মুতামিদের কাছে পত্র লিখে বলে, অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে। এখানে খুব গরম, আর মাছির বেশ উপদ্রব। আমার জন্য একটি পাখা পাঠাও। যেন বাতাসে জিরোতে পারি আর মাছি তাড়াতে পারি।

আলফোন্সো বুঝাতে চাচ্ছিল অবরোধ করতে তার আপত্তি নাই। মুসলিম বাহিনী নিয়েও সে চিন্তিত নয়। বরং এ মুহূর্তে মাছিই তাকে বেশি পেরেশান করছে। মুতামিদ এ পত্র পেয়ে পত্রের উলটো পিঠে লিখে দিলেন, তোমার পত্র পেয়েছি। শীঘ্রই আমি তোমার জন্য লামতি চামড়ার পাখা পাঠাবো। এ পাখা থাকবে মুরাবিতী সেনাদের হাতে। এ পাখার বাতাস আমাদেরকে তোমার হাত থেকে স্বস্তি দিবে কিন্তু তোমাকে কোনো স্বস্তি দিবে না।

—

মুতামিদ বিন আব্বাদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মুরাবিতিনদের সাহায্য চাইবেন। মুরাবিতীনরা তখন উত্তর আফ্রিকা শাসন করছে। তাদের আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন। তার শৌর্যবীর্যের গল্প শোনা যায় আন্দালুস থেকেও। মুতামিদ বিন আব্বাদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ইউসুফ বিন তাশফিনকে পত্র লিখবেন।

তাকে বলবেন, একবার অন্তত আন্দালুসে এসে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে। মুতামিদ তার সভাসদদের নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। কেউ কেউ তার সিদ্ধান্ত স্বাগত জানালেও অনেকে প্রতিবাদ করলো। বিশেষ করে বিভক্ত রাজ্যসমূহের শাসকরা তার সিদ্ধান্ত শুনে নাখোশ হলো। তারা বারবার তার সাতেহ দেখা করে তাকে বুঝাচ্ছিল, তিনি যেন ইউসুফ বিন তাশফিনের সাহায্য না চান।
তারা বলছিল, ইউসুফ বিন তাশফিন হয়তো আপনাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু একইসাথে তিনি আপনাকে রাজ্য ছাড়া করে নিজেই এ রাজ্য করায়ত্ত করবেন। এসব কথার জবাবে মুতামিদ বিন আব্বাদ যা বলেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন, শূকরের রাখাল হওয়ার চাইতে উট চড়ানো ভালো। অর্থাৎ আলফোন্সোর হাতে বন্দী হয়ে শূকর চড়ানোর চাইতে ইউসুফ বিন তাশফিনের গোলাম হয়ে উত্তর আফ্রিকায় উট চড়ানো উত্তম।

—

শাসকদের মধ্যে গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুক্কিন ও বাতালইয়ুস শাসক মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস, মুতামিদের সাথে একমত হন। ফলে সিদ্ধান্ত হলো গ্রান্ডা, সেভিল ও বাতালইয়ুস একত্রে মুরাবিতিন আমিরের কাছে সাহায্য চাইবে। মুতামিদ এবার প্রতিনিধিদল গঠন করেন।
এই দলে ছিলেন গ্রানাডার বিচারক আবু জাফর কালিয়ী, কর্ডোভার বিচারক আবু বকর বিন আদহাম, বাতলইয়ুসের বিচারক আবু ইসহাক বিন মুকানা। এই প্রতিনিধিদলের চতুর্থ সদস্য ছিলেন মুতামিদের উযির আবু বকর বিন যাইদুন। তিন বিচারকের দায়িত্ব ছিল তারা ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে আলোচনা করবেন। আর উযিরের দায়িত্ব ছিল কোনো চুক্তি করতে হলে তিনি তা সম্পাদন করবেন।

৪৭৮ হিজরীতে এই প্রতিনিধিদল ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে সাক্ষাত করে। তিনি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনেন। ইউসুফ বিন তাশফিন তো আগ থেকেই ভাবছিলেন আন্দালুসের ভাইদের সাহায্য করার কথা। অভিযান নির্বিঘ্ন করার জন্যই তিনি সাক্কুত বারগুয়ারির হাত থেকে সিউটা নৌবন্দর দখল করেন।
তিনি অপেক্ষায় ছিলেন সেভিল কিংবা গ্রানাডা থেকে কোনো বার্তা আসে কিনা। কারন এই দুই রাজ্য অতিক্রম করা ছাড়া আন্দালুসে প্রবেশের উপায় ছিল না। এখন মুতামিদ বিন আব্বাদের প্রতিনিধিদল আসায় ইউসুফ বিন তাশফিনের কাজ সহজ হয়ে গেল। ইউসুফ বিন তাশফিন প্রতিনিধিদলকে কথা দেন শীঘ্রই তিনি আন্দালুস আসবেন।

—

রোদের তেজ বেড়েছে। চোখের উপর হাত দিয়ে সামনে তাকাতে হয়। ধুলি উড়া দেখে বোঝা যায় যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। যোদ্ধারা ছড়িয়ে পড়ছে।

ইউসুফ বিন তাশফিন আরো একবার অতীতে ফিরে তাকান।তার মনে পড়ে মুতামিদের প্রতিনিধিদল কে বিদায় জানিয়েই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। বড় ছেলে তখন খুবই অসুস্থ। কিন্তু তবুও তিনি বিলম্ব করতে চাইছিলেন না। তার কানে ভেসে আসছিল আন্দালুসের মুসলমানদের আহবান। বারবার মনে পড়ছিল টলেডোর কথা। তিনি চাচ্ছিলেন না সেভিলের ভাগ্যেও নেমে আসুক টলেডোর সেই বিপর্যয়। ইতিমধ্যে আলফোন্সো তার আন্দালুস আগমনের সংবাদ পেয়ে দম্ভে ভরা একটি দীর্ঘ পত্র লিখে। পত্রের ভাষ্য ছিল,

......আপনাদের ধারনা, আল্লাহ আমাদের দশজনের বিরুদ্ধে আপনাদের একজনকে লড়তে বলেছেন। যান এটা আরো সহজ করে দিলাম। এখন আমাদের একজনের বিরুদ্ধে আপনাদের দশজন লড়লেই হবে।

.... শুনলাম আপনি নাকি সাগর পাড়ি দিতে পারছেন না। এক কাজ করুন। আমার জন্য কিছু নৌকা পাঠিয়ে দিন। আমি সমুদ্র অতিক্রম করে আপনার দেশে আসবো। তারপর আপনার পছন্দসই কোনো স্থানে আপনার সাথে লড়বো।

ইউসুফ বিন তাশফিন এই পত্রের কোনো জবাব না দিয়ে নিজের বাহিনী প্রস্তুতে মন দিলেন। অবশেষে তিনি আন্দালুসের পথ ধরেন। জিব্রাল্টার প্রনালী অতিক্রমকালে মুরাবিতদের বহনাকারী জাহাজগুলো সামদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। ইউসুফ বিন তাশফিন তখন হাত তুলে মুনাজাত ধরেন। তিনি দোয়ায় বলেন, হে আল্লাহ, যদি আমাদের এ সমুদ্র যাত্রায় মুসলমানদের কোনো কল্যাণ থাকে তাহলে এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আর যদি এতে কোনো কল্যান না থাকে তাহলে আমাদের জন্য এ সফর কঠিন করে দিন।

এই দোয়ার কিছুক্ষণ পর সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। ইউসুফ বিন তাশফিনের বাহিনী নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দেয়। আন্দালুসে পা রেখে ইউসুফ বিন তাশফিন সেজদায়ে শোকর আদায় করেন।

—

আন্দালুস নেমে ইউসুফ বিন তাশফিন সেভিলের পথ ধরেন। এ সময় আন্দালুসের মুসলমানরা তাকে স্বাগত জানায়। সেভিল থেকে তিনি বাতালইয়ুসের দিকে যাত্রা করেন। কারন ষষ্ঠ আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য যে যাল্লাকা ময়দানে শিবির স্থাপন করেছে তা বাতালইয়ুসের নিকটেই। পথে মুতামিদের সাথে সাক্ষাত হয়। মুতামিদ ছোট একটি বাহিনী নিয়ে এসেছেন। এছাড়া কর্ডোভা, সেভিল ও বাতালইয়ুস থেকে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা। এভাবে ইউসুফ বিন তাশফিনের সেনা সংখ্যা পৌছালো ত্রিশ হাজারে।

এবার ইউসুফ বিন তাশফিন আলফোন্সোর জবাব দিলেন। তিনি লিখলেন, তুমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমার সাথে লড়তে চেয়েছিলে। এখন আমিই তোমার কাছে চলে এসেছি। অপেক্ষা করো শীঘ্রই কোনো ময়দানে আমরা মুখোমুখি হবো।
এরপর তিনি আলফোন্সোকে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া আদায় অথবা যুদ্ধ তিনটির কোনো একটি বেছে নিতে বলেন। এই পত্র পেয়ে আলফোন্সো রেগে যায়। আশি বছর ধরে তারা আন্দালুসের মুসলমানদের থেকে জিযিয়া আদায় করছে, আজ কেউ তাকে শক্ত চ্যালেঞ্জ করলো।
'আমি যুদ্ধ বেছে নিলাম। তুমি কী ভাবছো?' ফিরতি জবাব্ব লিখলো আলফোন্সো।
'আমার জবাব তুমি চোখের সামনে দেখবে' লিখলেন ইউসুফ বিন তাশফিন।
ইউসুফ বিন তাশফিনের আগমনের সংবাদ পেয়েই আলফোন্সো তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। দলে দলে সৈন্য যোগদান করে তার বাহিনীতে। পাদ্রী ও বিশপরা সাধারণ জনতাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন। এভাবে তার বাহিনী বিশালাকার ধারণ করে। ঐতিহাসিকদের মতে যাল্লাকার ময়দানে আলফোন্সোর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ, যা কিনা মুসলিম বাহিনীর চেয়ে দশগুন বেশি।
আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীকে ধোকা দেয়ার জন্য যুদ্ধের দিন নির্ধারণ করে দেয়। আলফোন্সো তার এক বার্তায় জানায়, আগামীকাল শুক্রবার। এদিন আপনাদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই এদিন লড়া ঠিক হবে না। পরদিন শনিবার। এদিন ইহুদিদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। সেদিনও লড়া যাবে না। এরপর দিন রবিবার। আমাদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় আচার পালনের দিন। তাই আমার মনে হয় সোমবারে আমাদের লড়াই হলেই ভালো। এই বার্তা পেয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন সোমবারের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

—

'এটা হতো ভুল সিদ্ধান্ত' নিজের সেনাদের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। তিনি আলফোন্সোর ধূর্ততা ধরতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন সোমবারেই যুদ্ধ হবে। কিন্তু মুতামিদ বিন আব্বাদ আলফোন্সোর চাল ধরে ফেলেন। তিনি ইউসুফ বিন তাশফিনকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, আলফোন্সো সম্ভবত শুক্রবারেই হামলা করবে। একথা শুনে ইউসুফ বিন তাশফিন সতর্ক হন। নিজের সেনাপতিদেরকেও সতর্ক করে রাখেন।

'সতর্ক না হলে আজকের যুদ্ধ কঠিন হতো' ঘোড়ার কেশরে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। গত বছর হিময়ার গোত্রের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছেন ঘোড়াটি। গতরাতে খুব একটা ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। সারারাত

নফল ও মুনাজাত আদায় চলেছে। ফকিহরা সেনাদেরকে বারবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।
ঘোড়ার হ্রেষা ডাক শোনা যায়। ইউসুফ বিন তাশফিন ফিরে তাকালেন। একটু দূরে আবুল আব্বাস আহমাদ বিন রুমাইলাকে দেখা যাচ্ছে। ইউসুফ বিন তাশফিনের চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। তার মনে পড়ে সকালেই ইবনে রুমাইলা তাকে একটি স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন।
গতরাতে ইবনে রুমাইলা স্বপ্নে দেখেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, ইবনে রুমাইলা, তোমরাই বিজয়ী হবে এবং তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। ইউসুফ বিন তাশফিন আরো একবার আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ওঠেন। এই স্বপ্ন সুসংবাদ। ইনশাআল্লাহ, আজ বিজয় মুসলমানদেরই হবে।
তবে এখনো বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মুতামিদ বিন আব্বাদের বাহিনী লড়ে চলছে আলফোন্সোর বাহিনীর বিরুদ্ধে। মুতামিদের কথামত ইউসুফ বিন তাশফিন আজকের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। আন্দালুসের যোদ্ধারা থাকবে মুতামিদ বিন আব্বাদের নেতৃত্বে, রনাংগনের সামনের দিকে। তাদের সাথে থাকবে দাউদ বিন আয়েশার নেতৃত্বে মুরাবিতদের ছোট একটি বাহিনী।
মূল বাহিনী নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন টিলার আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন। এটি একটি যুদ্ধ কৌশল, যা ইউসুফ বিন তাশফিন ইতিহাস থেকে শিখেছেন। ইতিপূর্বে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) ওয়ালাজার যুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এছাড়া নোমান বিন মুকাররিনও নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করে সাফল্য অর্জন করেন। গতরাতেই সেনাদের এভাবে সাজানো হয়। আশংকা ছিল সকালেই হয়তো আলফোন্সো ওয়াদা ভংগ করে হামলা চালাবে। আর বাস্তবে তাই হলো। সকালেই আলফোন্সো তার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলে পড়ে।

টিলার আড়াল থেকে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের খবর রাখছিলেন। প্রথম থেকেই মুসলিম বাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করে। কিন্তু আলফোন্সো তার সেনাধিক্যের কারনে এগিয়ে যায়। অনেক মুসলিম সেনা নিহত হন। এমনকি সেনাপতি মুতামিদও আহত হন। তিনবার তার ঘোড়া মারা যায়। খ্রিস্টান সেনারা মুসলিম বাহিনীর রক্ষনব্যূহ ভেংগে ফেলে।
মুসলিম সেনারা দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও বিজয়ের পাল্লা খ্রিস্টান বাহিনীর দিকে ঝুকে পড়ে। ইউসুফ বিন তাশফিন বুঝলেন এখনই সময়। এখুনি খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা করতে হবে। তিনি নিজের কাছে থাকা বাহিনীকে দু ভাগ করলেন। সায়র বিন আবু বকরের নেতৃত্বে একটি দলকে পাঠালেন মুতামিদের বাহিনীকে সাহায্য

করতে। অন্য দলটি নিয়ে তিনি ঘুরে ময়দানের শেষ দিকে চলে গেলেন। এখানেই আলফোন্সোর শিবির। সারী সারী তাবু। ভেতরে আলফোন্সোর বাহিনীর রসদ। শিবিরের প্রহরায় সামান্য কজন সৈন্য।

ইউসুফ বিন তাশফিনের জোরালো হামলায় তারা খড়কুটোর মতই ভেসে গেল। যারা বেচে গেল তারা প্রতিরধের পরিবর্তে পালিয়ে আলফোন্সোর বাহিনীর দিকে গেল। ইউসুফ বিন তাশফিন তাবুতে আগুন ধরিরে দিলেন। জ্বলতে থাকে আলফোন্সোর বাহিনীর রসদ। আগুনের লোলিহান শিখা জ্বলে ওঠে আলফোন্সোর শিবিরে। মুখে আগুনের উত্তাপ অনুভব করেন ইউসুফ বিন তাশফিন। নিজের বাহিনীকে এবার তিনি ময়দানের দিকে ঘুরিয়ে দেন।
এদিকে আলফোন্সোর শিবিরের পলাতক প্রহরীরা তাকে শিবিরে হামলার কথা জানায়। আলফোন্সো তার বাহিনীর একাংশকে শিবিরের দিকে প্রেরণ করে। এই বাহিনী শিবিরের দিকে যাওয়ার আগেই ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের উপর হামলে পড়েন। খ্রিস্টান বাহিনী এখন দুদিক থেকেই হামলার মুখোমুখি। তীব্র লড়াই হয়। দুপক্ষের যোদ্ধারা বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে।

৭৯ বছর বয়সী ইউসুফ বিন তাশফিনও একজন সাধারণ যোদ্ধার মতই লড়েন। জয়ের পাল্লা স্থির হয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা লড়াই চলে। অবশেষে খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়। একের পর এক খ্রিস্টান সেনার লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আলফোন্সো তার একান্ত সহচরদের সাথে পালাতে থাকে।
ইউসুফ বিন তাশফিন তার নেতৃত্বে থাকা সুদানী বাহিনীকে ইশারা দেন আলফোন্সোকে ধাওয়া করতে। এই বাহিনী আলফোন্সোর বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তুমুল লড়াই চলে। এ সময় ওক যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত বর্শা আলফোন্সোর উরু ভেদ করে। আলফোন্সো মারাত্মক আহত হয়ে পলায়ন করে। এই আঘাতের ফলে সারাজীবন তাকে খুড়িয়ে চলতে হত। আলফোন্সো তার ৫০০ সেনাসহ পালিয়ে যায়।

এসময় মুতামিদের সাথে ইউসুফ বিন তাশফিনের মতের অমিল হয়। মুতামিদ চাচ্ছিলেন আলফোন্সোকে ধাওয়া করে হত্যা করতে। ইউসুফ বিন তাশফিনের বক্তব্য ছিল সারাদিনের যুদ্ধে মুসলিমরা ক্লান্ত। আর আলফোন্সোর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সে হয়তো নির্মমভাবে রুখে দাঁড়াবে। তাই তিনি ধাওয়া করতে চাচ্ছিলেন না। এভাবেই আলফোন্সো পালিয়ে যায়। আন্দালুসের পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকালে মুতামিদের সিদ্ধান্তই সঠিক মনে হয়।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করা হয়। প্রচুর গণিমত অর্জিত হয়। গণিমত ভাগের সময় মুরাবিতদেরকেও একটি ভাগ দেয়ার কথা হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন সাফ জানিয়ে দেন, তিনি গণিমত নিবেন না। ৭৯ বছর বয়সে দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিযানে তিনি গণিমতের জন্য আসেন নি। তিনি এসেছেন মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে। জিহাদের ফজিলত অর্জন করতে। তিনি এর প্রতিদান চান আল্লাহর কাছে। তাই তিনি পার্থিব কিছুই গ্রহণ করবেন না।

ইউসুফ বিন তাশফিন গণিমতের ভাগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ইতিমধ্যে মরক্কো থেকে সংবাদ আসে ইউসুফ বিন তাশফিনের বড় ছেলে ইন্তেকাল করেছেন। এ সংবাদে ইউসুফ বিন তাশফিন ব্যথিত হন। তিনি সেনাবাহিনী সহ মরক্কো ফিরে যান। এদিকে আন্দালুসের প্রতিটি মসজিদের মিম্বর থেকে তখন ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্য দোয়া করা হচ্ছে।

—

এক সহস্রাব্দ দূরে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এক নগন্য পাঠক যখন ভাবে ইউসুফ বিন তাশফিনের কথা, তখন তার কীর্তিগাথা বিস্ময়কর মনে হয়। ৭৯ বছর বয়সে তিনি দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি উপেক্ষা করে ছুটে এসেছিলেন আন্দালুসে, কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়া। কেবলই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের জায়গা থেকে। তার কারনেই আন্দালুসে মুসলিম শাসন টিকে ছিল আরো কয়েক শতাব্দী। যাল্লাকার যুদ্ধের পর আরো দুবার তিনি আন্দালুসে গমন করেন।

৪৮১ হিজরীতে দ্বিতীয়বার, ৪৮৩ হিজরীতে তৃতীয়বার। তিনি চাচ্ছিলেন মুসলিম শাসকদের সাহায্য করতে, মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু মুসলিম শাসকরা নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্রমেই দূর্বল হচ্ছিল, এমনকি তারা একে অপরের বিরুদ্ধে গোপনে হাত মিলাচ্ছিল খ্রিস্টানদের সাথে। এমনকি ইউসুফ বিন তাশফিনের হাতে এমন একটি পত্র আসে যাতে একজন মুসলিম শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে লড়াই করার জন্য খ্রিস্টানদের সাহায্য চেয়েছিল। এসব তিনি ইউসুফ বিন তাশফিন অত্যন্ত ব্যথিত হন। এতদিন তার রাজ্যজয়ের কোনো চিন্তা ছিল না।
কিন্তু এবার মনে হলো আন্দালুসের মুসলমানদের কল্যানের জন্যই এইসব অথর্ব শাসকদের হটানোর কোন বিকল্প নাই। তাই ৪৮৩ হিজরীতে ইউসুফ বিন তাশফিনের অভিযান ছিল রাজ্যজয়ের অভিযান। একেরপর পর এক আন্দালুসের শহরগুলো দখল করে নেন তিনি।

একে মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তবে এ হামলার আগে তিনি আলেমদের কাছে পত্র লিখে আন্দালুসের বিস্তারিত অবস্থা জানান এবং হামলা

চালানোর ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চান। আলেমরা সবাই তাকে হামলা চালানোর বৈধতা দেন। যারা তাকে হামলা চালানোর বৈধতা দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাগদাদের একজন আলেম, ইতিহাস যাকে চেনে ইমাম গাজালি নামে।

—

ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্ম ৪০০ হিজরীতে। ৪৫৩ হিজরীতে তিনি উত্তর সেনেগাল ও দক্ষিণ মৌরিতানিয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, পুরো সেনেগাল ও পুরো মৌরিতানিয়া কব্জা করে নেন। ৪৬৮ হিজরীতে দেখা যায় তার দলে অশ্বারোহী সেনা সংখ্যাই এক লক্ষ।

ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন মারাকিশ শহর। নিজের জন্য তিনি বেছে নেন আমিরুল মুসলিমীন উপাধি। নিজেকে পরিচয় দিতেন বাগদাদের খলিফার একজন নগন্য কর্মচারী বলে। অথচ ততদিনে বাগদাদের দূর্বল আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে মুরাবিতি সাম্রাজ্য হাজারগুন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তার সাম্রাজ্যের প্রায় দুহাজার মসজিদে আব্বাসী খলিফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। ইউসুফ বিন তাশফিন ইন্তেকাল করেন ৫০০ হিজরীতে, ১০০ বছর বয়সে।

তথ্যসূত্র :

১. কিসসাতু আন্দালুস – ড. রাগেব সিরজানি
২. নাফহুত তিব– আল্লামা মাক্কারি

মাওদুদ বিন তুনিতকিন

মাওদুদ বিন তুনিতকিন।
ইতিহাসের এক বিস্মৃত বীর। ক্রুসেডের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে যার নাম বলতেই হয়।
মাওদুদ বিন তুনিতকিনের আবির্ভাব ঘোর অমানিষার কালে। মুসলিম বিশ্বে তখন হিংস্র থাবা বসিয়েছে ক্রুসেডাররা।

—

১৫ জুলাই ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের হাতে বাইতুল মাকদিসের পতন ঘটে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয় শহরের বাসিন্দাদের। মাসজিদুল আকসাতে বসানো হয় মদের আসর। উমর মসজিদের বারান্দা ডুবে যায় নিহত মুসলমানদের রক্তে। শহরের প্রাচীর থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হয় মুসলিম শিশুদের। গডফ্রে জেরুজালেমের রাজা হল। এরপর ত্রিপোলি ও টায়ার আক্রমন করে দখল করা হলো। সেখানেও চললো একই নির্মমতা। ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এক বিশাল অংশ ক্রুসেডারদের দখলে চলে গেল।
ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল লিখেছেন, ক্রুসেডাররা এসব অঞ্চলে এমনভাবে প্রবেশ করছিল যেভাবে পুরনো কাঠে খুব সহজেই পেরেক ঢুকানো হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চারটি খ্রিস্টান রাজ্য গড়ে উঠে। কুদস, এন্টিয়ক, ত্রিপোলি ও ইয়াফা। খ্রিস্টানদের সাহস এতটাই বেড়ে যায় যে কির্ক এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা আক্রমনের হুমকি দেয়। সেসময়ের খ্রিস্টানদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে ইবনুল আসির লিখেছেন, তাদের সেনাসংখ্যা ছিল অসংখ্য। তাদের অত্যাচারের মাত্রা প্রতিদিনই

বাড়ছিল। তাদের কোনো শাস্তির ভয় ছিল না। তারা হয়ে উঠে বেপরোয়া। এমন কোনো অপরাধ ছিল না যা তারা করছিল না।

—

আগেই বলা হয়েছে, খ্রিস্টানদের বাধা দেয়ার কেউ ছিল না। তারা ছিল নির্ভয়। মুসলিম জনপদগুলো তাদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছিল, নারীরা হারাচ্ছিল সম্ভ্রম। বাহ্যত মনে হচ্ছিল মুসলমানদের কোনো আশাই নেই। কেউই এগিয়ে আসবে না উম্মাহর এই দুসময়ে। খ্রিস্টানরা একের পর এক শহর জয় করছে, মুসলমানদের প্রথম কিবলা তাদের হাতে। জেরুজালেম পতনের পর মিসরের ফাতেমী উযির আল আফদাল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন, যার বেশকটিতেই তিনি পরাজিত হন।

—

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রথম যিনি জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেন তিনি মোসুলের আতাবেক মাওদুদ বিন তুনিতকিন। তিনি শারাফুদ্দৌলা নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তার পূর্বে ক্রুসেডারদের সাথে অন্য মুসলিম শাসকদের যে লড়াই হচ্ছিল তা ছিল অনেকাংশেই নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লড়াই। এমনকি তারা নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে কখনো কখনো ক্রুসেডারদের বশ্যতাও স্বীকার করে নিচ্ছিল। তারা ক্রুসেডারদের কর দিচ্ছিল। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ছিল নিজের পিঠ বাচানোর লড়াই। যখনই তারা ক্রুসেডারদের থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করতো, তখুনি তারা নীরব হয়ে যেত। বাইতুল মাকদিস মুক্ত করার কোনো চিন্তা তাদের আলোড়িত করতো না। নির্যাতিত মুসলিমদের আর্তনাদ তাদের ভাবাতো না।
মাওদুদ বিন তুনিতকিন ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করেন কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সওয়াব অর্জন ব্যতিত তার আর কোনো চাহিদা ছিল না।

—

মাওদুদ বিন তুনিতকিন ছিলেন মসুলের শাসক। প্রজাবান্ধব শাসক হওয়ার কারনে জনগনের মাঝে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। মুসলিম বিশ্বে ক্রুসেডারদের হামলার ঘটনা মাওদুদকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন, নির্যাতিত মুসলমানদের কথা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন।

১১১০ খ্রিস্টাব্দে মাওদুদ বিন তুনিতকিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। ৫০৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে (এপ্রিল ১১১০ খ্রিস্টাব্দ) তিনি এডেসা অবরোধ করেন। সে সময় এডেসা ছিল ক্রুসেডারদের একটি মজবুত ঘাটি। মাওদুদের এই অভিযানের ফলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন দিগন্তের

সূচনা হয়। এই অভিযানে মাওদুদের সাথে ছিলেন ৩০ বছর বয়সী এক যুবক, মাওদুদ যার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের সাথে রেখেছিলেন। এই যুবকের নাম ইমাদুদ্দিন, পরবর্তী বছরগুলোতে বিশ্ব যাকে চিনেছিল ইমাদুদ্দিন যিংকি নামে।

মাওদুদ টানা দুই মাস শহরটি অবরোধ করে রাখেন। থেমে থেমে সংঘর্ষ হতে থাকে কিন্তু শহরের মজবুত কেল্লা দখল করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে বৈরুত থেকে প্রথম বল্ডউইন একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মাওদুদের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে। তার সাথে যোগ দেয় তরাবলিসের আমির। বাধ্য হয়ে মাওদুদ অবরোধ তুলে নেন। মোসুলে ফিরে তিনি আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুজাহিদরা এসে মাওদুদের বাহিনীতে যোগ দেয়।

—

এ সময় যুবকদের মধ্যে জাগরণের সূচনা হয়। মাওদুদ বিন তুনিতকিনের আবেগ তাদের মধ্যেও সঞ্চার হয়। যুবকরা দেখছিল, মাওদুদ একাকী জিহাদের ময়দানে নেমে পড়েছেন। তার পাশে শক্তিশালী কেউ নেই। কোথায় বাগদাদের খলিফা? উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে তিনি কী ভূমিকা রাখছেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর যুবকদের ভাবাচ্ছিল। আলেপ্পোর যুবকরা উঠে দাঁড়ায়। তারা বাগদাদ অভিমুখে রওনা হয়। তারা খলিফা মুস্তাযহির বিল্লাহর সাথে দেখা করে তাকে আহবান জানায় শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রেরণ করতে। হায়, যুবকরা খলিফাকে বলছে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করতে ! অথচ খলিফার দায়িত্ব ছিল নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

খলিফা যুবকদের কথা শুনেন। তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি অবশ্যই মুনাজাতে দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ মুসলমানদের থেকে এ বিপদ দূর করে দেন! হায়, জিহাদ ত্যাগ করে নির্জনে বসে মাজলুমের জন্য দোয়া করার এ সিলসিলা নতুন নয়।

—

যুবকরা যা বুঝার বুঝে নিলো। তারা এবার শহরবাসীর দিকে মনোযোগ দিল। তারা শহরবাসীকে জানালো বাইতুল মাকদিসের দুর্দশার কথা, জানালো ক্রুসেডাররা কী নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে। তারা বাগদাদের বাসিন্দাদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। যুবকদের আলোচনার ফলে বাগদাদের বাসিন্দাদের মনে জিহাদের স্পৃহা জেগে উঠে। তাদের ঘুমন্ত চেতনা নাড়িয়ে দেয়ার জন্য একটা ঝাঁকুনি দরকার ছিল, আর যুবকরা সফলভাবেই সেই ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিল।

বাগদাদের লোকেরাও আলেপ্পোর যুবকদের সাথে সুর মিলিয়ে খলিফার কাছে সেনাবাহিনী গঠনের আহবান জানায়। এমনকি এক শুক্রবারে জুমার নামাজের আগে তারা জামে মসজিদে একত্রিত হয়। এসময় তারা বারবার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাহিনী গঠনের আবেদন জানায়। ভীড় বাড়তে থাকে, সাথে হট্টগোল। জনতা ছিল ক্রোধান্বিত। খলিফা সংবাদ শুনে জনতাকে শান্ত করার জন্য ওয়াদা করলেন শীঘ্রই সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। জনতা ঘরে ফিরে গেল।
এক সপ্তাহ পার হলেও খলিফার ওয়াদা বাস্তবায়নের কোনো আলামত দেখা গেল না। পরের শুক্রবার জনতা এগিয়ে গেল খলিফার প্রাসাদের দিকে। এবার তারা আগের চেয়েও ক্রোধান্বিত। প্রাসাদের প্রহরীরা তাদেরকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে বাধা দিল। জনতা প্রাসাদের জানালা ভেংগে ফেলে।

এরপর তারা শাহী মসজিদে খলিফা যে আসনে বসতেন তাও ভেংগে ফেলে। এই উদ্ভুত পরিস্থিতির কারনে মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছিল। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গঠন ব্যতিত জনতাকে শান্ত করা যাবে না। যুবকরা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অটল ছিল। শেষে খলিফা সেনাবাহিনী গঠনের ঘোষণা দিলেন। মাসউদকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হল।

—

সুবহানাল্লাহ, এ ছিল অল্প কজন যুবকের পরিশ্রমের ফসল। এই যুবকরা বিখ্যাত কেউ ছিল না, আজ আমরা তাদের নামও জানি না, ইবনুল আসিরও তাদের নাম বলতে পারেননি, শুধু লিখেছেন 'যুবকরা'। এই যুবকরা যমিনে অখ্যাত, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তারা নিজ নিজ ইখলাস ও নিয়ত অনুসারে অবশ্যই প্রতিদান পাবেন। আল্লাহ এই যুবকদের অন্তরে জিহাদের তামান্না ঢেলে দিয়েছিলেন, পরে যুবকরা তা সঞ্চার করেছিল বাগদাদবাসীর মনে।
কেন উম্মাহর যুবকরা জাগ্রত হয়? কেন আলেপ্পোর যুবকরা উঠে দাড়িয়েছিল? কেন দামেশক, হামা, বা হিমসের যুবকরা মাথা তুলে দাঁড়ায়নি? এই প্রশ্নের জবাব ইবনুল আসিরের লেখাতেই পাওয়া যায়। ইবনুল আসির স্পষ্ট লিখেছেন, এই যুবকদের সাথে আলেমদের একটি বড় জামাত ছিল। আলেমরা এই যুবকদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।
হ্যা, আলেমরাই এই উম্মাহর নেতৃত্ব দিবেন। তারা উম্মাহকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবেন। তারা যখন উম্মাহকে সঠিক নির্দেশনা দিতে ভুলে যান, তখন উম্মাহ পথ হারাতে বাধ্য।
এটি ছিল ৫০৪ হিজরীর ঘটনা।

—

৫০৫ হিজরীতে (১১১১ খ্রিস্টাব্দ) মাওদুদ তার বাহিনী নিয়ে ফোরাত নদী অতিক্রম করে সিরিয়ার তাল বাশির অবরোধ করেন। তিনি এ শহর চল্লিশ দিন অবরোধ করে রাখেন। কোনো সাফল্য না আসায় তিনি অবরোধ তুলে হিমস এবং হামা শহরের মাঝামাঝি মাআররাতুন নুমান শহরে আক্রমন করেন। শহরের ফরাসীরা পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে গোপনে দামেশকের আমির তুগতিকিনের সাথে সন্ধি করে ফেলে। দামেশকের আমির রাজি হলেন মাওদুদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্য করতে। আমির ভয় পাচ্ছিলেন, মাওদুদ শক্তিশালী হয়ে গেলে তিনি দামেশকের ক্ষমতা কেড়ে নিবেন। মাওদুদ যখন দেখলেন দামেশকের আমির এগিয়ে আসছে ফরাসিদের সাহায্যে তখন পিছু হটা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।

মাওদুদ বিন তুনিতকিন তার বাহিনীসহ একা হয়ে গেলেন। তিনি নিজের রাজ্য উত্তর ইরাক থেকে বহুদূরে অবস্থান করছিলেন। আশপাশে ক্রুসেডারদের এলাকা, এর মধ্যে দামেশকের আমিরও চলে গেছে তার বিপক্ষে। মাওদুদ ফিরে গেলেন, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিলেন শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন।

—

৫০৬ হিজরীর মহররম মাসে মাওদুদ বিন তুনিতকিন আবার এডেসা অবরোধ করেন। কিন্তু এবার তাল বাশির থেকে জোসেলিনের বাহিনী এগিয়ে আসে এডেসার সাহায্যে। মাওদুদের এই অভিযানও সফল হয়নি।

৫০৭ হিজরীতে (১১১৩ খ্রিস্টাব্দ) মাওদুদ জর্দানের সানবারা এলাকায় ক্রুসেডারদের ঘাটিতে হামলা চালান। এই যুদ্ধে প্রায় এক হাজার ক্রুসেডার নিহত হয়। মাওদুদ বিন তুনিতকিন ১৬ দিন শহরটি অবরোধ করে রাখেন কিন্তু ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে ক্রুসেডারদের ১৬ হাজার সৈন্য এসে পৌছে। মাওদুদ বিন তুনিতকিন আবারো অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। তাকে তার সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছিল। অবরোধ তুলে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

তিনি দামেশকে ফিরে এলেন নতুন করে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। একদিন দামেশকের জামে মসজিদে নামাজ শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এসময় একজন বাতেনী গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা করে। ইমাম যাহাবীর ভাষ্যমতে মাওদুদ সেদিন রোজা রেখেছিলেন। সময়টি ছিল সেপ্টেম্বর ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ।

—

মাওদুদ বিন তুনিতকিন ছিলেন একাকী এক সমরনায়ক। কখনো তিনি মনোবল হারাননি। আল্লাহর উপর ভরসা করে একের পর এক জিহাদে অংশগ্রহণ

করেছেন। কেউ তার পাশে ছিল না, তবু তিনি হতাশ হননি। মূলত বান্দার কাজই হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া।
মাওদুদ বিন তুনিতকিন বারবার এডেসায় হামলা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এডেসা জয়ের জন্য মনোনিত করেছিলেন মাওদুদের সংগী সেই যুবককে, ইমাদুদ্দিন যার নাম। প্রায় ত্রিশ বছর পরে, ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইমাদুদ্দিন যিংকি এডেসা জয় করেন।

—

বাহ্যিক চোখে মাওদুদ বিন তুনিতকিন খুব বেশি যুদ্ধে জয়লাভ করেননি, তার সাফল্যের খাতাটাও তাই শূন্য মনে হতে পারে। কিন্তু ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ধারা তিনি শুরু করেছিলেন তা ধরেই পরে এগিয়ে গেছেন ইমাদুদ্দিন যিংকি, নুরুদ্দিন যিংকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর মত মহানায়করা।
সহীহ মুসলিমের একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামে ভালো কোন রীতি-রেওয়াজ চালু করবে, সে তার নিজের এবং তার (মৃত্যুর) পর সেই রীতিনির্ভর আমলকারী প্রত্যেকের আমলের (সমপরিমান) সওয়াব পাবে; আমলকারীদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কম করা ছাড়াই

—

মাওদুদ ক্রুসেডারদের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু গুপ্তঘাতকের ছুরী তার প্রাণ কেড়ে নেয়। তার মৃত্যুতে মুসলমানরা মুষড়ে পড়ে। তাদের আশার প্রদীপ নিভে যায়। আর এই সময়ে দৃশ্যপটে আবির্ভুত হলেন সুলতান ইমাদুদ্দিন যিংকি। পরবর্তী বছরগুলোতে যিনি একাই হয়ে উঠেছিলেন ক্রুসেডারদের ত্রাস।

সূত্র –

১। আত তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ– ইবনুল আসির।
২। আল কামিল ফিত তারিখ– ইবনুল আসির।
৩। কিসসাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা– ড. রাগেব সিরজানি
৪। তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

মানসা মুসা

হজের সফরে চলছেন রাজা। সাথে আছে ৬০ হাজার সঙ্গী। এর মধ্যে রাজার সেবকই আছেন প্রায় ১৪ হাজার। প্রতিজন সেবকের কাছে আছে সোনার বার। এই কাফেলার সাথে আছে ১০০ উট-বোঝাই স্বর্ণ। মালি থেকে মিসর হয়ে হেজাজের পথে যেখানেই কাফেলা বিরতি দিল, রাজা দুহাতে স্বর্ণ দান করলেন স্থানীয়দের। তাঁর স্বর্ণদানের কারণে মিসরে সোনার দামই কমে গেল।
মক্কায় হজ সেরে আরো তিনমাস অবস্থান করলেন রাজা। ততদিনে তাঁর বিশাল ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে। এবার তিনি ব্যবসায়ীদের থেকে ঋণ নিলেন। ঋণের টাকায় কিনলেন ফিকহে মালেকির বইপত্র। এবার চললেন নিজের রাজ্যের দিকে। সাথে জুটিয়ে নিলেন আলেম, কবি, সাহিত্যিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের এক বিশাল জামাতকে। উদ্দেশ্য, এঁদেরকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবেন। রাজ্যকে সমৃদ্ধ করবেন।
রাজা ফিরলেন দেশে। লোকেরা বলল, 'বাহ, উটভর্তি সোনা নিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন উটভর্তি বই নিয়ে!'
এই রাজার নাম মানসা মুসা। তিনি ছিলেন বর্তমান মালির শাসক। রাজ্যে সোনার খনি ছিল। তাই অভাবের মুখ দেখেননি কখনো। যেভাবে সোনা এসে কোষাগারে ঢুকত সেভাবেই আবার তা বিলি করে দিতেন দুস্থ-দরিদ্র প্রজাদের মাঝে। মানসা মুসাকে বলা হয় সর্বকালের ধনীদের একজন। ২০১৫ সালে টাইম ম্যাগাজিন ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ১০ জনের তালিকা করে। এতে সর্বকালের সেরা ধনী বলা হয় মানসা মুসাকে।
মানসা মুসা সিংহাসনে আরোহণ করেন ৭১২ হিজরিতে (১৩১২ খ্রিস্টাব্দ)। ইবনু আমির হাজিব মনসা মুসাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কীভাবে এই রাজত্ব লাভ করলেন?'
মনসা মুসা শুনিয়েছিলেন নিজের সিংহাসন আরোহণের গল্প। 'আমাদের অঞ্চলে লোকজনের বিশ্বাস ছিল আটলান্টিক মহাসাগরই পৃথিবীর শেষ। এর ওপাড়ে আর কোনো ভূখণ্ড নেই। আমার আগে যিনি শাসক ছিলেন, দ্বিতীয় আবু বকর কেইতা, তিনি মনে করতেন আটলান্টিকের ওপাড়েও ভূখণ্ড আছে। তিনি দুইশো জাহাজ

দিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীকে কয়েক বছরের রসদ দেয়া হয়। তাদের উপর আদেশ ছিল, তারা আটলান্টিকের ওপাড়ে নতুন ভূখণ্ড সন্ধান করে বেড়াবে। নতুন ভূখন্ডের সন্ধান না পেলে তাদের ফিরে আসা নিষেধ ছিল। এই বাহিনী চলে যায়। কয়েক বছর তাদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। এরপর আবু বকর কেইতা দুই হাজার জাহাজ নিয়ে নতুন ভূখণ্ডের সন্ধানে যান এবং আমাকে রাজত্বের দায়িত্ব দিয়েন যান।'[৯২]

আল্লামা মাকরেজির বর্ণনামতে, মানসা মুসা হজ করেন ৬২৪ হিজরিতে[৯৩]। তাঁর এই হজের সফরই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সফরের শুরুতেই তিনি পৌঁছেন মিসরে। সেখানে তখন আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের শাসন চলছিল। মানসা মুসার আগমনের সংবাদ শুনে সুলতান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সুলতান তাঁর নিজের কেল্লায় মানসা মুসাকে অবস্থান করার অনুরোধ করেন। প্রথম যেদিন মানসা মুসা সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন তাঁকে বলা হয় দরবারের রীতি মেনে সুলতানের সামনে মাটি চুম্বন করতে। তখন মানসা মুসা বলেন, 'আমি শুধু আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনেই মাথা নিচু করি।' সুলতান এ কথায় প্রভাবিত হন। তিনি মানসা মুসাকে খুব সম্মানের সাথে রাখেন। তাঁকে অনেক উপহার দেন। মানসা মুসার বিশাল কাফেলার আগমনে মিসরের অর্থনীতিতেও প্রভাব পড়ে। একদিকে তাঁর স্বর্ণ বিতরণের কারণে সোনার দাম কমে যাচ্ছিল, আবার তাঁর কাফেলার কাছে জিনিসপত্র বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা খুব লাভবান হচ্ছিলেন। এ সময় সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা বেশ মুনাফা লুটে নেয়। তারা এক দিনার মূল্যের কাপড় ৪৬ দিনারে বিক্রি করতে থাকে[৯৪]।

এরপর মানসা মুসা পৌঁছলেন মক্কায়। সেখানেও তিনি প্রচুর দান করেন। তবে মক্কার আবহাওয়া তাঁর কাফেলার সদস্যদের জন্য সহনীয় হয়নি। তাঁর কাফেলার এক তৃতীয়াংশ সদস্যই এই সফরে মারা যান[৯৫]।

---

[৯২] শিহাবুদ্দিন উমরি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন ইয়াহইয়া (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী), মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, ৪/৫৬,৫৭ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)

[৯৩] মাকরেজি, তকিউদ্দিন আহমাদ বিন আলি (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরী), আয যাহাবুল মাসবুক ফি যিকরি মান হাজ্জা মিনাল খুলাফাই ওয়াল মুলুক, পৃ- ১৪০ (মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দিনিয়্যাহ, ১৪২০ হিজরী)

[৯৪] শিহাবুদ্দিন উমরি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন ইয়াহইয়া (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী), মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, ৪/৫৮ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)

[৯৫] ইবনু হাজার আসকালানি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আলি বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী), আদ দুরারুল কামিনাহ, ৪/৩৮৩, (বৈরুত, দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, ১৩৪৯ হিজরী)

মানসা মুসা ছিলেন প্রজাবান্ধব শাসক। সাম্রাজ্যের উন্নতিতে তিনি প্রচুর কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন। হজের সফর থেকে ফেরার সময় তিনি আন্দালুসের কবি আবু ইসহাক ইবরাহিম সাহেলিকে সাথে নিয়ে আসেন। তিনি নিজের রাজ্যে প্রচুর মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। থিমবুকতু শহরেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে তা মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। এবং তারও পরে এটি ইউনিভার্সিটি অব শাংকোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে এর কার্যক্রম খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

আটলান্টিকের তীর থেকে তিম্বাকতু পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল এলাকায় মানসা মুসা রাজত্ব করেছিলেন। সুদানের অমুসলিম গোত্রগুলোর সাথে বারবার তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। শত্রুপক্ষের সেনারা বন্দি হলে তাদের পাঠানো হতো স্বর্ণের খনিতে। শ্রমিক হিসেবে। ২৫ বছরের শাসন শেষে ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে মানসা মুসা মারা যান।[৯৬]

[96] The Encyclopaedia Of Islam, part- ৬, page- ৪২২ (E J Brill, ১৯৯১)

খাইরুদ্দিন বারবারোসা

যদি মুসলিম তরুণদের জিজ্ঞেস করা হয় খাইরুদ্দিন বারবারোসার কথা, তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশই তাকে চেনে না।যারা চেনে তারাও হয়তো এটুকুই জানে, তিনি ছিলেন লাল দাড়িওয়ালা একজন জলদস্যু। ভূমধ্যসাগরে লুটতরাজ করে বেড়াতেন।

আফসোস, ইসলামের এই মহান মুজাহিদ সম্পর্কে এমন চিত্রই অংকন করা হয়েছে হলিউড মুভি এবং পশ্চিমা লেখকদের গল্প-উপন্যাসে। অথচ, খাইরুদ্দিন বারবারোসা কোনো জলদস্যু ছিলেন না। তিনি ছিলেন উসমানি সালতানাতের নৌবাহিনী প্রধান। উম্মাহর প্রতি তার অসামান্য অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আমরা কি কখনো ইতিহাসের পাতা উলটে দেখার সুযোগ পেয়েছি? বা ইচ্ছে করেছি?

খাইরুদ্দিন বারবারোসা হয়তো মধ্যযুগের আর দুচারজন সেনাপতির মতই ইতিহাসের কোনো এক কোণে ঠাই পেতেন, কিন্তু তার অসামান্য কর্মকান্ডের ফলে তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছেন। উম্মাহ তাকে স্মরণ করতে বাধ্য তার অবিস্মরনীয় কর্মকান্ডের জন্য। খাইরুদ্দিন বারবারোসাকে উম্মাহ স্মরণ করে কারণ,

১। তিনি অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মহান খেদমতে।

২। তিনি আন্দালুস থেকে ৭০ হাজার মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন।

৩। স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ভূমধ্যসাগরকে তিনি নিরাপদ করে তোলেন।

৪। প্রিভেজার যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদের নির্মমভাবে পরাজিত করেন।

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসার জন্ম ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে, গ্রীসের লেসবস দ্বীপে। তিনি ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজন। পিতা ইয়াকুব বিন ইউসুফ ছিলেন উসমানি বাহিনীর একজন সাধারণ যোদ্ধা। মা ছিলেন আন্দালুসের বংশোদ্ভুত। সাদামাটা ছিমছাম পরিবার। রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে এই পরিবারের কোনো

কতৃত্ব ছিল না। খাইরুদ্দিনের অন্য ভাইয়েরা হলেন আরুজ, ইসহাক ও মুহাম্মদ ইলিয়াস। খাইরুদ্দিনের মূল নাম খাসরুফ।

দ্বীপে বসবাস করার কারনে খাইরুদ্দিনের ভাইয়েরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বড় ভাই আরুজের বেশ কয়েকটি নৌকা ছিল। প্রথমদিকে তিন ভাই নাবিক হিসেবে কাজ করলেও পরে তারা ভূমধ্যসাগরে সেন্ট জনের জলদস্যুদের মোকাবিলা করতে থাকেন। আরুজ ও ইলিয়াস লিভেন্টে (আধুনিক সিরিয়া ও লেবানন) এবং খিজির এজিয়ান সাগরে ততপরতা চালাতেন। খাইরুদ্দিনের মূল ঘাটি ছিল থেসালোনিকা। ছোট ভাই ইসহাক গ্রীসেই অবস্থান করতেন। তার কাজ ছিল পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করা।

--

আরুজ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ নাবিক। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লেবাননের ত্রিপোলিতে এক অভিযান শেষে ফেরার পথে সেন্ট জনের জলদস্যুরা তার উপর হামলা করে। আরুজ বন্দী হন। সংঘর্ষে ইলিয়াস নিহত হন। আরুজ তিন বছর বোদরুম দুর্গে বন্দী থাকেন। সংবাদ পেয়ে খাইরুদ্দিন বোদরুম যান এবং আরুজকে পালাতে সাহায্য করেন।
মুক্তি পেয়ে আরুজ তুরস্কের আনাতোলিয়ায় যান। সেখানে উসমানি গভর্নর শাহজাদা কোরকুতের সাথে দেখা করেন। শাহজাদা কোরকুত তার কর্মকান্ডের কথা জেনে তাকে ১৮ টি গ্যালে দেন এবং জলদ্যুসের বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব অর্পন করেন। সে সময় এই জলদস্যুরা উসমানিয়দের বানিজ্যিক জাহাজগুলোর উপর হামলা করে বেশ ক্ষতি করছিল। পরের বছর আরুজকে ২৪ টি জাহাজ দিয়ে ইটালির আপুলিয়াতে এক অভিযানে পাঠানো হয়। এই অভিযানে আরুজ বেশ কয়েকটি দুর্গে গোলা বর্ষণ করেন। জলদস্যুদের দুটি জাহাজ দখল করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আরুজ আরো তিনটি জাহাজ আটক করেন। এসময় তিনি তিউনেসিয়ার জারবা দ্বীপকে নিজের ঘাটি বানান। আরুজ একের পর এক অভিযান চালাতে থাকেন। একবার তিনি পোপের দুটি জাহাজ আটক করেন। তবে আরুজ বিখ্যাত হয়ে উঠেন আন্দালুস তথা স্পেনে অভিযান পরিচালনা করে।

--

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসের ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আন্দালুসের মুসলমানদের অনেকে এসময় সাগর পাড়ি দিয়ে তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় চলে আসেন। যারা পালাতে পারেননি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। এই ধর্মান্তরিতদেরকেই পরে মরিসকো বলে অভিহিত করা হয়। তবে মুসলমানদের অনেকেই বাহ্যিকভাবে ধর্ম পরিবর্তন করে গোপনে নিজের আকিদা

বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন। তারা গোপনে ইবাদতও করতেন। কিন্তু এই সুযোগ বেশিদিন মিললো না। তাদেরকে মুখোমুখি হতে হলো ইনকুইজিশনের। ইনকুইজিশন হলো ক্যাথলিক চার্চের অধিনে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা যাদের কাজ ছিল বিরোধী মত দমন করা। ইতিপূর্বে ইনকুইজিশনের মাধ্যমে ইউরোপে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। আন্দালুসের পতনের পর এখানেও চালু করা হয় ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশনের গোয়েন্দারা শহরের অলিগলিতে ঘুরতে থাকে। কারো ঘরে কুরআনুল কারিম পাওয়া গেলে কিংবা কাউকে ইবাদত করতে দেখলেই তাকে গ্রেফতার করা হত। এমনকি কেউ যদি শুকরের মাংস খেতে অস্বীকার করতো, কিংবা শুক্রবার গোসল করতো তাহলেও তাকে গ্রেফতার করা হত। ইনকুইজিশনের আদালত ছিল ভয়ংকর। সেখানে কারো নামে অভিযোগ উঠলে তার আর রেহাই ছিল না। কোনো না কোনো শাস্তি তাকে পেতেই হত। ইনকুইজিশনের কাছে নির্যাতন করার জন্য অনেক ভয়ংকর যন্ত্রপাতি ছিল। এসবের সাহায্যে নির্যাতন করা হতো কিংবা জীবন্ত কবর দেয়া হত।
ইনকুইজিশন শুরু হলে আন্দালুস হয়ে উঠে মুসলমানদের জন্য নরকতুল্য। এমন নরক, যেখান থেকে পালানোর উপায় নেই।

--

১৫১৪ সালে আরুজ ও খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার জিজেল শহরে অবস্থিত স্প্যানিশদের নৌঘাটিতে হামলা চালান। এই যুদ্ধে স্প্যানিশরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। শহরের নিয়ন্ত্রন আরুজের হাতে চলে আসে। শহরটি সমূদ্রের কূলে অবস্থিত হওয়ার কারনে এর সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আরুজ এই শহরকেই নিজেদের হেড কোয়ার্টার বানা। ইতিমধ্যে রোডস দ্বীপে একটি অভিযান চালানোর সময় আরুজ সেন্ট জনের বাহিনীর হাতে বন্দী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে ইটালি চলে যান। সেখানে ক্রুসেডারদের একটি জাহাজ দখল করে মিসরের পথ ধরেন।

১৫১৮ খিস্টাব্দে আরুজ ও খাইরুদ্দিন তিলিসমান শহরে অবস্থিত স্প্যানিশ বাহিনীর ঘাটিতে হামলা করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের এক ফাকে আরুজকে স্প্যানিশরা ঘিরে ফেলে। তরবারীর আঘাতে তাকে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। আরুজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে তিনি শহীদ হয়ে যান। স্প্যানিশরা আরুজের মাথা কেটে ইউরোপে নিয়ে যায়। তার কাটা মাথা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরানো হয়। আরুজের কাটা মাথা যেদিক দিয়ে যেত সেখানকার গির্জায় ঘন্টা বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হত।

আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানরা খুশি ছিল। তারা ভাবছিল আরুজের মৃত্যুর ফলে মুসলমানদের মনোবল ভেংগে যাবে। অথচ মুসলমানরা ব্যক্তি নির্ভর কোনো জাতী নয়। তাদের কাছে পতাকা উত্তোলন করাটাই মূল কাজ, কে করলো তা বড় নয়। আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, তাদের এই স্বস্তি বাতাসে মিলিয়ে যাবে। শীঘ্রই তাদের মুখোমুখি হতে হবে এমন এক সেনাপতির, যিনি আরুজের চেয়েও দুর্ধর্ষ ও বিচক্ষণ। সামনের দিনগুলিতে যিনি একাই ইউরোপিয়ান বাহিনীর ঘুম কেড়ে নিবেন।
সেই সেনাপতির নাম খাইরুদ্দিন বারবারোসা।
--
আরুজের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব খাইরুদ্দিনের হাতে আসে। তার হাতে রয়েছে ছোট একটি নৌবাহিনী । এছাড়া আলজেরিয়ার বিশাল এলাকা তার দখলে। তিনি চাইলে স্বাধীন শাসক হিসেবে আলজেরিয়ায় নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। আরাম আয়েশে দিন কাটাতেন। স্প্যানিশদের সাথে খাতির করে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করতে পারতেন, যেমনটা করছিল তখন তিউনেসিয়ার হাফসি সুলতানরা।
খাইরুদ্দিন সেপথে গেলেন না। তিনি তো আরাম আয়েশের জীবন চান না। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। প্রায়ই তিনি সংগীদের বলতেন, মৃত্যুই যখন শেষ গন্তব্য তখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বেছে নেয়াই শ্রেয়। খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন আন্দালুসের মুসলমানদের কথা। ইতিপূর্বে তিনি ও তার ভাই বেশকিছু মুসলমানকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখনো অনেকে বন্দী ইনকুইজিশনের কারাগারে। খাইরুদ্দিন তাদেরকেও মুক্ত করতে চান। এদিকে ভূমধ্যসাগরে ঘুরছে ইউরোপিয়ানদের নৌবহর। খাইরুদ্দিন চান তাদের দম্ভ চূর্ণ করতে। কিন্তু খাইরুদ্দিনের ছোট বাহিনী নিয়ে একাজ করা সম্ভব নয়। তারপাশে চাই শক্তিশালী কোনো মিত্র কে।
খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন কে হতে পারে সেই মিত্র। অনেক ভেবে খাইরুদ্দিন ঠিক করলেন, উসমানিয়রাই হতে পারে কাংখিত সেই মিত্র।
--
৩ নভেম্বর ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিনের আদেশে আলজেরিয়ার গন্যমান্য ব্যক্তিত্বরা সুলতান প্রথম সেলিমের কাছে একটি পত্র লিখে। পত্রে তারা আরুজ ও খাইরুদ্দিনের অবদানের কথা উল্লেখ করে। ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়। তারপর সুলতানের কাছে আবেদন জানানো হয় সুলতান যেন আলজেরিয়াকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুলতান প্রথম সেলিম তখন সবেমাত্র মিশর ও সিরিয়া সফর শেষে ফিরেছেন। এই পত্র পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তিনি আলজেরিয়াকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেদিন থেকে সুলতান সেলিমের নামে আলজেরিয়াতে খুতবা পড়া শুরু হয়। সুলতান আলজেরিয়াতে দু হাজার সৈন্য ও একটি তোপখানা প্রেরণ করেন। খাইরুদ্দিনকে সম্মানসূচক বেলারবি পদ দান করা হয়। খাইরুদ্দিন তার ভাইয়ের স্থালি্ভষিক্ত হন এবং ভাইয়ের অসমাপ্ত মিশন সমাপ্ত করার দায়িত্ব পান।
--
খাইরুদ্দিন তো এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি ক্ষমতা চাচ্ছিলেন না। চাচ্ছিলেন সামান্য একটু সাহায্য, যা নিয়ে তিনি ছুটে যাবেন নির্যাতিত মুসলমানদের কাছে। সুলতান প্রথম সেলিমের পর ক্ষমতায় বসেন সুলতান সুলাইমান আল কানুনি। তিনিও পিতার মতো খাইরুদ্দিনকে সাহায্য করতে থাকেন।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার একটি দ্বীপে অবস্থিত স্প্যানিশ দুর্গে হামলা করেন। তিনি ২০ দিন একটানা গোলাবর্ষণ করেন। পরে কেল্লার পতন হয়। স্প্যানিশরা পালিয়ে যায়, অনেকে বন্দি হয়। সে বছরই খাইরুদ্দিন ৩৬ টি জাহাজ নিয়ে স্পেনের উপকূলের বিভিন্ন শহরে যান এবং অনেক মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন। স্পেন তখন রোমানিয়ার শাসক চার্লস পঞ্চমের অধীনে। এভাবে খাইরুদ্দিন বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন।
খাইরুদ্দিন ৭ দফায় ৭০ হাজার বন্দী মুসলমানকে স্পেন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। খাইরুদ্দিনের মূল নাম ছিল খসরুফ।

আন্দালুসিয়ার বাসিন্দারা তাকে উপাধি দেয় খাইরুদ্দিন। পরে এই নামই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এই নামের সাথেই মিশে আছে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য তার অসামান্য কোরবানীর ইতিহাস। ইউরোপিয়রা তাকে নাম দেয় বারবারোসা। ইটালিয় ভাষায় এই শব্দের অর্থ লাল দাড়িওয়ালা।
খাইরুদ্দিন নিয়মিত ভূমধ্যসাগরে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। একের পর এক ইউরোপিয়ান নৌবহরকে তিনি পরাজিত করতে থাকেন। তিনি হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য।
--
১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুলাইমান কানুনি খাইরুদ্দিনকে ইস্তাম্বুলে আমন্ত্রণ করেন। খাইরুদ্দিন ৪৪ টি জাহাজ নিয়ে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হন। পথে যেসব দ্বীপে তিনি যাত্রাবিরতী করছিলেন সবখানেই উতসুক জনতা তাকে এক নজর দেখতে ছুটে আসে। খাইরুদ্দিন ইস্তাম্বুল পৌছলে তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথীর মর্যাদা দেয়া হয়। প্রাসাদের পাশেই একটি মহলে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

উজিরে আযম তখন হালাবে অবস্থান করছিলেন। খাইরুদ্দিনের ইস্তাম্বুল আগমনের সংবাদ পেয়ে তার মন আনচান করে ওঠে। তারও ইচ্ছে হয় এই মর্দে মুজাহিদকে এক নজর দেখার। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারনে তিনি ইস্তাম্বুল ফেরার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তিনি সুলতানের কাছে পত্র লিখে নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। সুলতান সুলাইমান খাইরুদ্দিনকে হালাবে প্রেরণ করেন। একইসাথে উজিরে আজমকে পত্র লিখে বলেন, খাইরুদ্দিনকে সম্বর্ধনা দিতে এবং আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি না করতে।

হালাবে খাইরুদ্দিনকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে তিনি ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন। সুলতান তাকে উসমানি নৌবাহিনীর প্রধান (কাপুদান-ই-দরিয়া) নিযুক্ত করেন। একইসাথে তাকে উত্তর আফ্রিকার বেলারবি (গভর্নর) নিয়োগ দেয়া হয়। সুলতান তাকে রত্নখচিত একটি তরবারী উপহার দেন। খাইরুদ্দিনকে নির্দেশ দেয়া হয় একটি নতুন নৌবাহিনী গঠন করার। তাকে অস্ত্রাগার ও গোল্ডেন হর্নের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। খাইরুদ্দিন দ্রুত কাজ শুরু করেন। এক বছরে ৮৪ টি জাহাজ নির্মান হয়। খাইরুদ্দিন তার বহর নিয়ে ইটালির কয়েকটি দ্বীপে হামলা করেন। কয়েকটি শহর উসমানিদের দখলে আসে।

ঐতিহাসিক হাজি খলিফা লিখেছেন, বারবারোসা ১২ টি দ্বীপ দখল করেন। আরো ১৩টি দ্বীপে হামলা করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। তার অভিযানে মোট ১৬ হাজার লোক বন্দী হয়। মুক্তিপণ হিসেবে পাওয়া যায় চার লাখ স্বর্নমুদ্রা।

--

একের পর এক হামলায় বিপর্যস্ত ইউরোপিয়ানরা সিদ্ধান্ত নেয় এবার তারা খাইরুদ্দিনের উপর চুড়ান্ত হামলা করবে। ভূমধ্যসাগর থেকে মুসলিম নৌবহরকে বিতাড়ন করা হবে। পোপ তৃতীয় জন পল হলি লীগ আহবান করেন। পুরো ইউরোপে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। গঠিত হয় সে সময়ের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনী। এই বহরে ছিল

১। রিপাবলিক অব ভেনিস।

২। ডাচি অব মান্তুয়া

৩। স্প্যানিশ এম্পায়ার

৪। পর্তুগিজ এম্পায়ার

৫। পাপাল স্টেটস

৬। রিপাবলিক অব জেনোয়া

৭। অর্ডার অব সেইন্ট জন

ইউরোপিয়ানদের প্রস্তুতির খবর পৌছে যায় খাইরুদ্দিনের কাছে। তিনিও তার বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকেন। অবশেষে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর দুই বাহিনী গ্রীসের প্রিভেজা এলাকায় মুখোমুখি হয়।

--

২৮ সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
ইউরোপিয়ান বাহিনীর মুখোমুখি উসমানি বাহিনী। আজই ফয়সালা হবে কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ভূমধ্যসাগরের নৌপথ। ইউরোপিয়ানদের বিশাল বাহিনী। যুদ্ধ জাহাজ এসেছে ৩০২ টি। মোট সেনাসংখ্যা ৬০ হাজার। অপরদিকে উসমানি বাহিনীর জাহাজ ১২২ টি। সেনাসংখ্যা মাত্র ১২ হাজার। ইউরোপিয়ান বাহিনীর নেতৃত্বে এন্ডড়িয়া ডোরিয়া। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে খাইরুদ্দিন বারবারোসা। তার সহকারী হিসেবে আছেন সাইয়িদি আলি রইস, বিখ্যাত মিরআতুল মামালিক গ্রন্থের লেখক।
যে কোনো বিশ্লেষণেই এই যুদ্ধ ছিল অসম যুদ্ধ। শক্তির বিচারে দূর্বল উসমানি বাহিনী ইউরোপিয়ান বাহিনীর সামনে বেশিক্ষণ টেকার কথা নয় ।

খাইরুদ্দিন বারবারোসা তার বহরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম তিনটি বহর তিনি বক্রাকারে সাজান। যুদ্ধের শুরুতেই এই তিন বহর বক্রাকারে এগিয়ে যায় ইউরোপিয়ান বাহিনীর দিকে। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া অবাক হয়ে দেখলেন উসমানি বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলতে চাচ্ছে। স্বল্পসংখ্যক উসমানি বাহিনী থেকে এমন দুঃসাহসিক হামলা রীতিমত অবিশ্বাস্য। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া তার বহর নিয়ে সরে যেতে চাইলেও বাতাস স্থির থাকায় তার চেষ্টা সফল হয় না। ইতিমধ্যে খাইরুদ্দিনের বহর থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। ইউরোপিয়ান বাহিনী পাল্টা জবাব দেয় কিন্তু খাইরুদ্দিনের প্রথম আক্রমণ তাদের মনোবলে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্র হয়ে ওঠে কুরুক্ষেত্র। একের পর এক কামান গর্জাচ্ছে, বাতাসে বারুদ ও রক্তের গন্ধ। চারপাশ থেকে আহতদের চিৎকার ও জীবিতদের শ্লোগান ভেসে আসে। যুদ্ধে উসমানি বাহিনী এগিয়ে যায়। বিপুল সেনা থাকা সত্ত্বেও ইউরোপিয়ান বাহিনীর মনোবল ভেংগে যায়। সাত ঘন্টার লড়াই শেষে ইউরোপিয়ান বাহিনী পরাজিত হয়। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া পালিয়ে যায়। যুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের
১৩টি জাহাজ ধবংস হয়। ৩৬ টি জাহাজ উসমানিয়রা দখল করে। ৩০০০ ইউরোপিয়ান সেনা বন্দি হয়। অপরদিকে উসমানিয়দের ৪০০ সেনা নিহত হন, ৮০০ আহত হন। তাদের কোনো জাহাজই হারাতে হয়নি।

এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল অবিশ্বাস্য। শীঘ্রই এই যুদ্ধের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বজুড়ে। মক্কা, মদীনা, আল কুদস, সমরকন্দ, দামেশক, কায়রোর মসজিদগুলোর মিনার হতে উচ্চারিত হতে থাকে আল্লাহু আকবর ধবনী।
এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরে উসমানিয়দের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতেই। এমনকি ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও সিসিলির জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরে চলার জন্য উসমানিয়দের ট্যাক্স দিত।
এই যুদ্ধ জয়ের পেছনে ছিল খাইরুদ্দিন বারবারোসার কুশলী আক্রমন ও সেনা পরিচালনা। ইউরোপের কাছে এই নাম ছিল আতংকের মত।
--
১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিন ইতালির সানরেমো, বোরঘেট্টো সান্টো স্পিরিটো ও সিরাইলিতে আক্রমন করেন। তিনি স্পেন ও ইতালির নৌবহরকে পরাজিত করেন। নেপসলের ভেতরে হামলা চালান। এরপর তিনি ২১০ জাহাজের পুরো বহর নিয়ে জেনোয়ার দিকে রওনা হন। সেখানে তুর্কি এডমিরাল তুরগুত রইসকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। খাইরুদ্দিন হুমকি দেন রইসকে মুক্তি না দিলে তিনি শহরে হামলা চালাবেন। জেনয়ার ফাসোলতে এন্ড্রিয়া ডোরিয়ার প্রাসাদে খাইরুদ্দিনের সাথে বৈঠক হয়। শেষে সিদ্ধান্ত হয় ৩ হাজারের স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রইসকে মুক্তি দেয়া হবে।
এরপর খাইরুদ্দিন এলবো শহরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। এই শহরে অটোমান নৌকমান্ডার সিনান রইসের পুত্র বন্দী ছিলেন। খাইরুদ্দিন হুমকি দেন তাকে মুক্তি দেয়া না হলে তিনি শহরে গোলাবর্ষন করবেন। শহরের প্রশাসক খাইরুদ্দিনের কথায় রাজি না হলে খাইরুদ্দিন তীব্র হামলা চালান। শেষে বারবারোসার তীব্রতার কাছে শহরের প্রশাসক হার মানতে বাধ্য হন। সিনান রইসের পুত্রকে মুক্তি দেয়া হয়।
--
খাইরুদ্দিন বারবারোসার সারাজীবন কেটেছে সমুদ্রে। একের পর এক লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। চাইলেই নির্বিঘ্ন জীবন বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু সে পথে হাটেননি কখনো। উম্মাহর কল্যানসাধনের মাঝেই খুজে পেয়েছিলেন সুখ। পুথিগত বিদ্যায় খাইরুদ্দিন হয়তো বড় কেউ ছিলেন না। কিন্তু তার জীবনটাই হয়ে উঠেছে উত্তরসূরিদের জন্য হাজারো বইয়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু।
-
১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে পুত্র হাসান পাশাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে খাইরুদ্দিন বারবারোসা ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। তিনি মুরাদি সিনানকে তার আত্মজীবনি লেখার জন্য

নির্দেশ দেন। পাচ খন্ডে হস্তলিখিত এই আত্মজীবনি সমাপ্ত হয়। এটি সাধারণত গাজাওয়াত-ই-খাইরুদ্দিন নামে পরিচিত। সম্প্রতি তুর্কি অধ্যাপক ড আহমদ সামগিরশিল কাপ্তান পাসানিন সায়ের দেফতরি (ক্যাপ্টেন পাশার লগবুক) নামে এই আত্মজীবনি প্রকাশ করেছেন।

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসার পতাকার শীর্ষে ছিল সুরা আস সাফের ১৩ নং আয়াত। 'এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।' আয়াতের নিচে ছিল চারটি তারকা। চার তারকার ভেতরে চার খলিফার নাম। চার তারকার মাঝখানে একটি দ্বিফলা তরবারী যা ছিল জুলফিকারের প্রতিক। নিচে একটি ৬ প্রান্তবিশিষ্ট তারকা।

--

এই মহান যোদ্ধা ৪ জুলাই ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন।

তথ্যসূত্র :

১। আদ দাওলাতুল উসমানিয়া-- আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি।
২। খাইরুদ্দিন বারবারোসা-- বাসসাম ইসিলি।
৩। দাওলাতে উসমানিয়া-- ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ।
৪। মুজাকারাতু খাইরুদ্দিন।

রুকনুদ্দিন বাইবার্স

তিনি ছিলেন কঠোর স্বভাবের একজন সুলতান ও সেনাপতি। তিনি আঘাত হানতেন বিদ্যুতগতিতে। শত্রুদের জন্য তার মনে কোনো দয়া বা করুনার স্থান ছিল না। দুইটি মহাদেশ জুড়ে ছুটে বেরিয়েছে তার ঘোড়া। একাই লড়েছেন দুটি পরাশক্তি ক্রুসেডার ও তাতারদের বিরুদ্ধে। তার হাতেই ঘটেছে ক্রুসেডের সমাপ্তি। চূর্ন হয়েছে তাতারদের দম্ভ। সিরিয়ায় এসাসিনদের উপর শেষ মরনকামড় দেয়ার কৃতিত্বও তারই। বাগদাদের পতন পরবর্তী বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সাহসিকতার সাথে। মুসলিম সীমান্তকে করেছেন নিরাপদ। একইসাথে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন সর্বত্র। তার ক্ষিপ্রতা ও চতুরতার কথা মনে করে পশ্চিমা বিশ্ব তাকে নাম দিয়েছে দ্য প্যান্থার। তিনি আর কেউ নন, মহান মামলুক সুলতান আল মালিকুয যাহির আবুল ফুতুহ রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল বান্দুকদারি।

তার সম্পর্কে হ্যারল্ড ল্যাম্বের মূল্যায়নই তাকে বুঝতে যথার্থ। হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন, কোনও রকম পাহারা ছাড়াই ঘোড়ায় চেপে উধাও হয়ে যেতেন, তারপর পরদিন উদয় হতেন প্যালেস্টাইনে-চতুর্থদিনে আরবীয় মরুভূমিতে। দ্রুত এবং দূরে হারিয়ে যাওয়ার সমস্ত গুন তার ছিল। তিনি দামেস্কে দরবারি টেনিস খেলতেন, আবার একই সপ্তাহে আটশো মাইল দূরে কায়রোতেও খেলতেন। গ্যারিসন যখন ভাবতো নীল নদের পাড়ে ভোজে মত্ত তিনি, ঠিক সে সময় আলেপ্পোর ধূসর দুর্গের গেটে গিয়ে হাজির হতেন তিনি। সভাসদদের তার পরিকল্পনার কথা জানাতেন না কখনোই, সকল পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখতেন নিজের মনের ভেতর।

-

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স ছিলেন বিশালদেহী একজন যোদ্ধা। চুলের রং লাল, চেহারা তামাটে। একটি চোখ ছিল নীল, অন্যটিতে ক্ষত। তিনি ছিলেন বাঁহাতি, যুদ্ধের ময়দানে এই হাতেই ঝলসে উঠতো তার ধারালো তরবারী।

সুলতান জন্মেছিলেন ভলগা নদী ও উরাল নদীর মাঝামাঝি অবস্থিত দশথ-ই-কিপচাক বা কুমানিয়া অঞ্চলে (বর্তমানে এটি কাজাখস্থানে অবস্থিত) , ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই। তার জন্মের মাত্র কয়েক বছর আগেই খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যে চেঙ্গিস খানের আক্রমনের মাধ্যমে মুসলিম ভূখন্ডে তাতারদের আগ্রাসন শুরু হয়। সুলতান বাইবার্সের বাল্যকাল সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায়নি। তবে বাল্যকালেই তাঁকে বিরুপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বাইবার্সের ১৪ বছর বয়সে তার জন্মভূমিতে তাতারদের আক্রমনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় গোটা এলাকা। শিশু বাইবার্স বন্দি হন তাদের হাতে । কিছুদিন পর তাঁকে দেখা গেল দামেশকের দাসবাজারে। ৮০০ দিরহামের বিনিময় তাঁকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাএক নিয়ে যাওয়া হয় হামাহর দাসবাজারে। সেখান থেকে তাঁকে কিনে নেন সুলতান আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের একজন সেনাপতি আলাউদ্দিন আইতাকিন বন্দুকদার। আইতাকিন বালক বাইবার্সকে মিশরে নিয়ে আসেন। এখানে মামলুকদের সাথে বেড়ে উঠেন বাইবার্স। সে সময় মামলুকরা বেড়ে উঠতো নিবিড় পরিচর্যার মধ্য দিয়ে। বাইবার্সও এর ব্যতিক্রম নন। পড়াশোনা ও যুদ্ধে তিনি নৈপুন্যের পরিচয় দেন। শীঘ্রই তিনি সুলতান আল মালিকুস সালেহের দৃষ্টি কেড়ে নেন। তাঁকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়। ধীরে ধীরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠ হন।

বাইবার্সকে প্রথম শক্তিশালি ভূমিকায় দেখা যায় ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে। সে সময় তিনি নাজমুদ্দিন আইয়ুবের সাথে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। তবে বাইবার্স বিখ্যাত হয়ে উঠেন ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে সংঘঠিত মানসুরার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে। এই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের মুখোমুখি হয় মামলুক বাহিনী। ক্রুসেডারদের পক্ষে ছিলেন নবম লুইস, রবার্ট ডি আউতুইস্ট প্রমুখ। মামলুক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স। তার নেতৃত্বে ছিল দশ হাজার সেনা। অপরদিকে ক্রুসেডারদের বাহিনীতে ছিল ২৫০০০ সেনা। যাদের মধ্যে প্রায় তিনশো নাইট ছিল। মানসুরার যুদ্ধের কিছুদিন আগে ক্রুসেডাররা দিময়াত শহর আক্রমন করে দখল করে। এটি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বৃহত বন্দরনগরি। শহরের পতনের সংবাদ শুনে সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি বুঝতে পারেন ক্রুসেডাররা এবার নীলনদ অতিক্রম করে কায়রোর দিকে এগিয়ে আসবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কায়রোর কাছাকাছি আসার আগেই ক্রুসেডারদের আটকাতে হবে।

এর জন্য তিনি মানসুরাকে বেছে নিলনে। এটি ছিল নীলনদের পাড়ে অবস্থিত। নাজমুদ্দিন আইয়ুব তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি আদেশ দেন তাকেও সেনাবাহিনির সাথে মানসুরা নিয়ে যাওয়া হোক। যুদ্ধের মূল দায়িত্ব ছিল বাইবার্সের কাঁধে। তিনি নানা পরিকল্পনা সাজাতে থাকেন। একইসাথে নাজমুদ্দিন আইয়ুবকে মানসুরায় নিয়ে আসা হয়। ১৫ শাবান, ৬৪৭ হিজরিতে এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তার স্ত্রী শাজারাতুদ দূর একটি অসামান্য পরিকল্পনা গ্রহন করেন। তিনি রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহনে অটল থাকতে নির্দেশ দেন এবং সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। তবে শীঘ্রই সুলতানের মৃত্যুসংবাদ জানাজানি হয়ে যায়। এতে মামলুকদের মনোবল কিছুটা হ্রাস পায়।

এরইমধ্যে ৮ ফেব্রুয়ারী ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের মুখোমুখি হল মুসলিম বাহিনী। বাইবার্সের তীব্র আক্রমনে ক্রুসেডারদের রক্ষনব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। টানা চারদিন ধরে চলা এই লড়াইয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর এক বড় অংশ নিহত হয়। এমনকি নিহত হয় তাদের সেনাপতি রবার্ট। ক্রুসেডাররা সাময়িক পিছু হটে। তবে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য নদীপথে ক্রুসেডারদের আরেকটি বাহিনী এগিয়ে আসে।

৬ এপ্রিল ফারিসকু নামক স্থানে আবারও ক্রুসেডারদের মুখমুখি হয় মুসলিম বাহিনী। এখানে হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রায় ৫ হাজার ক্রুসেডার নিহত হয়। বন্দি হয় নবম লুইস। তার হাত পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয় মুসলিম শিবিরে। পরাক্রমশলী ক্রুসেডার নবম লুইস হাতকড়া পরা অবস্থায় আটকে রইলেন মামলুক শিবিরে। তার মুক্তির জন্য দেয়া হলো, কঠোর শর্ত। শর্তগুলো ছিল

১। আট লক্ষ স্বর্নমুদ্রা দিতে হবে। অর্ধেক নগদ, অর্ধেক বাকি।
২। অবশিষ্ট স্বর্নমুদ্রা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বন্দি ক্রুসেডারদের মুক্তি দেয়া হবে না।
৩। মুসলিম বন্দিদের ছেড়ে দিতে হবে।
৪। দিময়াত শহর মুসলমানদের হাতে সমর্পন করতে হবে।
৫। দুই দলের মাঝে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি হবে।

নবম লুইস অনেক কষ্টে ৪ লক্ষ স্বর্নমুদ্রা জমা দেন। তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিময়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের অভাবনীয় বিজয় হয়। ক্রুসেডারদের দর্প চূর্ন হয়। এর নায়ক ছিলেন সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন হয়। তারা এগিয়ে আসে সিরিয়ার দিকে। হালাকু খানের পত্র আসে মিসরের শাসক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুযের কাছে। আহবান করা হয় পরামর্শসভা। সবাই ছিলেন আতংকিত। কারণ তাতাররা অপরাজেয়। তাদের কেউ পরাজিত করতে পারেনি। কারো সাহস ছিল না দৃঢ় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার। সবাই চাচ্ছিলেন তাতারদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পন করতে। কিন্তু সাইফুদ্দিন কুতুযের ইচ্ছা ছিল তিনি তাতারদের সাথে লড়বেন। তাকে সমর্থন জানান সভায় উপস্থিত সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। বাইবার্সের পরামর্শে তাতারদের দূতদের মাথা কেটে লটকে রাখা হলো শহরের ফটকে। ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো তাতার শিবিরে। মামলুক শিবিরেও শুরু হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর আইন জালুত প্রান্তরে তাতারদের মুখোমুখি হল মামলুক বাহিনী। মামলুকদের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ও সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। রুকনুদ্দিন বাইবার্স যুদ্ধের ময়দানে এসেছিলেন তার আবিষ্কৃত হাত কামান নিয়ে যার নাম মিদফা। এটি ছিল তাতারদের অজেয় ধনুকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী অস্ত্র। তাতাররা যুদ্ধে ব্যবহার করতো বিশ ফুট লম্বা ধনুক। তা থেকে নিক্ষেপ করত গান পাউডার মাখানো তীর। এটি ছিল শত্রুদের কাছে প্রচন্ড আতংকের এক অস্ত্র।

আইন জালুতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শুরুর দিকে তাতাররা এগিয়ে ছিল। কিন্তু দ্রুত ময়দানে নেমে আসেন সাইফুদ্দিন কুতুয। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনী উজ্জিবীত হয়ে উঠে। মামলুকদের জয় নিশ্চিত হয়। সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স সাড়ে চারশো কিলোমিটার পথ ধাওয়া করে প্রায় সকল তাতার সেনাকে হত্যা করে ফেলেন। এর ফলে তাতারদের মধ্যে প্রচন্ড আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে কখনো তারা এমন শক্ত সেনাপতির মুখোমুখি হয়নি।

আইন জালুত যুদ্ধের পর সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ফিরছিলেন মিসরে। পথে রুকনুদ্দিন বাইবার্স তাকে হত্যা করেন। হত্যার পেছনে মূল কারণ ছিল সাইফুদ্দিন কুতুযের সাথে তার পুরনো শত্রুতার জের ও আলেপ্পোর শাসক হতে না পারার ক্ষোভ। ইসলামের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা সেনানায়কদের একজন হওয়া সত্ত্বেও বাইবার্সের এই কর্মকান্ড তার চরিতে কালিমা লেপন করেছে। তার এই কর্মের মাধ্যমে মামলুকদের মধ্যে শুরু হয় নতুন এক ধারা। আর তা হলো ক্ষমতা দখলের জন্য হত্যা করা।

২৪ অক্টোবর ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে বাইবার্স সালিহিয়া শহরে এসে পৌছেন। এখানে এসে তিনি নিজেকে সুলতান ঘোষনা দেন। উপাধি নেন আল মালিকুয যাহির। এরপর কায়রো পৌঁছে তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেন। বাইবার্স ক্ষমতায় থিতু হতে না হতেই আসে যুদ্ধের ডাক। আইন জালুতের পরাজয়ের অপমানের কথা ভুলতে পারছিল না হালাকু খান।

আইন জালুতের চরম প্রতিশোধ নিতে হালাকু খান আবার ধেয়ে আসে মিসর-সিরিয়া পানে। ফোরাত নদী অতিক্রম করে তার বাহিনী আছড়ে পড়ে মামলুক সীমান্তের অভ্যন্তরে। চোখের পলকে হিমস পর্যন্ত শামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হালাকু খান ফের কব্জা করে নেয়। শুনে দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

১২৬২ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে হিমসের ময়দানে হালাকু খানের বাহিনীর মুখোমুখি হল রুকনুদ্দিন বাইবার্সের মামলুক বাহিনী। দুদিকে ইতিহাসের সেরা দুই জেনারেল। প্রচন্ড যুদ্ধ হলো হিমসের প্রান্তরে। আচমকা মামলুকরা পালানোর ভান করে। উল্লসিত তাতাররা তাদের ধাওয়া করে। তাদের চমকে দিয়ে মামলুকরা ঘুরে পালটা আঘাত হানে। অপ্রস্তুত তাতাররা কাতারে কাতারে মরতে থাকে। মামলুকরা হ্যান্ড কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা তাতারদের উপর মরনকামড় বসায়। হালাকু খান নিজে বারবার নেতৃত্ব দিয়েও সুবিধা করতে পারছিল না। এই প্রথম সে উপলব্ধি করলো, আইন জালুত ময়দানে মুসলিমদের জয় কোনো কাকতালিয় ঘটনা ছিল না। বরং এই প্রথম তারা মুখোমুখি হয়েছে এমন এক শত্রুর যা এতদিনের পরিচিত মুসলিমদের চেয়ে ভিন্ন। মামলুকরা যুদ্ধ কৌশলে অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে, সাহসিকতায়ও তারা অনন্য। সবচেয়ে বড় কথা তাদের মনে তাতারদের প্রতি কোনো ভয়ই নেই। এই যুদ্ধে স্বয়ং হালাকু খান পরাজিত হন এবং পিছু হটেন। মুসলিমদের মন থেকেও তাতার আতংক মুছে যায়।

১২৬২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বাইবার্স পুনরায় আব্বাসি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল আব্বাস আহমদ নামে আব্বাসিদের একজন বংশধরকে তিনি মিসরে নিয়ে আসেন। ২২ নভেম্বর ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে তাকে খলিফা নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে মিসরে আব্বাসি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়। উসমানি সুলতান সেলিমের হাতে পতনের আগ পর্যন্ত এই খিলাফাহ টিকে ছিল। তবে বলে রাখা ভাল, এটি সত্যিকারের কোনো খিলাফাহ ছিল না। এটি ছিল প্রতিকি খিলাফাহ। মূল ক্ষমতা থাকতো মামলুক সুলতানদের হাতেই। এমনকি তারাই খলিফাকে নিয়োগ দিতেন এবং ইচ্ছে হলে অপসারণ করতেন। একজন যোদ্ধা ও সেনাপতি হিসেবে বাইবার্স ছিলেন

অনন্য। এর পাশাপাশি তিনি সামাজিক সংস্কারের নানা কাজও করেছেন। ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে তিনি জাহিরিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসার ছিল সুবিশাল কুতুবখানা। এখানে এতিমদের পড়াশোনা করার ব্যবস্থা ছিল। ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামেশকেও জাহিরিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা এখনো টিকে আছে। ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে জামি জাহির বাইবার্স নামে এক সুবিশাল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাতাররা পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারছিল না। ১২৭৩ খৃস্টাব্দে বীরা নামক স্থানে বাইবার্স আবার তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। একপর্যায়ে তারা এশিয়া মাইনরের রোম্যান সালজুক সালতানাতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ১২৭৭ সালে মামলুকদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এলবিস্তান নামক স্থানে সংগঠিত এই যুদ্ধে সুলতান বাইবার্স শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন মঙ্গোল বাহিনী ও মিত্র সালজুক বাহিনীকে।

বাইবার্সের শত্রু শুধু তাতাররাই নয়। বরং ক্রুসেডাররাও। ইতিপূর্বে মানসুরার যুদ্ধে তিনি একবার ক্রুসেডারদের শায়েস্তা করেছিলেন। ক্রুসেডাররা সেই অপমান ভুলতে পারেনি। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, এজন্য আইন জালুতের যুদ্ধেও তারা তাতারদের সাহায্য করেছিল। এন্টিয়কের রাজা ষষ্ঠ বহিমন্ডের সাথে তাতারাদের সুসম্পর্ক ছিল। বাইবার্স সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রুর শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। তিনি নজর দিলেন এন্টিয়কের দিকে।

এন্টিয়ক ছিল এশিয়ায় খৃস্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি । সুলতান বাইবার্স এন্টিয়ক অবরোধের জন্য একটি বাহিনী প্রেরন করেন এবং দীর্ঘদিন তা অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে আর্মেনীয় রাজা হিথম তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে সুলতান বাইবার্স অবরোধ তুলে নেন। এরপর ১২৬৩ সালে তিনি ক্রুসেডারদের অন্যতম শক্ত দুর্গ আক্কা অবরোধ করেন। এরপর তিনি একে একে ক্রুসেডারদের সকল দুর্গগুলো গুঁড়িয়ে দিতে থাকেন। তার হাতে পতন হয় নাজারেথ ও আরসুফ দুর্গ। এরপর তিনি দখল করেন ছেতিউ পেলিরিন। ক্রুসেডারদের কাছে এই দুর্গের প্ররিচিতি ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ নামে। ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাইবার্স আতলিত অবরোধ করেন। কাঠের নির্মিত কামান থেকে দুর্গের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হতে থাকে। আগুন ধরে যায় দুর্গের প্রাচীরে। এক সময় শহরের পতন ঘটে। বাইবার্সের আদেশে হত্যা করা হয় শহরের চার হাজার অধিবাসীকে। ১২৬৫ সালে ক্রুসেডারদের দখলে থাকা জেরুজালেমের নিকটবর্তী কাইসারিয়া ও হাইফা শহরদুটি জয় করেন। বিনা যুদ্ধে জাফাও দখলে নেন। এরপর ৪০ দিনের অবরোধ শেষে আরসুফও দখল করে নেন। ১২৬৬ সালে সাফেদ ও রামলা শহর দুটিও ক্রুসেডারদের দখলমুক্ত

করে ফেলেন। এভাবে একের পর রাজ্য হারিয়ে ক্রুসেডাররা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে কোন কোন ক্রুসেড রাজ্য তাদের দখলে থাকা কিছু ভখন্ড স্বেচ্ছায় সুলতান বাইবার্সকে উপহার দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

এবার সুলতান তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ক্ষুদ্র আর্মেনীয় সম্রাজ্যের প্রতি। তিনি প্রথমে আর্মেনীয় রাজা হিথমকে আনুগত্য প্রদর্শন ও কর প্রদান করতে বলেন। কিন্তু মঙ্গোলদের চাপে সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সুলতান বাইবার্স আমির সাইফুদ্দিন কালাউনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরন করেন তাকে শায়েস্তা করতে। ১২৬৬ সালে সংগঠিত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে মামলুকদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় আর্মেনীয় বাহিনী। সিস ও আয়াস নামক দু'টি দূর্গ দখল করে মামলুক সৈন্যরা পাইকারি হারে তাদের হত্যা ও বন্দি করে এবং আর্মেনীয় সম্রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসাযজ্ঞ চালায়। এরপর ধীরে ধীরে এ সম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ১২৬৮ সালে সুলতান বাইবার্স এশিয়ায় খ্রিস্টানদের দোলনা ও দুর্ভেদ্য ঘাটি খ্যাত এন্টিয়ক জয় করেন। এ সময় ১৬ হাজার ক্রুসেডারকে হত্যা এবং বন্দি করা হয় আরও ১ লাখ ক্রুসেডারকে । এন্টিয়োকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের ছোটখাটো ক্রুসেড রাজ্যগুলিও ভেঙ্গে পড়ে। নিজেদের শহর হাতছাড়া হতে দেখে মরিয়া হয়ে উঠে ক্রুসেডাররা। তারা নতুন করে ক্রুসেড ঘোষণা করে। এই ক্রুসেডের আহবান এসেছিল এন্টিয়কের রাজা চতুর্থ বোহেম্নডের কাছ থেকে। সিদ্ধান্ত হয় এই ক্রুসেডে তাতারদেরও সাহায্য নেয়া হবে। সম্মিলিত বাহিনী একসাথে তিনদিক থেকে মামলুক সাম্রাজ্যে আক্রমণ করবে। ফ্রেঞ্চ সম্রাট নবম লুই তার বাহিনীণ নিয়ে তিউনিস দিয়ে প্রবেশ করবে এবং হামলা চালাবে। ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের ক্রুসেডাররা হামলা চালাবে মামলুক সাম্রাজ্যের এশিয় অংশে, লেভান্টে। তাতার নেতা আবাগা খান তার বাহিনী নিয়ে হামলা করবে হালাব ও দামেশককে। তিনদিকে একসাথে আক্রমনের ফলে বাইবার্স দিশেহারা হয়ে উঠবেন। এটি ছিল ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে মরনকামড়।

১২৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ক্রুসেডারদের নৌবহর এসে উপস্থিত হল প্রাচীন নগরী কার্থেজ এর উপকুলে। এই এলাকা তখন ছিল বনু হাফসের শাসকদের দখলে। কিন্তু মুসলমান হলেও তারা ছিল ক্রুসেডারদের মিত্র। ক্রুসেডাররা সামনে এগিয়ে যেত কিন্তু সাগর পাড়ি দিয়ে এসে তাদের বেশিরভাগ সেনা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সম্রাট নবম লুই এর ছেলে জন ত্রিস্তান মারা যায়। কিছুদিন পর সম্রাট নিজেও পেটের ব্যাথায় ভুগে মারা যায়। পুরো বাহিনীতে হতাশা দেখা যায়। ক্রুসেডাররা ফেরত যায়। তাদের অবস্থা দেখে অন্য দুই বাহিনী আর মাঠেই নামেনি। এভাবে কোনো লড়াই ছাড়াই থেমে যায় অষ্টম ক্রুসেড।

কিন্তু পরের বছর আবার বেজে উঠে ক্রুসেডের ডংকা। সুলতান বাইবার্স তখন ত্রিপোলি অবরোধ করে আছেন। এ সময় ক্রুসেডারদের রনতরী এগিয়ে আসে লড়াই করতে। মামলুকরাও অগ্রসর হয় তাদের নৌবাহিনী নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই মামলুকরা পরাজিত হয়। সংবাদ পেয়ে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসলেন সুলতান বাইবার্স। হামলে পড়লেন ক্রুসেডারদের উপর। একের পর এক আক্রমনে পরাজিত করেন তাদের। ১২৭২ সালের মে মাসে ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পন করে। কাইসারিয়াতে দুইদলের প্রতিনিধিরা বসে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

আর এভাবেই সুলতান বাইবারসের মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে স্থায়িভাবে ক্রুসেডাররা বিতাড়িত হয়, মুসলিম উম্মাহ ফিরে পায় তার হারানো গৌরব। ক্রুসেডের ইতিহাসে সুলতান বাইবার্সই সব থেকে বেশি ক্রুসেডার হত্যাকারী ও তাদের শহর ও দুর্গ ধ্বংসকারী ব্যক্তি। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধই মূলত তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। ইসলামকে রক্ষার জন্য মোঙ্গল ও ধর্মযুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় সালাহ উদ্দিন উপাধি লাভ করেন।

বাইবার্সের তৃতীয় শত্রু ছিল এসাসিনরা। এসাসিনদের উত্থান সেলজুকি শাসনামলে, যখন সুলতান মালিক শাহ সেলজুকি ক্ষমতায় ছিলেন। পারস্যে হাসান বিন সাব্বাহ নামে এক শিয়া এই দল প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও তারা ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের কথা বলতো, কিন্তু তারা পরিচিত ছিল গুপ্তঘাতক হিসেবেই। এটিই ছিল তাদের পেশা। তাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হন। ক্রুসেড শুরু হলে ক্রুসেডাররা তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে। এ সময় এসাসিনরা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উপরও দুবার আক্রমণ করেন। এসাসিনদের দুটি শক্তিশালী ঘাটি ছিল ইরানে ও সিরিয়ার। ইরানের আলামুত দুর্গ ছিল তাদের হেডকোয়ার্টার। বাগদাদ আক্রমনের পূর্বে হালাকু খান এই দুর্গে আক্রমণ করে। এসাসিনদের পরাজিত করে তাদের শাইখুল জাবাল রুকনুদ্দিন খোরশাহকে বন্দি করে কারাকোরাম নিয়ে যায়। এর ফলে ইরানে এসাসিনদের উতপাত চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সিরিয়ায় তাদের ছিল নিরাপদ দুর্গ। সেখান থেকে তারা নিরাপদে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেত।

১২৭০ খ্রিস্টাব্দে বাইবার্স নজর দিলেন সিরিয়ার এসাসিন দুর্গের দিকে। পরের তিন বছর একের পর এক আক্রমনে কাপিয়ে তুললেন এসাসিনদের সাম্রাজ্য। ১২৭৩ সালের মধ্যে বাইবার্স তাদের ৯টি দূর্গই দখল করে উক্ত অঞ্চলসমূহকে তার সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই আক্রমণে গুপ্তঘাতকদের ক্ষমতা চিরতরে

খর্ব করেন তিনি। এইভাবে যবনিকাপাত হয় ত্রাস ও ষরযন্ত্রে ভরা দীর্ঘ এক শাসনকালের। ১২৭৬ খৃস্টাব্দে বাইবার্স নুবিয়া অধিকার করেন এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাও তাঁর করদরাজ্যে পরিণত হয়।

১২৭৭ সালে বাইবার্স এগিয়ে গেলেন আনাতোলিয়ার দিকে। উদ্দেশ্য তাতারদের থেকে সালজুক রোম কেড়ে নিবেন। আলবিস্তানের উত্তরে অবস্থিত কাইসারিয়া শহরে আরো একবার মুখোমুখি হল তাতার-মামলুক বাহিনী। এখানে সংঘঠিত ভয়াবহ যুদ্ধে তাতারদের বেশিরভাগ নেতা নিহত হয়। ক্রুদ্ধ মামলুকরা তাতারদের কেটে টুকরো টুকরো করতে থাকে। ২৩ এপ্রিল ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বাইবার্স বিজয়ীর বেশে কাইসারিয়া শহরে প্রবেশ করেন। এই শহরে দীর্ঘদিন মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্যে ধর্মপালন নিষিদ্ধ ছিল। সুলতান বাইবার্স এসব আদেশ রহিত করেন।

-

১২৭৭ সাল।

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স অবস্থান করছিলেন দামেশকে। দামেশক হলো সেই শহর, যেখানে শাসন করেছেন সুলতান নুরুদ্দিন জেংগির মত মহান শাসক। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দারুল হাদিস নুরিয়া। বাইবার্সও দামেশককে সাজিয়েছিলেন নিজের মনমত করে। এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নানা প্রতিষ্ঠান।

এই শহরে অবস্থান করছিলেন বাইবার্স। একের পর এক যুদ্ধে তিনি ছিলেন কিছুটা ক্লান্ত। তার বিশ্রাম দরকার ছিল। কিন্তু কেহানে অবস্থানকালে ১২৭৭ সালের ১ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন। ধারণা করা হয় তার পানিয়তে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৫৪ বছর। তিনি ১৭ বছর ধরে মামলুক সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। মুসলিম ভূমিকে রক্ষা করেছিলেন ক্রুসেডার, তাতার ও এসাসিনদের করাল থাবা থেকে।

তিনি ছিলেন অসামান্য সাহসিকতার অধিকারি। ইবনে তাগরি বারদি ও মাকরেজি রহিমাহুল্লাহ দুজনেই তার প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন অল্পকজন সাহসী মানুষের অন্যতম যাকে শত্রু কখনো আতংকিত করতে পারেনি। ক্রুসেডারদের সেরা বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি লড়ে গেছেন কিন্তু বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি।

তিনি ছিলেন দয়ালু ও মানবিক এক শাসক। মাকরেজি লিখেছেন, রমজানের প্রতিরাতে তিনি ৫ হাজার মানুষকে খাবার খাওয়াতেন। প্রতিবছর দরিদ্র ও দুস্থদেরকে দশ হাজার ইরদাব দান করতেন।

বাইবার্সকে তুলনা করা চলে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সাথে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে উনেক সময় তিনি ছিলেন আইয়ুবির চেয়েও সফল। এর কারণ হলো তিনি নেতৃত্ব দিতেন মামলুকদের মত প্রশিক্ষিত দুর্ধর্ষ একটি বাহিনীর। অপরদিকে সুলতান আইয়ুবী মাঝারি মানের একটি বাহিনী নিয়ে দিনের পর দিন লড়ে গেছেন ক্রুসেডারদের সেরা বাহিনীর বিরুদ্ধে। সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের ময়দানেও শরয়ী বিষয় মাথায় রেখে লড়তেন। ফলে শত্রু সন্ধি করতে চাইলে তাতেই তিনি সায় দিতেন। ইসলামের যুদ্ধনীতি শতভাগ মেনে চলতেন। অপরদিকে বাইবার্স চাইতেন শত্রুদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে দিতে। তিনি যখন আঘাত করতেন তখন ভয়াবহ আক্রমণ করতেন। শত্রুকে নিকেশ না করে থামতেন না। অনেক সময় তিনি সন্ধির প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিতেন। ফলে শত্রুরাও তাকে প্রচন্ড ভয় পেত।

সুলতান সুলেমান

তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তিনি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ৪৬ বছর। এই সময়ের মধ্যে ১০ বছরই কেটেছে বিভিন্ন যুদ্ধে। তিনি স্বশরীরে অংশ নিয়েছেন ১৩ টি যুদ্ধে, অতিক্রম করেছিলেন ৪৮ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব, যেখানে পৃথিবীর পরিধিই মাত্র ৪০ হাজার কিলোমিটার। তিনি ছিলেন সর্বকালের সেরা সম্রাটদের একজন। তাঁর পিতা যে সাম্রাজ্য রেখে যান তাঁর পরিধি ছিল ৬৫ লক্ষ সাতান্ন হাজার কিলোমিটার। তিনি এই সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৩ হাজার কিলোমিটারে।
তিনি দশম অটোমান সুলতান সোলাইমান আল কানুনি। সাধারণত তিনি সুলতান সুলেমান নামেই পরিচিত। পাশ্চাত্য তাকে নাম দিয়েছে সোলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট। সুলতান সুলেমানের জন্ম ৬ নভেম্বর ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে, কৃষ্ণ সাগর বরাবর ট্রেবিজোন্ড শহরে। তাঁর পিতা সুলতান প্রথম সেলিম, যিনি মিসরে মামলুক সাম্রাজ্যের পতন ঘটয়ে মিসরকে অটোমান সাম্রজায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। মা আস্যাহ হাফসা সুলতানা ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান।
সুলেমান বেড়ে উঠেছিলেন আর দশজন তুর্কি শাহজাদার মতই। ৭ বছর বয়সে তাকে তোপকাপি প্রাসাদের স্কুলে পাঠানো হয়। এখানে তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও সামরিক কৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১৫ বছর বয়সে দাদা সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ তাকে কারাহিসার শহরের গভর্নর (সানজাক বে) নিয়োগ দেন। কিন্তু চাচা শাহজাদা আহমদের বিরোধিতার কারণে তাঁর এই নিয়োগ বাতিল করে তাকে ক্রিমিয়ার থিউডসিয়াতে পাঠানো হয়। এখানে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন।

১৫২০ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর কোর্লুতে সেনাশিবিরের সুলতান প্রথম সেলিম ইন্তেকাল করেন। শাহজাদা সোলাইমান তখন ম্যাগনিসায় অবস্থান করছিলেন। উজিরে আজম পিরি পাশা সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে শাহাজাদার কাছে পত্র লিখে দ্রতু তাকে রাজধানীতে ফেরার আদেশ দেন। পিরি পাশার আশা ছিল তিনি ৭ দিন সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখতে পারবেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল সুলতানের মৃত্যুসংবাদ জেনে গেলে জেনিসারিরা বিদ্রোহ করে

বসবে, যাদের দমন করা তরুণ শাহজাদার জন্য কঠিন হবে। পিরি পাশার কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও ৫ দিন পর সুলতানের মৃত্যুসংবাদ জানাজানি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে পিরি পাশা স্বীকার করেন সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। তবে জেনিসারিরা কোনো গোলযোগ পাকায়নি। তারা শোক প্রকাশ করছিল বুক চাপড়ে। ৩০ সেপ্টেম্বর সোলেমান বসফরাস প্রণালীর এশীয় উপকূল উস্কুদারে এসে পৌছেন। এখানে উজিরে আজম পিরি পাশা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরদিন ভোরে আলেম-উলামা ও গন্যমান্য ব্যক্তিরা দিওয়ান তথা কাউন্সিল কক্ষে সোলেমানকে স্বাগত জানান। সোলেমানের আর কোনো ভাই জীবিত ছিল না। ফলে শাসনক্ষমতার জন্য তাকে বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। শাইখুল ইসলাম তাঁর হাত ধরে তাকে একটি মঞ্চে নিয়ে আসেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, মহান আল্লাহ তাকে উসমান বংশের সুলতান হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তারপর তিনি সুলতানের কোমরে ঐতিহ্যবাহী তরবারী বেধে দেন। এ সময় সুলেমানের বয়স ছিল ২৬ বছর। এর কয়েকদিন পর ভেনিসীয় দূত বার্টলমিউ কন্টারিনি সুলতানের সাথে দেখা করেন। তাঁর বর্ননামতে, সুলতানের দেহ ছিল লম্বা ও সরু। মুখের গড়ন ছিপছিপে। ভ্রু ছিল ঘন। তাকে দেখতে বন্ধুবতসল্মনে হত।

-

দিনের শুরু দেখে অনেকসময় বোঝা যায় দিনের শেষটি কেমন হবে ।

সুলতান সুলেমান সিং হাসনে আরোহনের কয়েকদিন পর সভাসদদের নিয়ে বসলেন। হলঘরের মাঝামাঝি একটি বড় মানচিত্র বিছানো ছিল।

‘আপনাদের কি ধারণা আছে এই মানচিত্র এখানে এনেছি কেন?’ সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

সভাসদরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারা নীরব থাকে।

‘এই মানচিত্র দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চাই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? আমাদের সাম্রাজ্য শুধু বলকানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বেলগ্রেড, রোম, বুদাপেস্ট ও ভিয়েনায় আমাদের তরবারি ঝলসে উঠবে। আমাদের আঘাতে পরাস্ত হবে ইউরোপিয়ানরা। আমরা পাড়ি দেবো কাস্পিয়ান সাগর। আমরা পাড়ি দিব ভূমধ্যসাগর। রোমান সম্রাট চার্লস, ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস, হেনরি ট্রোডরকে আমরা শায়েস্তা করবো। ভূমধ্যসাগর থাকবে আমাদের দখলে। আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ পাল তুলবে না, কোনো জাহাজ নোঙ্গর ফেলবে না’ হলঘরে গমগম করে উঠে সুলতানের কন্ঠ।

-

সুলতান সুলেমান তাঁর ক্ষমতা আরোহনের শুরুতেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সভাসদদের স্পষ্টকন্ঠে তা জানিয়েছেনও। তাঁর সামনে দ্রুতই

রাজ্যজয়ের সুযোগ এসে যায় যখন হাঙ্গেরিয়াতে রাজস্ব সংগ্রহে নিয়োজিত অটোমান কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যা সুলতান সুলেমানকে রাগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হাংগেরিতে অভিযান চালাবেন। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের পুরো শীতকাল কনস্টান্টিনোপলে চলছিল যুদ্ধের মহড়া। সেনাবাহিনীর জন্য রসদ ও ঘোড়া সংগ্রহ করা হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর যাত্রাপথে নির্মাণ করা হয় সড়ক ও সেতু। সুলতানের ইচ্ছে ছিল দানিয়ুবের প্রবেশদ্বার বেলগ্রেড। বেলগ্রেড দুর্গের পতন ঘটলে অটোমান সেনাদের জন্য ভিয়েনা ও ভিজা উপত্যকা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

১৫২১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী অটোমান বাহিনী কনস্টান্টিনোপল থেকে যাত্রা শুরু করে। এটি ছিল সুলতান সুলেমানের প্রথম অভিযান। অটোমান সেনারা যাত্রাকালে কঠোর শৃংখলা মেনে চলে। তারা সকল থেকে দুপুর পথ চলতো। দুপুরে তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম। আবার পরদিন সকালে যাত্রা। অটোমান বাহিনী সাভা ও দানিয়ুবের মোহনায় পৌঁছে যায়। এখানে এসে সুলতানের আদেশে একটি দ্বীপে কামান বসানো হয়। সিদ্ধান্ত হয় এই দ্বীপ থেকেই বেলগ্রেড দুর্গে গোলা নিক্ষেপ করা হবে। টানা তিন সপ্তাহ অটোমানরা গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু কোনো ফলাফল এলো না। বেলগ্রেড দুর্গে ছিল মাত্র সাতশো সৈন্য। তাদের সহায়তায় কেউ এগিয়ে আসেনি। কিন্তু দুর্গ ছিল মজবুত ফলে তারা টিকে যাচ্ছিল। সুলতানের একরোখা মনোভাবের ফলে টানা গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। দুর্গ প্রাচীরের নিচে বসানো হয় মাইন। অবশেষে দুর্গবাসী আত্মসমর্পন করে। বেলে্গ্রড দুর্গের অধিপতি এসে সুলতানের হাত চুম্বন করেন। তাকে সম্মানসূচক একটি আলখেল্লা পরিয়ে দেয়া হয়। সুলতানের আদেশে সেনারা শোকরানা সালাত আদায় করে। বেলগ্রেড দুর্গের ভেতর তিনবার বেজে উঠে জেনিসারি রণসংগীত। সুলতান নিজেও দুর্গে প্রবেশ করেন। একটি গির্জায় তিনি জুমার সালাত আদায় করেন। বালি আগাকে বেলগ্রেডের নতুন গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়। আবার শুরু হয় অটোমানদের বিজয়রথ। তারা সাবাক, সেমলিন ও সামানদিরা শহর জয় করে। কেটে ফেলা হয় উপকূলের বনভূমি। উন্মুক্ত হয়ে যায় মধ্য ইউরোপগামী পথ।

অটোমানদের বিজয়কাহিনী পৌঁছে যায় ইউরোপের সর্বত্র। ভেনিস ও রাশিয়ার দূতরা সুলতানকে অভিনন্দন জানান। সে সময় তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েও আতংকিত ছিল। ভেনিসে নিযুক্ত অটোমান দূতকে পাচশো স্বর্নমুদ্রা উপহার দেয়া হয়। সুলতান ফিরে আসেন কনস্টান্টিনোপলে। আইউব মসজিদে তিনি শোকরানা সালাত আদায় করেন। রাস্তার দুপাশে সারীবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছিল জনতা।

সুলতানকে এক নজর দেখার জন্য তারা ছিল উৎসুক। সুলতান জয়ের আনন্দে সবার জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেন।

হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়া জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু সুলতান তখনই সেদিকে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। কারণ, তাকে বারবার বিরক্ত করছিল রোডস দ্বীপে অবস্থানরত হসপিটালার নাইটরা। তাদেরকে শায়েস্তা না করে সুলতান সামনে এগুতে চাচ্ছিলেন না। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সুলতান রওনা হলেন রোডস অভিমুখে। তাঁর সাথে ছিল এক লাখ সেনা। তিনি দ্বীপের বিপরীতপ্রান্তে অবস্থান নেন। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া চারশো জাহাজের নৌবহর পাঠান রোডস দ্বীপ অভিমুখে। ২৬ জুন কোবান পাশার নেতৃত্বে চারশো অটোমান জাহাজ এসে রোডস দ্বীপে উপস্থিত হয়। ২৮ জুলাই সুলতান নিজে উপস্থিত হয়ে বাহিনীর কমান্ড বুঝে নেন। অটোমানরা পোতাশ্রয় অবরোধ করে। ২৯ জুলাই থেকে শুরু হয় লাগাতার গোলাবর্ষন। গোলাবর্ষনে প্রাচীরের খুব একটা ক্ষতি হচ্ছিল না। ৪ সেপ্টেম্বর মাইন বিস্ফোরণে প্রাচীরের প্রায় ১২ মিটার অংশ ধবসে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। অটোমানদের নেতৃত্বে ছিলেন কাসিম পাশা। নাইটদের নেতৃত্ব ছিল দ্য লায়ল এডামের হাতে। এদিন অটোমানরা বারবার দেয়াল আঘাত হানে। তবে সব হামলা সফল হয়নি। ২৪ সেপ্টেম্বর সুলতানের নির্দেশে প্রাচীরের বিভিন্ন স্থানে জোরালো আঘাত হানা হয়। প্রচন্ড লড়াইতে প্রায় ৪৫ হাজার অটোমান সেনা নিহত হয়। সুলতান সেদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছিল। দুপক্ষকেই প্রচুর সেনা হারাতে হছচিল। এদিকে শহরে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে। দুপক্ষেরই মনোবল ভেঙ্গে যায়। তবু থেমে থেমে লড়াই চলতে থাকে। ২২ ডিসেম্বর নাইটরা আত্মসমর্পণ করে। সুলতান তাদেরকে দ্বীপ ত্যাগের জন্য ১২ দিন সময় বেঁধে দেন। এছাড়াও সুলতান ঘোষণা দেন, কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হবে না, শিশুদেরকে দাস বানানো হবে না, কোনো গির্জাকে মসজিদে রুপান্তরিত করা হবে না, কারোসম্পদ কেড়ে নেয়া হবে না। কেউ বিদায় নিতে চাইলে তুর্কি জাহাজে করে তাকে ক্রিট দ্বিপে পৌঁছে দেয়া হবে। এমন উদার শর্ত নাইটরাও বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুলতানের সাথে দ্য লায়ল এডামের সাক্ষাত হয়।

রোডস জয়ের পর সুলতানকে অভিনন্দন জানিয়ে ভেনিস, মক্কা ও পারস্য থেকে পত্র আসে। এমনকি মস্কো থেকেও পত্র মারফত তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দের পহেলা জানুয়ারী নাইটরা শহর ছেড়ে বিদায় নেয়। তারা ৫০টি জাহাজে করে ক্রীটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

রোডস বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এই জয়ের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কন্সটান্টিনোপল, শাম, ও কায়রোর বিভিন্ন বন্দরের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়।

–

১৫২০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুলেমান হাঙ্গেরি জয়ের ইচ্ছা করেছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি বেলগ্রেড জয় করেছিলেন। কিন্তু পরে নানা ব্যস্ততায় তিনি আর সামনে এগুতে পারেননি। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন চূড়ান্ত আঘাত হানবেন। ততদিনে সাম্রাজ্যের নানা ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়েছেন তিনি। এক লাখ সেনা ও তিনশো কামান নিয়ে ইস্তাম্বুলের আদ্রিয়ানোপল ফটক থেকে হাঙ্গেরির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন সুলতান সুলেমান। দিনটি ছিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল। তাঁর সাথে ছিলেন উজিরে আজম ইবরাহিম পাশা, ভগ্নিপতি মোস্তফা পাশা, আয়াজ বে ও ইউনুস বে।

অটোমান বাহিনী দ্রুত পথ চলছিল। তারা অতিক্রম করে বলকান পর্বতমালা। তারা পিটারভারাদ, ইউজলাক ও ইসজাক শহর অবরোধ করে। পন্টুন ব্রিজ দিয়ে মাত্র ৫ দিনে সাভা ও দ্রাভা নদী অতিক্রম করে। হাংগেরির রাজা দ্বীতিয় লুইয়ের অটোমানদের মোকাবেলা করার মত তেমন কোনো শক্তিই ছিল না। তিনি সর্বসাকুল্যে মাত্র ২৫/৩০ হাজার সেনা একত্র করতে পেরেছিলেন। তাঁর বাহিনী ছিল ভারী বর্মে সজ্জিত নাইটদের উপর নির্ভরশীল। তবে অটোমান বাহিনী ছল তাদের চেয়ে আধুনিক। তাদের ছিল মাস্কেট সজ্জিত দুই হাজার জেনিসারি সেনা। ২৯ আগস্ট দুপুর তিনইটার দিকে দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যুদ্ধ মাত্র ৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়। ১৪ হাজারের বেশি হাংগেরিয়ান সেনা নিহত হয়। রাজা লুই পলায়ন করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ মোহাকচের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। সুলতান নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিলনে না এত সহজে তিনি যুদ্ধ জয়লাভ করবেন। তিনি এটিকে শত্রু চাল মনে করে আরও কয়েকদিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন। কিন্তু অপরপক্ষের সাড়া না পেয়ে তিনি রাজধানী বুদার দিকে যাত্রা শুরু করেন। ১০ সেপ্টম্বর সুলতান জনশূন্য বুদায় প্রবেশ করেন। দুর্গ ও এর আশেপাশের এলাকায় কয়েকটি অভিযান চালিয়ে তিনি ফিরে আসেন।

–

১৫২৯) ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ভিয়েনা দখলের জন্য দুটি অভিযান চালান। কিন্তু দুটিতেই অটোমানরা পরাজিত হয়। এ পরাজয়ের জন্য বৈরী আবহাওয়া দায়ী ছিল।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রিসের উত্তর-পূর্ন অংশে অটোমান নৌবহর ও খ্রিস্টান জোটের মধ্যে সং ঘঠিত হয় প্রিভেজা যুদ্ধ। পোপ তৃতীয় পলের আহবানে খ্রিস্টান নৌবহর

একত্রিত হয়েছিল অটমানদের মোকাবেলা করার জন্য। প্রিভেজা যুদ্ধ ছিল ষোড়শ শতাব্দিতে ভূমধ্যসাগরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ তিনটি যুদ্ধের একটি। এই যুদ্ধে তিনশো জাহাজের অধিকারী খ্রিস্টান জোট তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল অটোমান নৌবহরের কাছে পরাজিত হয়। খাইরুদ্দিন বারবারোসার অসামান্য নৈপুন্যের ফলে অটোমানদের জয় নিশ্চিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে লিপান্টোর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ৩৩ বছরের জন্য ভুমধ্যসাগরে অটোমানদের আধিপত্য নিশ্চিত হয়।

-

১৫৪১ সালে সুলতান তার বাহিনী নিয়ে হাংগেরির রাজধানী বুদা অবরোধ করেন। সুলতানের বাহিনীতে সেনাসংখ্যা ছিল ৩১ হাজার । এর মধ্যে জেনিসারি সৈন্য ছিল ৬ হাজার ৩৬২ জন। ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট এই বাহিনী বুদায় পৌঁছে এবং উইলহেম ভন রোজেনডর্ফের বাহিনীর সাথে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে অটোমানরা জয়ী হয়। প্রায় দেড়শো বছরের জন্য হাঙ্গেরিতে অটোমান শাসনের সূচনা হয়।

-

সুলতানের শেষ অভিযান ছিল হাংগেরীতে । ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট অটোমান বাহিনী জিগেতভার দুর্গ অবরোধ করে। যুদ্ধ যাত্রাকালে সুলতান ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার বারবার নিষেধ করছিলেন , কিন্তু সুলতান কারো কথা না শুনেই যুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৭২ বছর। দুর্গ অবরোধ করার পর অটোমান কামানগুলো একটানা গোলাবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু কোনো ফলাফল আসছিল না। সুলতান মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েন। ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান সেনাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাষনের পরেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চিকিতসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ইস্তাম্বুলে তার নির্মিত সোলাইমানিয়া মসজিদের সামনে তাকে দাফন করা হয়।

-

সুলতান সুলেমান ছিলেন অটোমান শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন শাসক। তিনি নিয়মিত দিনলিপি লিখতেন। তার এই দিনলিপিও হয়ে উঠছে ইতিহাসের মূল্যবান উৎস। তিনি একজন কবিও ছিলেন। মুহিব্বি ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তিনি নিজ হাতে কোরানুল কারিমের ৮টি কপি সংকলন করেন এবং সোলাইমানিয়া মসজিদে তা দান করেন। তিন পবিত্র কাবা শরিফ সংস্কার করেছিলেন। তার শাসনামলে অটোমান সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বেড়ে দেড় কোটি থেকে আড়াই কোটিতে পরিণত হয়। আধুনিক হাংগেরির বুদাপেস্ট থেকে সৌদি আরবের মক্কা, আলজেরিয়া থেকে বাগদাদ ছিল তার

রাজ্যের সীমানা। ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াত তার নৌবহর। ১৫৪৮ সালে অটোমান নৌবহর পর্তুগিজদের সাথে লড়াই করে এডেন বন্দর উদ্ধার করে নেয়। ১৫৫২সালে তারা দখল করে মাস্কাট। তিনি তিনবার ইরানের শিয়া পরিচালিত সাফাবি সাম্রাজ্যে আক্রমন করেছিলেন।

–

সুলতান সুলেমানের মৃত্যুর পর অটোমানদের মধ্যে এমন শক্তিশালী শাসক আর দেখা যায়নি। দিনদিন তাদের দূর্বলতা স্পষ্ট হতে থাকে। ক্রমশ এই সাম্রাজ্য দূর্বল হতে থাকে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এর চূড়ান্ত পতন ঘটে।
উসমানিয়রা এখন ইতিহাসের অংশ। বসফরাসের পাড়ে কান পাতলে এখনো শোনা যায় তাদের বিজয়গাঁথা।

হাজিব আল মানসুর : যে সেনাপতি পরাজিত হননি একটি যুদ্ধেও

একজন শাসক। একজন যোদ্ধা। একজন সেনাপতি। জীবনে তিনি ৫৪টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কখনোই পরাজিত হননি। তাঁর পতাকা কখনো ভূলুণ্ঠিত হয়নি। জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যানে তিনি ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত সেনাপতির চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি সাথে রাখতেন নিজ হাতে লেখা কুরআনুল কারিম। যখনই সময় পেতেন কুরআনুল কারিম তেলাওত করতেন। তাঁর ভয়ে ইউরোপ ছিল তটস্থ। তাঁর মৃত্যুতে তারা ফিরে পেয়েছিল স্বস্তি। তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল জিহাদের ময়দানে।

তিনি মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আবি আমের। ইতিহাস তাঁকে চেনে হাজিব আল মানসুর নামে।

হাজিব আল মানসুরের জন্ম দক্ষিণ আন্দালুসের জাজিরাতুল খাদরায়। সময়টা ছিল ৩২৬ হিজরি। খ্রিষ্টীয় হিসেবে ৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ। এই গ্রামটি ছিল কুরতুবার কাছেই। এই গ্রামের পথ ধরেই মুসলমানরা প্রবেশ করেছিলেন আন্দালুসে। এই পথ অতিক্রম করেছিলেন তারিক বিন যিয়াদ, মুসা বিন নুসাইর ও আবদুর রহমান আদ-দাখিলের মতো বরেণ্য সেনানায়করা। এখানেই বেড়ে ওঠেন হাজিব আল মানসুর।

বাল্যকালেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি হাদিস শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া তাঁর আগ্রহ ছিল সাহিত্যচর্চায়। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কুরতুবায় গমন করেন। সেখানে পড়াশোনা সেরে কাজি মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন সালিমের সহকারীর পদে কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি তাঁর মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অনেকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন।

ইতিমধ্যে আন্দালুসের খলিফা হাকাম আল মুস্তানসিরের সন্তান আবদুর রহমানের জন্ম হয়। খলিফা তাঁর পুত্রের দেখাশোনা ও পড়াশোনার জন্য একজন উপযুক্ত লোক সন্ধান করছিলেন। এ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় ইবনু আবি আমেরকে। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র ৩০ বছর। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খলীফার দরবারে অবস্থান মজবুত করে ফেলেন। এক পর্যায়ে তাঁকে টাকশালের পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর সেভিলের কাজির পদ দেয়া হয়।

কিছুদিন তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বেও ছিলেন। পরে খলিফা তাঁকে উত্তর আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। তবে ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে খলিফা তাঁকে আন্দালুসে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ৩৬৬ হিজরিতে খলিফা হাকাম আল মুস্তানসির ইন্তেকাল করেন। এরপর কিছু রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইবনু আবি আমের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন।[৯৭]

ইবনু আবি আমের তাঁর শাসনের শুরুতেই বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। সে সময় আন্দালুসের উত্তর সীমান্তে খ্রিষ্টানরা একের পর এক হামলা চালাচ্ছিল। ৩৬৬ হিজরির রজব মাসে ইবনু আবি আমের তাঁর বাহিনীসহ উত্তরাঞ্চলে অভিযানে বের হন। ৫২ দিনের এই অভিযানে তিনি হামা ও রাবজা দুর্গ জয় করেন। প্রচুর যুদ্ধলব্দ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীসহ তিনি কুরতুবায় ফিরে আসেন। প্রথম অভিযানেই জয়ের মাধ্যমে ইবনু আবি আমের প্রজাদের আস্থা লাভ করেন।

একই বছর ঈদুল ফিতরের দিন তিনি আবারও অভিযানে বের হন। এবার তিনি ক্যাস্টোলার মুলা দুর্গ জয় করেন। এরপর নজর দেন প্রশাসনের দিকে। নতুন করে ঢেলে সাজান পুরো রাষ্ট্রের কাঠামো। দুর্বল, ভীরু ও অযোগ্যদের বাদ দিয়ে নতুন ও কর্মঠদের নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবেই তিনি আমিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আমিরিয়া সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম আন্দালুসের প্রতাপের যুগ।

রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করে ইবনু আবি আমের নজর দেন আন্দালুসের পাশে অবস্থিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর দিকে। শুরু করেন এক দীর্ঘমেয়াদী অভিযানের, যা চালু ছিল পরবর্তী ২৭ বছর ধরে। এই সময়ে প্রতিটি যুদ্ধেই ইবনু আবি আমের জয়লাভ করেছেন। কখনো তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়নি, কখনো তাঁর বাহিনীর পতাকা অবদমিত হয়নি। তিনি ঘোড়া দাপিয়েছেন উত্তরে বিস্কে উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত। তাঁর বাহিনী অতিক্রম করেছিল এমনসব এলাকা, তাঁর আগে কোনো সেনাপতি বা শাসক যে পর্যন্ত যেতে পারেনি।

তিনি কখনো জয় করেছিলেন সাখরা অঞ্চল, আবার কখনো ছুটে গিয়েছেন সেন্ট ইয়াকুব নগরীতে। কখনো তাঁর বাহিনী ঝড়ের গতিতে আছড়ে পড়েছে সান স্টিফেন দুর্গে। তিনি অতিক্রম করেছিলেন পার্বত্য এলাকা, তাঁর সামনে বাধা হতে পারেনি দুর্গম বন্ধুর পথ।

প্রতিবছর দুবার তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। একবার গ্রীষ্মকালে, আরেকবার শীতকালে। এর আগ পর্যন্ত আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে শুধু গ্রীষ্মকালে অভিযানে যাওয়ার প্রচলন ছিল। প্রতিটি অভিযান থেকে ফিরে তিনি

---

[৯৭] বাসসাম আসালি, কদাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা, পৃ-৪১৮-৪৩০ (বৈরুত, দারুন নাফাইস, ১৪৩৩ হিজরি)

পরনের পোষাক ঝেরে ধুলোবালি সংগ্রহ করতেন। তারপর তা একটি বোতলে জমা করে রাখতেন। তিনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁর কাফনের সাথে যেন এই ধুলোবালিও দিয়ে দেয়া হয়।[৯৮]
মূলত তিনি একটি হাদিসে বর্ণিত সুসংবাদের প্রতি লক্ষ রেখেই এমনটা করেছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হবে না।[৯৯]

৩৭১ হিজরিতে তিনি হাজিব আল মানসুর উপাধি ধারণ করেন। একবার তিনি সংবাদ পান নাফার রাষ্ট্রে তিনজন মুসলিম নারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। দ্রুত তিনি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেন। এই বাহিনী উপস্থিত হয় নাফার রাষ্ট্রের সীমান্তে। নাফার সম্রাট আতংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কেন এসেছেন। তাঁকে বলা হয়, আপনার রাজ্যের একটি গির্জায় তিনজন মুসলিম নারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। নাফার সম্রাট জানান, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এবং দ্রুতই তিনি এর সমাধান করবেন। সম্রাট নিজের উদ্যোগে সেই তিন মুসলিম নারীকে মুক্ত করেন। এর সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের সবাইকে শাস্তি দেন। এমনকি হাজিব আল মানসুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি গির্জাটিও ভেঙে ফেলেন।[১০০]

একরাতে হাজিব আল মানসুরের এক কর্মচারী তাঁকে বললেন, আমাদের মনিবের চেহারার ক্লান্তি বলে দিচ্ছে তাঁর এখন ঘুম দরকার। নিদ্রাহীনতা তাঁকে অসুস্থ করে দেবে। জবাবে হাজিব আল মানসুর বললেন, যখন প্রজারা ঘুমায় তখন শাসনকর্তা ঘুমাতে পারে না। যদি আমার ঘুম দীর্ঘ হয় তাহলে এই রাজ্যের সমৃদ্ধিও ঘুমিয়ে যাবে।[১০১]
হাজিব আল মানসুর ইন্তেকাল করেন ৩৯৪ হিজরিতে। তাঁর কবরফলকে কেউ একজন লিখে দিলেন, তাঁর কৃতকর্মই তোমাকে তাঁর সম্পর্কে জানাবে, মনে হবে তুমি নিজ চোখেই তাঁকে দেখছো। তাঁর সময়কালের মতো সময় হয়তো আর আসবে না। উপকূলীয় শহর হয়তো আর কখনো উত্তপ্ত অগ্নিগর্ভ হবে না।

---

[৯৮] যাহাবী, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন উসমান (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১৬, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭ হিজরি)
[৯৯] জামে তিরমিজি, ১৬৩৩
[১০০] মাক্কারি, আহমাদ বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ১০৪১ হিজরি), নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব, ১/৪০৪ (দার সাদের, বৈরুত)
[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ-৪১৬
[১০৩] বাসসাম আসালি, কদাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা, পৃ-৪১৮ (বৈরুত, দারুন নাফাইস, ১৪৩৩ হিজরি)

তারপর বহুদিন গত হলো। আন্দালুস হয়ে পড়লো বিভক্ত। উত্তরে শক্তি সঞ্চয় করলো খ্রিষ্টানরা। তারা দখল করে নিল একের পর এক রাজ্য। আলফান্সো দখল করে নিল হাজিব আল মানসুরের শহর মাদিনাতুস সালেম।

আলফান্সোর নির্দেশে হাজিব আল মানসুরের কবরের উপর তাবু গাড়া হলো। সেখানেই রাখা হলো আলফান্সোর শোয়ার খাট। আলফান্সো তার স্ত্রীসহ সেই খাটে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলো, বাহ, আমি মুসলমানদের রাজত্ব দখল করেছি এবং তাদের সম্রাটের কবরের উপর আমার খাট রেখেছি।
উপস্থিত একজন বলে উঠলো, যদি এই কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তি জীবিত থাকতেন তাহলে আপনি আজ এখানে থাকা দূরের কথা এই রাজ্যের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও পেতেন না। তিনি আমাদের কাউকেই ছাড়তেন না। এই কথা শুনে আলফান্সো রেগে যায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, সে সত্যই বলেছে। তুমি কি নিজেকে তার (হাজিব আল মানসুর) মতো মনে করো?[১০২]

---

[১০২] বাসসাম আসালি, কদাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা, পৃ-৪১৮ (বৈরুত, দারুন নাফাইস, ১৪৩৩ হিজরি)

ওয়াররাকদের বিচিত্র জীবন

ইবনে নাদীম, পুরো নাম আবুল ফারাজ মোহাম্মদ বিন ইসহাক আন নাদীম, বিস্ময়কর আল ফিহরিস্ত বইয়ের লেখক, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ওয়াররাক। আমাদের পরিচিত আরো অনেকেই ওয়াররাক ছিলেন। বিখ্যাত বুজুর্গ মালেক ইবনে দীনারের কথাই ধরা যাক। ১৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরনকারী এই মনিষীও ওয়াররাক ছিলেন। ইয়াকুত হামাভী, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ, যিনি মুজামুল বুলদানের লেখক, তিনিও ছিলেন ওয়াররাক। ওয়াররাকদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। সে তালিকায় যাওয়ার আগে জেনে নেয়া যাক, ওয়াররাকদের পরিচয় ।

ইবনে খালদুন ওয়াররাকদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করা, প্রুফ দেখা, বাধাই করা এবং বই সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু ওয়াররাকদের কাজের আওতায় পড়ে' । আল্লামা সামআনি অবশ্য সংজ্ঞাটা আরো পরিস্কার করেছেন, ' ওয়াররাকরা কুরআনুল কারীম, হাদীস ও অন্যান্য বইপত্র লেখার কাজ করে। এছাড়া যারা কাগজ বিক্রী করে তাদেরকেও ওয়াররাক বলা হয়।

'ওয়াররাক (وراق) শব্দের অর্থ কাগজবিক্রেতা, বইবিক্রেতা, নকল-নবিস ইত্যাদী। শুধু এটুকুতেই ওয়াররাকদের পুরো পরিচয় উঠে আসে না । ওয়াররাকরা বই বাধাই করতেন, অনুলিপি প্রস্তুত করতে , প্রচ্ছদে ছবি একে দিতেন, পান্ডুলিপি সংশোধনও করতেন। ইবনে খালদুন যেমনটা বলেছেন, এক সময় ইরাক ও আন্দালুসে ওয়াররাকদের প্রাচুর্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে বাগদাদেই ওয়াররাকদের একশো দোকান ছিল। তাইতো আবুল মোতাহহার আযদী গর্ব করে ইস্ফাহানের লোকদের বলেছিলেন, বাগদাদে আমি যে পরিমান ওয়াররাক দেখেছি তোমাদের এখানে সে পরিমান নেই।

ওয়াররাকদের দোকানে পাওয়া যেত লেখার উপকরণ, কাগজ, কলম ও বিভিন্ন শাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য বই। ওয়াররাকদের দোকানের প্রতি তাই জ্ঞানপিপাসুদের ছিল অন্যরকম আকর্ষণ। ওয়াররাকদের দোকানে ভিড় জমাতেন কবি, সাহিত্যিক ও আলেমরা। মুতাযিলী সাহিত্যিক জাহেয (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী/৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

টাকার বিনিময়ে ওয়াররাকদের দোকানে রাত কাটাতেন। ওয়াররাকদের দোকানে ঘুরতেন মুতানাব্বিও (মৃত্যু ৩৫৫ হিজরী/৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। আবুল ফারজ ইস্ফাহানিও (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী/৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) ওয়াররাকদের দোকান থেকেই কেনাকাটা করতেন।

শুধু বাগদাদ কিংবা আন্দালুস নয়, ওয়াররাকদের এমন দোকান গড়ে উঠেছিল পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে। রাহা শহরে ছিল সাদ ওয়াররাকের দোকান। বইয়ের লোভে সেখানে ছুটে আসতেন জ্ঞানীগুনিরা।
ঐতিহাসিক মাকরেজি লিখেছেন , কায়রোতে ওয়ারাকদের প্রচুর দোকান ছিল। সেদিনের মুসলিমবিশ্বে ছিল ওয়াররাকদের প্রাচুর্য। তাদের দোকানে জন্ম নিচ্ছিল নতুন নতুন হস্তলিপি। দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপির সন্ধান মিলছে তাদের কাছে। প্রথমদিকে ওয়াররাকরা কাগজ, কলম ও অন্যান্য লেখার উপকরণ বিক্রি করতেন। ধীরে ধীরে তারা অনুলিপি প্রস্তুত শুরু করেন। এবং এক সময় পান্ডুলিপি সংশোধন, প্রুফ দেখা এসব কাজেও দক্ষতা অর্জন করেন। এসময় তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের বইপত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন এবং প্রচুর অনুলিপি প্রস্তুত করেন। প্রথম যুগের ওয়াররাকদের মধ্যে আমরা পাই খালেদ বিন আবি হাইয়াজের নাম। তিনি ছিলেন তার সুন্দর হস্তলিপির জন্য বিখ্যাত। তিনি উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেকের দরবারের ফরমান ও ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতেন। ইবনে নাদীম লিখেছেন, খালেদ বিন আবি হাইয়াজ খলীফা উমর বিন আব্দুল আজিজের জন্য কোরআনের একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন।
প্রথম যুগের আরেকজন বিখ্যাত ওয়াররাক হলেন মালেক ইবনে দীনার (মৃত্যু ১৩১ হিজরী / ৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি অনুলিপি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।খলীফা হারুনুর রশীদের সময়ে এমন দুজন বিখ্যাত ওয়াররাক ছিলেন, খাশনাম বসরী ও মাহদী আল কুফী। ইবনে নাদীমের সময় বিখ্যাত ওয়াররাকদের মধ্যে ইবনে উম্মে শায়বান, মাসহুর, আবুল ফারাজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ওয়াররাকদের কেউ কেউ বইয়ের মলাটে স্বর্ণের প্রলেপ লাগাতেন। ইবরাহিম সগির, আবু মুসা বিন আম্মার, ইবনুস সাকতি, আবু আবদুল্লাহ খুজাইমি প্রমুখ এই কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ওয়াররাকদের স্বর্ণযুগ ছিল আব্বাসী খেলাফতের সময়কালে। কারণ ততোদিনে কাগজের ব্যবহার বেড়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদ চামড়ায় সরকারী ফরমান লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং সকল লেখালেখি কাগজে করার নির্দেশ দেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয় কাগজের কল। গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের বইপত্র অনুবাদ হচ্ছে আরবি ভাষায়। ফলে ওয়ারাকদের চাহিদাও বাড়ছে।

ওয়ারাকদের কাজ ছিল কয়েক ধরনের

১। তারা বই, কাগজ, কলম ইত্যাদী বিক্রি করতেন।

২। লেখকরা তাদের বই পাঠাতেন ওয়ারাকদের কাছে। ওয়াররাকরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনুলিপি প্রস্তুত করে দিতো। এক্ষেত্রে লেখকরা খোজ করতেন সুন্দর হস্তলিপির ওয়াররাক। ইবনে নাদিম লিখেছেন, আবু মুসা হামেদ ছিলেন সুন্দর হস্তাক্ষর ও লিখনশৈলীর জন্য বিখ্যাত। মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কিরামি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তার হাতের লেখাও খুব সুন্দর ছিল। ইয়াকুত হামাভী এমন অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন যারা সুন্দর হাতের লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এমনই একজন আহমদ বিন মোহাম্মদ কারশি। আবুল হাসান আলি বিন আহমদ বিন আবু দুজানা মিসরীও হাতের লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তবে তার প্রায়ই বানান ভুল হতো। ইবনে খাল্লিকান মুগ্ধ হয়েছেন আবু মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহর হাতের লেখা দেখে। কর্ডোভায় বিখ্যাত ছিলেন আহমাদ বিন মোহাম্মদ বিন হাসান । মারক্কোতে বিখ্যাত ছিলেন আব্বাস বিন ওমর সকলি।

৩। কখনো কখনো ওয়াররাকরা উপস্থিত হতেন আলেমদের ইমলার মজলিসে। এসকল মজলিসে আলেমরা বিভিন্ন বিষয়ের দরস দিতেন। অনেকেই এগুলো লিপিবদ্ধ করতো। ওয়াররাকরাও লিখতো। পরে এইসব দরস বই আকারে সনকলন করা হত। এগুলোকে বলা হত আমালি। হাজি খলীফা কাশফুজ জুনুনে এমন অনেক আমালির কথা উল্লেখ করেছেন । আমালি ইবনু হাজেব, আমালি ইবনে হাজার আসকালানি, আমালি ইবনে দুরাইদ, আমালি আবু জাফর বুখতারী এই বইগুলো এ ধরনের মজলিসেই লেখা হয়।

৪। অনেক কুতুবখানা ও আলেমদের গৃহে ওয়ারাকদের নিয়োগ দেয়া হত। তারা সেখানে থেকে অনুলিপি প্রস্তুত, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদী কাজ করতেন। তারিখে বাগদাদের ভাষ্যমতে ইয়াকুব বিন শাইবা সাদুসী (মৃত্যু ২৬২ হিজরী/৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) যখন তার মুসনাদ লেখার কাজ শুরু করেন তখন তার গৃহে চল্লিশটি তোষক ছিল ওয়াররাকদের রাত্রী যাপনের জন্য।

৫। সাধারণ পাঠকরা এসে ওয়ারাকদের নির্দিষ্ট কোনো বই অনুলিপি করে দিতে বলত। ওয়াররাকরা সেটি করে দিতো।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ননা থেকে ওয়ররাকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে অনুমান করা যায়। যদিও এই ধারনা সার্বজনিন নয়, কিংবা সব অঞ্চলের ওয়াররাকদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্যও নয়, তবু একটা মোটামুটি ধারনা হয়। হিজরী তৃতীয় শতকের শুরুর দিকে ওয়াররাকরা দশ পৃষ্ঠার অনুলিপির বিনিময় নিতেন ১ দিরহাম। এই সময়ে ফাররা খলীফা মামুনের বেশ কিছু কাজ করেছেন এই বিনিময়ে। এই

শতকের মাঝামাঝি ওয়াররাকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়। ৫ পৃষ্ঠার বিনিময় হয় ১ দিরহাম। এ সময় মোহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন দিনার ১০০ পৃষ্ঠা লেখার বিনিময়ে আবু উবাইদুল্লাহ ইয়াযিদীর কাছ থেকে ২০ দিরহাম গ্রহন করেছেন। এই শতকের শেষ দিকে আবারও মূল্য বেড়ে যায়। ৫ পৃষ্ঠার বিনিময় তখন ৩ দিরহাম। এই সময়ের একজন বিখ্যাত ওয়াররাক আবু মোহাম্মদ উবাইদুল্লাহ সম্পর্কে খতীব বাগদাদী লিখেছেন , তিনি ৫ পৃষ্ঠার বিনিময়ে ২ দিনার তথা ৩ দিরহাম গ্রহণ করতেন।হিজরী চতুর্থ শতাব্দির শেষদিকে আবারো মূল্য বেড়ে যায়। এ সময় ওয়াররাকরা ১ পৃষ্ঠার বিনিময়ে ১ দিরহাম গ্রহণ করতেন। কাজী আবু সাইদ সিরাজী (মৃত্যু ৩৬৮ হিজরী/৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ১০ পৃষ্ঠার বিনিময়ে ১০ দিরহাম নিয়েছেন। ফাররা এবং সিরাজীর সময়কালের পার্থক্য ১৬১ বছর। এই সময়ে ওয়ারাকদের মুজুরি বেড়েছে ১০ বার।
ওয়াররাকদের পেশা ছিল সম্মানের পেশা। আলেম উলামা ও কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই তাই এই পেশায় খুজতেন হালাল রিজিক। আবু উবাইদ আলি বিন হুসাইন বিন হারব বাগদাদী ছিলেন শাফেয়ি মাজহাবের ফকিহ। তিনি মিসরের কাজী ছিলেন। পেশাগত দায়িত্বের বাইরে তিনি ছিলেন একজন ওয়াররাক। এই পেশা থেকে তার মাসিক উপার্জন ছিল ১২০ দিনার। আবুল আব্বাস মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব উমাভী ছিলেন খোরাসানের বিখ্যাত আলেম। তিনি হাদীস বর্ননা করে অর্থ গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন তাই পেশা হিসেবে বিরাক্বাহ বেছে নেন।

আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আদি হিজরি চতুর্থ শতাব্দির একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তিনি নিজের হাতে তাফসিরে তাবারীর দুটি অনুলিপি প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রয় করেন। কেউ কেউ আর্থিক সংকটের কারনেও এই পেশায় আসতেন। মোহাম্মদ বিন সোলাইমান বিন তুর্কমান শাহের পিতা অনেক সম্পদ রেখে যান। তিনি আমোদ উল্লাসে সম্পদ উড়িয়ে দেন। পরে বাধ্য হয়ে এই পেশায় আসেন। খতিব বাগদাদী লিখেছেন সিবরী বিন আহমদ বিন মসুলির কথা। তিনিও আর্থিক অনটনে পড়ে নিজের কবিতার বই ওয়াররাকদের বাজারে বিক্রি করে দেন। তাজউদ্দিন আলি বিন আহমদ হুসাইনি ছিলেন ইস্কান্দরিয়ার প্রখ্যাত ওয়াররাক। একসময় আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে তিনি এই পেশা ছেড়ে দেন।

ওয়াররাকরা দিনে কী পরিমান লিখতেন তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। ব্যক্তি ভেদে তাদের লেখার গতিও ভিন্ন হতো। তবে আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আদী ও ইবনে শিহাব আকবরির জীবনি থেকে জানা যায় তারা প্রতিদিন গড়ে ১০০ পৃষ্ঠা

লিখতেন, অনুলিপি করতেন। ওয়াররাকদের পেশা ছিল সম্মানের। তবে কেউ কেউ ওয়াররাকদের নিন্দাও করেছেন। যেমন জনৈক কবি লিখেছেন

....

(বখিল এবং কৃপণ পেশা কাগজ-কলম-গ্রন্থনা
যেথায় শুধু অপূর্ণতা, পাতায়-পাতায় বঞ্চনা
সুঁইয়ের ছোঁয়ায় বস্ত্র-বুনট, তবু যে তার শূন্যতা
লেখক এবং সুঁইয়ের মাঝে কোথায় বলো ভিন্নতা?)

কাব্যানুবাদ- মাহমুদ সিদ্দিকী

বাগদাদে ওয়াররাকদের দুটি বাজার ছিল। একটি নগরীর পশ্চিম প্রান্তে, কারখ অঞ্চলে। এই বাজারের বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় ইয়াকুত হামাভির লেখায়। তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এই বাজার পরিভ্রমণ করেন। তখন সেখানে ওয়াররাকদের ১০০ দোকান ছিল। কারখের এই বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৫৭ হিজরীতে। ওয়াররাকদের অন্য বাজারটি ছিল নগরীর পূর্ব প্রান্তে, রসাফাহ অঞ্চলে। ইবনুল জাওযি (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) কারখের বাজারের কথা উল্লেখ না করলেও এই বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, এখানে নিয়মিত উলামাদের এবং কবিদের মজলিস বসতো। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন আবুল গানায়েম হাবশি বিন মোহাম্মদ টানা বিশ বছর প্রতি রাতে ওয়াররাকদের বাজারে এসব মজলিসে উপস্থিত হতেন। সমকালীন জনজীবনে এইসব মজলিসের সামাজিক , সাংস্কৃতিক প্রভাব অপরিসীম। কেমন কর্মব্যস্ত ছিল এই বাজারদুটি। ইয়াকুত হামাভীর বর্ননা থেকে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। কারখের বাজারেই ছিল ওয়াররাকদের একশোটি দোকান। এখানে বই কেনাবেচা হতো। ওয়াররাকদের এসব দোকানে লেখালেখির যাবতীয় উপকরণ পাওয়া যেতো। আলেম উলামাদের ভীড় লেগেই থাকতো। তারা তাদের প্রয়োজনীয় বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করাতেন দক্ষ ওয়াররাকদের হাতে। কারখের ওয়াররাকের জানার পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাকে বাগদাদের বাইরের খোজখবরও রাখতে হতো। মরক্কো, মিসর কিংবা আন্দালুসে নতুন কোন বইটি প্রকাশিত হলো সে বিষয়ে থাকতো তার স্বচ্ছ ধারনা। ওয়াররাকদের দোকানে তাই মিলতো নতুন বইয়ের খবরাখবর।

জাহেজ কারখের বাজারেই রাত কাটাতেন। এসব বাজারে বসতো বিতর্কের মজলিস। সেকালে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে এইসব বাজারের ভুমিকা ছিল অনন্য। মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা তার ছেলেকে যে অসিয়ত করেছেন তা থেকে

বিষয়টি বুঝা যায়। তিনি সন্তানদের বলেছিলেন, তোমরা কখনো বাজারে সময় কাটাবে না। তবে বর্মনির্মাতা ও ওয়াররাকদের পাশে বসতো পারো'। ওয়াররাকরা প্রায়ই নিলামদার নিয়োগ দিতেন। এই নিলামদারের কাজ হতো বাজারের মোড়ে কিংবা অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে দাঁড়িয়ে বইয়ের নিলাম করা। প্রথমে সে উচ্চকণ্ঠে বই এবং লেখকের নাম বলতো। বলতো বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা। বইয়ের গুরুত্বপূর্ন কিছু লাইন পড়ে শোনাতো। তারপর আগ্রহী ক্রেতাদের মধ্যে নিলাম শুরু হতো।আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির কিতাবুল আগানি চার হাজার দিরহামে নিলামে বিক্রি করা হয়। এইসব নিলামদাররা অনেক দক্ষ হতো। বিভিন্ন শাস্ত্রের বইপত্র সম্পর্কে তাদের থাকত অগাধ জ্ঞান। ইবনে সীনা একবার ওয়াররাকদের বাজারে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তখন আবু নসর ফারাবির বইয়ের নিলাম চলছিল। নিলামদার ইবনে সীনাকে জোরাজুরি করছিল বইটি কেনার জন্য। ইবনে সীনা অনাগ্রহ প্রকাশ করলেন। নিলামদার বললো, এটি খুবই মূল্যবান বই কিন্তু দাম কম। তার চাপাচাপিতে ইবনে সীনা ৩ দিরহামে বইটি ক্রয় করে বাসায় নিয়ে যান। পরে ইবনে সীনা বলেছিলেন, 'এই বইটি আমার সামনে এক নতুন জগত উন্মোচন করেছে'। কেউ মারা গেলে নিলামদাররা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে বইপত্র কিনে আনতো। সাআলাবের ইন্তেকালের পর খাইরান ওয়াররাক তার কুতুবখানা ৩০০ দিনারে ক্রয় করে। আসআদ বিন মাতরানের ইন্তেকালের পর তার বইপত্র তিন হাজার দিরহামে ক্রয় করা হয়। এভাবে ওয়াররাকরা অনেক দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করতো। কোনো বই বেশি ভালো লাগলে তারা সেটি নিজের সংগ্রহে রেখে দিত। বিক্রি করতো না। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন আবু সাইদ উমর বিন আহমদ দিনাওয়ারির কথা। তার কাছে তবারির _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _বইটি ছিল। এটি প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার বই, যা ইমলার মজলিসে লেখা হয়। আবু সাইদ উমর এটি বিক্রি করেন নি। তিনি এটি নিজের সাথে শামে নিয়ে যান এবং এ বই থেকে উপকৃত হন।

ওয়াররাকদের বাজারে নানা ধরনের প্রতারণা ও ছলছাতুরিও হতো। ইবনে খশশাব (মৃত্যু ৫৬৭ হিজরী/১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) বাজারে গেলে ওয়াররাকদের অমনযোগিতার সুযোগে বইয়ের পৃষ্ঠা ছিড়ে ফেলতেন। তারপর বলতেন বইটি তো ত্রুটিপূর্ণ। এই বলে বইটি কমদামে কিনতেন। কখনো কখনো ওয়াররাকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আসতো। ইবনুল আসির ২৭৯ হিজরীর (৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনাবলীতে লিখেছেন এ বছর ওয়াররাকদের নিষেধ করা হয় দর্শন ও ইলমুল কালামের বইপত্র বিক্রি করতে। ইবনুল জাওযি লিখেছেন মনসুর হাল্লাজকে হত্যার পর তার বইপত্র বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়।ওয়াররাকদের মধ্যে আলেম উলামা কবি সাহিত্যিক যেমন ছিলেন তেমনি মদ্যপ ও লম্পট চরিত্রের লোকও ছিল।

বকর বিন খারেজা আল কুফি তার উপার্জনের পুরোটাই মদপান করে উড়িয়ে দিতো। উমর বিন আব্দুল মালেক তো মদের গুনাগুন বর্ননা করে অনেক কবিতাই লিখে ফেলে। ইবনে রশিক বলেন, আমি আবু বকর আতিবা বিন মোহাম্মদ তাইমিকে দেখলাম মসজিদের মিম্বরে বসে বয়ান করছে। বয়ানের ফাকে ফাকে সে কান্না করছিল। সেরাতে আমি তার গৃহে গেলাম। দেখি সে তাম্বুরা নিয়ে বসে আছে, পাশে এক সুদর্শন গোলাম। আমি বললাম, আফসোস । তোমার দিনের চরিত আর রাতের চরিত্রে কী আকাশ পাতাল তফাত। সে বললো, ওটা ছিল আল্লাহর ঘর আর এটা আমার ঘর। আমি যেখানে থাকি সেখানের নিয়ম মেনে চলি ।

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভারতবর্ষের প্রতিটি শহর ও গ্রামে ওয়াররাকদের বসবাস ছিল। তাদের কর্মের ধরন মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য শহরে বসবাসকারী ওয়াররাকদের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। কারখের বাজারে বসা ওয়াররাকের সাথে বিলগ্রামের ওয়াররাকদের কাজের মিল ছিল অনেকাংশেই। আল্লামা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী ওয়াররাকদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা থেকেই বিষয়টি পরিস্কার হয়। তার ভাষ্যমতে, ওয়াররাক তাদেরকে বলা হয় যারা কুরআনুল কারীম, হাদীস এবং অন্যান্য বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তত করে। এছাড়া কাগজ বিক্রেতাদেরকেও ওয়াররাক বলা হয়।

ভারতবর্ষে ওয়াররাকদের নুসসাখও বলা হতো। ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এমনই এক ওয়াররাকের কথা বলেছেন। শায়খ ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শকরের ভাই শায়খ নাজিবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের 'জামিউল হেকায়াত' বইটি প্রয়োজন ছিল। আর্থিক অসামথ্যের কারনে তিনি বইটির অনুলিপি প্রস্তুত করতে পারছিলেন না। একদিন হামিদ ওয়াররাক তার দরবারে এলে তাকে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন। হামিদ ওয়াররাক জিজ্ঞাসা করলো 'আপনার কাছে এখন কতো আছে?'। 'এক দিরহাম' বললেন শায়খ নাজিবুদ্দীন। হামিদ ওয়াররাক সেই এক দিরহাম গ্রহণ করে কাগজ কিনে আনলো এবং জামেউল হেকায়াতের অনুলিপি লেখার কাজ শুরু করে দিলো।

ভারতবর্ষে ওয়াররাকদের পরিমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ুনীর লেখায়। বিখ্যাত কবি উরফী সিরাজীর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এমন কোনো বাজার ছিল না যেখানে বই বিক্রেতারা উরফি ও সানাইর দিওয়ান বিক্রি করতো না । ভারতবর্ষে ওয়াররাকদের প্রাচুর্যের পক্ষে আরেকটি শক্ত দলীল স্বয়ং মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ুনীর লেখা 'মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ' বইটি, যা তারীখে বাদায়ুনী নামেও পরিচিত। বইটি তিনি লেখেন আকবরের শাসনামলে। বইয়ের কিছু অংশ আকবরকে ক্ষিপ্ত করতে পারে এই

আশংকায় তিনি বইটি প্রকাশ না করে লুকিয়ে রাখেন। তার মৃত্যুর পর বইটি কোনো এক ওয়াররাকের হাতে পৌছায়। তিনি বেশ কিছু কপি তৈরী করে ফেলেন। দ্রুতই বইটি ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়। তখন জাহাংগীরের শাসনামল। বইটি পাঠ করে তিনিও ক্ষিপ্ত হন। মোল্লা সাহেবের পরিবারকে রাজদরবারে ডেকে ভৎসনা করা হয়। তাদের থেকে মুচলেকা নেয়া হয়, তারা আর এই বই প্রকাশ করবে না। জাহাঙ্গীর নিজে বইটি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। তবুও বইটি বাজার থেকে সরানো সম্ভব হলো না। শহর নগর এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তখন প্রচুর ওয়াররাকদের বসবাস। তারা দ্রুতই বইটির প্রচুর অনুলিপি প্রস্তুত করে ফেলছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করতে মুঘল সম্রাটও ব্যর্থ হয়েছেন।

অলিগলিতে তখন ওয়াররাকদের দোকান। যে কোনো বই তারা কপি করে ফেলছেন স্বল্পসময়ে। পেশাদার ওয়াররাক নন, এমন ব্যক্তিরাও তখন ঈর্ষনীয় দক্ষতার অধিকারী হতেন। বিলগ্রামের একজন আলেম শাহ তৈয়বের জীবনিতে মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী লিখেছেন, 'তিনি ১৫ দিনে শরহে জামীর একটি অনুলিপি লিখেছিলেন' যারা শরহে জামী কিতাবের আকৃতি সম্পর্কে জানেন তারা বুঝতে পারবেন, এতো অল্পসময়ে এই কাজ করতে কী পরিমান দক্ষতা প্রয়োজন। এছাড়াও শাহ তৈয়ব আরো অনেক কিতাবের অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে আছে ইয়াহইয়া বিন আবু বকর আমেরি আল ইয়ামানির লেখা বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ বাহজাতুল মাহাফিল। এটি তিনি তেইশ দিনে লিখেছেন।

মাওলানা আজাদ বিলগ্রামী লিখেছেন, শাহ তৈয়বের বেশ বড়সড় একটি কুতুবখানা ছিল। যেখানে শুধু তার নিজের হাতে অনুলিপি করা বইগুলো ছিল। শাহ তৈয়ব কোনো পেশাদার ওয়াররাক ছিলেন না। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি অন্যান্য কাজ করতেন। দরস-তাদরীসে সময় দিতেন। তবুও তার এ পরিমান দক্ষতা ছিল যে নিজের অনুলিপি করা বই দিয়েই একটা বড়সড় কুতুবখানা হয়ে যায়। শায়খ কামাল নামে আরেকজন আলেম নাহু, সরফ, মানতেক, দর্শন ও ফিকহের বিভিন্ন বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাশিয়া বা পার্শ্বটীকা লিখে দিতেন। সেকালের বেশিরভাগ আলেমই বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুতে দক্ষতা রাখতেন। আবুল ফজলের পিতা মোল্লা মোবারক নাগোরী নিজের হাতে বড় বড় ৫০০ টি বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। শায়খ জুনাইদ হিসারী র. সম্পর্কে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী আখবারুল আখইয়ারে লিখেছেন, তিনি মাত্র তিন দিনে পুরো কোরআনুল কারীম এরাবসহ (যবর, যের, পেশ) লিখে ফেলতেন।

ওয়াররাকদের সেই দিন আর নেই। প্রযুক্তির অগ্রসরতার সাথে সাথে হারিয়ে গেছে ওয়াররাকরা। তবে এখনো দেওবন্দ কিংবা হাটহাজারীর সংকীর্ণ কুঠুরিতে বসে বই বাধাইয়ে মগ্ন বৃদ্ধগন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন ওয়ারাকদের সোনালী যুগের কথা।

তথ্যসূত্র

১। আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা — ড ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরি

২। মাওসুআতুল ওয়াররাকাহ ওয়াল ওয়াররাকিন — ড খাইরুল্লাহ সাদ

৩। আল খত্ব ওয়াল কিতাবাহ ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যা– ড ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরি

৪। ওয়াররাকু বাগদাদ ফিল আসরিল আব্বাসি –ড খাইরুল্লাহ সাদ

৫। হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত– মানাযির আহসান গিলানী

৬। আখবারুল আখইয়ার– আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী

ইমাম আবু বকর নাবলুসি

মিসরের উবাইদি[১০৩] শাসক আবু তামিম সাদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। তার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে বিশিষ্ট আলেম মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন সাহল রমালিকে। আবু তামিমের কাছে সংবাদ এসেছে এই আলেম উবাইদি শাসনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে।

'আমার কাছে সংবাদ এসেছে , আপনি নাকি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন, যদি আপনার কাছে ১০টি তীর থাকে তাহলে আপনি একটি রোমানদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করবেন, আর নয়টি আমাদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করবেন। এটা সত্য?' আবু তামিম প্রশ্ন করলো।

'না , আমি এমন কথা বলিনি' শায়খ শান্ত কণ্ঠে বললেন।

'তাহলে কী বলেছেন?' শায়খ তার অবস্থান পরিবর্তন করছেন ভেবে খুশি হয়ে উঠে আবু তামিম সাদ।

'আমি বলেছি যদি আমার কাছে দশটি তীর থাকে, তাহলে আমি নয়টি তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করবো এবং দশমটিও তোমাদের দিকেই নিক্ষেপ করবো। কারন, তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করেছো, নেককারদের হত্যা করেছো, তাওহিদের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছো' শায়খ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

আবু তামিম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যায়। সে প্রহরীদের আদেশ দেয় শায়খকে বন্দী করতে। শায়খকে বন্দী করা হয়। দ্বিতীয় দিন শায়খকে চাবুক দিয়ে প্রচন্ড প্রহার করা হয়। এরপর একজন ইহুদিকে আদেশ দেয়া হয় জীবন্ত অবস্থাতেই শায়খের চামড়া আলাদা করে ফেলতে। শায়খের হাত পা বেধে ফেলা হয়। ইহুদি ধারালো ছুরি দিয়ে দিয়ে তার চামড়া আলাদা করতে থাকে। শায়খ সে সময় কোরআন

---

[১০৩] উবাইদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ মাহদি। সে ছিল শিয়া। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা'তে লিখেছেন, উবাইদুল্লাহ আবু মুহাম্মদ বাতেনি উবাইদিয়্যাদের প্রথম খলিফা। তারা ইসলামকে পরিবর্তন করেছিল, শিয়া মতাদর্শ প্রচার করেছিল। উবাইদিদের শাসনকালে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। তারা বিকৃত আকিদা বিশ্বাস প্রচার করতো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবি রচিত 'আদ দাওলাতুল ফাতিমিয়্যা আল উবাইদিয়্যা'।

তিলাওয়াত করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে ইহুদির মনে দয়ার উদ্রেক হয়। সে শায়খের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। শায়খ শহিদ হয়ে যান।[১০৪] শায়খের ইন্তেকালের পর তার চামড়া থেকে কোরআন তিলাওয়াতের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।[১০৫]
ইমাম দারা কুতনি যখনই শায়খের কথা আলোচনা করতেন তখন তিনি কান্না করতেন। একবার তিনি বলেন, যখন শায়খের চামড়া তার শরীর থেকে আলাদা করা হচ্ছিল তখন তিনি কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন,

– – – – – – – – – – – – – – – –

ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৫৮)

শায়খ ছিলেন হাদিস ও ফিকহের ইমাম। একই সাথে হক কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে পরোয়া করতেন না। বেশিরভাগ দিন তিনি রোজা রাখতেন। শায়খ যখন মিসরে আসেন , তখন কেউ কেউ বলেছিল, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রেখেছেন। জবাবে শায়খ বলেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এখনো আমার দ্বীন নিরাপদ রেখেছেন।
শায়খের শাহাদাতের পর ইবনুশ শাশা তাকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে শায়খকে দেখা যায় সুন্দর অবয়বে। ইবনুশ শাশা প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? জবাবে শায়খ বলেন, আমার প্রভু আমাকে তার ভালোবাসায় আবদ্ধ করেছেন। তিনি আমাকে নৈকট্য দান করেছেন, এবং বলেছেন তার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে।[১০৬]

---

[১০৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৫/৩৬৭– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির।
[১০৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/১৪৯– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।
[১০৬] তারিখুল ইসলাম, ২৬/৩১২– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিক

দামেশক। ৯৯ হিজরি।

একজন নারীর জন্য তার স্বামীর উন্নতি ও মর্যাদা প্রাপ্তি পরম আনন্দের বিষয়। এমনই এক মুহূর্ত উপস্থিত ফাতেমা বিন্ত আবদুল মালিকের সামনে। ১৪ বছরের বৈবাহিক জীবনে এমন সময় আর আসেনি। এমন এক সৌভাগ্যের হাতছানি এসেছে যা খুব কম নারীর ভাগ্যেই জুটে।

শীঘ্রই মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে বাইয়াত নিবেন তাঁর স্বামী। ইতিমধ্যেই শহরে কেমন একটা সাড়া পড়ে গেছে।

অনেক স্মৃতি মনে আসছে তার। ১৪ বছর আগে এক সকালে তাঁর পিতা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বসেছিলেন এক সুদর্শন তরুনের সামনে। তরুণটি তার ভাতিজা। তরুণের জন্ম মদীনায়। সেখানেই তার পড়াশোনার হাতে খড়ি। ইতিমধ্যেই ইলমের জগতে এই তরুণ আলো ছড়াচ্ছে। তার চলাফেরায় ফুটে উঠে আভিজাত্য। তার পোষাক কিনে আনা হয় চারশো দিরহামে। তিনি যে পথে হাটেন সে পথের বাতাসে মিশে যায় আতরের সুগন্ধী।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন, তার মেয়ে ফাতেমাকে কার হাতে তুলে দেয়া যায়। অবশেষে তার মনে হয়েছে, আপন ভাতিজা উমর ইবনে আব্দুল আযিযই তো আছে। উমরের ইলম ও তাকওয়া তাকে মুগ্ধ করে। তিনি জানতেন মাইমুন বিন মেহরান বলেছেন, উমার বিন আবদুল আযিয আলেমদের শিক্ষক।

‘উমর, আমি তোমার কাছে আমার মেয়েকে বিবাহ দিতে চাই’ বললেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, পঞ্চম উমাইয়া খলিফা। তরুণের চেহারায় ফুটে উঠে সলাজ হাসি।

‘উমর তোমার ব্যয় কেমন?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জবাবে উমর সুরা ফুরকানের ৬৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

‘তারা যখন ব্যয় করে অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতা করে না। তারা এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে’।

জবান শুনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান মুগ্ধ হলেন। শীঘ্রই বিবাহ হয়ে গেল।

—

খলিফা হিসেবে বাইয়াত নিলেন ফাতেমার স্বামী উমার বিন আব্দুল আজিজ। সারাদিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, রাতের বেলা তিনি স্ত্রীর কাছে এলেন।

‘ফাতেমা, তোমাকে কিছু বলার ছিল’
‘বলে ফেলুন প্রিয়তম’
‘ তোমার যেসব অলংকার আছে, এসব কোথায় পেয়েছ?’
‘এগুলো বাবা আমাকে দিয়েছেন’
‘আমি চাই তুমি এগুলো বাইতুল মালে দিয়ে দাও। আমি চাইনা আমি, তুমি ও অলংকার সব এক ঘরে থাকুক’
‘আমি তো শুধু আপনার সন্তুষ্টিই চাই। এখুনি সব অলংকার নিয়ে যান। বাইতুল মালে জমা করে দিন’
—
শুরু হলো ফাতেমার নতুন জীবন। ফাতেমা জন্মেছিলেন রাজপ্রাসাদে। পিতা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ছিলেন খলিফা। চার ভাই, ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক, ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক, হিশাম বিন আবদুল মালিক প্রত্যেকেই ছিলেন খলিফা। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নেন নতুন জীবনের জন্য, যে পথে হাটছিলেন তার স্বামী উমার বিন আবদুল আজিজ। তারুণ্যের শুরুতে যে মানুষটি ছিলেন উচ্ছ্বল, সেই তিনিই খেলাফতের দায়িত্ব পেয়ে হয়ে উঠেন প্রচন্ড দায়িত্ববান। ত্যাগ করেন সবরকমের বিলাসিতা। তাকে সংগ দেন ফাতেমা।
ইরাকের এক মহিলা এসেছিলেন উমার বিন আবদুল আজিজের গৃহে। দেখলেন সুতা বুনছেন ফাতেমা। ঘরে নেই কোনো দামী আসবাব। এমনকি চাকরবাকরও নেই।
‘আপনাদের ঘরে দামি কিছুই নেই?’ বিস্ময় প্রকাশ করে সেই মহিলা। ফাতেমা মুচকি হাসেন।
ফাতেমাকে বলা হয়েছিল, আপনার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, অনেকসময় তিনি মুনাজাতে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তিনি বারবার বলেন গোটা উম্মাহর দায়িত্ব আমার কাঁধে। কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব?
—
ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিক ছিলেন সাহিত্যিক। কাব্যচর্চায় পারংগম। হাদীসশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন দক্ষ। তার থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন আতা ইবনু আবি রবাহ ও উত্তর আফ্রিকা বিজেতা উকবা বিন নাফের ছেলে উবাইদুল্লাহ।
(তারিখু দিমাশক, নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা)

কাজি মুগিসউদ্দিনের সাহসিকতা

দিল্লি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দরবারে ডেকেছেন বিশিষ্ট আলেম কাজি মুগিসউদ্দিনকে।

'আমি দেবগিরিতে হামলা করে যেসকল সম্পদ পেয়েছি তা আমার নিজের কাছেই রেখেছি। এটা কি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দেয়ার প্রয়োজন আছে?'[১০৭] প্রশ্ন করলেন সুলতান।

'এই হামলায় অর্জিত সম্পদ রাষ্ট্রের সেনাদের দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। তাই এই সম্পদ অবশ্যই বাইতুল মালে (কোষাগার) জমা দিতে হবে' কাজি সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

'এ কেমন কথা? এই অভিযানে আমি নিজের জান বাজি রেখে লড়েছি। এটা ছিল এমন এক স্থান যার কথা এর আগে দিল্লির লোকেরা জানতেও পারেনি' সুলতান রেগে গেলেন।

'আপনি আমার কাছে শরিয়তের মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাই বলেছি' কাজি মুগিসউদ্দিন শান্তকণ্ঠে বললেন।

'বাইতুল মাল থেকে আমি নিজের জন্য কী পরিমান ভাতা নিতে পারি?' সুলতান আবার প্রশ্ন করলেন।

' আপনি যদি খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণ করেন তাহলে নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য ২৩৪ তংকা গ্রহণ করতে পারেন। অথবা চাইলে আপনি দরবারের আমীরদের পরিমান ভাতাও গ্রহণ করতে পারেন। অথবা তাদের চেয়ে সামান্য কিছু বেশিও নিতে পারেন, যেন আপনার সম্মান ও বিশিষ্টতা থাকে। এই তিন পন্থার

---

[১০৭] সুলতান এই হামলা করেছিলেন কোড়া অঞ্চলের প্রশাসক থাকা অবস্থায়, তার শ্বশুর জালালুদ্দিন খলজির শাসনকালে। সে সময় স্ত্রীর সাথে আলাউদ্দিনের সম্পর্ক খারাপ ছিল, শ্বশুরের উপরও তিনি ছিলেন নাখোশ। তিনি চাচ্ছিলেন প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করে দূরে কোথাও চলে যাবেন। তাই সুলতানকে না জানিয়েই তিনি দেবগিরিতে হামলা করেন এবং প্রচুর সম্পদ অর্জন করেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন জিয়াউদ্দিন বারণী লিখিত তারীখে ফিরোজশাহী।

বাইরে যদি বাইতুল মাল থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করেন, লালা জওহর খচিত পোশাক যদি বাইতুল মাল থেকে নেন কিংবা কাউকে দেন তাহলে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে'

এই জবাব শুনে সুলতান আরো রেগে গেলেন। তিনি বললেন, আমি শুনেছি আপনি আমার অনেক আদেশকেই শরিয়াহ বিরোধী বলে প্রচার করছেন। যেমন, বিদ্রোহীদের সপরিবারে বিনাশ করা, ব্যভিচারীর পুরুষাংগ কেটে নেয়া এবং মহিলাকে হত্যা করা ইত্যাদী।

'আমিও আগেও বলেছি এখনও বলছি এগুলো পরিস্কার শরিয়াহ বিরোধী কাজ। শরিয়াহয় এমন কোনো আদেশ দেয়া হয়নি'

সুলতান প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আপনি কি আমার তরবারীকে ভয় করেন না?

'হ্যা ভয় করি। এজন্যই কাফনের কাপড় হিসেবে পাগড়ি সাথে নিয়ে ঘুরি' কাজি শান্তকণ্ঠে বললেন। এই জবাব শুনে সুলতান চুপ হয়ে গেলেন। একটু পর তিনি উঠে ভেতরে চলে যান। কাজি সাহেব নিজের গৃহে ফিরে আসেন। —

পরদিন কাজি মুগিস আবারও সুলতানের দরবারে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেন, গোসল করেন। তাকে দেখেই সুলতান প্রসন্ন হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, আপনি তো জানেন আমি পড়ালেখা করিনি। তবে আমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যের উন্নতির জন্যই নানাবিধ আদেশ দিয়েছি। এসব আদেশ দেয়ার সময় শরিয়াহর বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে পারিনি। জানি না কিয়ামাতের দিন আল্লাহ আমার জন্য কী ফয়সালা করেন।[১০৮]

---

[১০৮] নুজহাতুল খাওয়াতির, ২য় খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা– আবদুল হাই হাসানি নদভী।

মুসা বিন আবী গাসসান

১৪৯১ খ্রিস্টাব্দ।
তৃতীয়বারের মতো গ্রানাডা অবরোধ করেছেন ক্যাস্টোলার শাসক পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড। শেষবারের মত অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নামলো গ্রানাডাবাসী। তরুণরা সিদ্ধান্ত নিলো শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তারা খ্রিস্টানবাহিনীর মোকাবিলা করবে। এই সময়ে তরুণদের নেতৃত্বে ছিলেন মুসা বিন আবী গাসসান। তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, খ্রিস্টান সম্রাট জেনে রাখুক, আরবদের জন্মই হয়েছে বর্শা নিক্ষেপ ও ঘোড়ায় আরোহণের জন্য। শত্রুদের বিলাসবহুল প্রাসাদে অবস্থান করার চেয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করে গ্রানাডার কোনো ভগ্নদেয়ালের নিচে নিজের কবর নির্ধারণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।[১০৯]

শুরু হলো যুবকদের প্রতিরোধ। আল হামরা প্রাসাদে বসে ইতিপূর্বে করা নিজের ভুলের মাশুল দিচ্ছিলেন দূর্বল শাসক সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল আহমার আস সগির।
টানা সাত মাস যুবকদের সাথে খ্রিস্টানবাহিনীর লড়াই চলতে থাকে। ফার্ডিন্যান্ডের বাহিনী গ্রানাডার বাইরে থাকা গ্রামগুলোর উপর হামলা করে সবকটি গ্রাম দখল করে নেয়। শুধু ফাখখার গ্রামটি তখনো তারা দখল করতে পারেনি। এই গ্রামের দখলকে কেন্দ্র করে মুসলিমবাহিনীর সাথে তাদের বেশ কয়েকটি লড়াই হয়। খ্রিস্টানদের অনেক সেনা নিহত হয়। তবু তারা গ্রামটির দখল নিতে পারছিল না। মুসলমানরা প্রায়ই খ্রিস্টান শিবিরে গেরিলা হামলা চালাতো।
অবরোধ ও প্রতিরোধ দীর্ঘ হয়ে উঠে। মুসলমানদের সেনাসংখ্যাও কমতে থাকে। শীতের শুরুতে তীব্র তুষারপাত হয়। বন্ধ হয়ে যায় বাশারাহগামী সড়ক। ফলে

---

[১০৯] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা– মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান।

বাহির থেকে গ্রানাডায় রসদ আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বেড়া যায় দ্রব্যমূল্য ও ভিক্ষাবৃত্তি।
আবু আবদুল্লাহ ক্রমেই নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। তিনি আত্মসমর্পনে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু জনরোষের কথা ভেবে চুপ ছিলেন। অবরোধের শুরুতেই সুলতান এবং তার আমীরদের অনেকে নিজ মালিকানার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। গ্রানাডার পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের একাংশ সুলতানের সাথে দেখা করে তাকে আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ জানান। সুলতান এমন কিছুর অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি দ্রুত আমিরদের পাঠালেন ফার্ডিন্যান্ডের কাছে। দ্রুত উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়। মাক্কারীর বর্ননা মতে, এই সমঝোতা-চুক্তিতে মোট ৬৭টি শর্ত ছিল। চুক্তির ধারাগুলো ছিল চমকপ্রদ। যেমন, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করবে না। মুসলমানদের আদালত ও বিচারকার্য শরিয়াহ অনুসারেই হবে[১১০], কোনো মুসলমানকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হবে না, মুসলমানদের সম্পত্তির মালিকানা তাদের হাতেই থাকবে, কোনো খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কোনো বাধা দেয়া হবে না। কোনো মুসলমান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে আদালতের মাধ্যমে তার ফায়সালা হবে। তদন্ত করা হবে তাকে কেউ চাপ দিয়েছে কিনা।[১১১]

চুক্তি হয়ে গেল।

এই সংবাদ পেয়ে আল হামরা প্রাসাদে উপস্থিত হলেন মুসা বিন আবী গাসসান। সুলতান ও তার আমিরদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আপনারা কি নারী শিশুদের জন্য কান্না রেখে যাচ্ছেন? আমরা পুরুষ, আমাদের রয়েছে অন্তর, যা অশ্রু প্রবাহের জন্য নয়, বরং রক্ত প্রবাহিত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। হায়, গ্রানাডার সম্ভ্রান্তরা আজ প্রতিরোধযুদ্ধে যেতে ভয় পাচ্ছে।
এই বলে মুসা থামলেন। দরবারে পিনপতন নীরবতা। মুসা আবার কথা শুরু করেন, আপনারা নিজেকে নিজে ধোঁকা দিবেন না। খ্রিস্টানরা কখনোই তাদের

---

[১১০] এখানে সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী রহিমাহুল্লাহর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, পৃথিবীতে কিছুই নতুন নয়। সবকিছুই পুরনো কিছু থেকে কাটছাঁট ও ধার করা। চুক্তির এ অংশে ফার্ডিন্যান্ড যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বর্তমানেও তা দেয়া হচ্ছে। সেকালে আবু আবদুল্লাহ ও গ্রানাডার মুসলমানরা তা বিশ্বাস করেছিল , একালে আমরা বিশ্বাস করছি। সেকালে ফার্ডিন্যান্ড এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, একালেও কেউ তা করছে না। তবে বিশ্বাসের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে প্রতিদিনই। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না।

[১১১] নাফহুত তীব, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৭– মাক্কারি।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। আপনারা তার মহত্ত্বের প্রতি আস্থা রাখবেন না। সামনে যে দিনের আশংকা আমি করছি তার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ বিষয়। এই নগরীতে নেমে আসবে ধবংস, লুণ্ঠিত হবে আমাদের বসতবাড়ি, সম্ভ্রম হারাবে আমাদের নারীরা। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বন্দীশালা, চাবুক ও জিঞ্জির। আজ যারা সৌভাগ্যের মৃত্যুকে ভয় করছে, শীঘ্রই তারা এসব নির্যাতনের মুখোমুখি হবে। আল্লাহর কসম, আমি কখনোই এসব প্রত্যক্ষ করবো না। [১১২]

এই বলে মুসা বিন আবী গাসসান দরবার ত্যাগ করেন। তিনি বাড়িতে যান এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। এরপর তিনি পনেরোজন খ্রিস্টান সেনার একটি দলের সাথে লড়াই করতে থাকেন। অস্ত্রের আঘাতে তার শরীর টুকরো-টুকরো হয়ে যায়।[১১৩]

মুসা বিন আবী গাসসান যে আশংকা করেছিলেন , গ্রানাডার পতনের পর ঠিক তা-ই হয়েছিল। আন্দালুসের মুসলমানদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল নির্মম নির্যাতনের।

[১১২] ....

[১১৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, ৫ম খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা– মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান।

শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালামের দৃঢ়তা

একজন আলেম শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এ সংবাদ শুনে ঘরবাড়ি ছেড়ে তার পিছু নিয়েছে শহরবাসী। জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে গোটা শহর। অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল মিসরে। ৮০০ বছর আগে।

—

মিসরে তখন আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের শাসনকাল। সেসময় মিসরের প্রশাসনে মামলুকদের কর্তৃত্ব বাড়ছিল। আরবীতে মামলুক বলা হয় গোলাম বা দাসকে। আইয়ুবী শাসনামলে আমীর ও সুলতানরা যুদ্ধের জন্য মামলুকদের উপর ভরসা রাখতেন। তাদের দেয়া হতো উচ্চতর প্রশিক্ষণ। মামলুকদের আরবী শেখানো হতো। ফিকহের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত। সাধারণত এই মামলুকদের সংগ্রহ করা হতো খাওয়ারেজম ও মা ওয়ারাউন্নাহার অঞ্চল থেকে। নিজেদের যোগ্যতাবলে মামলুকরা প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে। নাজমুদ্দিন আইয়ুবের আমলে একজন মামলুক সুলতানের সহকারী পদে নিয়োগ পান। এছাড়া আরো কয়েকজন মামলুক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ন পদে অবস্থান করছিলেন। এ বিষয়ে মিসরের আলেমরা চুপ থাকলেও একজন আলেম গর্জে উঠেন। তিনি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, এই সকল আমীরদের শরিয়তসম্মত পন্থায় মুক্ত করা হয়নি। তাই এরা ক্রীতদাস হিসেবেই বিবেচিত। এদের সাথে লেনদেন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ঠিক হবে না।

শায়খের এই ফতুয়ার ফলে জনমত প্রভাবিত হয়। বাধ্য হয়ে আমিররা এই আলেমের কাছে এসে বললেন, আপনি কী চান? শায়খ বললেন, আমি চাই বড় একটি মজলিস ডাকা হবে। সেখানে বাইতুল মালের পক্ষ থেকে আপনাদের নীলামে চড়ানো হবে। এরপর আপনাদেরকে শরয়ী পন্থায় আযাদ করা হবে।

আমিরদের জন্য পুরো ব্যাপারটিই ছিল লজ্জাকর। আমিররা এ বিষয়ে নাজমুদ্দিন আইয়ুবের সাথে আলাপ করেন। সুলতান নানাভাবে এই আলেমকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কারো কথাই মানছিলেন না। শেষে সুলতান বিরক্ত হয়ে বললেন, এসবের সাথে তার কী সম্পর্ক? তাকে কে বলছে আমিরদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে?

সুলতানের কথা আলেমের কানে আসে। তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি মিসর ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করবেন। তিনি দ্রুত তার পরিবারকে নিয়ে কায়রো ত্যাগ করেন। এদিকে এই আলেমের শহর ত্যাগের ঘটনা জানতে পেরে কায়রোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উলামা, সুফি, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার লোকেরা তার পিছু নেয়। তাদের একটাই কথা, শায়খ যে শহরে থাকবেন না, আমরাও সেখানে থাকবো না। শায়খ যেদিকে যাবেন, আমরাও সেদিকে যাবো। সুবহানাল্লাহ, এ ছিল সমকালীন জনজীবনে একজন আলেমের প্রভাব। একজন আলেম শহর ত্যাগ করছেন বলে শূন্য হয়ে যাচ্ছে কায়রো।

—

এই সংবাদ পৌছলো সুলতানের কানে। সুলতান নিজেই এবার শায়খের কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কায়রো ফিরিয়ে আনেন। সুলতান সিদ্ধান্ত নেন, আমিরদেরকে নিলামে তোলা হবে। একথা শুনে সুলতানের সহকারী রেগে যান। তিনি বলেন, আমরা দেশের শাসক। আর সে আমাদের নিলামে তুলবে ? দেখি কীভাবে সে আমাদের নিলামে তোলে। আমি যাচ্ছি, সে বাড়াবাড়ি করলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। এই কথা বলে তিনি নাংগা তরবারী হাতে শায়খের ঘরের সামনে উপস্থিত হন। শায়খের ছেলে আবদুল লতিফ দরজা খুলে দেয়।

ছেলে পিতাকে জানায় সুলতানের সহকারী নাংগা তরবারী হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। শুনে শায়খ বললেন, তোমার পিতার সৌভাগ্য, হয়তো সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। শায়খ ঘর থেকে বের হন। শায়খকে দেখেই সুলতানের সহকারীর হাত কাপতে থাকে। তার হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়।

তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, হে আমাদের অভিভাবক, আপনি কী চান? শায়খ নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, আমি চাই তোমাদেরকে নিলামে তুলে বিক্রি করবো।

‘আমাদের মূল্য কী কাজে লাগাবেন?’

‘মুসলমানদের কাজে’

‘এর দাম কে দিবে?’

‘আমি নিজেই দিব’

সুলতানের সহকারী রাজি হয়ে যান। নির্ধারিত দিনে নিলাম ডাকা হয়। শায়খ সকল মামলুক আমিরকে নিলামে তোলেন। তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে উচু দাম নির্ধারণ করেন। সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব নিজের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে সকল আমিরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। বিক্রয়মূল্য বাইতুল মালে জমা করা হয়।
সেদিন থেকে শায়খকে বাইউল উমারা বা আমির বিক্রেতা বলে অভিহিত করা হতে থাকে।
এই ঘটনা উল্লেখ করে তকিউদ্দিন আস সুবকি লিখেছেন, ইতিপূর্বে আর কোনো আলেমের ক্ষেত্রে এমনটা শোনা যায়নি।[১১৪]

—

এ ছিল একজন আলেমের সাহসিকতা ও দৃঢ়তা। এই আলেম সাধারণ কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম।

—

ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালামের জন্ম ৫৭৮ হিজরীতে, সিরিয়ার দামেশকে। যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে তার পড়াশোনার পাঠ সমাপ্ত হয়। পড়াশোনা শেষে তিনি দীর্ঘদিন যাবিয়া-ই-গাযালিয়া নামক স্থানে দরস দেন। দামেশকের জামে উমাভির খতিব ছিলেন অনেকদিন। এসময় তিনি শিরক, বিদাত উচ্ছেদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

—

সিরিয়ায় অবস্থানকালে শায়খ সিরিয়ার শাসক সালিহ ইসমাইলের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। সালিহ ইসমাইল ছিলেন মিসরের শাসক নাজমুদ্দিন আইয়ুবের ভাই। তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি ছিল। সালেহ ইসমাইল নিজের ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করার জন্য খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করেছিল। চুক্তির শর্তাবলী ছিল,
১। সালেহ ইসমাইল খ্রিস্টানদের সয়দা ও সাকিফ শহর প্রদান করবে।
২। খ্রিস্টানদেরকে দামেশক থেকে অস্ত্র কেনার সুযোগ দেয়া হবে।
৩। মিশর আক্রমনের সময় সালেহ ইসমাইল খ্রিস্টানদেরকে সংগ দিবে।[১১৫]
তিনটি শর্তই চুড়ান্ত অপমানজনক। কিন্তু ক্ষমতার লোভে মত্ত সালেহ ইসমাইলের এসব ভাবার সময় কোথায়।

—

শায়খ ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম জুমার খুতবায় এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন।

---

[১১৪] তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৮ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা– আল্লামা তকিউদ্দিন আস সুবকি।
[১১৫] কিসসাতুত তাতার, ২৬২ পৃষ্ঠা– ড রাগেব সিরজানি

তিনি পরিস্কার বলে দেন, মুসলমানদের শহরগুলো সালেহ ইসমাইলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যে সে চাইলেই যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিবে। এছাড়া খ্রিস্টানরা এই অস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে সুতরাং তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করাও নাজায়েজ। শায়খ ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি জুমার খুতবায় সুলতানের জন্য দোয়া করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া তিনি দোয়ায় বারবার বলতেন, হে আল্লাহ, আপনি ইসলামের অনুসারীদের সাহায্য করুন। মুলহিদ ও ধর্মের শত্রুদের লাঞ্চিত করুন।

—

অল্পকদিনের মধ্যেই শায়খের সকল পদপদবী কেড়ে নেয়া হয়। শায়খকে বন্দী করা হয়। কিছুদিন পর শায়খকে বাইতুল মাকদিসে পাঠানো হয়।
এদিকে সালেহ ইসমাইল, হেমসের শাসনকর্তা আল মালিকুল মানসুর ও খ্রিস্টান নেতারা মিসরে হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা নিজস্ব সেনাবাহিনী নিয়ে বাইতুল মাকদিসে আগমন করে। সালেহ ইসমাইল শায়খের বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে নিজের এক সহকারিকে একটি রুমাল দিয়ে বলে এটি শায়খকে দিয়ে আসো। তুমি তাকে বলবে তিনি চাইলেই আমি তাকে পূর্বের সকল পদ ফিরিয়ে দিব। তিনি যদি তিনি তা না চান তাহলে তাকে আমার পাশের তাবুতেই বন্দী করে রাখা হবে। সেই আমির শায়খের কাছে এসে বললো, আপনি সুলতানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলুন। আপনি তার দরবারে যান। আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। শুধু সুলতানের হাত চুম্বন করলেই হবে। তিনি আপনাকে আপনার সব পদ-মর্যাদা ফিরিয়ে দিবেন।

—

একটি সুবর্ণ সুযোগ। শায়খ চাইলেই আবার ফিরে পাবেন নিজের হারানো পদ-মর্যাদা। মুক্তি পাবেন কারাগার থেকে। আবার তিনি ফিরে যেতে পারবেন মসজিদের দরসে, মাদরাসার মসনদে। শায়খ চাইলে ভাবতে পারতেন, আমি মুক্ত হলে কতো কতো খেদমত করতে পারবো। কিন্তু শায়খ জানতেন, তার মুক্ত হওয়া মানে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া, পরাজিত হওয়া। যতক্ষণ সালেহ ইসমাইল নিজের কর্ম থেকে সরে আসবে না, ততক্ষন তার পক্ষ নেয়ার সুযোগ নেই।
শায়খ দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, আরে মূর্খ, বাদশাহ আমার হাত চুম্বন করুক, এটাও তো আমি চাই না। আর সেখানে আমি কেনো তার হাত চুম্বন করবো? শুনে নাও, তোমরা এক জগতের বাসিন্দা, আমি অন্য জগতের। প্রশংসা আল্লাহর, তোমরা যার হাতে বন্দী, আমি তা থেকে মুক্ত।
শায়খের জবাব শুনে শায়খকে সুলতানের পাশের তাবুতে বন্দী করা হয়। একদিন শায়খ সেই তাবুতে বসে তিলাওয়াত করছিলেন। পাশের তাবুতে সুলতান ও

খ্রিস্টান রাজা বসা ছিল। সুলতান বললো, পাশের তাবুতেকে আছে জানো? সে মুসলমানদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। তোমার সাথে চুক্তি করায় সে আমার বিরোধিতা করে। তাই আমি তাকে বন্দী করেছি। একথা শুনে খ্রিস্টান রাজা বললো, সে যদি আমাদের পাদ্রী হতো তাহলে আমরা তার পা ধুয়ে পানি পান করতাম।

—

কিছুদিন পরেই মিসরী বাহিনীর সাথে সালেহ ইসমাইলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সালেহ ইসমাইল ও খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। শায়খ মুক্ত হন। তিনি মিসরের দিকে রওনা হন।

পথে কির্কের শাসক তাকে কির্কে অবস্থানের আবেদন জানান। শায়খ বলেন, তোমাদের এই ছোট শহর আমার জ্ঞানের ভার বইতে পারবে না।[১১৬]

শায়খ যখন মিসরে পৌছলেন (৬৩৯ হিজরীতে) তখন আত তারগিব ওয়াত তারহিব গ্রন্থের লেখক আল্লামা মুনযিরি বললেন, আজ থেকে আমি আর ফতোয়া দিব না। যে শহরে ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালামের মত আলেম অবস্থান করেন সেখানে অন্যদের ফতোয়া দেয়া উচিত নয়।

—

শায়খ একবার সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের দরবারে উপস্থিত হন। দরবার চলছিল তখন। শায়খ সুলতানকে কোনো সম্মান না জানিয়ে সরাসরি বলেন, আইয়ুব তোমার রাজত্বে স্বাধীনভাবে মদপান করা হয়। কেয়ামতের দিন এ বিষয়ে আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দিবে?

নাজমুদ্দিন আইয়ুব বলেন, আসলেই কি এমনটা হচ্ছে? তখন শায়খ বিভিন্ন এলাকার নাম বলেন। সুলতান তখনই এসব মদের দোকান বন্ধ করার আদেশ দেন।

শায়খ শুধু নির্জন খানকাহয় বসা সাধক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মর্দে মুজাহিদ। একবার ক্রুসেডারদের সাথে নাজমুদ্দিন আইয়ুবের লড়াই চলছিল। ক্রুসেডাররা মানসুরা পৌছে গিয়েছিল। শায়খ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সাথে। যুদ্ধে খ্রিস্টানরা এগিয়ে গেলে শায়খ কয়েকবার , হে বায়ু, তাদেরকে আটকে ফেলো, বলে চিৎকার করেন। কিছুক্ষণ পরে বাতাসের গতি পালটে যায়, ক্রুসেডারদের অনেকগুলো জাহাজ ডুবে যায়। যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে এগিয়ে

---

[১১৬] তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৮ম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা– আল্লামা তকিউদ্দিন

আসে।[১১৭]

৬৫৮ হিজরী। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ।
তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয। সিরিয়া দখলের পর তাতাররা এগিয়ে আসছে মিসরের দিকে। মিসরের কোষাগার প্রায় শূন্য তখন। সাইফুদ্দিন কুতুয সিদ্ধান্ত নিলেন জনগনের উপর কর ধার্য করবেন। যে মজলিসে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শায়খ ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, দুটি শর্তসাপেক্ষে কর নেয়া জায়েজ হবে।
১। রাষ্ট্রিয় কোষাগারে সম্পদ না থাকতে হবে।
২। আমির ও সভাসদরা তাদের তরবারী ও ঘোড়া ব্যতিত সব বিক্রি করে দিবে।
এরপরও যদি অর্থের দরকার হয় তখন কর বাসানো যাবে।
শায়খের এই ফতোয়া মেনে নেয় সবাই। আমিররা নিজেদের সকল সম্পদ বিক্রি করে দেয়।[১১৮]

—

এই ঘটনার সময় শায়খের বয়স ছিল ৮০ বছর। তবু শায়খ শরিয়াহর ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। নিজেকে মাজুর মনে করে কুতুযের কাজের বৈধতা দেননি, কিংবা খাদেমবর্গ দ্বারাও প্রভাবিত হননি।

—

শায়খ ছিলেন উচু মাপের আলেম। ইবনুল হাজিব বলেছেন, ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম গাজালির চেয়েও বড় ফকীহ ছিলেন।
তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তিনি যুহদে ছিলেন অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। সর্বদা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করতেন। জালালুদ্দিন সুয়ুতী বলেছেন, তিনি শাইখুল ইসলাম, সুলতানুল উলামা। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেছেন, তার যুগে তিনি একাই ছিলেন অনন্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তার কাছে আসতো।[১১৯]

—

শায়খ সত্য প্রচারে কঠোর ছিলেন। যা হক তাই প্রচার করতেন। নিজের ভুল হলে অকপটে স্বীকার করতেন। মিসরে অবস্থানকালে তিনি একটি ভুল ফতোয়া দেন।

---

[১১৭] তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৮ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা– আল্লামা তকিউদ্দিন আস সুবকি।
[১১৮] তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৮ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা– আল্লামা তকিউদ্দিন আস সুবকি।
[১১৯] আল ইয বিন আব্দিস সালাম সুলতানুল উলামা ওয়া বাইউল মুলুক– মুহাম্মদ যুহাইলি।

পরে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষনা দেন, আমার ফতুয়াটি ভুল ছিল। কেউ যেন এর উপর আমল না করে।[১২০]

—

শায়খের জানাযায় আল মালিকুজ জাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স বলেছিলেন, আজকে আমার শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। যদি তিনি বলতেন, হে জনতা তোমরা বের হও, বিদ্রোহ কর। তাহলে লোকেরা তাই করতো ।[১২১]

শায়খ ইন্তেকাল করেন ৬৬০ হিজরীতে।

---

[১২০] হুসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহেরা, ২য় খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা — জালালুদ্দিন সুয়ুতী।
[১২১] তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৮ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা– আল্লামা তকিউদ্দিন আস সুবকি।

নুর কুতুবুল আলম : দুর্যোগকালের মহানায়ক

পান্ডুয়া।
রাত নেমেছে। নির্জন হয়ে গেছে শহরের পথঘাট। কুতুব শাহি মসজিদের প্রশস্ত চত্বরে একটানা বয়ে চলছে দখিনা বাতাস। এশার নামাজ শেষ হয়েছে অনেক আগে। হাতের কাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে লোকজন। সুফি দরবেশ নুর কুতুবুল আলমের খানকায়ও সবাই ঘুমাচ্ছে। শুধু দরবেশ একা জেগে আছেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই। দুচোখে খেলা করছে দুশ্চিন্তা। নিজের জন্য তাঁর কোনো চিন্তা নেই। পরিবারের জন্যও না। তিনি চিন্তিত বাংলার মুসলমানদের জন্য। যে বিপদ আজ ধেয়ে এসেছে বাংলার মুসলমানদের উপর তা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে ভাবছেন তিনি। হিন্দুত্ববাদী শক্তির হাতে আজ বাংলার মুসলমানরা নির্যাতিত। কদিন আগেই হত্যা করা হয়েছে বিখ্যাত দরবেশ বদরুল ইসলামকে। মহানন্দা নদীতে নৌকা ডুবিয়ে মারা হয়েছে আরও অনেক সুফি-দরবেশকে[১২২]। রাজা গনেশের কালো থাবায় বাংলার মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত। আদীনা মসজিদকে বানানো হয়েছে রাজার কাছারি। সেখানে থেমে গেছে আজানের ধ্বনি। স্থাপন করা হয়েছে পাথুরে মূর্তি[১২৩]। নুর কুতুবুল আলম অজু করে এলেন। তিনি কিয়ামুল লাইলে দাঁড়াবেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই। তাঁর কাছেই তিনি সাহায্য চাইবেন।

২. সাম্রাজ্যের পতন একদিনে হয় না। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনগুলিতেই জন্ম নেয় ঘুণপোকা। আর তা ভেতর থেকে খেয়ে শেষ করে দেয় সাম্রাজ্যকে। বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহি শাসনামল এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হাজি ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বাংলার সুলতান হন। তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার সর্বপ্রথম সুলতান। তাঁর সময়কালেই এই অঞ্চলকে বাংগালাহ নামে অভিহিত করা হয়। একজন দক্ষ শাসক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

---

[১২২] বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭), পৃ-৮১ – আবদুল করিম। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
[১২৩] ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আবিদ আলী খান মালদহী ব্রিটিশ সরকারের আদেশে গৌড় ও পান্ডুয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, আদীনা মসজিদের সিঁড়ির ভাঙ্গা অংশে একটি সিংহের মাথা দেখা যায়। এছাড়া মেহরাবে ও মসজিদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন হিন্দু মূর্তি দেখা যায়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতিকথা, পৃ- ১৫৬ – আবিদ আলী খান মালদহী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

কিন্তু তিনি যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নিজের অজান্তে নিজেই সেই রাজত্বের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন সুলতান। ফলে দিল্লির সুলতানদের সাথে তাঁকে লড়তে হচ্ছিল। এসব লড়াইয়ে তিনি হিন্দুদের সাহায্য নেন। ফলে তাঁর সময়কালেই হিন্দুরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করে। তারা কেউ কেউ সেনাপতি ও উজিরের পদেও আসীন হয়[১২৪]। পরবর্তী ইলিয়াস শাহি সুলতানদের আমলেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শাসনামলেও দেখা যায় হিন্দুরা বাংলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছে। এ সময় ভাতুড়িয়ার জমিদার গনেশ রাজদরবারে উচ্চপদ লাভ করেন।

বিহারের বিখ্যাত সুফি মাওলানা মুজাফফর শামস বলখি সুলতানের কাছে লিখিত এক পত্রে তাঁকে সতর্ক করে লিখেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা উম্মাহর বাইরে কারও সাথে মিত্রতা করো না।" তাফসিরে বলা হয়েছে, "মুমিনরা অবিশ্বাসী ও অপরিচিতদের উজির ও কর্মচারী নিয়োগ করবে না।" যদি মুমিনরা বলে তারা কাফেরদেরকে বন্ধু বানাচ্ছে না, বরং সুবিধার জন্য তারা এমন করছে, তাহলে বলব এতে কোনো সুবিধাই হয় না। বরং বিদ্রোহ ও গোলযোগই বাড়ে। অমুসলিমদের ছোটখাটো পদে নিয়োগ দেয়া যায়, কিন্তু তাদেরকে ওয়ালি বা গভর্নর পদে নিয়োগ দেয়া যায় না। তাহলে তারা মুমিনদের উপর কতৃত্ব খাটাবে। দেখা যাচ্ছে অমুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে মুসলিমদের উপর কতৃত্ব খাটাচ্ছে। এমনটা হওয়া উচিত নয়[১২৫]।'

মাওলানা বলখির সতর্কবাণী কানে তোলেননি সুলতান। সুলতানকে সতর্ক করেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু সুফি নুর কুতুবুল আলমও। বাল্যকালে দুজন একসাথে পড়াশোনা করেছিলেন কাজি হামিদুদ্দিন নাগোরির কাছে। বাল্যবন্ধুকে নানাভাবে সতর্ক করেছিলেন নুর কুতুবুল আলম। কিন্তু সুলতান সতর্ক হননি। নুর কুতুবুল আলমের ভাই আজম শাহ ছিলেন সুলতানের প্রধান উজির। তিনিও কর্ণপাত করেননি ভাইয়ের সতর্কবাণীতে। রাজত্বের বড় বড় পদ চলে যাচ্ছিল হিন্দুদের দখলে। তারা ক্রমেই হয়ে উঠছিল শক্তিশালী। সুলতান বুঝতেও পারেননি তিনি নিজেকে ও নিজের রাজত্বকে কতটা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন। মাওলানা বলখি সুলতানকে যে সতর্কবাণী লিখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হলো ৮১৩ হিজরিতে (১৪১০-১১ খ্রিষ্টাব্দ)। সে বছর নিহত হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ।

---

[১২৪] বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ২১২ – আবদুল করিম। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ- ২১১

তাঁকে হত্যা করেছিলেন তাঁরই একান্ত আস্থাভাজন রাজা গনেশ[১২৬]। পরবর্তী দিনগুলিতে বাংলার মুসলমানদের জন্য যিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত বিভীষিকা।

৩. গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতাপের যুগ শেষ হয়ে যায়। এরপর যে কজন সুলতান শাসন করেছেন তাঁরা ছিলেন মূলত রাজা গনেশের হাতের পুতুল। তাঁদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ছিল না। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের পর তাঁর ছেলে সাইফুদ্দিন হামজা শাহ ক্ষমতায় বসেন। দুবছর রাজত্ব করার পর ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে গনেশের ইশারায় ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিনের হাতে তিনি নিহত হন।
রাজত্ব চলছিল গনেশের হাতের ইশারায়। কিন্তু তখনো তিনি নিজে সামনে আসেননি। হামজা শাহকে হত্যা করার পর তিনি শিহাবুদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। তিন বছর পর , ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে গনেশের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ কয়েক মাস শাসন করেন। গনেশ তাঁকেও হত্যা করেন। গনেশ ততদিনে সর্বত্র নিজের লোকজন বসিয়ে ফেলেছেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই আর। আর অপেক্ষা নয়। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে গনেশ সিংহাসনে আসীন হলেন। নিজের নাম রাখলেন দনুজমর্দ্দনদেব। নিজের নামে মুদ্রা চালু করলেন[১২৭]।

৪. ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটেছে। বাংলার মসনদে রাজা গনেশ। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো চলে গেছে হিন্দুদের দখলে। তাই শুরু থেকেই রাজা গনেশ ছিলেন বেপরোয়া। মুসলমানদের উপর চলতে থাকে নানা জুলুম-নির্যাতন। গনেশ চাচ্ছিলেন বাংলা থেকে ইসলামধর্ম সমূলে উৎখাত করতে। ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন সলিম লিখেছেন, ‘একবার বিখ্যাত সুফি বদরুল ইসলাম রাজার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁকে বলা হলো রাজাকে সম্মান দেখাতে। তিনি বললেন, “ইসলামধর্ম মতে বিধর্মীকে সম্মান দেখানো যায় না। আর রাজা মুসলমানদের উপর অনেক অত্যাচার করছেন, তাই তাঁকে সম্মান দেখাব না।” রাজা এই কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর আদেশে বদরুল আলম ও তাঁর ভাইদেরকে হত্যা করা হয়[১২৮]।’

[১২৬] বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭), পৃ-৭৬ – আবদুল করিম। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮
[১২৮] রিয়াযুস সালাতিন, পৃ- ৯০ – গোলাম হুসেন সলীম। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

এরপর রাজার আদেশে অনেক আলেম ও সুফিকে মহানন্দা নদীতে নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। রাজা গনেশের প্রতি মুগ্ধ হিন্দু ঐতিহাসিক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন[১২৯]।

গনেশের আদেশে ঐতিহাসিক আদীনা মসজিদকে বানানো হয় রাজার কাছারি। সেখানে স্থাপন করা হয় মূর্তি। রাজ্যের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। নির্যাতিত মুসলিমদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠছে আকাশ-বাতাস। তাদের রক্ষার কেউ নেই। পাশে উড়িষ্যা, আসাম ও কামরুপে চলছে হিন্দু রাজত্ব। ইতিপূর্বে সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তাদের সাথে লড়াই করেও দমন করতে পারেননি তাদের। ফলে বাহির থেকে সাহায্য আসারও সম্ভাবনা নেই। বাংলার মুসলিমরা যাত্রা শুরু করেছিল এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে।

৫. গনেশের উপর আঘাতটা এলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। পান্ডুয়ার খানকাহর এক নিরীহ সৌম্যদর্শন সুফি সাধক নুর কুতুবুল আলম রাতারাতি হয়ে উঠলেন গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। দরবেশ আলাউল হকের ছেলে নুর কুতুবুল আলম সারাজীবন কাটিয়েছিলেন পড়াশোনা ও আধ্যাত্মিকতার সাধনা করে। বাল্যবন্ধু সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তাঁকে প্রস্তাব করেছিলেন বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে। কিন্তু সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রাজদরবারের সাথে সবসময় বজায় রেখেছিলেন দূরত্ব।
কিন্তু বাংলার এই বিপদের সময় তিনি আর নীরব থাকলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এখনই তাঁকে কিছু করতে হবে। সেনাবাহিনী ও প্রশাসন চলে গেছে হিন্দুদের কতৃত্বে। তাদের দিক থেকে সাহায্য পাবার সুযোগ নেই। নিরস্ত্র মুসলিমরাও গনেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। সমাধান একটাই, জৌনপুরের শর্কি সালতানাতের দ্বারস্থ হওয়া।

৬. নুর কুতুবুল আলমের খানকাহ। পান্ডুয়া।
নিজের কক্ষে বসে আছেন নুর কুতুবুল আলম। খাদেম কাগজ কলম দিয়ে গেছে। নুর কুতুবুল আলম পত্র লিখবেন সুলতান ইবরাহিম শর্কির কাছে। শেষবারের মতো মনে মনে পত্রের কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছেন তিনি। খাদেমকে বলে দিলেন কেউ যেন বিরক্ত না করে। নুর কুতুবুল আলম লিখতে শুরু করলেন, ‘এই দেশের শাসনকর্তা কংস (গনেশ) একজন বিধর্মী। তিনি এখানে অত্যাচার ও রক্তপাত

---

[১২৯] বাংলার ইতিহাসের দু’শো বছর, পৃ-১০৯ – শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়। ভারতী বুকস্টল, কলকাতা। আরেকজন হিন্দু ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার গনেশ সম্পর্কে লিখেছেন, পরমধর্মদ্বেষ হইতে রাজা গনেশ একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দেখুন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ- ৬৩ – শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

চালাচ্ছেন। অনেক আলেম ও সুফিকে হত্যা করেছেন। তিনি এই অঞ্চল থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করার চিন্তায় ব্যস্ত। যেকোনো মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হলো মুসলমানদের সাহায্য করা। এইজন্য আমি আপনাকে এই পত্র লিখছি। এই দেশের বাসিন্দাদের উদ্ধারের জন্য এখানে আপনি আগমন করুন। মুসলমানদেরকে অত্যচারীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইতি নুর কুতুবুল আলম।'

একজন পত্রবাহকের হাতে চিঠি তুলে দিয়ে নুর কুতুবুল আলম বললেন, 'দ্রুত এই পত্র সুলতান ইবরাহিম শর্কির হাতে পৌছে দাও[১৩০]।'

৭. সুলতান ইবরাহিম শর্কির দরবার।

নুর কুতুবুল আলমের পত্র এসে পৌঁছেছে তাঁর কাছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। তাঁর রাজত্বের সীমানা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। দরবেশ তাঁকে অনুরোধ করছেন বাংলায় আক্রমণ করার জন্য। কাজটা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। সুলতান পরামর্শ চাইলেন কাজি শিহাবুদ্দিন জৌনপুরির কাছে।

'আপনার এখুনি যাত্রা শুরু করা উচিত। একদিকে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়ে সওয়াব অর্জন করবেন অপরদিকে দরবেশ নুর কুতুবুল আলমের সাক্ষাতলাভে ধন্য হবেন।'–পরামর্শ দিলেন কাজি শিহাবুদ্দিন।

এরপর সুলতান পরামর্শ চাইলেন বিখ্যাত বুজুর্গ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানির কাছে। জবাবি পত্রে শায়খ সিমনানি লিখলেন, 'ধার্মিক রাজার জন্য মুসলমানদের রক্ষা করতে সেনাবাহিনী প্রেরণের চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। বাংলায় এখনো অনেক দরবেশ বসবাস করছেন, যদি তাঁদেরকে রক্ষা করা যায় তবে তা খুবই ভালো কাজ হবে।'

দুজন আলেমের পরামর্শ পেয়ে উজ্জীবিত হলেন সুলতান ইবরাহিম শর্কি। আদেশ দিলেন রণপ্রস্তুতির। যুদ্ধের ডংকা বেজে উঠল।

৮. ৮১৮ হিজরি। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে ছুটে এলেন সুলতান ইবরাহিম শর্কি। পথে ত্রিহুতের রাজা শিবসিংহের সাথে এই বাহিনীর লড়াই হলো। শিবসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন। সুলতানের বাহিনী আবার বাংলার পথে যাত্রা শুরু করে।

এদিকে গনেশ জেনে গেছেন নুর কুতুবুল আলমের পত্র পেয়ে সুলতান ইবরাহিম শর্কি এগিয়ে আসছেন বাংলার দিকে। পরাজিত হয়েছেন ত্রিহুতের রাজা। নিজের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে শংকিত হয়ে ওঠেন গনেশ। দ্রুত ছুটে এলেন নুর কুতুবুল আলমের খানকাহয়।

---

[১৩০] রিয়াযুস সালাতিন, পৃ- ৯১ – গোলাম হুসেন সলীম। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

দরবেশের সামনে সমর্পণ করলেন নিজেকে। কেঁদেকেটে ক্ষমা চাইলেন নিজের অপরাধের জন্য। ‘আমাকে ক্ষমা করুন। সুলতান ইবরাহিমকে বলুন তিনি যেন এখানে না আসেন।’—বললেন গনেশ।
‘আমি কোনো বিধর্মীর জন্য সুপারিশ করতে পারব না। তুমি অত্যাচারী। মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছো। আমিই তাঁকে এখানে আসতে বলেছি।’—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন নুর কুতুবুল আলম।
‘আপনি যে আদেশ করবেন আমি তা-ই মেনে নেবো।’—গনেশের কণ্ঠে আগের সেই প্রতাপ নেই। তাঁর কণ্ঠে খেলা করছে অসহায়ত্ব।
‘তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তারপর আমি দেখব কী করা যায়।’—*শেষ ফায়সালা জানালেন নুর কুতুবুল আলম।*

৯. গনেশের মনে কী ছিল তা জানা যায় না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, গৃহে ফিরে গনেশ রানীর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। রানী তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেন। গনেশ আবার এলেন নুর কুতুবুল আলমের খানকায়। এবার তাঁর সাথে তাঁর বারো বছর বয়সী পুত্র যদু।
‘আমি বৃদ্ধ হয়েছি। রাজ্যশাসনের লোভ আর নেই। আমার এই পুত্রকে আপনি মুসলমান করে নিন। আমি তাঁর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেবো।’—গনেশ প্রস্তাব দিলেন।
নুর কুতুবুল আলম নীরব রইলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, অযথা রক্তপাতের বদলে যদি শান্তিপূর্ণভাবে সবকিছুর সমাধান হয় তাহলে তো ভালোই। তিনি গনেশের প্রস্তাব মেনে নিলেন। যদুকে কালেমা পড়িয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হলো। তাঁর নাম রাখা হলো জালালউদ্দিন। সেদিনই তাঁকে মসনদে বসানো হলো। পুরো বাংলায় তাঁর নামে খুতবা চালু হলো।
কাছাকাছি চলে এসেছেন ইবরাহিম শর্কি। নুর কুতুবুল আলম দেখা করলেন তাঁর সাথে। অনুরোধ করলেন ফিরে যেতে। ‘আপনিই তো আমাকে ডেকে এনেছেন।’—বিরক্তস্বরে বললেন সুলতান।

‘আমি যখন পত্র লিখেছিলাম তখন এক অত্যাচারী বিধর্মী মুসলমানদের নির্যাতন করছিল। কিন্তু আপনার আগমনের ভয় পেয়ে সে তার ছেলের হাতে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। তার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। জিহাদ আবশ্যক কাফেরের বিরুদ্ধে, মুসলিমের বিরুদ্ধে নয়।’ শান্তকণ্ঠে বললেন নুর কুতুবুল আলম।
অসন্তুষ্ট সুলতান তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন জৌনপুরে।

১০. সুলতানের বাহিনী ফিরে যেতেই আবার স্বরূপে আবির্ভূত হলেন গনেশ। তিনি নিজের ছেলের পদচ্যুতি ঘটালেন এবং নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ব্রাহ্মণদের পরামর্শমতে জালালউদ্দিনকে আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু জালালউদ্দিন মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল রইলেন। ফলে তাঁকে রাজার আদেশে বন্দী করা হয়।
মুসলমানদের উপর আবার শুরু হয় নির্যাতন। নুর কুতুবুল আলমের ছেলে শায়েখ আনোয়ারকে হত্যা করা হয়। নাতি শায়েখ জাহিদ বন্দী হন সোনারগাঁতে। নতুন এই বিপর্যয়ে নুর কুতুবুল আলম ছিলেন অনেকটাই অসহায়। বাংলা থেকে ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই ইবরাহিম শর্কি মারা যান। ফলে নুর কুতুবুল আলম তাঁর শক্তিশালী মিত্রকে হারান। এ সময় এক আত্মীয়ের কাছে লেখা পত্রে নুর কুতুবুল আলম লিখেন, 'আমাদের সাহায্য আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এখন আমাদের উচিত সারারাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া[১৩১]।'

১১. ইবরাহিম শর্কি ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন নুর কুতুবুল আলম। সময়টা ছিল ৮১৮ হিজরি (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ)। নুর কুতুবুল আলমের মৃত্যুতে গনেশ আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বেশিদিন শাসন করা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। মাত্র চৌদ্দমাস পরেই তিনি নিহত হন। কারাগার থেকে জালালুদ্দিন পিতাকে হত্যার ছক এঁকেছিলেন[১৩২]।
পিতাকে হত্যার পর জালালউদ্দিন সাথে সাথেই ক্ষমতায় বসেননি। ক্ষমতায় বসেছিলেন তাঁর ভাই মহেন্দ্রদেব। জালালউদ্দিন শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। দুই মাস পর ভাইকে সরিয়ে তিনি ক্ষমতায় বসেন। বাংলায় আবার মুসলিম শাসন ফিরে আসে। জালালউদ্দিন অভিহিত হন জালালউদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ নামে।
সুশাসক হিসেবে জালালউদ্দিন নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। নুর কুতুবুল আলমের নাতি শায়েখ জাহিদকে সসম্মানে সোনারগাঁ থেকে ফিরিয়ে আনেন। ঐতিহাসিক ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর প্রশংসা করে লিখেছেন, 'সুলতান জালালউদ্দিন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে রাজ্য শাসন করেন।'

১২. রাজা গনেশ যে কালোরাত্রির সূচনা করেছিলেন তাঁর ছেলে জালালউদ্দিনের হাতেই তার অবসান হয়। জালালউদ্দিনকে তৈরির পেছনে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শায়েখ নুর কুতুবুল আলম। সারাজীবন তিনি ছিলেন খানকায় বসে থাকা নিমগ্ন সাধক। কিন্তু দেশ ও জাতির দুর্দিনে তিনি সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, সমাজ-বিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকতার চর্চা কোনো ফল বয়ে

---

[১৩১] বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ-২২৫ – আবদুল করিম। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
[১৩২] মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, পৃ-১৩২ – আশকার ইবনে শাইখ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আনে না। নুর কুতুবুল আলমের সঠিক সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন বাংলার মুসলমানরা রক্ষা পেয়েছিল।

ড এনামুল হক তাই লিখেছেন, ‘তাহার রাজনৈতিক চালবাজিতে সেবার বাংগালার মুসলমানরা যেরূপ আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিল তাহার তুলনা বাংগালার মুসলিম ইতিহাসে তো নাই-ই এমনকি ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসেও অতি বিরল[১৩৩]।’

এম এ রহিম লিখেছেন, ‘নুর কুতুবুল আলম ছিলেন মুসলিম বাংলার ত্রাণকর্তা[১৩৪]।

---

[১৩৩] বঙ্গে স্থূফী প্রভাব, পৃ-৭৬ – ড এনামুল হক। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

[১৩৪] বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ- ১০২ – এম এ রহিম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পূর্বসূরী (১-১২)

১। তউস ইবনে কায়সানের দুনিয়া বিমুখতা

তউস ইবনে কায়সান রহিমাহুল্লাহ। ইয়ামানের এই তাবেয়ী উম্মুল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ এক মনিষী। শাসকদের কাছে ঘেঁষা অপছন্দ করতেন। সত্য বলায় ছিলেন নির্ভীক। কারো প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত হতেন না।

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই। ইয়ামানের গভর্নর। এক অনুচরের হাতে ৫০০ দিনার দিয়ে বললেন, এটা তউস ইবনে কায়সানের হাতে দিয়ে আসো। যদি তাকে এই দিনারগুলো গ্রহণ করাতে পারো তাহলে তোমাকে পুরস্কৃত করবো।

অনুচর ৫০০ দিনার নিয়ে এলো তউস ইবনে কায়সানের কাছে। তউস ইবনে কায়সান দিনার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অনেক চাপাচাপি করেও তাকে গ্রহণ করানো গেলো না। শেষে অনুচর দিনারের থলে তউস ইবনে কায়সানের ঘরের কোনে ছুড়ে ফেলে চলে গেল। গভর্নরকে বললো, তিনি দিনার গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পর মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ কোনো কারনে তউস ইবনে কায়সানের উপর ক্ষিপ্ত হন।

'তাকে যে ৫০০ দিনার দিয়েছি ফেরত নিয়ে আসো' একজনকে আদেশ দিলেন গভর্নর।

সেই ব্যক্তি এলো তউস ইবনে কায়সানের কাছে।

'গভর্নর আপনাকে যে ৫০০ দিনার দিয়েছেন তা ফেরত দিন' বলল সে।

'আমি কোনো দিনার নেইনি' তউস ইবনে কায়সান অস্বীকার করলেন।

প্রথম অনুচরকে ডাকা হলো। সে এসে বললো, দিনার আপনার ঘরে রেখে গিয়েছিলাম।

'তাহলে যেখানে রেখেছো খুঁজে দেখো' তউস ইবনে কায়সান বললেন। অনুচর খুঁজে দেখে সে যেখানে দিনার রেখে গেছে সেখানেই আছে। কেউ ধরেও দেখেনি। দিনারের থলের উপর মাকড়সা জাল বুনেছে।

তউস ইবনে কায়সান একবার আতা ইবনু আবি রবা'কে বলেছিলেন, আতা, কখনো তাদের কাছে কিছু চেয়ো না, যারা রাত হলে দরজা লাগিয়ে দেয়, যারা দরজায় পাহারাদার বসায়। তার কাছে চাও যিনি কেয়ামত পর্যন্ত দরজা খোলা রাখেন, তার কাছে কোনো প্রহরীও নেই। *(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা- হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির র.। মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত)*

২। এক আলেমের সাহসিকতা

বাগদাদ। আব্বাসী খলিফা আবু জাফর মানসুরের (শাসনকাল ৭৫৪-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ) রাজপ্রাসাদ। খলিফা ডেকে পাঠিয়েছেন বিশিষ্ট আলেম আমর বিন উবাইদকে। আমর পৌছালেন দরবারে। কথাবার্তার পর খলিফা তাকে কিছু উপহার দিলেন। আমর প্রত্যাখ্যান করলেন। আবু জাফর মানসুর বললেন, আল্লাহর কসম আপনাকে এসব গ্রহন করতেই হবে।

আমর বিন উবাইদ বললেন,আল্লাহর কসম , আমি গ্রহন করবো না।

যুবরাজ মাহদি (পরবর্তী খলিফা) বললেন, খলিফা কসম করে ফেলেছেন। আপনি উপহার গ্রহন করুন।

আমর বললেন, খলিফার জন্য কসমের কাফফারা দেয়া সহজ ।

খলিফা বললেন, আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন'

'আমার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু বলি, আমি এখানে নিজ থেকে না আসলে আমাকে ডেকে পাঠানোর দরকার নাই'

'আমি মাহদিকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনিত করেছি। আপনি কী বলেন?'

'আপনার ইন্তেকালের পর আপনি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত থাকবেন। কে খলিফা হলো না হলো তা নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবেন না'

খলিফা নির্বাক হয়ে সাহসী এই আলেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(তারীখুল খুলাফা, ৪৩২ পৃষ্ঠা– আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী র.)

৩। কাজী আবু বকর বাকেল্লানীর প্রজ্ঞা

কাজী আবু বকর বাকেল্লানী রহিমাহুল্লাহ। মালেকী মাজহাবের বিখ্যাত আলেম। আল্লাহ তাকে অসামান্য মেধা দান করেছিলেন। খতীব বাগদাদী লিখেছেন, তিনি প্রতিরাতে বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তারপর বসে ২৫ পৃষ্ঠা লিখতেন। সকালে লোকজনদের তা পড়াতেন। আবু বকর খাওয়ারেজমী বলেন, বাগদাদের প্রত্যেক লেখকই অন্য লেখকদের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেন। একমাত্র ব্যতিক্রম কাজী আবু বকর বাকেল্লানী। আল্লাহ তার অন্তরকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

রাফেজী, খারেজী, মুতাযিলা ও জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে তার কলম ছিল খোলা তরবারীর ন্যায়।

খলীফা ইযদুদদৌলা তাকে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। সম্রাট জানতেন একজন মুসলমান হিসেবে কাজী সাহেব কখনোই দরবারের প্রচলিত নিয়ম মেনে সম্রাটকে মাথা নিচু করে সম্মান জানাবেন না। তাই

সম্রাট একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি কাজী সাহেবকে এমন একটি দরজা দিয়ে দরবারে ঢুকতে বাধ্য করেন যার উচ্চতা খুবই কম এবং দরজা অতিক্রম করতে হলে অবশ্যই মাথা নিচু করতে হয়। কাজী সাহেব দরজার উচ্চতা দেখে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেন এবং দরবারের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টোভাবে হেটে দরবারে প্রবেশ করেন।

দরবারে সম্রাটের সভাসদরা ছাড়াও খ্রিস্টান পাদ্রিরা উপস্থিত ছিলেন। পরিচয়পর্বের সময় কাজী সাহেব এক পাদ্রীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?'

পাদ্রী বিব্রত হয়ে চুপ থাকেন।

'কাজী সাহেব আপনি সম্ভবত জানেন না, আমাদের পাদ্রীরা বিবাহ করেন না। তারা এসকল পার্থিব বিষয় থেকে পবিত্র' সম্রাট বললেন।

'বাহ চমৎকার, পাদ্রীরা স্ত্রী, ছেলে সন্তান থেকে পবিত্র। আবার আপনারাই আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে দিচ্ছেন' কাজী সাহেবের উপস্থিত জবাব শুনে সম্রাট হতবাক হয়ে যান।

—

'আপনাদের নবীর কথা বলুন। তিনি কি জীবদ্দশায় কোনো যুদ্ধ করেছেন?' সম্রাট বললেন।

'হা। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন' কাজী সাহেব জবাব দিলেন।

'এসকল যুদ্ধের ফলাফল কী? কে জিতেছে?'

'কখনো আমাদের নবী জিতেছেন, আর কখনো তার শত্রুরা জিতেছে'

'এটা কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহর নবীও যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন?'

'এটাই বা কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহর সন্তানকে (নাউযুবিল্লাহ) শূলিতে চড়ানো হয়েছে?' কাজী সাহেব হালকা কন্ঠে বললেন।

—

'আপনাদের সতী নারীর ঘটনা বলুন' সম্রাট বললেন। মূলত সুক্ষ্মভাবে হজরত আয়েশা (রা) এর প্রতি অপবাদের সেই ঘটনার দিকে ইংগিত করলেন।

'আমাদের ইতিহাসে দুজন সতী নারীর কথা পাই। দুজনের বিরুদ্ধেই দুর্জনরা অপবাদ দিয়েছে। কোরআন দুজনের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছে। তবে তাদের একজন সন্তানসহ (হযরত মরিয়ম আ.) এসেছিলেন, অন্যজন সন্তান ছাড়া। আপনি কোনজনের কথা বলছেন?'

সম্রাট বিব্রত হয়ে চুপ হয়ে যান।

'এই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী?' সম্রাট পাদ্রীদের প্রশ্ন করেন।

‘তাকে সসম্মানে বিদায় দিলেই ভালো। নচেত যেকোনো সময় সে আপনার রাজত্বও কেড়ে নিতে পারে’ প্রধান পাদ্রী বললেন।

—

কাজী আবু বকর বাকেল্লানী ৪০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার জানাযায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। শায়খ আবুল ফজল তামিমী তার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী। সারাজীবনে তিনি ৭০ হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন।

(তারীখে বাগদাদ, ৩য় খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা– আবু বকর খতীব বাগদাদী। দারুল গরবিল ইসলামি।

তারিখু কুযাতিল আন্দালুস, ৩৭ পৃষ্ঠা— আবুল হাসান নুবাহি আন্দালুসি। দারুল আফাকিল জাদিদা, বৈরুত।

সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭শ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ।)

৪। ইমাম আউযায়ীর সাহসিকতা

ইমাম আউযায়ী রহিমাহুল্লাহ। শামের বিখ্যাত আলেম। ১৫৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন*। হালকাপাতলা গড়নের এই আলেম ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলতেন, যদি আমাকে বলা হয় এই উম্মাহর জন্য দুজন আলেম বেছে নিতে, তাহলে আমি ইমাম আউযায়ী ও সুফিয়ান সাওরিকে বেছে নিবো।

—

শামে এসেছেন আবদুল্লাহ বিন আলী, আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস সাফফাহর ভাই ও খলিফা আবু জাফর মানসুরের চাচা। সময়টা উমাইয়াদের পতনের যুগ। শাসনক্ষমতা হারিয়েছে তারা। খুজে খুজে হত্যা করা হচ্ছে পুরুষদের। যুবরাজ আব্দুর রহমান কোনোমতে ফোরাত নদী পাড়ি দিয়ে কাইরাওয়ানের পথ ধরেছেন। আবদুল্লাহ বিন আলী শামে এসে উমাইয়াদের হত্যা শুরু করেন। জ্বালিয়ে দেয়া হলো তাদের ঘরবাড়ি। আবদুল্লাহ বিন আলীর কানে পৌছেছে ইমাম আউযায়ীর প্রশংসা। ইমাম আউযায়ীকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ইমাম আউযায়ী তিনদিন অপেক্ষা করে চতুর্থ দিন রওনা হলেন আবদুল্লাহ বিন আলীর গৃহের দিকে।

আবদুল্লাহ বিন আলীর চেহারা রাগে থমথম করছে। তার পাশে নাংগা তলোয়ার হাতে প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। ইমাম আউযায়ী সালাম দিলেন। আবদুল্লাহ বিন আলী কোনো জবাব না দিয়ে তার হাতে ধরে রাখা ছড়ি মাটিতে ঠোকরাতে থাকেন।

‘আপনি আউযায়ী?’ আবদুল্লাহ বিন আলী কিছুক্ষন চুপ থেকে বললেন।
‘হ্যা’
‘আউযায়ী, আমি বনু উমাইয়ার সাথে যা করছি এ সম্পর্কে আপনার মত কী? এটা কি জুলুম হচ্ছে ? নাকি জিহাদ ?’
‘আমাকে ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল আনসারি একটি হাদিস বর্ননা করেছেন। তিনি শুনেছেন, মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত তাইমির কাছ থেকে, তিনি আলকামা বিন ওয়াক্কাস থেকে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষ যা নিয়ত করবে তাই পাবে।’ (বুখারী, মুসলিম) ইমাম আউযায়ী শান্তকণ্ঠে বললেন। আবদুল্লাহ বিন আলীর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। সে আগের চাইতে দ্রুতগতিতে ছড়ি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো।
‘আমি বনু উমাইয়াকে হত্যা করছি এ সম্পর্কে আপনার মত কী?’ আবদুল্লাহ বিন আলীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।
‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ননা করেছেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন কারন ব্যতিত কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো বৈধ নয়, ১.বিবাহিতব্যক্তি যদি যেনা করে ২.কাউকে বিনা কারনে হত্যা করে, ৩.স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করে , মুসলিম জামাতে ফাটল সৃষ্টি করে। (বুখারী, মুসলিম)’
‘বনু উমাইয়ার সম্পদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?’
‘তারা যদি এই সম্পদ বৈধভাবে অর্জন করে তাহলে আপনার জন্য তা হারাম। আর যদি তারা অবৈধ পন্থায় অর্জন করে তবুও শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া আপনার জন্য তা হালাল হবে না’ ইমাম আউযায়ীর জবাব শুনে আবদুল্লাহ বিন আলীর চেহারা রাগে লাল হয়ে যায়।
কিছুক্ষন পর সে বলে, ‘আমরা কি আপনাকে কাজী নিয়োগ করবো?’
‘আপনার পূর্ববর্তীরা আমার কাধে এই দায়িত্ব চাপাননি। তারা আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি চাই আপনার সময়েও এই অনুগ্রহ বলবত থাকুক’
‘এই তিনদিন কেনো আসেননি’
‘আমি রোজা রেখেছিলাম’
আবদুল্লাহ বিন আলী, ইমাম আউযায়ীর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হন। ইমাম সাহেবকে ইফতারীর আমন্ত্রন জানান। ইমাম আউযায়ী এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিদায় নিয়ে বের হয়ে আসেন। ফটকের কাছে পৌঁছলে এক চাকর দৌড়ে আসে।
‘আমীর আপনাকে এই দুইশো দিনার হাদিয়া করেছেন’ বলে সে।
ইমাম আউযায়ী হাদিয়া গ্রহন করেন এবং সেখানেই তা সদকা করে দেন। ——

---

*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ ১৫৭ হিজরী লিখেছেন। তবে সিয়ারু আলামিন নুবালাতে ইমাম যাহাবী লিখেছেন, আলি ইবনুল মাদিনীর মতে তার ইন্তেকাল ১৫১ হিজরীতে।
(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩শ খন্ড, ৪৪৯-৪৫১ পৃষ্ঠা,– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা।
সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭ম খন্ড, ১০৭-১১০ পৃষ্ঠা। -হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী। মুআসসাতুর রিসালাহ)

৫। আকবরের সামনে নির্ভীক আলেম

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ।
মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। আকবর ছিলেন নিরক্ষর। তবে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনে তার ছিল সীমাহীন তৃষ্ণা। ঐতিহাসিক আব্দুল কাদের বাদায়ুনির বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রথম জীবনে আকবর বেশ ধার্মিক ছিলেন। পীর বুজুর্গদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। প্রতি জুমার রাতে আলেমদের মজলিস বসাতেন। কাজি জালাল ও অন্যান্য আলেমদের তিনি তাফসির করার আদেশ দেন। একবার আজমির যাওয়ার পথে সেকালের বিখ্যাত বুজুর্গ শায়খ নিজাম নারনুলির সাথেও দেখা করেন। দোয়া নেন। শায়খ মোহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারিকে তিনি এক কোটি মুদ্রা মূল্যের জায়গীর উপহার দেন।
তবে শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন, আকবরের এই ধর্মবোধ ছিল ভাসাভাসা আবেগের উপর, যার কোনো মজবুত ভিত্তি ছিল না। কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কেও তার কোনো অধ্যয়ন ছিল না। তার এই ধর্মবোধের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে মাজারে হাজিরা দেয়া, সেখানকার মূর্খ খাদেমদের শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও খানকাহ ঝাড়ু দেয়া।
আকবরের দূর্ভাগ্য তার পাশে এমনকিছু আলেম জড়ো হয়েছিলেন যারা ছিলেন প্রচন্ড দুনিয়ালোভী। উদাহরণস্বরূপ মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপুরীর কথা বলা যায়। এই আলেম যাকাত দেয়া থেকে বাচার জন্য নানা ছলচাতুরী করতেন। এমনকি তিনি ফতোয়া দেন হজ্বের ফরজিয়ত আর অবশিষ্ট নেই। আকবরের জুমা রাতের মজলিসে অনেক মাসালা নিয়ে আলোচনা হতো। এই মজলিসগুলোতে আলেমরা প্রায়ই পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাতে লিপ্ত হতো এমনকি একে অপরকে কাফের ফতুয়াও দিতেন। একই সময়ে আকবর ধর্মীয় সভা আহবান করেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার মজলিস বসান। আলেমরা এসব মজলিসে বসতেন কিন্তু তারা থাকতেন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তারা কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে পারতেন না, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যার সমাধান দিতেও তারা ছিলেন

অক্ষম। ফলে আকবরের মনে এক ধরনের বিরাগ জন্ম নেয়। তিনি সকল ধর্মের মিশেলে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের কথা ভাবেন। এই চিন্তায় সহযোগী হিসেবে পেয়ে যান ভারতবর্ষের বিস্ময়কর তিন প্রতিভা মোল্লা মোবারক নাগোরী, ফইজি ও আবুল ফজলকে। তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থে সম্রাটকে নতুন ধর্ম প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। আকবর দ্বীনে এলাহী নামে নতুন একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। আকবর অগ্নিপূজা ও সূর্য পূজা শুরু করেন। যাকাত নিষিদ্ধ করা হয়, মদ পানে উদ্বুদ্ধ করা হয় এমনকি মুফতি মীর আদলও মদপান করেন। ধর্মীয় রোকনগুলোকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা হয়। নামাজ নিষিদ্ধ করা হয়। আকবরের এই ধর্ম মতে কয়েকটি ধর্মের অনুসারীরা যোগ দেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস একটি বিপদজনক বাঁকে এসে পৌছায়। সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর ভাষায়, এ ছিল পৈতাধারীর হাতে তাসবিহ ও তাসবিহধারীর গলায় পৈতা লটকে দেয়া।

দরবারী আলেমরা আকবরের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। যেসকল আলেমরা আকবরের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান, তাদেরকে হয় নির্বাসনে পাঠানো হয় কিংবা হত্যা করা হয়।

সেই ক্রান্তিলগ্নেও অনেক আলেম সত্য প্রকাশের দু:সাহস বুকে লালন করতেন।

—

শাহবায খান কাম্বুহ এমনই একজন আলেম। তিনি ছিলেন আকবরের সভাসদ। আকবর তাকে মীর বখশ উপাধী দেন। শাহবায খান কখনো মদ পান করেননি, দাড়িও মুন্ডন করেননি। আকবরের প্রচলিত ধর্মমতের তিনি ছিলেন প্রকাশ্য বিরোধী।

একদিন বিকেলের ঘটনা। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে একটি পুকুরের পাড়ে পায়চারি করছিলেন। শাহবায খান সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট তার হাত ধরে হাটতে থাকেন। নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। উপস্থিতরা ভাবতে থাকে শাহবায খান আজ কোনোভাবেই সম্রাটের হাত থেকে ছাড়া পাবে না। তার মাগরিবের নামাজ কাযা হবেই। শাহবায খান সম্রাটকে বলেন, আমি নামাজ পড়বো।

‘আমাকে একা রেখে যেও না। পরে কাজা করে নিও’ সম্রাট বলেন।

শাহবায খান জোর করে সম্রাটের হাত থেকে হাত সরিয়ে নেন। চাদর বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যান। নামাজ শেষে নিয়মিত আমল অজিফা শুরু করেন। সম্রাটের প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। সম্রাট প্রচন্ড রাগে কাঁপছিলেন। উপস্থিত দুই আমির আবুল ফাতাহ ও হাকিম আলি গিলানী অনেক কষ্টে সম্রাটকে ঠান্ডা করেন।

—

শায়খ আব্দুল কাদের উচাঈ সে যুগের আরেকজন সাহসী আলেম। একবার সম্রাট তাকে আফিম সাধেন। আব্দুল কাদের অস্বীকৃতি জানালে সম্রাট রেগে যান।
একবার তিনি ইবাদতখানায় নফল পড়ছিলেন। আকবর বললেন, আপনার উচিত ঘরে গিয়ে নামাজ পড়া।
'এই এবাদতখানা আপনার রাজত্ব নয়' শান্তকণ্ঠে বললেন আব্দুল কাদের উচাঈ।
'আমার রাজত্ব পছন্দ না হলে এখান থেকে চলে যান' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন আকবর।
এই ঘটনার পর আব্দুল কাদের উচাঈকে নির্বাসিত করা হয়।
(আকবরের জীবনের প্রথমদিকের ঘটনাবলী জানতে দেখুন, মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ– মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ুনি।
তারীখে দাওয়াত ও আযিমত, ৪র্থ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা– সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী। নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫৩৯ ও ৫৬৮ পৃষ্ঠা- শায়খ আব্দুল হাই হাসানি নদভী। দার ইবনে হাযম বৈরুত)

৬। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি

তুঘলক বংশের পতনের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন সালতানাত গড়ে উঠে। এ সময় জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজা জাহান 'মালিকুশ শরক' উপাধি ধারন করে শর্কি বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বংশ প্রায় ৮০ বছর কনৌজ থেকে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃর্ন অঞ্চল শাসন করে। শর্কি বংশের শাসনকালে জৌনপুরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় বড় বড় মাদরাসা, খানকাহ ও আলীশান অট্টালিকা। শর্কি সুলতানদের প্রভাব বুঝা যায় বাংলার বিখ্যাত বুজুর্গ নুর কুতবুল আলমের ঘটনা থেকে। সেকালে রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়ার জায়গিরদার রাজা গনেশের অত্যাচারে জনগন ছিল অতিষ্ঠ। নুর কুতবে আলম তখন জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কির কাছে পত্র লিখে এ ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। [১৩৫]
শর্কি সালতানাতের পতনের পরেও জৌনপুর তার ঐতিহ্য হারায়নি। মুঘল আমলেও এখানকার মাদরাসাগুলোর পড়ালেখার মান ছিল খুব উন্নত। শায়খ আব্দুল হাই হাসানি নদভী এমন অন্তত ১৪ টি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৬]

---

[১৩৫] রিয়াজুস সালাতিন- গোলাম হুসেন সলিম
[১৩৬] আল হিন্দ ফি আহদিল ইসলামি- আব্দুল হাই হাসানি নদভী

জৌনপুরে বড় বড় আলেম জন্মগ্রহন করেছেন। শাসকবর্গ সবসময়ই এসব আলেমদের সম্মানের চোখে দেখতেন। প্রতিটি মাদরাসা ও খানকাহর জন্য প্রচুর জমি ওয়াকফ ছিল। স্বয়ং শর্কি সুলতানরা আলেমদের দরসে বসতেন।[১৩৭]
মুঘল আমলেও এখানে বড় বড় আলেম জন্মেছেন। এমনই এক আলেমের নাম মুফতি সাইয়েদ আবুল বাকা। তিনি ১০৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে তিনি জৌনপুরের প্রধান মুফতি ছিলেন। একবার সম্রাট তার কাছে একটি বই পাঠিয়ে এর ভুলগুলো সংশোধন করে দিতে বলেন। মুফতি সাহেব বইটি একবার পড়ে কুতুবখানায় রেখে দেন। অন্যান্য ব্যস্ততায় এই বইয়ের কথা ভুলে যান। প্রায় ৬ মাস পর সম্রাট আবার তাগাদা দেন। মুফতি সাহেব কুতুবখানায় বইটি খুজেন, কিন্তু বইটি হারিয়ে গেছে। অনেক খুজেও বইটি না পেয়ে তিনি নিজের স্মৃতি থেকে পুরো বইটি লিখে ফেলেন। সম্রাট বইটি পেয়ে খুব খুশি হন এবং মুফতি সাহেবকে জায়গীর প্রদান করেন।[১৩৮]

৭। ইবরাহিম তাইমির আত্মত্যাগ

ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফি পেরেশান। ইবরাহিম বিন ইয়াযিদ নাখয়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ ও গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে খুজছে তাকে, কিন্তু এখনো তার সন্ধান মেলেনি। ইবরা
হিম বিন ইয়াজিদ নাখয়ি একজন তাবেয়ী। যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহদের একজন। তার অপরাধ, তিনি হাজ্জাজের ঘোর বিরোধী। একবার তার দরসে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেউ যদি হাজ্জাজকে লানত দেয় তাকে আপনি কী বলবেন? তিনি জবাবে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন,
শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। [সুরা হুদ ১১:১৮]
মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আশআস যখন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন ইবরাহীম নাখয়ি তাকে সমর্থন দেন। হাজ্জাজ প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হয়। পুলিশকে নির্দেশ দেয়, ইবরাহিম নাখয়িকে গ্রেফতার করতে। ইবরাহিম গা ঢাকা দেন।

মধ্যরাত। কুফার বাসিন্দারা ঘুমে বিভোর। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কুফার বিখ্যাত আবেদ ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ তাইমি ঘর থেকে বের হলেন। সরু গলি ধরে হাটছেন। হালকা চাদের আলো। পথ দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। জামে মসজিদে পৌছে অযু করলেন। নামাজে দাড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু

---

[১৩৭] হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ কে তামাদ্দুনি কারনামে- দারুল মুসান্নেফিন, আযমগড়।
[১৩৮] হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ কে তামাদ্দুনি কারনামে- দারুল মুসান্নেফিন, আযমগড়।

করলেন। প্রতিরাতের মতো হাজ্জাজের পুলিশ বাহিনী ঘুরছে কুফার অলিগলিতে। জামে মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেল ভেতরে কেউ একজন নামাজ পড়ছে। পুলিশ বাহিনীর লোকেরা মসজিদে প্রবেশ করলো। ইবরাহিম তাইমির নামাজ শেষ হলে তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনার নাম কী?' 'ইবরাহীম'
'আপনিই কি ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ?'
'জি। আমিই' শান্তকণ্ঠে বললেন ইবরাহিম তাইমি। 'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। কী ভেবেছিলেন? আমার হাত ফাকি দিয়ে পালাবেন? আমরা তো পাতাল থেকেও অপরাধীকে ধরে নিয়ে আসি' পুলিশ অফিসার উল্লসিত কণ্ঠে বললো। ইবরাহিম তাইমি বুঝতে পারলেন পুলিশ এসেছে ইবরাহিম নাখয়িকে গ্রেফতার করতে। তবু তিনি নিজের আসল পরিচয় দিলেন না। চুপ থাকলেন। ইবরাহিম তাইমিকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হলো। হাজ্জাজ কোনো প্রশ্ন না করে আদেশ দিলো ইবরাহিম তাইমিকে দিমাসের কারাগারে বন্দী করতে।
সেকালে দিমাসের কারাগার ছিল ভয়ংকর কারাগার। শুধুমাত্র ভয়ংকর অপরাধীদেরকেই এখানে বন্দী করা হতো। এক প্রশস্ত ময়দানের চারপাশে প্রাচীর তুলে দেয়া, এর ভেতরে বন্দীরা থাকতো। ভেতরে কোনো ঘর নেই। খোলা মাঠেই থাকতে হতো। রোদ বৃষ্টি ঝড় থেকে বাচার উপায় নেই। কিছুদিন পর ইবরাহিম তাইমির আম্মা এলেন ছেলেকে দেখতে। ছেলেকে দেখে তিনি নিজেই চিনতে পারলেন না। ইবরাহিম তাইমির শরিরে শুধু হাড়টুকু অবশিষ্ট আছে। মা প্রশ্ন করলেন বেটা তুমি তো জানতে পুলিশ তোমাকে খুজছে না। তারা খুজছে ইবরাহিম নাখয়িকে। তবু কেন তুমি তাদেরকে নিজের আসল পরিচয় জানালে না? ইবরাহিম তাইমি জবাব দিলেন, মা, ইবরাহিম নাখয়ি অনেক বড় আলেম। এই উম্মাহর জন্য তিনি রহমতস্বরুপ। আমি চেয়েছি তিনি নিরাপদ থাকুন। তাই আমি নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছি।
ইবরাহিম তাইমি কারাগারেই ইন্তেকাল করলেন। তার ইন্তেকালের রাতে হাজ্জাজ স্বপ্নে দেখলো কেউ একজন বলছে, আজ একজন জান্নাতি মানুষ মারা গেলো। সকালে হাজ্জাজ খবর নিয়ে ইবরাহিম তাইমির মৃত্যুসংবাদ শুনলো। হাজ্জাজ আদেশ দিলো তার লাশের উপর ঘোড়া চালিয়ে দাও। 'রাতের স্বপ্নটা ওয়াসওয়াসা ছিল' এই ভেবে হাজ্জাজ নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ইবরাহিমের লাশের সাথে বেয়াদবি করা হলো। ইবরাহিমের রুহ হয়তো তখন মুচকি হাসছিল। অপেক্ষায় ছিল রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অভ্যর্থনার,

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে,
সন্তোষভাজন হয়ে। (ফাজর ২৭-২৮)

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫ম খন্ড, ৬০-৬২ পৃষ্ঠা। –হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত)

৮। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের কন্যা

মদীনা। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের দরসগাহ। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলি ইবনুল মাদিনী যার সম্পর্কে বলেছেন, তাবেয়ীদের মধ্যে এত প্রশস্ত ইলমের অধিকারী আর কাউকে চিনি না। কাতাদাহ বলেছেন, আমি তার চেয়ে বড় কোনো আলেম দেখিনি। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, অসামান্য সাহসিকতার অধিকারী এই তাবেয়ী কখনো অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি। জাবির বিন আসওয়াদ যখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের পক্ষে বাধ্যতামূলক বায়াত নেয়া শুরু করেন, তখন সাইদ কঠোরতার নিন্দা জানান। পরিনামে জাবির তাকে বেত্রাঘাত করেন। তখনো তিনি হকের পক্ষে অনড় ছিলেন। জাবিরের ছিল চার স্ত্রী, পরে এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইদ্দত চলাকালীন পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেন, যা ছিল স্পষ্ট হারাম। সাইদ নির্যাতিত অবস্থাতেও এই অনাচারের প্রতিবাদ করেন।

এই সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের ঘটনা শুনিয়েছেন তার ছাত্র আবু ওয়াদাআ। তার মুখেই শোনা যাক :

আমি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের দরসে বসতাম। একবার আমি কদিন অনুপস্থিত থাকি। পরে উপস্থিত হলে সাইদ প্রশ্ন করেন

‘এ কদিন কোথায় ছিলে?’ ‘আমার স্ত্রী মারা গেছে। কাফন দাফনে ব্যস্ত ছিলাম’ জবাব দিলাম। ‘আমাকে জানাতে। জানাযায় উপস্থিত হতাম’

একটু পর তিনি আবার প্রশ্ন করেন

‘এখন বিয়ে করবে ?’ ‘কে আমাকে মেয়ে দিবে? আমার কাছে তো মোহরের সামর্থ্য নেই’ ‘কত আছে?’ ‘দুই বা তিন দেরহাম”

সাইদ বললেন, ‘আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই’ এরপর সে মজলিসেই তিনি তার মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দেন। আমি আনন্দিত মনে ঘরে ফিরে আসি।

আমি ছিলাম রোজাদার। ইফতারির সময় দরজায় করাঘাত হলো।

‘কে?’ জানতে চাইলাম। ‘সাইদ’ জবাব এল।

ভাবতে লাগলাম কে হতে পারে। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব বাদে আর সবার কথা মাথায় এলো। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব আসবেন না এটা নিশ্চিত, কারন গত ৪০ বছর ধরে তিনি ঘর থেকে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যান না। দরজা খুলি। দেখি সামনে সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব দাঁড়িয়ে আছেন।

‘আপনি কষ্ট করে এলেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হতো’ বিস্ময় সামলে বললাম। ‘না, আমারই আসতে হতো। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করেছো। আজ

রাতে তুমি একা থাকবে, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে নি। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি' এই বলে সাইদ সরে দাড়ালেন। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্ত্রী। সাইদ তার মেয়েকে হাত ধরে আমার ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন। তারপর তিনি বিদায় নিলেন।

এই হলো আমার বিয়ের ঘটনা।

আমার সৌভাগ্য আমি এমন স্ত্রী পেয়েছি যিনি হাফেজা এবং হাদীস শাস্ত্রেও পারদর্শী। সৌন্দর্যেও অতুলনীয়া। আলহামদুলিল্লাহ।

(সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের এই কন্যার গুনে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান (রাজত্বকাল ৬৮৫–৭০৫) তার ছেলে যুবরাজ ওয়ালিদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সাইদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন)

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪র্থ খন্ড,– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ)

৯। বাঘের সামনেও নির্ভয় ছিলেন যে আলেম

শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান বুনান বিন মুহাম্মদ বিন হামদান বিন সাইদ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস। জন্মেছেন ইরাকের ওয়াসিত শহরে। পরে মিসরে চলে আসেন, এখানেই বসবাস করেন। ৩১৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি শারিরিকভাবে ছিলেন সুঠামদেহী, শাসকদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহন করতেন না। জনসাধারণের মাঝে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল।

একবার মিসরের শাসক আহমাদ ইবনে তুলুনের সাথে তার দেখা হয়। তিনি আহমাদ ইবনে তুলুনকে কিছু নসিহত করেন। আহমদ ইবনে তুলুন ক্ষিপ্ত হয়ে আদেশ দেন, তাকে বাঘের খাচায় ছেড়ে দাও। আবুল হাসান বুনানকে বাঘের খাচায় রাখা হয়। বাঘ এগিয়ে এসে তাকে একবার শুকে দেখে। তারপর এক কোনে চলে যায়। শান্ত হয়ে বসে আবুল হাসান বুনানকে দেখতে থাকে।

বাধ্য হয়ে আবুল হাসান বুনানকে খাচা থেকে বের করা হয়।

'যখন বাঘ আপনার কাছে এলো আপনার অনুভূতি কী ছিল?' জিজ্ঞেস করলো কেউ একজন।

'আমি তখন ফিকহের কিতাবে পড়া বাঘের উচ্ছিষ্টের মাসআলা নিয়ে ভাবছিলাম' শান্ত স্বরে জবাব দিলেন তিনি।

এরপর কাজি উবাইদুল্লাহ তাকে সাতটি বেত্রাঘাত করে। বেত্রাঘাত শেষে আবুল হাসান বুনান বলেন, প্রতি আঘাতের জন্য এক বছর।

উপস্থিত জনতা এই কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। বুঝেছে কিছুদিন পর।

যখন আহমাদ ইবনে তুলুন কাজি উবাইদুল্লাহকে সাত বছরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেছিল।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪শ খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত)

১০। আল আযমাতু লিল্লাহ

আজই প্রথম দিল্লী এলাম। আগে কয়েকবার আসতে চেয়েছি। বাবা অনুমতি দেন নি। তার একটাই কথা,

'আমরা ফকীর মানুষ। দিল্লীতে আমাদের কী কাজ?'

একথার কোনো জবাব দিতে পারি নি। দিল্লীও আসা হয় নি। অবশেষে আজ দিল্লী এলাম পিতার হাত ধরে। এসেছি বাধ্য হয়ে। আমার বাবা, কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ারকে ডেকে পাঠিয়েছেন সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক। অদ্ভুত মেধা আর বেপরোয়া মনোভাবের এক শাসক, মন চাইলেই যিনি রাজধানী সরিয়ে নেন দিল্লী থেকে দেবগিরি, তিনি আমার পিতাকে ডেকেছেন।

কদিন আগের কথা। সুলতান গেছেন রাজধানীর বাইরে । তার সাথে দেখা করতে এসেছে সবাই। স্থানীয় ওলামারাও বাদ পড়েন নি। বাদ পড়েছেন আমার পিতা।

'রাজা বাদশাহদের কাছে ফকিরদের কী প্রয়োজন ?' এ কথা বলে নিজের খানকাতেই রইলেন তিনি।

তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক। রাজধানীতে পৌছেই তলব করলেন বাবাকে। বাবা আসার সময় আমাকেও নিয়ে এলেন।

প্রাসাদের মূল ফটকে পৌছে থমকে গেলাম। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা। ভয় করছে আমার।দরবারকক্ষে প্রবেশ করলাম। ওই তো, বসে আছেন সুলতান। তার চেহারায় প্রতিভার আভা। পাশে বসে আছে সেনাপতিরা। কোমরে ঝুলছে খঞ্জর। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তরবারি হাতে খোজাপ্রহরী।বাবার হাত জোরে চেপে ধরলাম। আমার ভয় লাগছে। শরীর কাঁপছে। জানি না সুলতান আমার বাবাকে কী শাস্তি দেন। পিতা টের পেলেন, আমি ভয় পাচ্ছি। আমার কাধে হাত রাখলেন তিনি। শান্তকণ্ঠে মৃদুস্বরে বললেন,

'আল আযমাতু লিল্লাহ'

শুধু এটুকুই। পিতার এ উচ্চারণ শোনার সাথে সাথে আমার ভিতরে কী এক অলৌকিক পরিবর্তন এলো নিজেও জানি না। একটু আগের ভয় ও শংকা এক নিমিষে কোথায় উড়ে গেলো! একটু আগে যাদেরকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম এখন তাদেরকে ভেড়া আর বকরী মনে হচ্ছে।

(সূত্র: আল মুসলিমুনা ফিল হিন্দ — সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.)

১১। ৮০ বছর বয়সী ছাত্র

ওয়াসিত। কুফা এবং বসরার মাঝামাঝি একটি শহর। এখানে থাকেন আলী ইবনুল বাকিল্লানি। নিয়মিত দরস দেন 'কেরাতে আশারা'।আজ তার দরসে নতুন দুজন ছাত্র এসেছে। একজন মধ্যবয়সী। নাম ইউসুফ। অন্যজন তার পিতা। অশীতিপর বৃদ্ধ। বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। বৃদ্ধ মনোযোগী হয়ে বসেছেন। প্রয়োজনীয় কথাগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করছেন। এই বৃদ্ধের নাম জামাল উদ্দিন আবুল ফারাজ। মুসলিম বিশ্বে যিনি পরিচিত ইমাম ইবনুল জাওযি নামে। হাফেজ যাহাবি যাকে বলেছেন ইলমের ইমাম। যার হাতে লিখিত কিতাবের সংখ্যা গণনাও আজ কষ্টসাধ্য।

এই অসাধারণ মানুষটি, আশি বছর বয়সে বসেছেন তার ছাত্র সমতুল্য একজনের দরসে।

'...... সালাফদের ইলম অর্জনের ঘটনাবলি থেকে এটাই বোঝা যায়, তারা নিজেদের মান-মর্যাদার চাইতে ইলমকে বেশি মূল্য দিতেন। নিজেরা বড় শায়খ হয়েও ছাত্রের মজলিসে পূর্ণ আদবের সাথে বসতেন.....' লিখেছেন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র.

(তথ্যসূত্র : আল উলামাউল উযযাব — শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র.)

১২। হাত লম্বা করলেন না

দামেস্ক ।

মসজিদে দরস দিচ্ছেন শায়খ সাঈদ আল হালাবি। কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে এবং মসজিদের দরজার দিকে মুখ করে বসেছেন। ওযরবশত পা ছড়িয়ে রেখেছেন।

শহরের গভর্নর বদমেজাজি ইবরাহীম পাশা। কোথাও যাওয়ার পথে ভাবলো, মসজিদে যাই। শায়খের সাথে দেখা করি।

রক্ষীদল নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো ইবরাহীম পাশা।

শায়খ সাইদ তাকে দেখেও দেখলেন না। তার পা একটুও সরলো না। দরসও বন্ধ হলো না। হতভম্ব ইবরাহীম পাশা দাঁড়িয়ে রইলো শায়খের পায়ের সামনে।

ছাত্ররা আতংকিত। এই বুঝি বদমেজাজি গভর্নর আদেশ দিবে শায়খকে গ্রেফতার করতে। এই বুঝি পেটোয়া বাহিনী হামলে পড়বে শায়খের উপর।

কিছুই হলো না। গভর্নর নীরবে ফিরে গেলো। প্রাসাদে ফিরে খাদেমের হাতে আশরাফী ভর্তি থলে দিয়ে বললো, এটা শায়খকে দিয়ে আসো। বলো আমার এ ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করতে।

খাদেম এলো মসজিদে। শায়খের সামনে রাখলো আশরাফী ভর্তি থলে।

শায়খ ধীর কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, যে পা লম্বা করে, সে হাত লম্বা করে না।

(আমি বলবো না, আপনাকে পা লম্বা করতেই হবে। প্রয়োজন ছাড়া এমন করার শিক্ষাও ইসলাম দেয় না। তবে এটা অবশ্যই বলবো, কারো সামনে হাত লম্বা করার দীনতা যেন আমাদের স্পর্শ না করে—- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.)
[সূত্র: পা-জা সুরা-গে জিন্দেগী– সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী]

পূর্বসূরী (১৩-২৬)

১৩। এক অচেনা বীরের গল্প

তার জন্মসাল সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। জানা যায়নি কোথায় এবং কবে তার জন্ম। তিনি কোনো গোত্রপতি ছিলেন না। ছিলেন না সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো আদুরে দুলাল। এতদূর জানা যায়, তার বাল্যকাল কেটেছে শহরের ফটকে ভিক্ষা করে। কিছুদিন লোকদের পানি পান করিয়ে উপার্জন করেন। পরে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে।

তাকে প্রথম দেখা যায়, ৭০১ খ্রিস্টাব্দে। আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ বিন আশআসের বিরুদ্ধে লড়ছেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ হয়ে। তার সাহসিকতা ও রণদক্ষতার প্রশংসা করেছেন তাবারী। পরের বছরগুলিতে তিনি হারিয়ে গেছেন ইতিহাসের পাতা থেকে। আবার তার দেখা মেলে ৭১৮ খ্রিস্টাব্দে। এবার লড়ছেন শাওজাব খারেজির বিরুদ্ধে।

আবার তিন বছর বিরতী। ৭২১ খ্রিস্টাব্দ। উমর বিন হুবাইরা তাকে সুগদের[১৩৯] যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি এসে এক তেজোদীপ্ত ভাষণ দিয়ে সেনাবাহিনীকে চাঙ্গা করেন। বিজয় ছিনিয়ে আনেন। ৭২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাইহুন নদী অতিক্রম করে দাবুসিয়া শহর দখল করেন। ৭৩০ খ্রিস্টাব্দ। আরমেনিয়ার একাংশের প্রশাসক জাররাহ বিন আবদুল্লাহ আল হাকামি খুন হলেন। খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তাকে প্রেরণ করলেন আরমেনিয়ায়। তিনি ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হন আরযান শহরে। জাররাহের বন্ধুদের সাথে মিলিত হন। দায়িত্ব বুঝে নেন। আরমেনিয়ার অন্যান্য এলাকা বিজয় করেন।

তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সেনাপতি। সতর্ক, কুশলী। উঠে এসেছিলেন ভিক্ষুকের পেশা থেকে। কিন্তু একাগ্রতা তাকে উঠিয়েছে অনন্য উচ্চতায়।

তার নাম সাইদ বিন আমর আল হারাশি। তার জন্মতারিখ যেমন জানা যায় না, মৃত্যু তারিখও তেমনই অজ্ঞাত।

—-

আবু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজ। আন্দালুসের যোদ্ধা। তার সাহসিকতার খ্যাতি ছিল গোটা আন্দালুস জুড়ে। জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। হাফেজ যাহাবীর মতে তিনি ৫৬৮ হিজরী পর্যন্ত বেচে ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ বিন আলি মারাকেশি বলেন, তিনি ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। মুনাজাতে বসলে দ্রুতই

---

[১৩৯] সমরকন্দ ও বুখারার মধ্যবর্তী একটি এলাকা। *(সূত্র– কদাতুল ফাতহিল ইসলামি ফি ইরমিনিয়া– মাহমুদ শীত খাত্তাব)*

তার চোখে অশ্রু জমা হতো। তিনি যখন ঘোড়ায় আরোহন করতেন তখন তার সামনে দাড়ানোর সাহস হতো না কারো। খ্রিস্টানদের চোখে তিনি ছিলেন একাই একশো যোদ্ধার সমতূল্য।

আবু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজ নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, সেবার আমরা ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম। তারা ছিল প্রায় দুলাখ যোদ্ধা। এর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল এক লাখ। তারা যখন আমাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে তখন মনে হচ্ছিল পংগপালের ঝাক এগিয়ে আসছে। বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে তারা। এমনকি তীরের ঝাকের আড়ালে সূর্যও হারিয়ে যায়। এই তীরবৃষ্টির মধ্যেও আমরা দুইশ যোদ্ধা এগিয়ে যাই। ফরাসিদের রক্ষনব্যুহ ভেদ করে আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। তীব্র লড়াই হয়। পরে আমরা যাইতুনা দুর্গে আশ্রয় নেই।

মাসউদ বিন ইযযিন নাস বলেন, রোমিয়দের সাথে যুদ্ধ চলছিল। আবু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজ এক রোমান সেনাকে জোরে ধাক্কা দিলে সে পড়ে যায়। তার আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছিল তার হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে গেছে। আবু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজ তার কোমর ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেলেন। তার আংগুলের ফাকে রক্ত দেখা যায়। ইবনু ইয়াজ রোমান সেনাকে আছাড় মারেন। সেনাটির মাথা ফেটে যায়।

আরেকবারের ঘটনা। এক রোমান সেনা ইবনু ইয়াজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ার আহবান জানালো। ইবনু ইয়াজ এগিয়ে গেলেন। তার পরিহিত জামার হাতা ছিল লম্বা। হাতার ভেতর পাথর লুকানো ছিল। হাতার মুখ বন্ধ ছিল। কোমরে ঝুলছিল তরবারী। ইবনু ইয়াজ সৈন্যটির কাছাকাছি হতেই তার মুখে সজোরে হাত দিয়ে আঘাত করেন। সৈন্যটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আবু মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজ জীবনের শেষ যুদ্ধে লড়ছিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে। প্রায় ৫০০ রোমান সেনাকে তিনি তার বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন। লড়াইয়ের এক ফাকে পেছন থেকে একটি তীর এসে তার পিঠে বিদ্ধ হয়। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লড়াই অব্যাহত রাখেন। এ যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়। তার পিঠ থেকে তীর খোলার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তীর তার মেরুদন্ডের হাড়ে বিধেছিল। এই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়।

যতদিন বেচে ছিলেন সাহসিকতার সাথেই বেচে ছিলেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২০শ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী)

১৪। আমি ছোট পাগড়ি পরেই নামাজ পড়েছি

কনস্টান্টিনোপল। শহরের বিচারক শায়খ ইউসুফ বিন হুসাইন নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উযির ইবরাহিম পাশার দূত। 'শায়খ, উযির আপনাকে ডেকেছেন' 'চলো' এই বলে রওনা হলেন শায়খ।

তার মাথায় বাঁধা ছোট একটি পাগড়ি। সেকালে উসমানিয়দের রীতি ছিল সুলতান বা উযিরের দরবারে উপস্থিত হতে হলে লম্বা পাগড়ি পরিধান করতে হবে। ছোট পাগড়ি পরিধান করা দোষ বলে গন্য হতো।
উযির ইবরাহিম পাশা শায়খকে দেখেই ক্রোধান্বিত হলেন।
'আপনি দরবারের আদব জানেন না ? ছোট পাগড়ি পরেছেন কেন?'
'আমি এই ছোট পাগড়ি পরেই নামাজ পড়েছি। এরপর শুনলাম আপনি আমাকে ডেকেছেন। যে পাগড়ি পরে নামাজ পড়েছি, আল্লাহর সামনে দাড়িয়েছি তা বদলে লম্বা পাগড়ি পরা আমার কাছে বেয়াদবি মনে হয়েছে। আল্লাহর দরবারের চেয়ে কোনো মানুষের দরবারকে বেশি সম্মান দিতে আমার ঈমানী গায়রত বাধা দিয়েছে' শান্তকণ্ঠে বললেন ইউসুফ বিন হুসাইন।
উযির ইবরাহিম পাশা শায়খের কথায় খুবই প্রভাবিত হন। পরে সুলতান বায়েযিদের কাছেও এ ঘটনা উল্লেখ করেন।
(আশ শাকাইকুন নুমানিয়া ফি উলামাইদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা– তাশ কুবরাযাদা। দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত)

১৫। হাসান বসরীর দৃঢ়তা
হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি ছিলেন তার যুগে আলেমদের সর্দার। তিনি হাদিস বর্ননা করেছেন ইমরান বিন হুসাইন, মুগিরা ইবনে শোবা, সামুরা বিন জুনদুব ও নুমান বিন বশির থেকে। বসবাস করতেন বসরায়। দলে দলে মানুষ ভিড় জমাতো তার মজলিসে। হাসান বসরি ও রাবেয়া বসরিকে নিয়ে অনেক কিচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত আছে। বাস্তবে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। হাসান বসরি ইন্তেকাল করেছেন ১১০ হিজরীতে[১৪০]। পক্ষান্তরে রাবেয়া বসরির জন্মই ১০০ হিজরীতে।[১৪১]— হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ইরাকের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন তখন তার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার ছিলেন হাসান বসরী তাদের অন্যতম। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ওয়াসিত শহরে একটি অট্টালিকা নির্মান করেন। শহরবাসীকে সেখানে নিমন্ত্রন করা হয়। হাসান বসরিও উপস্থিত হন। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। রাজণ্যরা নিজেদের সম্মানিত মনে করে। আর আমরা প্রতিনিয়ত তাদের কাজ থেকে শিক্ষা নেই। হে হাজ্জাজ, এই প্রাসাদ তোমার কী উপকারে আসবে? যমিনের বাসিন্দারা তোমাকে ঘৃণা করে। আসমানের বাসিন্দারা তোমাকে

---

[১৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১৩শ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)- — হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা।
[১৪১] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)— হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

অভিসম্পাত করে। তুমি অস্থায়ী ঘর নির্মানে ব্যস্ত অথচ ভুলে গেছ স্থায়ী আবাসের কথা। প্রশংসা আল্লাহর। তিনি আলেমদের থেকে অংগীকার নিয়েছেন তারা যেন স্পষ্ট ভাষায় হক প্রকাশ করে এবং সত্য গোপন না করে।

এই বলে চলে এলেন।[১৪২] — ১০৩ হিজরী। খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক ইরাক ও খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ দিলেন উমর বিন হুবাইরা আল ফাযারিকে। খলিফা বিভিন্ন সময় উমর বিন হুবাইরার কাছে এমন কিছু নির্দেশ পাঠাতেন যা ছিল সুস্পষ্ট অন্যায়। উমর বিন হুবাইরা ডেকে পাঠালেন মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, ইমাম শাআবি ও হাসান বসরিকে।

'আমিরুল মুমেনিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিককে আল্লাহ আমাদের খলিফা বানিয়েছেন। আমাদের উপর আবশ্যক হলো তার আনুগত্য করা। আমিরুল মুমেনিনের আদেশ পালনের ব্যাপারে আপনারা কী বলেন?' উমর বিন হুবাইরা প্রশ্ন করলেন। ইমাম শাআবি এমন জবাব দিলেন যা ছিল খলিফা ও গভর্নরের প্রতি পক্ষপাতমূলক।

'হাসান, আপনি কিছু বলুন' বললেন গভর্নর। 'শাআবি তো বলেছেনই' জবাব দিলেন হাসান বসরি।

'আপনার কথাও শুনতে চাই'

'তাহলে শুনে রাখো, শীঘ্রই আল্লাহ তোমার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। সে ফেরেশতা তোমাকে তোমার এই আলিশান অট্টালিকা থেকে বের করে কবরের সংকীর্ণতা ও অন্ধকারে নিয়ে যাবে। সেখানে তোমার নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না। মনে রেখো, আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অনিষ্ট থেকে বাচাতে সক্ষম। কিন্তু খলিফা তোমাকে আল্লাহর আজাব ও গজব থেকে বাচাতে পারবে না। সুতরাং তুমি খলিফার আদেশ মানার সময় আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর আদেশ মানতে গিয়ে খলিফাকে ভয় করো না'।[১৪৩]

১৬। হাজিব আল মানসুর

হাজিব আল মানসুর। আন্দালুসে আমিরিয়া সাম্রাজ্যের (৩৬৬-৩৯৯ হিজরী/৯৭৬-১০০৯) অধিপতি। পুরো নাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমের। প্রথম জীবনে তিনি কেরানী পদে কাজ করতেন। পরে ৩৫৬ হিজরীতে শাহজাদা আবদুর রহমানের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। খলীফা হাকাম আল মুসতানসিরের মৃত্যুর পর আন্দালুসের আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা।

---

[১৪২] আদাবুল হাসান আল বসরি ওয়া যুহদুহু ওয়া মাওয়াইউজুহু, ১০৭ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি। দারুন নাওয়াদের। দামেশক।

[১৪৩] ওফায়াতুল আইয়ান (২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)– আল্লামা ইবনে খাল্লিকান। দার সাদের, বৈরুত।

উত্তরের খৃস্টান রাজ্যগুলো পূর্বের সকল চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা নিয়মিত মুসলমানদের এলাকায় হামলা চালিয়ে লুটপাট করতে থাকে। এদিকে এগারো বছর বয়সী খলিফা হিশাম ইবনুল হাকাম প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। এই অস্থির পরিস্থিতিতে উত্থান ঘটে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমেরের। পরে যিনি হাজিব মানসুর উপাধি ধারণ করেন। তিনি শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন। লাগাতার যুদ্ধে খৃস্টান রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন। প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

—

হাজিব মানসুরের সাথে নাফার রাষ্ট্রের চুক্তি ছিল, তারা নিয়মিত হাজিব মানসুরকে জিযিয়া দিবে এবং কখনো কোনো মুসলমানকে বন্দী করবে না। একবার হাজিব মানসুর তার দূত পাঠালেন নাফার রাষ্ট্রে। সেখানকার প্রশাসন এই দূতের খুব যত্নআত্তি করে। তাকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হয়। একদিন দূত এক গির্জায় তিনজন মুসলমান নারীকে দেখে অবাক হয়। সে প্রশ্ন করে, তোমরা এখানে কেন? নারীরা জানায় তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।
দূত ফিরে এসে হাজিব মানসুরকে একথা জানাতেই তিনি ক্রোধান্বিত হন। এক বিশাল মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন নাফার রাষ্ট্র অভিমুখে। খ্রিস্টানরা মুসলিম বাহিনী দেখে অবাক হয়।
'আপনাদের সাথে তো আমাদের চুক্তি হয়েছে। আমরা আপনাদের জিযিয়া দিব। বিনিময়ে আপনারা আমাদের সাথে লড়াই করবেন না। তাহলে এই বাহিনী নিয়ে এলেন কেন?' তারা বলে।
'তোমরা আমাদের তিন নারীকে বন্দী করে রেখেছো। আমরা তাদের উদ্ধার করতে এসেছি' মুসলিম সেনাপতি জবাব দেন।
খৃস্টান নৃপতি জানায় তারা কোনো মুলমানকে বন্দী করেনি। পরে মুসলিম দূত সেই গির্জায় গিয়ে তিন নারীকে বের করে আনে। খ্রিস্টান নৃপতি বারবার ক্ষমা চায়। সে বলে, এটা জনৈক সৈন্যের কাজ। দ্রুতই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।
খ্রিস্টান নৃপতি হাজিব মানসুরের কাছেও পত্র লিখে ক্ষমা চায়। সে জানায়, আমরা দোষীকে শাস্তি দিয়েছি এবং গির্জাটিও ভেংগে ফেলেছি।
হাজিব মানসুরের বাহিনী তিন মুসলিম নারীকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে কর্ডোভায় ফিরে আসে।

তথ্যসূত্রঃ

১।নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব (১ম খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)– আহমাদ বিন মোহাম্মদ আল মাক্কারি। দার সাদের, বৈরুত। মাক্কারির বর্ননায় একজন মহিলার কথা আছে।

২।আল বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতিসারি আখবারী মুলুকিল উন্দলুস ওয়াল মাগরিব — আহমাদ বিন মুহাম্মদ মারাকেশী। দারুল গরবিল ইসলামি, তিউনিসিয়া।

১৭। এক আলেমের আত্মমর্যাদা

কাবিচা বিন উকবা রহিমাহুল্লাহ। ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তার থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন। ২১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। — একবার শাহজাদা দালিফ বিন আবু দালিফ খাদেমসহ তার সাথে দেখা করতে আসলেন। খাদেমরা ঘরের দরজায় করাঘাত করলো। সম্ভবত শায়খ কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বের হতে দেরী করছিলেন। একজন খাদেম অতিউৎসাহি হয়ে বললো, শায়খ, আপনি দেরী করছেন কেন? মালিকুল জাবালের (পাহাড়ের বাদশাহ) ছেলে এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে। তিনি আপনার কাছ থেকে হাদিস শুনবেন। একথা শুনে শায়খ বের হলেন। শায়খের কাপড়ে শুকনো রুটির টুকরো লেগেছিল। শায়খ রুটির টুকরোর দিকে ইশারা করে বললেন,

‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার উপর এতেই সন্তুষ্ট হয়ে আছে, তার কাছে পাহাড়ের শাহজাদার কী কাজ? তার সাথে আমি কোনো কথাই বলবো না’

একথা বলে শায়খ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা , ১০ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ)

১৮। আমি কখনোই তোমাকে আদিল বলবো না

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক।

শাসনকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ। ভারতবর্ষের এক বিস্ময়কর শাসক। জ্ঞানেগুনে, সাহসিকতা ও বিচক্ষনতায়, বুদ্ধিমত্তা ও মেধার প্রখরতায়, ন্যায়বিচার ও শাসনদক্ষতায়, উচ্চ মনোবল ও একগুয়ে মানসিকতায়, যে দৃষ্টিকোন থেকেই দেখা হোক, সুলতান ছিলেন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শাসক। শিহাবুদ্দিন দিমাশকির বর্ননামতে, সুলতান কোরআনের হাফেজ ছিলেন। এছাড়া হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়াও তার মুখস্থ ছিল।[১৪৪] সুলতানের চিন্তাধারা ছিল তার

[১৪৪] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, ৩য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

যুগ থেকে অনেক এগিয়ে। ফলে জনসাধারণ প্রায়ই তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বুঝতে ব্যার্থ হত। আবার সুলতানের তাড়াহুড়া ও একগুয়ে মানসিকতাও তাকে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দিত। প্রফেসর খলিক আহমদ নিজামির ভাষায়, তার মেজাজের কারনে পরিস্থিতি খারাপ হলো, আবার পরিস্থিতির কারনেও তার মেজাজ বিগড়ে গেল।[১৪৫] তার মুল্যায়ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরাও তাই বিপাকে পড়েছেন। সুলতানী আমলের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী কখনো তাকে নিযামুল মুলক কিংবা আহমদ হাসানের সাথে তুলনা করেছেন আবার কখনো ইয়াজিদ কিংবা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে তুলনা করেছেন।[১৪৬] — সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ডেকে পাঠিয়েছেন মাওলানা শিহাবুদ্দিন হককে। শায়খ শিহাবুদ্দিন হক পৌছলেন সুলতানের দরবারে।
'এখন থেকে আমাকে মুহাম্মদ আদিল (ন্যায়বিচারক) বলবেন' সুলতান আদেশ দিলেন।
'কখনোই নয়। আমি আপনাকে জালিম মনে করি' শান্তকণ্ঠে বললেন শায়খ শিহাবুদ্দিন হক।
'আদিল বলতেই হবে। নইলে প্রহরীদের আদেশ দিব আপনাকে কেল্লার দেয়াল থেকে ফেলে হত্যা করতে'
'আমি কখনোই তোমাকে আদিল বলে স্বীকৃতি দিব না' শায়খ তার কথায় অনড়। সুলতানের আদেশে শায়খকে কেল্লার দেয়াল থেকে ফেলে হত্যা করা হয়। পরে কেল্লার পাশেই তাকে কবর দেয়া হয়।[১৪৭]

১৯। আমাদের মায়েরা

ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস। জন্ম ১০৭ হিজরীতে, ইন্তেকাল ১৯৮ হিজরীতে। তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হেজাজে যদি ইমাম মালিক ও সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ না থাকতেন তাহলে হেজাজ থেকে ইলম বিদায় নিতো। দশ বছর বয়সেই তিনি হাদীস শেখার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল সফর শুরু করেন।[১৪৮] — সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ হাদিসের অন্বেষণে সফর শুরু করলে তার আম্মা তাকে বলেছিলেন, বেটা, তুমি মন দিয়ে হাদিস পড়তে থাকো। আমি সুতার চরকা কেটে উপার্জন করবো, তোমার দেখভাল করবো। তুমি দশটি হাদিস শোনার পর নিজের দিকে তাকাবে। দেখবে তোমার

---

[১৪৫] সালাতিনে দিহলি কি মাজহাবি রুজহানাত, ৩২৪ পৃষ্ঠা।
[১৪৬] তারীখে ফিরোজশাহী।
[১৪৭] আখবারুল আখইয়ার, ১৪৬ পৃষ্ঠা– শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী।
[১৪৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

চালচলন ও আচার আচরণে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা। যদি না আসে তাহলে বুঝবে অর্জিত ইলম তোমার কোনো উপকারে আসেনি।[১৪৯]

ইমাম আউযায়ী রহিমাহুল্লাহ। শামের বিখ্যাত আলেম। ১৫৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন*। হালকাপাতলা গড়নের এই মানুষটি ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলতেন, যদি আমাকে বলা হয় এই উম্মাহর জন্য দুজন আলেম বেছে নিতে, তাহলে আমি ইমাম আউযায়ী ও সুফিয়ান সাওরিকে বেছে নিবো। — ইমাম আউযায়ী জন্মেছেন বালাবাক্কা শহরে। বাল্যকালেই পিতাকে হারান। প্রতিপালিত হয়েছেন মায়ের আদরে। মায়ের কাছেই তার শিক্ষাজীবনের শুরু। ওলিদ বিন মাজিদ বলেন, ইমাম আউযায়ীর আম্মা তাকে যে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, রাজা বাদশাহরাও তাদের সন্তানকে এমন শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে অপারগ ছিল।[১৫০]

** *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ ১৫৭ হিজরী লিখেছেন। তবে সিয়ারু আলামিন নুবালাতে ইমাম যাহাবী লিখেছেন, আলি ইবনুল মাদিনীর মতে তার ইন্তেকাল ১৫১ হিজরীতে।*

—

২০. ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ। মালেকি মাজহাবের ইমাম। তিনি নিজের শিক্ষাজীবনের শুরুর দিকের গল্প শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আম্মাকে বললাম, আমি ইলম শিখতে চাই। আম্মা বললেন, আসো, আমি তোমাকে আলেমদের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আম্মা আমার মাথায় একটি কালো টুপি পরিয়ে দিলেন, পাগড়ি বেধে দিলেন। তারপর বললেন, যাও, রবিয়া আর রায় এর মজলিসে বসো। আগে তার কাছ থেকে আদব শিখো, এরপর ইলম। — ইমাম মালেকের মায়ের নাম আলিয়া বিনতে শরিক বিন আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ মহিলা।

শোবা ইবনুল হাজ্জাজ। সুফইয়ান সাওরি তাকে আমিরুল মুমেনিন ফিল হাদিস বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি শোবা ইবনুল হাজ্জাজ না থাকতেন তাহলে ইরাক থেকে ইলমে হাদিস বিদায় নিতো। আবু দাউদ তয়ালিসি বলেন, আমি শোবা ইবনুল হাজ্জাজ থেকে সাত হাজার হাদিস শ্রবণ করেছি। আইয়ুব সখতিয়ানি ও সুফইয়ান সাওরির মতো মুহাদ্দিসরা তার থেকে হাদিস শ্রবন করেছেন। — শোবা ইবনুল হাজ্জাজকে তার আম্মা হাদিস শ্রবনে তাগাদা দিতেন।

---

[১৪৯] তারীখে জুরজান, ৪৯২ পৃষ্ঠা– হামজা ইবনে ইউসুফ আস সাহমি।
[১৫০] তাজকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

একবার তিনি বলেন, বা্বা, শহরের এক মহিলা হজরত আয়েশা (রা) থেকে হাদিস বর্ননা করছেন। তার কাছে যাও। হাদিস লিখে আনো। শোবা ইবনুল হাজ্জাজ মায়ের কথা মতো সেই মহিলার গৃহে হাদিস শ্রবন করতে যান।

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল আওকাস। মক্কার কাজি ছিলেন। চেহারা ছিল শ্রীহীন। গলার আকৃতি ছোট ছিল, মনে হতো কাধের উপর ধড় বসানো। তার আম্মা তাকে বলেন, বেটা, তোমার চেহারার যে অবস্থা তুমি যেখানেই যাবে মানুষ তোমাকে অবজ্ঞা করবে। তোমার উচিত ইলম অর্জনে মনোযোগী হওয়া। ইলম তোমাকে সম্মান এনে দিবে। মানুষের মধ্যে অনন্য করে তুলবে। মুহাম্মদ আল আওকাস মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তার অর্জিত ইলম তাকে অনন্য সম্মান এনে দিয়েছিল। তিনি প্রায় ২০ বছর মক্কা শরীফের কাজির দায়িত্ব পালন করেন।

আবু হাফস উমর বিন হারুন বলখী। খোরাসানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। মায়ের কাছেই পড়াশোনার হাতেখড়ি। এমনকি তার আম্মা তাকে হাদিস লেখায় সাহায্য করতেন।

(খাওয়াতিনে ইসলাম কি দিনি ও ইলমি খিদমাত– কাজী আতহার মোবারকপুরী)

২০। রাজমহলের নন্দিনী

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কে জানতো।

সামান্য একটা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। তর্কের একপর্যায়ে স্বামীর কণ্ঠ চড়তে থাকে। স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বসেন। স্বামীর এ আচরণ স্ত্রীর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তার দুচোখ অশ্রুতে টলমল করে উঠে। দৌড়ে নিজের মহলে ছুটে আসেন তিনি। হতভম্ব স্বামী স্ত্রীর পিছু নেন। স্ত্রী মহলে পৌছে দরজা আটকে দেন। স্বামী বেচারা দাঁড়িয়ে থাকেন দরজার ওপাশে। স্বামী অনুনয় বিনয় করেন, মাফ চান, বারবার বলেন দরজা খুলতে কিন্তু স্ত্রী কোনো জবাব দেন না।

স্বামী আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান, ৫ম উমাইয়া খলিফা, ইবনে খালদুন যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। সময় গড়ায়, স্ত্রী দরজা আটকে বসে থাকেন। খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে প্রতিটি মুহুর্ত্য অসহ্য মনে হয়। দ্রুত নিজের কক্ষে এসে ডেকে পাঠান উমর বিন বেলাল আসাদিকে। উমর বিন বেলাল আসাদি বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয়দের একজন। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার দরবারেও তাকে সমীহ করা হতো। উমর বিন বেলাল আসাদি খলিফার ডাক পেয়ে ছুটে এলেন।

‘আমার স্ত্রী আমার উপর অভিমান করেছে। সে নিজের মহলে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে। আমি অনেক বলেছি, সে কিছুতেই দরজা খুলছে না’ বললেন খলিফা।
‘অভিমান তো। একটু পরেই কেটে যাবে। আপনি পেরেশান হবেন না’ বললেন উমর বিন বেলাল আসাদি।
‘নাহ, তাকে ছাড়া প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য মনে হচ্ছে। আমি আর থাকতে পারছি না। আপনি যেভাবে পারেন তাকে বুঝান’ অনুনয়ের স্বরে বললেন খলিফা। মুসলিম বিশ্বের প্রতাপশালী এই খলিফার এমন চেহারা আগে দেখেনি কেউ।
‘আচ্ছা আমি দেখছি কী করা যায়’ এই বলে উঠে এলেন উমর বিন বেলাল আসাদি। — উমর বিন বেলাল আসাদি এলেন রানীর মহলের সামনে। দরজার সামনে বসে তিনি কান্না শুরু করলেন। রানী দাসীদের পাঠালেন খবর জানতে। দাসীরা এসে উমর বিন বেলাল আসাদিকে দেখে চমকে গেল। যে মানুষটিকে বনু উমাইয়ার ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই শ্রদ্ধা করে তিনি কান্না করছেন।
‘আপনি কান্না করছেন কেন?’ দাসীরা প্রশ্ন করে।
‘আমার দুই ছেলে। আজ তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে। আমি খলিফাকে বললাম, আমি যেহেতু নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তাই আমি খুনীকে মাফ করে দিলাম। খলিফা আমার কথা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, খুনীকেও হত্যা করা হবে। যেন তা অন্য খুনীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।
আমি তা হতে দিতে পারি না। আমি চাইনা আমার দুই ছেলেই নিহত হোক। তোমরা যাও, রানীকে একটু বলো আমার কথা। শুধু তিনিই পারেন খলীফাকে বোঝাতে। তিনি খলীফাকে একটু বোঝালেই আমার ছেলের জীবন রক্ষা পাবে’ কাদতে কাদতে বললেন উমর বিন বেলাল। — দাসিরা এসে রানীকে সব জানালো।
‘আমি এখন কী করবো? আমি তো রাগ করে খলীফার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি’ রানী অসহায় কণ্ঠে বললেন।
‘সমস্যা নেই। খলিফা নিজেও আপনার সাথে কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। তিনি তো দরজার পাশে অনেকক্ষন অপেক্ষা করেছেন’ দাসীদের একজন বলে।
‘আমার যাওয়া উচিত। উমর বিন বেলালকে আমার বাবা ও দাদা খুব সম্মান করতেন। আমি চাইনা এই মানুষটা শেষ বয়সে এসে এতবড় আঘাত পাক’ এই বলে রানী নতুন কাপড় পরলেন, সুগন্ধী মাখলেন। দাসীদের বললেন, মহলের দরজা খুলে দাও। আমি খলীফার কক্ষে যাবো। — নিজের কক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান। রানী কক্ষে প্রবেশ করে সালাম দিলেন। খলীফা কোনো জবাব দিলেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। তার বুকেও জমে আছে চাপা অভিমান।

‘আমি নিজের জন্য আপনার কাছে আসিনি। এসেছি উমর বিন বেলালের পক্ষ হয়ে’ রানী বললেন।
‘বলো, শুনছি’ খলিফা নির্বিকার কণ্ঠে বললেন।
‘আপনি তার ছেলেকে কতল করতে চান, অথচ তিনি নিজেই সেই ছেলেকে মাফ করে দিয়েছেন। আপনিও তাকে মাফ করে দিন’ রানী মৃদু কণ্ঠে বললেন।
‘নাহ, আমি মাফ করবো না। আমি চাই এই ঘটনা সবার জন্য শিক্ষা হয়ে থাকুক। আর কেউ যেন কাউকে হত্যা করার সাহস না করে’ খলীফা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন। একবারও তিনি রানীর দিকে তাকাননি।
রানী এগিয়ে এসে খলীফার হাত ধরে ফেললেন। দুচোখে আকুলতা। খলীফা বাধ্য হলেন রানীর চোখে চোখ রাখতে।
‘আমার কথাটা রাখুন। আপনি জানেন আমার বাবা ও দাদার দরবারে উমর বিন বেলালকে কতটা সম্মান করা হতো। এই দিকটা ভেবে হলেও আপনি তার ছেলেকে মাফ করে দিন’ রানী কণ্ঠের সবটুকু আকুলতা মিশিয়ে বললেন।
খলীফার ভেতরের অভিমানের বাধ হুড়মুড় করে ভেংগে গেল। চোখে জমা হলো দুফোটা অশ্রু।
‘শুনো, উমর বিন বেলালের কিচ্ছু হয়নি। আমি তাকে বলেছি যেভাবে পারে তোমাকে মহল থেকে বের করতে। তাই সে এই অভিনয় করেছে’ এই বলে খলীফা স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। দুজনে গল্প শুরু করলেন। ভুলে গেলেন আগের রাগ, অভিমান, সবকিছু।
খলীফার প্রিয়তমা এই রানীর নাম আতিকা বিনতে ইয়াযিদ। যার সারাজীবন কেটেছে রাজপ্রাসাদে। তার আত্মীয়দের মধ্যে অন্তত বারোজন খলিফা হয়েছেন, যাদের সাথে তার পর্দা করা আবশ্যক ছিল না। দাদা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম উমাইয়া খলিফা। পিতা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া, বিতর্কিত এক খলিফা। ভাই মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ, তিনিও খলিফা। স্বামী আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান, ৫ম উমাইয়া খলীফা। শ্বশুর মারওয়ান বিন হাকাম, তিনিও খলিফা।
আতিকা বিনতে ইয়াযিদের জন্ম সিরিয়ায়। সেখানেই বেড়ে উঠেন। পিতা তার জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। শীঘ্রই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। বিশেষ করে হাদীসশাস্ত্রে তার পান্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত। দানশীলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নিজের সব সম্পদ আবু সুফিয়ানের পরিবারের গরিবদের দান করে দিয়েছিলেন। আতিকা বিনতে ইয়াযিদ ইন্তেকাল করেন দামেশকে, ১২৬ হিজরীতে (৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।
(সূত্র: নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা– আহমদ খলিল জুমআ)

——-

খলিফার প্রাসাদে আজই প্রথম আসা। লোকটির ভয় করছে। সে হেটে এসেছে দজলার পাড় দিয়ে। নদীতে ভাসছিল প্রমোদতরী ও ব্যবসায়ীদের নৌকা। ব্যবসায়ীদের নৌকাগুলো যাবে বসরা। অনেক আগে সে একবার বসরা গিয়েছিল। খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নহরের দৃশ্য এখনো মনে গেথে আছে।
প্রাসাদে ঢুকতে কোনো সমস্যা হলো না। স্বয়ং রানী তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। চাকররা তাকে একটি সাদা মহলে নিয়ে এল। 'বসুন এখানে, একটু পর রানী পাশের কামরায় আসবেন' এই বলে চাকর চলে গেল।
লোকটি বসে আছে। বাতাসে একটা অচেনা ফুলের সুবাস ভাসছে। মহলের ভেতর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শোনা যায়। একটু পর ওপাশের পর্দাটা মৃদু নড়ে উঠে। লোকটি মৃদুস্বরে সালাম দেয়।
'কেমন আছেন?' ওপাশ থেকে মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে আসে।
'ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?' লোকটি সমীহের সুরে বলে। পর্দার ওপাশে আছেন আবু জাফর মানসুরের আদরের নাতনী, আব্বাসী সাম্রাজ্যের রানী।
'ভালো। আপনার খবর বলুন'
'কাজ এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে ওয়াদি নোমান থেকে আরাফাত ময়দান পর্যন্ত নহর খনন করা হয়েছে। এখন আরেকটি শাখা হুনাইন থেকে মক্কা পর্যন্ত খনন করা হবে। সমস্যা হলো এই এলাকায় কয়েকটি পাহাড় আছে। পাহাড় কেটেই নহরের কাজ করতে হবে। এতে প্রচুর খরচ হবে' লোকটি বলে।
'আপনি কাজ করতে থাকুন। খরচ যা হয় আমি পাঠিয়ে দিব। যদি শ্রমিকদের হাতুড়ির প্রতিটি আঘাতের জন্য এক দিনার খরচ হয় তবুও পরোয়া করবেন না। কাজ চালিয়ে যাবেন' রানী কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললেন।
'আপনি ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করছেন না। ইতিমধ্যে প্রায় ১০ লাখ দিনার খরচ হয়ে গেছে' লোকটি মরিয়া হয়ে বললো।
'শুনুন, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আপনি কাজ চালিয়ে যান। আজ থেকে সব হিসাব বন্ধ। আমি এই হিসাব ত্যাগ করলাম, হিসাবের দিনের জন্য। হিসাবের দিন আমি আল্লাহকে এই হিসাব দিব' রানী বললেন।
এই কথার পর আর কথা চলে না। লোকটি বিদায় নিল।

এই ছিল নহরে যুবাইদা খননের সময়কার গল্প। হারুনুর রশিদ, আরব্য রজনীর রহস্যময় বাদশাহ, উজির জাফর বারমাকিকে নিয়ে যিনি রাতের আধারে ঘুরে বেড়াতেন বাগদাদ, তার স্ত্রী যুবাইদার আদেশে ও অর্থায়নে হাজিদের জন্য এই

নহর খনন করা হয়। এই নহর খননের ফলে হাজিদের পানির কষ্ট অনেকটাই লাগব হয়। নহর খননে মোট ব্যয় হয় ১৭ লাখ দিনার।

যুবাইদার আসল নাম আমাতুল আজিজ। বেড়ে উঠেছিলেন দাদা আবু জাফর মানসুরের প্রাসাদে। দাদা আদর করে তাকে ডাকতেন যুবাইদা নামে। পরে এই নামেই তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেন। ১৬৫ হিজরীতে হারুনুর রশীদের সাথে তার বিবাহ হয়। কসরুল খুলদ প্রাসাদে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তার গর্ভে খলিফা আমিনের জন্ম হয়। বলা হয়, তিনিই একমাত্র আব্বাসী মহিলা যার গর্ভে কোনো খলিফা জন্ম নিয়েছেন।

যুবাইদা ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও ইবাদতগুজার মহিলা। তার প্রাসাদে তিনি একশো হাফেজাকে রেখেছিলেন। এদের কাজ ছিল শুধু কুরআন তিলাওয়াত করা। একজনের পর একজন তিলাওয়াত করতে থাকতো। ২৪ ঘন্টাই তার প্রাসাদে তিলাওয়াতের শব্দ শোনা যেত। তিনি প্রচুর দান করতেন। খতীব বাগদাদী লিখেছেন, একবার হজ্বের সফরে, মাত্র ৬০ দিনে, যুবাইদা গরীব দুস্থ ও হাজিদের মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ দিনার দান করেন। যুবাইদা মক্কায় ৫টি হাউজ ও অনেক অযুখানা নির্মাণ করেন। খলীফা তার এই স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন।

যুবাইদা ইন্তেকাল করেন ২১৬ হিজরীতে। তিনি আশা করেছিলেন, হিসাবের দিনে তিনি আল্লাহর কাছে হিসাব দিবেন। আমরা আশা করি, তার নিয়তের কারনে তার হিসাব সহজ হবে। ইনশাআল্লাহ।

(১। ওফায়াতুল আইয়ান, ২য় খন্ড, — আল্লামা ইবনে খাল্লিকান, ২। আল ইকদুস সামিন ফি তারিখিল বালাদিল আমিন, ১ম খন্ড– মুহাম্মদ বিন আহমদ আল হাসানি ৩। তারীখে বাগদাদ, ১৬শ খন্ড– খতীব বাগদাদী)

২১। রোমান সম্রাটকে হারুনুর রশীদের জবাব

বাগদাদ। ১৮৭ হিজরী।

নিজের দরবারে বসে আছেন খলীফা হারুনুর রশীদ। পুরো দরবারে পিনপতন নীরবতা। খলিফার চেহারা রাগে থমথম করছে। সভাসদদের চেহারায় ভীতির ছাপ। অস্বস্তি নিয়ে দূরে সরে বসে কেউ কেউ।

বাইজেন্টাইনের সম্রাট নিকফুরের পত্র এসেছে খলীফা হারুনুর রশীদের নামে। সম্প্রতি গ্রীকরা রানী আইরিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিকফুরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আইরিনের সাথে খলীফা মাহদির সন্ধিচুক্ত হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে রানী আইরিন প্রতিবছর মুসলমান খলিফাকে কর দিতেন। ধারণা করা হয়েছিল নিকফুরও এই চুক্তি বজায় রাখবে। কিন্তু আজ সকালে নিকফুরের পক্ষ থেকে খলিফার কাছে পত্র এসেছে। পত্রের ভাষ্য নিম্মরুপ

‘রোমের সম্রাট নিকফুরের পক্ষ থেকে আরবদের বাদশাহ হারুনের নিকট। আমাদের সাবেক রানী তোমাকে কিশতির আসনে বসিয়ে নিজে বসেছেন বোড়ের আসনে। তার নারীসুলভ দুর্বলতা ও বোকামীর জন্যই এমনটা হয়েছে। এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি এতদিনে গৃহীত সকল অর্থ ফেরত দিবে, নইলে তরবারীই আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে’

পত্র পড়ে খলীফার চেহারায় ক্রোধ ঝিলিক মেরে উঠে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিকফুরের পত্রের অপর পৃষ্ঠায় তিনি লিখে দিলেন, আমিরুল মুমিনিন হারুনের পক্ষ থেকে রোমের কুকুর নিকফুরের নিকট। আমি তোমার পত্র পাঠ করেছি। পত্রের জবাব তুমি নিজ চোখে দেখবে, শুনবে না।

খলিফা উজির জাফর বারমাকিকে আদেশ দিলেন সৈন্যদের প্রস্তুত করো। আজই আমরা যুদ্ধযাত্রা শুরু করবো।

সেদিনই শুরু হলো যুদ্ধযাত্রা।

খলীফা সসৈন্যে ঝড়ের বেগে পৌছলেন বাইজান্টানদের অন্যতম শক্তিশালী দুর্গ হিরাক্লিয়াতে। এখানে নিকফুরের বাহিনীর সাথে খলীফার বাহিনীর তীব্র লড়াই হয়। জালালুদ্দিন সুয়ুতি এই যুদ্ধকে বলেছেন, বিখ্যাত যুদ্ধ ও প্রকাশ্য বিজয়’। এ যুদ্ধে নিকফুর পরাজিত হয়। সে প্রতিবছর আগের চেয়েও বেশি কর দিতে রাজি হয়ে শান্তিচুক্তি করে।

চুক্তি শেষে খলিফা হারুনুর রশিদ রাক্কা শহরে ফিরে আসেন। সময়টা ছিল শীতকাল। তীব্র শীতে তুষার জমেছে পাহাড়ি রাস্তাগুলোতে। নিকফুর ভাবলো এই সময় খলিফা চাইলেও আর ফিরতে পারবেন না। সে চুক্তি ভংগ করে। চুক্তিভংগের সংবাদ পৌছলো রাক্কা শহরে। সভাসদরা হতভম্ব। এই সংবাদ খলিফার কানে তুলবেন এমন সাহস নেই কারো। পরে আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ তাইমি কবিতা আবৃত্তি করে খলিফাকে নিকফুরের চুক্তিভংগের সংবাদ দিলেন।

খলীফা এই সংবাদ শুনে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করলেন না। তিনি আবারো বাইজেন্টাইনের পথ ধরলেন। হাড় কাপানো শীতে তিনি অতিক্রম করলেন টরাস পর্বত। হাজির হলেন নিকফুরের শিবিরের দোড়গোড়ায়। এবারও প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। নিকফুর শরীরের কয়েক জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হলো।.৪০ হাজার সৈন্যসহ নিকফুর ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। পরে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সন্ধি করার আহবান জানায়।

সূত্র

১। আল কামেল ফিত তারিখ, ৫ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা– ইবনুল আসীর। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

২। তারিখুল খুলাফা, ৪৬১ পৃষ্ঠা– জালালুদ্দিন সুয়ুতি। দারুল মিনহাজ লিন নাশরি ওয়াত তাউযি, জেদ্দা।
৩। তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম, ১২শ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। দারুল কুতুবিল আরাবি,বৈরুত।

২২। এক মহিলার অবিশ্বাস্য ঘটনা

দম মেরে বসে আছেন খাওয়ারেজমের শাসক আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মোহাম্মদ বিন তালহা বিন তাহের। এইমাত্র যা শুনেছেন তা রীতিমত অবিশ্বাস্য।
'নাহ, এমনটা হতেই পারে না। আমি বিশ্বাস করি না' সামনে বসা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি।
'অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমি যা বলেছি তাই সত্য। বাল্যকাল থেকেই আমি এই মহিলার কথা শুনে আসছি। তিনি কোনো খাবার কিংবা পানীয় গ্রহণ করা ছাড়াই বেঁচে আছেন। তিনি বসবাস করেন আন নামক একটি এলাকায়, যা খাওয়ারেজম থেকে অর্ধদিনের দূরত্বে অবস্থিত। একবার আমাদের এলাকার লোকজন আমাকে পাঠালো তার সাথে দেখা করে এই সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত হতে। আমি তার সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে নিজের জীবনের কাহিনী শোনান' বললেন আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান।
'আমাকেও তার কাহিনী শোনান' আবুল আব্বাস আহমদ আগ্রহী হয়ে উঠেন।
'তাহলে শুনুন। আমার এখনো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। দিনটি ছিল রৌদ্রজ্জ্বল। দুপুরের দিকে আমি সেই মহিলার ঘরে পৌছি। তাকে অনুরোধ করি তার জীবনকাহিনী শোনাতে। তিনি বলেন,
আমার নাম রহমত বিনতে ইবরাহীম। আমার স্বামী ছিলেন একজন দিনমজুর। আমাদের কয়েকটি সন্তান ছিল। আমাদের দিনগুলি ছিল হাসিমুখর। সারাদিন ঘরের কাজ সেরে আমি অপেক্ষায় থাকতাম স্বামী কখন ফিরবেন। কয়েক বছর আগের কথা। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসক আকতাই খান তিন হাজার সৈন্য পাঠালো খাওয়ারেজম আক্রমন করার জন্য। আকতাই খান ছিল তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী। প্রায়ই সে মুসলিম বসতিতে লুটপাট চালাতো। তার সৈন্যরা আমু দরিয়া অতিক্রম করে সীমান্তে পৌছে যায়। তারা জুরজানিয়া কেল্লা অবরোধ করে।কেল্লার অধিপতি সাহায্য চেয়ে আবদুল্লাহ বিন তাহেরের কাছে পত্র লিখেন। আমাদের সৈন্যরা কেল্লার প্রাচীরের উপর থেকে লড়ছিল। দুইদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তৃতীয় দিন আবদুল্লাহ বিন তাহেরের সাহায্য এসে পৌছে। তিনি সেনাপতি মিকাইলের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেদিন মুসলিম বাহিনী কেল্লা থেকে বের হয়ে লড়তে থাকে। আমার স্বামিও সেদিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। দিনশেষে

কেল্লায় মুসলমানদের চারশো লাশ আনা হয়। আমার স্বামীও সেদিনের যুদ্ধে শহীদ হন। তার লাশ আনা হলে আমি কান্নায় ভেংগে পড়ি। অন্য মহিলারা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম আমার সন্তানদের কথা। কীভাবে তাদের সান্ত্বনা দিব? কান্না করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখি আমি এক সবুজ শ্যামল উদ্যানে হাটছি। আমি আমার স্বামীকে খুজছি। অদৃশ্য থেকে একটি কন্ঠ ভেসে আসে, ডানদিকে যাও। আমি ডানদিকের পথ ধরি। এক প্রশস্ত খোলা মাঠ। বাতাসে সবুজ ঘাস নড়ছে। সামনে অনেকগুলো অট্টালিকা, এমন সুন্দর অট্টালিকা যার বিবরণ দেয়ার ভাষা আমার নেই। প্রাসাদের সামনে কিছু নহর প্রবাহিত হচ্ছে। আমি সামনে হাটতে থাকি। সবুজ পোষাক পরিহিত একদল লোকের সাক্ষাত পাই। তারা খাবার খাচ্ছে। আমি তাদের মাঝে আমার স্বামীকে খুজতে থাকি। এরমধ্যে আমার স্বামীর কন্ঠে ভেসে আসে, রহমত আমি এদিকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই স্বামীকে দেখতে পাই। তার চেহারা পূর্নিমার চাদের মতো শুভ্র। তিনি সাথীদের সাথে বসে খাবার খাচ্ছেন। আমি দ্রুত স্বামীর কাছে চলে যাই।

আমি তার পাশে পৌছলে তিনি তার সাথীদের বলেন, আমার স্ত্রী ক্ষুধার্ত। তাকে কিছু খাওয়াতে চাই। সাথীরা তাকে অনুমতি দেন। স্বামী আমার মুখে খাবারের একটি টুকরো তুলে দেন। টুকরোটি ছিল বরফের মত উজ্জ্বল শুভ্র, মাখনের মত নরম এবং মধুর মত মিষ্টি। এরপর স্বামী আমাকে বিদায় জানান। তিনি বলেন, যাও আল্লাহ তোমার রিজিকে বরকত দিবেন। যতদিন বেঁচে থাকবে তোমার আর কোনো খাবারের দরকার হবে না।

আমার ঘুম ভেংগে যায়। সেদিনের পর আমি কখনোই ক্ষুধা কিংবা পিপাসা অনুভব করিনি। আমি খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই সুস্থ বেঁচে আছি। আলহামদুলিল্লাহ।'

'পুরো ঘটনাটিই অবিশ্বাস্য' আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের কথা শেষ হলে বললেন আবুল আব্বাস আহমদ।

'বিশ্বাস না হলে এককাজ করতে পারেন। সেই মহিলা তো খুব বেশি দূরে থাকেন না। তাকে এখানে নিয়ে আসুন। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করুন'

এই পরামর্শ আবুল আব্বাস আহমদের পছন্দ হয়। তিনি আনের শাসনকর্তাকে পত্র লিখে আদেশ দেন সেই মহিলাকে সম্মানের সাথে আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও। মহিলা পৌছলে আবুল আব্বাস আহমদ তার আম্মাকে বলেন, মা আপনি এই মহিলার সেবাযত্নের প্রতি খেয়াল রাখবেন। তবে সতর্কতার সাথে খেয়াল করবেন তিনি কোনো পানীয় কিংবা খাবার গ্রহন করেন কিনা।

এই মহিলা দুই মাস প্রাসাদে অবস্থান করেন। পরে আবুল আব্বাস আহমাদের মা বলেন, আল্লাহর কসম আমি কখনো তাকে খাবার বা পানীয় গ্রহন করতে দেখিনি।

এটা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। পরে এই মহিলাকে সসম্মানে তার এলাকায় ফিরিয়ে নেয়া হয়। এর কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবুল আব্বাস ঈসা তহমানিও এই মহিলার সাক্ষাত পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি খাওয়ারেজমে এক মহিলার সাক্ষাত পাই যিনি বিশ বছর খাবার ও পানীয় ছাড়া ছেড়ে বেঁচে ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রায়ই নিজের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এর দ্বারা তিনি ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আবুল আব্বাস ঈসা তহমানি বলেন, এই মহিলা খাবার গ্রহণ করতেন না। এমনকি তিনি খাবার থেকে একটু দূরে সরে বসতেন। কখনো কখনো নাকে হাত দিতেন। আমি তাকে প্রশ্ন করি, আপনার ঘুম আসে? তিনি জবাব দেন, হ্যা, স্বাভাবিক মানুষের মতই।

'আপনি তো কিছুই খান না। শরীরে কোনো দূর্বলতা অনুভব হয়?'

'নাহ কখনোই শরীরে দূর্বলতা অনুভব করিনি'

'আপনি কি নামাজের জন্য অজু করেন?'

'হ্যা। যদিও আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার দরকার হয় না কিন্তু ফকিহরা আমাকে বলেছেন অজু করে নিতে। যেহেতু আমার ঘুম আসে'

'আমি শুনেছি আপনি প্রায়ই সদকা গ্রহন করেন। এটা দিয়ে কী করেন?'

'আমার ও বাচ্চাদের জন্য কাপড় ক্রয় করি'

সূত্র ———————

ঘটনাটি হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর সূত্রে হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী তার রচিত 'তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (২২শ খন্ড, ২১৮-২২ পৃষ্ঠা)। দারুল কিতাবিল আরাবি।

এই ঘটনা সম্পর্কে যাহাবী লিখেছেন, ঘটনাটি সত্য। এটি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩শ খন্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা) মুআসসসাতুর রিসালাহ।

একই ধরনের আরেকটি বর্ননা আছে আয়েশা বিনতে আবদুল্লাহ বিন আসেম আন্দালুসিয়া সম্পর্কেও। যাহাবীর সুত্রে ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, তিনি বিশ বছর খাবার ও পানীয় ছাড়া বেঁচে ছিলেন। (আদ দুরারুল কামিনা, ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

২৩। মুনজির বিন সাইদের সত্য উচ্চারণ

মুনজির বিন সাইদ আল বাল্লুতি। আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম। দীর্ঘদিন তিনি কর্ডোভার কাজি ছিলেন। সুবক্তা হিসেবে তার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি ছিলেন ফকিহ। কাব্যচর্চাতেও তার সুনাম ছিল। ইবনে বাশকুয়াল লিখেছেন, মুনজির বিন সাইদ অধিক হারে নফল রোজা রাখতেন । নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। সত্য প্রকাশে ছিলেন নির্ভিক। কারো কটুক্তি কিংবা অসন্তুষ্টির ভয় করতেন না তিনি।

খলিফা আবদুর রহমান আন নাসির। আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন। তার শাসনামলে আন্দালুসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। বিখ্যাত আয যাহরা প্রাসাদ তিনিই নির্মান করেন। ঐতিহাসিক মাক্কারী ও ইবনুল আযারী এই প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আয যাহরা প্রাসাদের কয়েকটি স্তম্ভে সোনা ও রুপার প্রলেপ দেয়া হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন খলীফা আবদুর রহমান আন নাসির। এ সময় উপস্থিত হলেন মুনজির বিন সাইদ আল বাল্লুতি।

'আমার পূর্বে আর কোনো খলিফাকে এমন কাজ করতে দেখেছেন কিংবা শুনেছেন?' গর্বের সুরে জিজ্ঞেস করলেন খলীফা।

মুনজির বিন সাইদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। তিনি বলেন, হে আমিরুল মুমেনিন। শয়তান আপনাকে এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে। 'একথা বলছেন কেন?' অবাক হলেন খলিফা।

মুনজির বিন সাইদ কোরআনুল কারিমের আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

— —
— — — — — — —

সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতালম্বী হইয়া পড়িবে এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহকে যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে। এবং উহাদের ঘরের জন্য দরজা ও পালংক, যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। এবং স্বর্ণ নির্মিতও। আর এসবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ। *(সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫)*

আয়াত শুনে খলীফা অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকেন। এরপর তিনি ধরা গলায় বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি স্তম্ভগুলো সরিয়ে ফেলার আদেশ দেন।

মুনজির বিন সাইদের জন্ম ২৭৩ হিজরীতে। তিনি ইন্তেকাল করেন ৩৫৫ হিজরীতে। রহিমাহুল্লাহ।
(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬শ খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী)

২৪। মৃত্যু যেখানে সুন্দর হয়ে ওঠে

৯২৩ হিজরী।

মালোয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন মন্ত্রী মন্দলি রায়। প্রাণভয়ে ভীত সুলতান মাহমুদ শাহ রাতের আধারে পালিয়েছেন নিজের রাজ্য থেকে। ক্ষমতার চাবি পেয়ে মন্দলি রায় হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য। রাজ্য থেকে ইসলামী নিদর্শনগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। পৌত্তলিক প্রথার প্রচার করা হয় ব্যাপকভাবে। নিজের রাজ্য ও জনগণ নিয়ে চিন্তিত মাহমুদ শাহ ভাবলেন, এর বিহিত করা দরকার। কিন্তু কে তাকে সাহায্য করবে? কার কাছে যাবেন? ভাবতে ভাবতে আশার আলো দেখলেন তিনি। একটাই সমাধান চোখে পড়লো তার। গুজরাট যাওয়া যায়। সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের সাথে দেখা করে তাকে সব জানাতে হবে। তিনি নিশ্চয় বসে থাকবেন না। কিছু একটা পদক্ষেপ নিবেনই।

মাহমুদ শাহ গুজরাটে পৌছলেন। দেখা করলেন সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের সাথে। মালোয়ার বৃত্তান্ত শুনে ব্যথিত হলেন সুলতান। দ্রুত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে রওনা হলেন মালোয়ার দিকে। সুলতানের বাহিনী ঝড়ের গতিতে মান্ডো পৌছে। সুলতান এখানের কেল্লা অবরোধ করেন। টানা কয়েকদিন থেমে থেমে যুদ্ধ চলছিল। আচমকা কেল্লার ফটক খুলে যেত। কয়েকজন অশ্বারোহী বের হয়ে সুলতানের বাহিনীতে হামলা চালিয়ে দ্রুত আবার কেল্লায় ফিরে যেত। এসব হামলায় দুপক্ষেই হতাহত হতো। মন্দলি রায় ভেবে দেখলো সুলতানের বাহিনীর সাথে লড়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে রানা সংঘের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখে। রানা সংঘ সুলতানের মুকাবিলা করার জন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হয়। সুলতান মুজাফফর শাহ এ সংবাদ শুনে আদিল খান ফারুকি, ফাতাহ খান ও কওয়াম খানকে রানা সংঘের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। রানা সংঘ সারেঙ্গপুরের কাছাকাছি এসে সুলতানের বাহিনীর কথা জানতে পেরে আর সামনে এগুনোর সাহস করেনি। সে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

কয়েকদিন যুদ্ধের পর সুলতান দুর্গ জয় করেন। সুলতানের বাহিনী কেল্লার ভেতর প্রবেশ করে। সুলতান আমীরদের সাথে নিয়ে কেল্লার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। এসময় তারা মালোয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ধনভান্ডার সম্পর্কে অবগিত হন। আমিরদের একজন জানতে চাইলো, সুলতান, এখন এ রাজ্য নিয়ে কী করবেন? সুলতান জবাব দিলেন, মাহমুদ শাহকে ফেরত দিব।

আমিরদের কেউ কেউ সাহস করে বলে ফেলে, এ যুদ্ধে আমাদের প্রায় দুহাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছে। আপনার উচিত এ রাজ্য নিজের করে নেয়া। মাহমুদ শাহকে ফিরিয়ে দেয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। একথা শুনে সুলতান দূর্গ পরিদর্শন বন্ধ করে কেল্লার বাইরে চলে আসেন। তিনি মাহমুদ শাহকে বলেন, আমার সাথীদের কাউকে আর কেল্লার ভেতর প্রবেশ করতে দিবেন না। মাহমুদ শাহ সুলতানকে কয়েকদিন কেল্লায় অবস্থান করার আমন্ত্রন জানান কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।
অনেকদিন পর সুলতান তার এক প্রিয়জনকে বলেছিলেন, আমি এই জিহাদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম। কিন্তু আমিরদের বক্তব্য শুনে মনে হলো শীঘ্রই হয়তো আমার নিয়ত বদলে যাবে, ইখলাস নষ্ট হবে। আমি সুলতান মাহমুদের কোনো উপকার করিনি, তিনিই আমার উপকার করেছেন। তার কারনে আমি জিহাদে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।
— এই হলেন গুজরাটের সুলতান মুজাফফর শাহ হালিম। তিনি শুধু নিছক একজন শাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফকিহ ও মুহাদ্দিস। সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের জন্ম ৮৭৫ হিজরীতে, গুজরাটে। তিনি মাজদুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ এলায়জির কাছে পড়াশোনা করেন। হাদিস পড়েন শায়খ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন উমরের কাছে। বাল্যকাল থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ৯১৭ হিজরীতে তিনি গুজরাটের সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলতান অনেক গুনের অধিকারী ছিলেন। তার হাতের লেখা ছিল সুন্দর। সাধারণত তিনি খত্তে নসখ ও খত্তে সুলুসে লিখতেন। তিনি নিজ হাতে কোরআনুল কারিমের অনুলিপি তৈরী করে মদীনায় প্রেরণ করেন। আলেমদের সম্মান করতেন। সবসময় অজু অবস্থায় থাকতেন। জামাতে নামাজ পড়তেন। কখনো মদ স্পর্শ করেননি। যৌবনের শুরুতেই কুরআন হিফজ করেছিলেন।
— মুজাফফর শাহ হালিম ইন্তেকাল করলেন ৯৩২ হিজরীর জমাদিউস সানিতে। দিনটি ছিল শুক্রবার। কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার সকালে গোসল করলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়ে মহলে এলেন। স্ত্রীর সাথে সামান্য কথা বলে দরবার ডাকলেন। সবাই উপস্থিত হলে বললেন, আল্লাহর শোকর, আমি কুরআন হিফজের পাশাপাশি প্রতিটি আয়াতের তাফসির, শানে নুযুল ও মর্মকথা আয়ত্ত করি। উস্তাদ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন উমরের কাছ থেকে যেসব হাদিসের সনদ নিয়েছি তার সনদ, মতন এবং রাবীদের জীবনি এখনো আমার স্মরণে আছে। আল্লাহর শোকর তিনি আমাকে ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানদান করেছেন , যার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যান কামনা করেন তাকে ফিকহের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী)

আমি আল্লামা বাগাভীর তাফসিরগ্রন্থ মাআলিমুত তানযিল একবার পড়েছি। আবার পড়া শুরু করে অর্ধেকে পৌছেছি। আশা করছি জান্নাতে গিয়ে বাকিটা শেষ করবো। ধীরে ধীরে তার মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ইতিমধ্যে জুমার আযান হয়। তিনি বলেন, আজ আযান অনেক আগে দিচ্ছে মনে হয়। আসাদুল মুলক এসময় সুলতানের পাশে ছিলেন । তিনি বললেন, আজ শুক্রবার জুমার আযান দিচ্ছে। একথা শুনে সুলতান জোহরের নামাজ পড়ে নেন। সবাইকে মসজিদে যাওয়ার আদেশ দেন। বলেন জোহর পড়েছি, আল্লাহ চাহে তো আসর জান্নাতে গিয়ে আদায় করবো।
এরপর শুয়ে তিনি সুরা ইউসুফের এই আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন,

— — — — — — — — — — — — — — — — —

হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলি ও জমিনের স্রস্টা, আপনিই ইহকালে ও পরকালে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০১)
তিনি কয়েকবার এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর কালিমা পড়েন। তার দেহ স্থির হয়ে যায়। শাহী মসজিদে তখন খতিব সাহেব খুতবা দিচ্ছিলেন।
(নুজহাতুল খাওয়াতির, ৪৩২-৪৩৫ পৃষ্ঠা– আল্লামা আবদুল হাই হাসানি নদভী। দার ইবনে হাজম)
—-

হাফেজ আবদুল গনী মাকদিসী রহিমাহুল্লাহ।
হাম্বলী মাজহাবের বিখ্যাত আলেম। ৫৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণকারী এই আলেম সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী লিখেছেন, তিনি হাম্বলী মাজহাবের ইমাম, হকের পতাকাবাহী, সাহসী, আবেদ, সুন্নাহর অনুসারী। তিনি সত্য প্রকাশে কাউকে ভয় পেতেন না। কোথাও অন্যায় দেখলে কথার মাধ্যমে কিংবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতেন। নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না। দামেশকে অবস্থানকালে তিনি বাদ্যযন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু বকর বিন আহমদ তহান বলেন, একবার সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর সন্তানদের কয়েকজন বাগানে বসে তাম্বুরাতে গান শুনছিল। আবদুল গনী মাকদিসী এ দৃশ্য দেখে তাম্বুরা ভেংগে ফেলেন।
আল মালিকুল আদিল বলতেন, আমি এই ব্যক্তির মত আর কাউকে এতটা ভয় পাই না।

তিনি অনেক বই লিখেছেন। তার শিষ্য হাফেজ জিয়াউদ্দিন মাকদিসী বলেন, তিনি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতেন না। ফজরের নামাজের পর লোকজনকে কোরআন পড়াতেন। কখনো আবার হাদিসের দরস দিতেন। এরপর অজু করে নামাজে দাড়াতেন। যোহরের আগ পর্যন্ত প্রায় তিনশো রাকাত নফল পড়তেন। এরপর সামান্য ঘুম। যোহরের পর লেখেলাখি কিংবা হাদিসের পাঠদানে ব্যস্ত হতেন। এভাবে মাগরিব পর্যন্ত চলতো। রোজা থাকলে ইফতার করে নিতেন। এশার পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন। এরপর আবার নামাজে দাড়াতেন। — ৬০০ হিজরী।

মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছেন হাফেজ আবদুল গনী মাকদিসী। টানা ১৬ দিন ধরে তিনি অসুস্থ। দাড়ানোর শক্তি নেই, কথা বলতেও কষ্ট হয়। পিতার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আবু মুসা।

‘বাবা, আপনার কিছু লাগবে? আপনি কিছু চান?’ আবু মুসা জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমি আল্লাহর রহমত চাই। আমি জান্নাত চাই’ মৃদু কণ্ঠে বললেন আবদুল গনী মাকদিসী। ইলমের অন্বেষণে দামেশক, বাগদাদ, ইস্কান্দরিয়া, মোসুল, ইস্ফাহান, হামাদান ও বাইতুল মাকদিস চষে বেড়ানো মানুষটির কণ্ঠ আজ বড়ই নিস্তেজ।

মসজিদে ফজরের আজান হয়। আবু মুসা গরম পানি এনে দেন। আবদুল গনি মাকদিসী অজু করেন। পুত্রকে বলেন, নামাজ পড়াও, কিরাত সংক্ষেপ করো। জামাতে নামাজ পড়া হয়। আবদুল গনী মাকদিসী বসে নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে আবু মুসা পিতার মাথার পাশে বসেন।

‘সুরা ইয়াসিন পড়ো’ বললেন আবদুল গনী মাকদিসী। আবু মুসা পিতার আদেশমত সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করেন। এরপর আবদুল গনী মাকদিসী দোয়া করতে থাকেন। পুত্র আবু মুসা তার দোয়াতে আমিন বলেন। আবু মুসা ওষুধ নিয়ে আসেন।

‘বেটা, এখন মৃত্যু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই’ বললেন আবদুল গনী মাকদিসী।

‘আপনি এখন কী চান?’

‘আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই’

‘আপনি কি আমার উপর সন্তুষ্ট?’

‘হ্যা আমি সন্তুষ্ট’

‘আপনার কোনো অসিয়ত আছে?’

‘কেউ আমার কাছে কিছু পায় না, আমিও কারো কাছে কিছু পাই না’ ‘আমাকে কিছু নসিহত করুন’

‘তোমার উপর আবশ্যক তাকওয়া অবলম্বন করা। সবসময় আল্লাহর আনুগত্য করবে’

এসময় কয়েকজন লোক শায়খকে দেখতে আসে। তারা এসে শায়খকে সালাম দেয়। শায়খ সালামের জবাব দেন। এরপর লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করে। শায়খ খুব বিরক্ত হন। তিনি বলেন, 'কী করছো? আল্লাহর জিকির করো। পড়ো লা ইলা ইল্লাল্লাহ। একটু পর লোকজন চলে যায়। শায়খের ঠোঁট নড়ছিল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি জিকির করছেন। একটু পর তিনি ইন্তেকাল করেন। রহিমাহুল্লাহ।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১শ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী)

২৫। রজা বিন হায়াতের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত

জাবেক। ৯৯ হিজরী।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক। খলিফার শিয়রে বসে আছেন বিশিষ্ট আলেম রজা বিন হাইওয়াহ।

'আমাকে পরামর্শ দিন। আমার পর কে খলিফা হবে? কাকে মনোনিত করে যাবো? আমার ছেলেদের কাউকে মনোনিত করবো? ' খলিফা বললেন।

'আপনার ছেলে দাউদ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছে। সে জীবিত না মৃত তা জানা যায়নি এখনো। আপনার অন্য সন্তানরা খুবই ছোট। তারা রাজ্যচালনার বয়সে পৌঁছেনি' রজা বিন হায়াত বললেন।

'আমি তাহলে কী করতে পারি?' খলিফা অসহায় কণ্ঠে বললেন।

'আপনার চাচাতো ভাই উমর ইবনে আবদুল আযিযকে মনোনিত করতে পারেন।'

'আমার ভাইয়েরা ক্ষিপ্ত হবে। আমি এই ঝুকি নিতে পারি না'

'আপনি উমর কে মনোনিত করুন। তারপরের খলিফা হিসেবে ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিককে মনোনিত করুন। আশা করি এতে তারা শান্ত হবে'

'তবু এই সংবাদ শুনলে তারা উত্তেজিত হবেই। কী করা যায়?'

'আপনি একটি কাগজে এখুনি ফরমান লিখে ফেলুন। তারপর একে খামবদ্ধ করে ফেলি। এই খামের লেখার উপর সবার বায়াত নেয়া হবে'

খলিফা দ্রুত কাগজ আনতে বলেন। কাগজ আনা হলে খলিফা তাতে পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আযিযের নাম লিখেন। কাগজ খামবদ্ধ করা হয়। 'এটা নিয়ে যান। সবাইকে বলুন এর উপর বায়াত দিতে' বললেন খলিফা।

রজা বিন হাইওয়াহ কামরার বাইরে এলেন। উপস্থিতদের বললেন, এই খামের ভেতর যার নাম আছে সেই হবে পরবর্তী খলিফা। তোমরা বায়াত দাও। সবাই নাম জানতে চাইলো।

'খলিফার মৃত্যুর আগে নাম প্রকাশ করা হবে না' বললেন রজা বিন হাইওয়াহ। কেউ বায়াত দিলো না। রজা ফিরে এলেন খলিফার কাছে। খলিফা সব শুনে

বললেন, পুলিশ প্রধানকে ডেকে আনো। তারপর সবাইকে বায়াত দিতে বলো। কেউ অসম্মতি জানালে তার গর্দানে আঘাত করবে। এবার সবাই বায়াত দেয়। কিছুক্ষণ পর খলিফা ইন্তেকাল করেন।

'এই খামের ভেতর উমর ইবনে আবদুল আযিযের নাম আছে। তিনিই পরবর্তী খলিফা হতে যাচ্ছেন।' শান্তকণ্ঠে বললেন রজা। আবদুল মালিকের সন্তানরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। রজা বলেন, উমরের পর খলিফা হবেন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক। একথা শুনে তারা শান্ত হয়।

উমর ইবনে আবদুল আযিয পুরো সময়টা চুপচাপ বসে ছিলেন। 'উঠুন , সবার বায়াত নিতে হবে' বললেন রজা বিন হায়াত।

একথা শুনে উমর ইবনে আবদুল আযিয উঠে দাড়ান। এবং সবার বায়াত গ্রহন করেন।[১৫১]

— উমর ইবনে আবদুল আযিযের সিংহাসন আরোহনকালে বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা দরকার। শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন, সেসময় হুকুমত কেবল ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায়ের একটি ব্যবস্থাপক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের আকিদা-আখলাক ও তাদের গোমরাহী কিংবা হেদায়াতের ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। প্রাচীন জাহেলী প্রবণতা যা খিলাফাতে রাশেদার প্রভাবে চুপসে গিয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গোত্রীয় অহমিকা, বংশীয় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি এগুলো আবার ফিরে আসে। বাইতুল মাল হয়ে ওঠে খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। গান বাজনা ও আমোদ প্রমোদের প্রতি সবার গভীর অনুরাগ দেখা দেয়। দেখে মনে হচ্ছিল আহত জাহিলিয়াত আবার ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নিতে।[১৫২]

এই সময়ে প্রয়োজন ছিল একটা ঝাকুনির। উম্মাহ এমন একজন শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল , যিনি এসে জাহিলী প্রবণতার বিনাশ করবেন। যিনি তার যুহদ, তাকওয়া, সতর্কতা ও সংযমের দ্বারা হুকুমতের প্রাণসত্তা বদলে দিবেন।

উমর ইবনে আবদুল আযিযই হলেন সেই শাসক। — উমর ইবনে আবদুল আযিযের জন্ম ৬১ হিজরীতে। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ও সুলাইমানের শাসনামলে তিনি মদীনার গভর্ণর ছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন সৌখিন কেতাদুরস্ত যুবকের প্রতিচ্ছবি। তার চলাফেরা ছিল যুবকেদের জন্য ঈর্ষনীয়। তিনি

---

[১৫১] তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।দারুল কুতুবিল আরাবি।

[১৫২] তারিখে দাওয়াত ও আযিমত, ১ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা– সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। মজলিসে তাহকিকাত ও নশরিয়াতে ইসলাম, লখনৌ।

যে পথ অতিক্রম করতেন সেপথে অনেকক্ষণ সুগন্ধি মেখে থাকতো।[১৫৩] খোদাপ্রদত্ত নেক মেজাজ ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা তার মাঝে দেখা যায়নি যা দ্বারা বুঝা যাবে তিনি আগামীতে বড় কোনো খেদমত করতে যাচ্ছেন। তাছাড়া সাধারণভাবে তার খলিফা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। হয় সুলাইমানের পুত্ররা খলিফা হবেন, নইলে তার ভাইয়েরা। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললে উমর ইবনে আবদুল আযিয বড়জোর কোনো একটি এলাকার শাসনকর্তা হতেন। কিন্তু একজন আলেমের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বনু উমাইয়ার ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিল। সেই আলেম হলেন রজা বিন হাইওয়াহ। যার পরামর্শে সুলাইমান বিন আবদুল মালিক পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আযিযকে মনোনিত করেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযিয সিংহাসনে আরোহন করে যেসকল বিপ্লাবত্মক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। তার যুহদ ও তাকওয়া নিয়েও ইতিহাসগ্রন্থ সমূহে বিশদ বর্ননা রয়েছে। তবে প্রায়ই আলোচনার আড়ালে থেকে যায় রজা বিন হাইওয়াহর ঘটনাটি।

— রজা বিন হাইওয়াহ ছিলেন তাবেয়ী। তিনি হাদিস বর্ননা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, আবু সাইদ খুদরি, আবু উমামা বাহেলী প্রমুখ থেকে। ইমাম নাসায়ী তাকে সিক্বাহ বলেছেন। ফকিহ হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। উমাইয়া খলিফাদের দরবারে তাকে খুব সম্মান করা হত।[১৫৪] ৬৬ হিজরীতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান যখন কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেন তখন নির্মাণকাজ তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয় রজা বিন হাইওয়াহকে।[১৫৫]

সমকালীন আলেমরা রজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে রজা বিন হাইওয়াহর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, তিনি উম্মাহকে একজন মহান শাসকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

---

[১৫৩] সিরাতু উমারিবনি আবদিল আযিয মা রওয়াহুল ইমাম মালিক বিন আনাস ওয়া আসহাবুহু, ২৫ পৃষ্ঠা— আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম।

[১৫৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪র্থ খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাতুর রসালা

[১৫৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২শ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির। মারকাজুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়া ওয়াল ইসলামিয়া।

উমর মুখতারের দৃঢ়তা

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে উমর মুখতার মিসর সফর করেন। এই সফরে তার সংগী ছিলেন আলি পাশা উবাইদি।

সেসময় উমর মুখতারের একের পর এক হামলার কারনে ইতালিয়ানরা নির্বিঘ্নে রাতে ঘুমাতেও পারছিল না। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ছিল খুবই কম, যা ছিল তাও পুরনো মান্ধাতা আমলের। তারা লড়ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। সংখ্যায় তারা ছিল কম, তবুও তারা নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল ইতালিয়ানদের। ইতালিয়ানরা বুঝতে পারছিল মুজাহিদদের নেতৃত্বে আছেন উমর মুখতার। তাকে কাবু করতে পারলেই যুদ্ধ অর্ধেক জেতা হয়ে যাবে। উমর মুখতার মিসরে অবস্থান কালে ইতালি সরকার তাদের স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে উমর মুখতারের সাথে যোগাযোগ করে। তারা প্রস্তাব করে, উমর মুখতার চাইলে ইতালি সরকার তাকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা করবে যা দিয়ে তিনি বেনগাজি বা আল মার্জ শহরে বাড়ি করতে পারবেন। আজীবন ইতালি সরকার তাকে নিরাপত্তা দিবে। তিনি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। উমর মুখতারকে দেয়া হবে ইতালির শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সমমর্যাদা। উমর মুখতার যদি চান তাহলে তাকে মিসরে বসবাসের সুযোগ করে দিতেও ইতালি সরকার রাজি। শর্ত একটাই, তাকে ইদরিস সানুসির সাথে সবধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। উমর মুখতারকে আজীবন মোটা অংকের ভাতা দেয়া হবে। এই চুক্তিতে সবরকমের গোপনিয়তা রক্ষা করা হবে। চুক্তি সম্পর্কে কেউ জানবে না। শুধু উমর মুখতার তার অনুসারিদের বলে দিবেন তারা যেন ইতালির বিরুদ্ধে লড়াই না করে।

একটি লোভনীয় অফার। বিপদসংকুল , অনিশ্চিত জীবনের মাঝে সম্ভাবনার হাতছানি। চাইলেই উমর মুখতার এই সুযোগ গ্রহন করতে পারতেন। কেউ জানতো না তার উদ্দেশ্য। তিনি একটা ফতুয়া দিয়ে দিতেন, ইতালিয়ানরা মুসলমানদের বন্ধু। তারা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছে। যেমন ফতুয়া দিয়ে থাকেন একালের দরবারী আলেমগন। কিন্তু উমর মুখতার দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিকিয়ে দিতে চাননি। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা ভালো করে জেনে নাও, আমি কোনো খাবারের লোকমা নই, যার ইচ্ছা সহজে গিলে ফেলবে। যদি কেউ আমার ঈমান আকিদা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করে দিবেন। যারা ইতালিকে চিনতে পারেনি তারা মূর্খ। আমি মূর্খ নই। এটা ভাবা ভুল

হবে যে, আমি রক্তের প্রতিশোধ না নিয়েই শান্তির আলোচনায় চলে যাবো। আমি পানাহ চাই সেই কালোদিন থেকে যেদিন আমি ইতালিয়ানদের বাহনে পরিনত হব। আল্লাহ না করুন যদি কোনোদিন আমি এই জিহাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই, তাহলে বারকাহর অধিবাসীরা যেন অস্ত্র সমর্পনের ক্ষেত্রে আমার আনুগত্য না করে। আমি খুব ভালো করেই জানি লিবিয়ায় আমার ও আমার সাথিদের যদি কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে তাহলে তা আছে সানুসিদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারনেই।

ইতালিয়ানরা এই জবাব পেয়েও হাল ছাড়েনি। তারা উমর মুখতারকে একের পর এক অফার দিতেই থাকে। এমনকি তিনি দেশে ফেরার পরেও তারা এমন কয়েকটি বার্তা পাঠায়।

উমর মুখতারের সাথে মিসরে অবস্থানকারী সানুসি নেতৃবৃন্দ দেখা করেন। তারা তাকে বলেন, আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। লিবিয়ায় জিহাদ পরিচালনা করার জন্য আমরা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিব। একথা শুনে উমর মুখতার রেগে যান। তিনি বলেন, যারা আমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছে তারা আমার কল্যান চায় না। এটা আমার জন্য কল্যানের রাস্তা। যারা আমাকে এর থেকে সরাতে চাইবে তারা আমার শত্রু। উমর মুখতার এই জিহাদকে ফরজ মনে করেই অংশগ্রহন করেছিলেন। তিনি সবসময় দোয়া করতেন, হে আল্লাহ এই পবিত্র রাস্তায়ই যেন আমার মৃত্যু হয়। তিনি বলতেন জিহাদ ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নাই।

(উমর মুখতার– ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবী)

উমর মুখতার

উমর মুখতারের জন্মসাল সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত। কারো কারো মতে উমর মুখতারের জন্ম ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। অপর একদল গবেষকের মতে তার জন্ম ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। লিবিয়ার জাবালে আখজার বা সবুজ পাহাড় বলে পরিচিত এলাকার বুতনান নামক অঞ্চলে তার জন্ম। তার পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবার। উমরের পিতার নাম মুখতার, দাদার নাম উমর। তার নামটি মূলত পিতার নাম ও দাদার নামের সমষ্টি। মুখতার হজ্বের সফরে ইন্তেকাল করেছিলেন। ইন্তেকালের আগে তিনি তার বন্ধু সাইয়িদ আহমদ গিরয়ানিকে বলেছিলেন, আমার ভাইকে বলবে সে যেন আমার দুই পুত্র উমর ও মুহাম্মদের দেখভাল করে।
চাচা উমর মুখতারকে যাবিয়া অঞ্চলের কুরআনিয়া মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাকে জাগবুগি মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়। জাগবুবি মাদরাসায় সে যুগের প্রখ্যাত আলেমরা দরস দিতেন। তারা ছাত্রদের জ্ঞানে গুনে অনন্য করে গড়ে তলতেন। পড়াশোনা শেষে ছাত্রদের লিবিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন যেন তারা সেখানে ইলম প্রচার করে। উমর জাগবুবি মাদরাসায় ইসলামি শরিয়াহর বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনি যাদের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন তারা হলেন, সাইয়িদ জার ওয়ালি মাগরিবি, সাইয়িদ ফালিহ বিন মুহাম্মদ, সাইয়িদ জাওয়ানি প্রমুখ। ছাত্রজীবন থেকেই উমর মুখতার সময় সঙ্গরক্ষনে সচেষ্ট ছিলেন। কখনো তিনি একদিনের কাজ আরেকদিনের জন্য ফেলে রাখেননি। জাগবুবি মাদরাসার শিক্ষকরা ছাত্রদের অবস্থা নিয়মিত তাদের আধ্যাত্মিক ইমাম মুহাম্মদ আল মাহদি সানুসির কাছে পৌছাতেন। এজন্য মুহাম্মদ আল মাহদি শুরু থেকেই উমর মুখতার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। উমর মুখতার শরিয়াহর জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি লিবিয়ার গোত্রগুলো, তাদের স্বভাব ও ইতিহাস সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি মরুভূমির রাস্তাগুলো সম্পর্কেও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। মরু অঞ্চলের গাছগাছালি ও এর ভেষজ গুন সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন, পরবর্তী বছরগুলোতে যা তার কাজে এসেছিল। মরুচারী বেদুইনদের সাহচর্যের ফলে তিনি পশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি সম্পর্কেও ভালো ধারনা রাখতেন।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে উমর মুখতার সুদানে সফরের উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় তার সংগী ছিলেন সাইয়িদ খালিদ বিন মুসা, মুহাম্মদ বিন মাসালুসি, কারজালিহ

মাজবুরি সহ আরো অনেকে। পথে তাদের সাথে আরেকটি বেদুইন কাফেলাও যুক্ত হয়। সুদান সীমান্তে পৌছে কাফেলার লোকেরা জানায়, সামনে একটি বিপদসংকুল পথ আছে। সেই পথে সিং হ বসে থাকে। তাদেরকে একটি উট দিতে হয়, নইলে কাফেলায় হামলা করে। বেদুইনরা কাফেলার একটি দুর্বল উট নির্ধারণ করে। সিদ্ধান্ত হয় এই উটটি সিংহকে দেয়া হবে। কাফেলার সবাইকে বলা হলো উটের মূল্যে শরিক থাকতে। এই সিদ্ধান্ত শুনে বেকে বসেন উমর মুখতার। তার কথা হলো, এটা আমাদের জন্য গ্লানি। আমরা অস্ত্রের জোরে সিং হকে তাড়িয়ে দিব। এভাবে হার মানবো না।
কাফেলা নির্দিষ্ট পথে এসে পৌছে। আড়াল থেকে গর্জন করে সিংহ বেরিয়ে আসে। কাফেলার সদস্যরা ভয়ে কাপতে থাকে। উমর মুখতার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গ্রিক বন্দুক তুলে নেন। সিংহের কপাল বরাবর গুলি করেন। সিংহ লাফিয়ে এগিয়ে আসে। উমর মুখতার আবার গুলি করেন। সিংহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর উমর মুখতার সিং হের চামড়া ছাড়িয়ে নেন। পরে একবার উমর মুখতারকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা বর্ননা করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কুরানের এই আয়াত পাঠ করেন, আপনি যখন তীর নিক্ষেপ করেছিলেন তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। আনফাল আয়াত ১৭
এই ঘটনা থেকে উমর মুখতারের সাহসিকতা ও কুরানের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা আচ করা যায়। উমর মুখতারের সাহসিকতার আরেকটি প্রমান মেলে তার লিখিত পত্রে যা তিনি ১৩৪৪ হিজরিতে শরিফ গিরইয়ানিকে লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন, আমরা শত্রুদের ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান, ইতালিয়ান ও আফ্রিকান ভাড়াটে সৈনিকদের মোটেই ভয় করি না। তারা আমাদের শস্যক্ষেতে যে বিস্ফোরক ফিট করে তাকেও আমরা ভয় করি না। আমরা আল্লাহর সৈনিক। আর আল্লাহর সৈনিকরাই বিজয়ী হয়।

শায়খ মুহাম্মদ আল মাহদি শুরু থেকেই উমর মুখতাদের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। অন্য ছাত্রদের চেয়ে উমর মুখতারকে তার আলাদা মনে হতো। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শায়খ মুহাম্মদ আল মাহদি জাগবুব থেকে আল কুফরাহ পর্যন্ত সফর করেন। এই সফরে উমর মুখতারকে তিনি নিজের সাথে রেখেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি উমর মুখতারকে আল মার্জ এলাকার আল কুসুর খানকাহর শায়খ বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। উমর মুখতার এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেন। সাধারনের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি গোত্রগুলোর অভ্যন্তরিন বিবাদ মেটাতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। খানকাহর পাশেই ছিল উবাইদ নামক একটি বেপরোয়া জেদি গোত্রের বসবাস। উমর মুখতার তার সহনশীলতা ও ধৈর্য দিয়ে এই গোত্রকে বশিভূত করেন। এইসময় চাদে ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল।

তারা সেখানকার মসজিদ মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দেয়। সে সময় সানুসী আন্দলনের পক্ষ থেকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করা হয়। এই জিহাদের জন্য যে কয়জন কমান্ডার নির্বাচিত করা হয় উমর মুখতার ছিলেন তাদের একজন। তিনি চাদে গেলেন। ফরাসিদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরিক হলেন। তার সাহসিকতা, বীরত্ব, নেতৃত্ব ও কৌশলের কারনে তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষন করতে সক্ষম হন। শায়খ মুহাম্মদ আল মাহদি তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, আমাদের কাছে যদি আর দশজন উমর মুখতার থাকতো তাহলে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদের পাশাপাশি উমর মুখতার দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও আকিদা বিনির্মানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় জনগনের মাঝে তিনি তাওহিদের শিক্ষা প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। এসময় তাকে একইসাথে নানা কাজ করতে হচ্ছিল। উমর মুখতারের বাহিনীতে চার হাজার উট ছিল। একবার উটগুলো অসুস্থ হয়ে যায়।তখন তাকে দেয়া হয় চিকিতসার ভার। তার চিকিতসার ফলে অল্পদিনেই উটগুলো সুস্থ হয়ে যায়। মুহাম্মদ আল মাহদির নির্দেশে উমর মুখতার আবার আল কুসুর খানকাহয় ফিরে আসেন। কিছুদিন পরেই সেনুসি মুজাহিদদের সাথে ব্রিটিশ সেনাদের লড়াই বেধে যায়। লড়াই হচ্ছিল মিসর-লিবিয়া সীমান্তের আল বারদি ও মাসাইদ অঞ্চলে। সময়টা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ। উমর মুখতার এই লড়াইয়ে শরিক হন। এই যুদ্ধ শেষে উমর মুখতার নতুন করে আলোচনায় আসেন। অন্যান্য শায়খদের মধ্যেও তার ব্যক্তিত্বের আভা ছড়িয়ে পড়ে। উসমানি খেলাফতের প্রশাসকগনের কানেও উমর মুখতার সমপর্কে নানা তথ্য পৌছতে থাকে। পরবর্তী কয়েক বছর উমর মুখতার স্থানীয়দের আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। পাশাপাশি চলছিল তালিমের কাজ। একইসাথে তিনি সচেষ্ট ছিলে গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লিবিয়া ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। উমর মুখতার তখন জালু নামক এলাকায় অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ শুরু হতেই তিনি আল কুসুর খানকাহয় ফিরে আসেন। এই খানকাহয় এসে তিনি উবাইদ গোত্রকে আদেশ দেন যারা যারা যুদ্ধের উপযুক্ত সবাই যেন জিহাদে বেরিয়ে পড়ে। উবাইদরা উমর মুখতারের ডাকে সাড়া দেয়। তারা অস্ত্র নিয়ে বের হয়ে আসে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ঈদুল আজহার কদিন আগের ঘটনা। উমর মুখতার ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তিনি তার বাহিনী নিয়ে বের হলেন ইতালিয়ানদের আক্রমন করতে। পথেই তারা ঈদুল আজহা উদযাপন করেন। ইদের দিন উমর মুখতারের পক্ষ থেকে সবাইকে গোশত বন্টন করা হয়। উমর মুখতার মুজাহিদদের নিয়ে বানিনাহ নামক স্থানে পৌছেন। এই বাহিনীতে তার সহযগী ছিলেন আহমাদ ঈসায়ী। বানিনা অঞ্চলে আগেই কজন মুজাহিদ ছাউনি ফেলেছিলেন। উমর মুখতারের আগমনে তারা খুব

খুশি হন। এখান থেকেই তারা ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তারা একের পর এক হামলা চালাতে থাকেন।এসব হামলায় তাদের হাতে অনেক গনিমত আসে। এসব যুদ্ধে উমর মুখতার সাহসিকতার সাথে লড়তেন।
শায়খ মুহাম্মদ আখজার ইসাই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সালাবি যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, ইয়াতালিয়ানরা অতর্কিত আমাদের উপর হামলা করে বসে। উমর মুখতার আঘাতপ্রাপ্ত হন। আমরা একটি গমক্ষেতে লুকাতে বাধ্য হই। আমাদের পাশে আরেকটি নিচু ভূমি ছিল। আমরা চাচ্ছিলাম উমর মুখতার সেখানে আশ্রয় নিন। কিন্তু তিনি এর বিরোধিতা করছিলেন। পরে সাইয়িদ আমিন জোর করে তাকে সেখানে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি সেখান থেকে বারবার বের হতে চাচ্ছিলেন। তার বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে তুর্কি কমান্ডাররাও বিস্মিত হন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সামরিক কলেজ থেকে পাশ করা জাদরেল কোনো সেনা অফিসার। প্রথম দিকে ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আহমাদ শরিফ সানুসি। উমর মুখতার সবসময় তার পাশে থাকতেন। তার পরামর্শ মেনে চলতেন। পরে তিনি হিজরত করে চলে গেলে উমর মুখতার , ইদরিস সানুসিকে নিজের মুরব্বী হিসেবে গ্রহন করেন। পরে ইদরিস সানুসি হিজরত করলে জাবালে আখজারের পূর্ণ দায়িত্ব আসে উমর মুখতারের কাধে। উমর মুখতার প্রতিরোধের পাশাপাশি সবার কাছে জিহাদের দা ওয়াত পৌছে দেন। তিনি এসময় বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে গোত্রপতিদের সাথে আলাপ করেন। তাদের মধ্যে জিহাদি জযবা ও উদ্দিপনার সঞ্চার করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উমর মুখতার জিহাদের পাশাপাশি এর দা ওয়াত বুতনান ও জাবালে আখজারের সকল গোত্রের কাছে পৌছে দেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি মিসরে সফর করে ইদরিস সানুসিকে সব বিষয়ে অবগত করবেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে উমর মুখতার মিসর সফর করেন। এই সফরে তার সংগী ছিলেন আলি পাশা উবাইদি।

এদিকে উমর মুখতারের একের পর এক হামলার কারনে ইতালিয়ানরা নির্বিঘ্নে রাতে ঘুমাতেও পারছিল না। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ছিল খুবই কম, যা ছিল তাও পুরনো মান্ধাতা আমলের। তারা লড়ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। সংখ্যায় তারা ছিল কম, তবুও তারা নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল ইতালিয়ানদের। ইতালিয়ানরা বুঝতে পারছিল মুজাহিদদের নেতৃত্বে আছেন উমর মুখতার। তাকে কাবু করতে পারলেই যুদ্ধ অর্ধেক যেতা হয়ে যাবে। উমর মুখতার মিসরে অবস্থান কালে ইতালি সরকার তাদের স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে উমর মুখতারের সাথে যোগাযোগ করে। তারা প্রস্তাব করে, উমর মুখতার চাইলে ইতালি সরকার তাকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা করবে যা দিয়ে তিনি বেনগাজি বা আল মার্জ শহরে বাড়ি করতে পারবেন। আজীবন ইতালি সরকার তাকে নিরাপত্তা দিবে। তিনি

সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। উমর মুখতারকে দেয়া হবে ইতালির শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সমমর্যাদা। উমর মুখতার যদি চান তাহলে তাকে মিসরে বসবাসের সুযোগ করে দিতেও ইতালি সরকার রাজি। শর্ত একটাই, তাকে ইদরিস সানুসির সাথে সবধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। উমর মুখতারকে আজীবন মোটা অংকের ভাতা দেয়া হবে। এই চুক্তিতে সবরকমের গোপনিয়তা রক্ষা করা হবে। চুক্তি সম্পর্কে কেউ জানবে না। শুধু উমর মুখতার তার অনুসারিদের বলে দিবে তারা যেন ইতালির বিরুদ্ধে লড়াই না করে।
একটি লোভনীয় অফার। বিপদসংকুল , অনিশ্চিত জীবনের মাঝে সম্ভাবনার হাতছানি। চাইলেই উমর মুখতার এই সুযোগ গ্রহন করতে পারতেন। কেউ জানতো না তার উদ্দেশ্য। তিনি একটা ফতুয়া দিয়ে দিতেন, ইতালিয়ানরা মুসলমানদের বন্ধু।

তারা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছে। যেমন ফতুয়া দিয়ে থাকেন একালের দরবারী আলেমগন। কিন্তু উমর মুখতার দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিকিয়ে দিতে চাননি। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা ভালো করে জেনে নাও, আমি কোনো খাবারের লোকমা নই, যার ইচ্ছা সহজে গিলে ফেলবে। যদি কেউ আমার ঈমান আকিদা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করে দিবেন। যারা ইতালিকে চিনতে পারেনি তারা মূর্খ। আমি মূর্খ নই। এটা ভাবা ভুল হবে যে, আমি রক্তের প্রতিশোধ না নিয়েই শান্তির আলোচনায় চলে যাবো। আমি পানাহ চাই সেই কালোদিন থেকে যেদিন আমি ইতালিয়ানদের বাহনে পরিনত হব। আল্লাহ না করুন যদি কোনোদিন আমি এই জিহাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই, তাহলে বারকাহর অধিবাসীরা যেন অস্ত্র সমর্পনের ক্ষেত্রে আমার আনুগত্য না করে। আমি খুব ভালো করেই জানি লিবিয়ায় আমার ও আমার সাথিদের যদি কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে তাহলে তা আছে সানুসিদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারনেই।
ইতালিয়ানরা এই জবাব পেয়েও হাল ছাড়েনি। তারা উমর মুখতারকে একের পর এক অফার দিতেই থাকে। এমনকি তিনি দেশে ফেরার পরেও তারা এমন কয়েকটি বার্তা পাঠায়।
উমর মুখতারের সাথে মিসরে অবস্থানকারী সানুসি নেতৃবৃন্দ দেখা করেন। তারা তাকে বলেন, আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। লিবিয়ায় জিহাদ পরিচালনা করার জন্য আমরা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিব। একথা শুনে উমর মুখতার রেগে যান। তিনি বলেন, যারা আমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছে তারা আমার কল্যান চায় না। এটা আমার জন্য কল্যানের রাস্তা। যারা আমাকে এর থেকে সরাতে চাইবে তারা আমার শত্রু। উমর মুখতার এই জিহাদকে ফরজ মনে করেই

অংশগ্রহন করেছিলেন। তিনি সবসময় দোয়া করতেন, হে আল্লাহ এই পবিত্র রাস্তায়ই যেন আমার মৃত্যু হয়। তিনি বলতেন জিহাদ ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নাই।

মিসরে অবস্থানকালে উমর মুখতারের সাথে সাইয়িদ ইদরিসের দেখাসাক্ষাত ও দীর্ঘ আলাপ হয়। এ সময় সিদ্ধনাত নেয়া হয়, উমর মুখতার হবেন লিবিয়ার জিহাদের সর্বাধিনায়ক। শায়খ ইদরিস মিসরে অবস্থান করে মুজাহিদদের রাজনৈতিক সহায়তা দেয়ার কাজ করবেন। তিনি চেষ্টা করবেন লিবিয়ান শরনার্থী ও মুজাহিদদের মিসরে আশ্রয় দিতে। মিসর থেকে জিহাদের নানা বিষয়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিবেন শায়খ ইদ্রিস। উমর মুখতারের সাথে তার যোগাযোগের মাধ্যম হবেন আলহাজ তাওয়াতি বারউসি।

উমর মুখতার মিসর ত্যাগ করেন। উমর মুখতার মিসরে অবস্থানকালে ইতালিয়ানদের সাথে মুজাহিদদের দুটি বড় বড় যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এসব যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুজাহিদ কমান্ডার শাহাদাত বরন করেন। বেশ কিছু অঞ্চল ইতালিয়ানদের দখলে চলে যায়। ইতালিয়ানরা উমর মুখতারের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। তারা চাচ্ছিল তাকে পথেই আটকে দিতে, যেন তিনি তার সাথীদের সাথে দেখা করতে না পারেন। কিন্তু উমর মুখতার তাদের নজর এড়িয়ে বি'রে আলগাবিতে পৌছে যান। সেখানে মুজাহিদদের ক্ষুদ্র একটি কাফেলা উমর মুখতারের জন্য অপেক্ষা করছিল। সময়টা ছিল রমজান মাস। সবাই রোজা রেখেছিলেন। আচমকা সেখানে ইতালিয়ান বাহিনী হামলা করে বসে। কিন্তু মুজাহিদদের প্রতিরোধের মুখে তারা পালাতে বাধ্য হয়। মিসর থেকে ফিরে এসে উমর মুখতার সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠার কাজে মন দেন। বারাইসাহ, আবিদ , হাসাহ নামক এলাকায় তিনি বেশ কয়েকটি সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন। এবার শুরু হয় সংঘটিত আক্রমন। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রিসাটব্দে মুজাহিদদের সাথে ইতালিয়ানদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধের ফলে মুজাহিদরা তাদের ততপরতার সীমানা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়। একইসাথে একজন দক্ষ সেনাপতি হিসেবে উমর মুখতার প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। একইসাথে তিনি গোত্রগুলোর মাঝে নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করেন, তারাও এই জিহাদে শরিক হয়। বিশেষ করে আবিদ, বারাইসাহ, হাসাহ, দারসাহ, আওয়াকির, শাহিবাত, মানফা এসব গোত্র এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল। উমর মুখতারের ঘাটি ছিল বারগিস ছাউনিতে। এখান থেকেই তিনি জিহাদ পরিচালনা করতেন। তিনি তখন লিবিয়ার জিহাদের অবিসংবাদিত সেনাধিনায়ক। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতালিয়ানরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল উমর মুখতারের ছাউনিগুলো দখল করার জন্য। ফলে উমর

মুখতারকে একের পর এক যুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। তার বিশ্রামের কোনো সুযোগই ছিল না।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটনাপ্রবাহ নতুন দিকে মোড় নেয়। সানুসি আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাইয়িদ রেজা মাহদি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গ্রেফতার হন। ফলে বারকা আল হামরা ও বারকা আল বাইদা এলাকাদুটি মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে যায়। একইসাথে ইতালিয়ানদের সামরিক নেতৃত্বেও পরিবর্তন আসে। জাবালে আখজার দখলের জন্য নিযুক্ত করা হয় জেনারেল মিজেটিকে। বেনগাজির গভর্নর মুম্বিলিকে সরিয়ে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় টেরটসকে। এই টেরটস ছিল একজন উচুমাপের ফ্যসিবাদি। জেনারেল মেজিটিকে সহায়তা করার জন্য অনেক বুদ্ধিজীবি, সামরিক বিশ্লেষক, সেনা কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। একইসাথে ত্রিপলি থেকে জেনারেল গ্রাজিয়ানির নেতৃত্বে ইতালির সামরিক বাহিনী আগমন করে। তারা আল জাফরা মরুদ্যান দখল করে নেয়। এসময় মুজাহিদদের সাথে বেশ কয়েকটি লড়াই হয় ইতালিয়ানদের যার মধ্যে হারুজের যুদ্ধ, জাবালুস সাওদার যুদ্ধ, কারাহ আফিয়া যুদ্ধ অন্যতম।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীর শেষদিকে গ্রাজিয়ানির নেতৃত্বে ইতালিয়ান বাহিনী মুজাহিদদের উপর হামলা করে। টানা পাচদিন লড়াই চলে। এই লড়াইয়ে ইতালিয়ানরা পরাজিত হয়। প্রচুর গোলাবারুদ, অস্ত্র ও গাড়ি মুজাহিদদের হাতে আসে। ইতালিয়ানদের আরেকটি বাহিনী ফেজানের দিকে এগিয়ে আসে। এই বাহিনীর উপর মুজাহিদরা গেরিলা পদ্ধতিতে হামলা করে নাস্তানাবুদ করে দেয়। প্রচুর ইতালিয়ান সেনা মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয়। এই যুদ্ধের ফলে ইতালিয়ানদের মনোবল ভেংগে যায়। ইতালিয়ানরা অর্থের লোভ দেখিয়ে কয়েকজন গোত্রপতিকে হাত করে ফেলে। জিহাদকে থামিয়ে দিতে তাদের এই প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখে। জাগবুব, জালু, উজলু, ফেজান এলাকাগুলি মুজাহিদদের হাতছাড়া হওয়ার পেছনে এই ষড়যন্ত্রই দায়ি ছিল। উমর মুখতার জাবালে আখজারে এক প্রকার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তবুও তিনি বেশ কয়েকটি হামলায় ইতালিয়ানদের পরাজিত করেন। ইতালিয়ানরা যুদ্ধের ময়দানে কোনো মানবিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা করতো না। তারা নারী ও শিশুদের উপরও হামলা করতো। নির্মম অত্যাচার করতো। তারা উবাইদি গোত্রের নারিদের কান থেকে অলংকার টেনে নিয়েছিল নির্মমভাবে। আওয়াকির গোত্রের ইবরাহিম পরিবারের সাথেও তারা নির্মম আচরন করেছিল। এই পরিবারের ৪০ জন পুরুষকে তারা হত্যা করে। তারপর লাশের উপর দিয়ে সামরিক যান চালিয়ে দেয়।

মুজাহিদদের অর্থের উতস ছিল উশর। উশর সংগ্রহ করা হতো খুবই গোপনিয়তার সাথে। এমনকি ইতালিয়ান গোয়েন্দারাও কিছুই টের পেত না। ইতালিয়ানরা কোনো মুজাহিদকে গ্রেফতার করতে পারলে তার শাস্তি হত সরাসরি ফাসি।

ইতালিয়ানরা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল মুজাহিদদের আক্রমনে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল ব্রেলা উমর মুখতারের সাথে সন্ধিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। উমর মুখতার শর্ত দেন ইতালি সরকার যদি সন্ধিচুক্তিতে আন্তরিক হয়ে থাকে তাহলে আলচনায় বসার আগে সানুসি নেতা মুহাম্মদ রেজাকে মুক্তি দিতে হবে। ইতালিয়ানরা এই শর্ত মেনে নেয়। তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২০ মার্চ আলি পাশা উবাইদির ঘরে উমর মুখতার ইতালি সরকারের প্রতিনিধির সাথে মিলিত হন। এই বৈঠকে ইতালি সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তা, লিবিয়ার কজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, কয়েকজন গোত্রপতি উপস্থিত ছিলেন। মে মাস পর্যন্ত একের পর এক বৈঠক চলতেই থাকে। ইতালি সরকার কয়েকটি শর্ত দেয়। যা নিম্মরুপ

১। সাইয়িদ ইদরিসসহ সানুসি আন্দোলনের সকল নেতা দেশে ফিরে আসবেন। তারা এখানে সম্মানের সাথে বসবাস করবেন।

২। সানুসি আন্দোলনের সবকটি খানকাহকে সম্মান করা হবে। শায়খদের মাসিক ভাতা দেয়া হবে।

৩। সানুসি পরিবারের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে।

৪। সানুসি পরিবারের সম্পদ ও খানকাহর জমির জন্য খাজনা মাফ করে দেয়া হবে।

৫। মুজাহিদরা তাদের অস্ত্র সমর্পন করবে। প্রতিটি বন্দুকের বিনিময়ে তাদেরকে এক হাজার লিরা দেয়া হবে।

৬। মুজাহিদ ছাউনি থেকে সানুসি সেনাদের সরিয়ে নিতে হবে। এদেরকে ইতালির বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হবে।

উমর মুখতার শেষ দুই শর্তের বিরোধিতা করেন। তিনি সরাসরি বলে দেন, মুজাহিদরা তাদের অস্ত্র সমর্পন করবে না, এবং সানুসি সেনাদেরকেও সরানো হবে না। কেউ কেউ ইতালিয়ানদের প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেও উমর মুখতার তার মতে অটল থাকেন। আরো কিছুদিন যায়, কয়েকটি বৈঠক হয়। এরপর উমর মুখতার শর্ত পেশ করেন,

১। ইতালিয়ান সরকার ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলাতে পারবে না। অফিস আদালতের ভাষা হবে আরবী।

২। আরবী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে উলুমে ইসলামিয়ার নানাদিক পড়ানো হবে।

৩। ইতালি সরকার প্রনিত সকল আইন বাতিল করতে হবে।
৪। মুজাহিদদেরকে অস্ত্র সমর্পনে বাহদ্য করা যাবে না।
৫। এতদিনে দখলকৃত সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।
৬। যারা মুরতাদ হয়ে গেছে কিংবা ইসলামের বিধান নিয়ে উপহাস করে মুজাহিদ বাহিনী শরিয়াহ অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দিবে।

ইতালিয়ানরা উমর মুখতারের এই শর্তাবলী মানে নি। এদিকে সাইয়েদ হাসান রেজা সানুসি ইতালিয়ানদের শর্তগুলো মেনে সন্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। উমর মুখতার তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হাসান রেজা সানুসি উমর মুখতারের দল থেকে বের হয়ে যায়। উমর মুখতার ছিলেন শান্ত। তিনি জানতেন ইতালিয়ানদের এসব শর্ত প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে মুজাহিদদের কোনো উপকারই হবে না।
২ জুন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরের কয়েকটি পত্রিকা উমর মুখতারের একটি বিবৃতি প্রচার করে। সেই বিবৃতিতে তিনিবলেন, লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমরা দায়ী নই। প্রাতরক ইতালিয়ানরা ক্ষমা প্রার্থনা করার আগ পর্যন্ত এখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। যে ব্যতি আল্লাহর গোলাম হয়ে যায় তার জন্য কোনো কাফেরের সামনে মাথা নত করা অসম্ভব।
ইতালিয়ানরা সাইয়িদ হাসান রেজার সাথে যে চুক্তি করেছিল দ্রুতই তারা তা ভংগ করে ফেলে। তারা ঠুনকো অজুহাতে হাসান রেজার বাহিনীর উপর হামলা করে এবং অনেককে হত্যা করে। ১০ জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে হাসান রেজাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে ফ্লোরেন্সে নির্বাসন দেয়া হয়। আবার শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বেন গাজির দায়িত্ব দেয়া হয় জেনারেল গ্রাজিয়ানিকে। গ্রাজিয়ানি এসেই শুরু করে নির্মমতা। সে প্রচুর বন্দীশিবির খুলে বসে। কারো ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হলেই তাকে বন্দী করা হতো। অনেক সময় পুরো পরিবার কিংবা গোত্রকেই বন্দী করা হতো। প্রচুর ফাসি মঞ্চ স্থাপন করা হয়। যখন তখন যে কাউকে ফাসি দিয়ে দেয়া হত। মুজাহিদদের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখলেই তাদেরকে বন্দীশিবিরে পাঠানো হত। বানিনাহ, রাজমাহ, বুর্জতুল্লিক এলাকায় প্রচুর বন্দিশিবীর খোলা হয়। এসব বন্দীশিবিরে প্রায় ৮০ হাজার মানুষকে বন্দী করা হয়। কাউকে গ্রেফতার করে তার বসতবাড়ি ও ক্ষেত খামার পুড়িয়ে দেয়া হত। তাদের কূপ ও পানির উতসগুলো নষ্ট করে দেয়া হত। অনেকসময় পাইকারীভাবে গুলি করে সবাইকে মেরে ফেলা হত। এই অভিযানে রফলে জাবালে আখজার জনশূন্য হয়ে পড়ে। বন্দীশিবিরে তারা চালাতো নির্মম নির্যাতন। সেখানে নানা রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল শতকরা ৯০ ভাগ।

এতদিন পর্যন্ত মুজাহিদরা কৃষকদের থেকে সাহায্য নিতেন। কিন্তু গ্রাজিয়ানি গোটা জাবালে আখজার উজাড় করে ফেলেছে। ফসলের মাঠ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সবাইকে করা হয়েছে বন্দী। বাধ্য হয়ে উমর মুখতার যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি এবার গেরিলা হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দেন। তিনি বিদ্যুতের মত হামলে পড়তেন ইতালিয়ানদের উপর। তারপর আবার নিমেশেই আড়ালে চলে যেতেন।

দিনগুলি ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছিল। মুজাহিদ বাহিনীকে নানা সংকটের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। জনতাও তাদেরকে সাহায্য করা কমিয়ে দেয়। কারন এর ফলে তাদেরকে বিপদে পড়তে হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে মুজাহিদরা কেউ কেউ বলে উঠে আমাদের হিজরত করে মিসরে চলে যাওয়াই ভালো। কাসরুল মাজাহির এলাকায় এ নিয়ে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে উমর মুখতার বলেন, ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে আমি এক পাও পিছু হটবো না। আমি জাবালে আখজার ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি হয় বিজয় অর্জন করবো নইলে শাহাদাত বরন করবো। এর বাইরে তৃতিয় কোনো পথ আমার নেই। তবে তোমাদের উপর আমার কোনো জোরাজুরি নেই। যার ইচ্ছা চলে যাও, যার ইচ্ছা থাকো। একথা শুনে মুজাহিদরা সিদ্ধান্ত নেন তারা উমর মুখতারের সাথেই থাকবেন। মুজাহিদদের মধ্যে আবার একতা ফিরে আসে।

জেনারেল গ্রাজিয়ানে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন আল ফাদিয়াহ অঞ্চল দখল করে নেয়। এ সময় তারা ৩ হাজার ১৭৫ টি বন্দুক কেড়ে নেয়। এদিকে উমর মুখতার তার ঘাটি হিসেবে দাফনা কে বেছে নে। জায়গাটি ছিল মিসর সীমান্তের কাছাকাছি। এখান থেকে যোগাযোগ ও সাহায্য সংগ্রহের সুযোগ ছিল। জেনারেল গ্রাজিয়ানি বিষয়টি জানতে পেরে সীমান্তে কাটাতার দিয়ে দেয়। একইসাথে সে লিবিয়ায় প্রচার করে দেয়, কেউ যদি উমর মুখতারকে সাহায্য না করে তবে তাকে উত্যক্ত করা হবে না।

এভাবে উমর মুখতারকে একা করে ফেলা হয়। এই সময় বিখ্যাত লেখক মুহাম্মদ আসাদ উমর মুখতারের সাথে দেখা করেন। উমর মুখতার তখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটছিলেন। মুহাম্মদ আসাদ জানতে পারলেন কদিন আগে তিনি এক যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। এই সাক্ষাতে মুহাম্মদ আসাদের সাথে উমর মুখতারের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ হয়।

উমর মুখতার ছিলেন সতর্ক যোদ্ধা। তার সাথে একটি সশস্ত্র রক্ষিবাহিনী থাকতো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা। জীবনের শেষ সফরে তিনি বের হলেন মাত্র ৪০ জন মুজাহিদ নিয়ে। তিনি অতিক্রম করছিলেন দুর্গম আল জুরাইব উপত্যকা। ইতালিয়ানরা তাদের গোয়েন্দা মারফত আগেই উমর মুখতারের আগমনের সংবাদ

জেনে যায়। তারাও এগিয়ে আসে। উপত্যকার ভেতরেই ইতালিয়ানদের সাথে মুজাহিদদের সংঘর্ষ বেধে যায়। কয়েকজন মুজাহিদ শহিদ হয়ে যান। উমর মুখতারের হাত গুলিবিদ্ধ হয়। তার ঘোড়ার গায়েও গুলি লাগে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তার অক্ষত হাতটি ঘোড়ার নিচে পড়ে যায়। তিনি টানাটানি করেও হাত বের করতে পারেননি। উমর মুখতারকে গ্রেফতার করে সুসা বন্দরে নিয়ে আসা হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে ইতালিয়ান রনতরীতে করে বেনগাজি আনা হয়। পুরো পথে কঠোর নিরাপত্তা নিযুক্ত করা হয়। ইতালিয়ান শিবিরে তখন উতসবের আমেজ।

জাহাজে ইতালিয়ান কর্মকর্তারা উমর মুখতারকে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দৃঢ়তার সাথে দেন। ইতালিয়ানরা বারবার তাকে দেখছিল। এই মানুষটিই গত ২০ বছর ধরে ইতালিয়ানিদের একের পর এক নাকানিচুবানি খাইয়েছে।

উমরমুখতারকে কারাগারে নেয়া হয়। এসময় তার সাথে সংবাদকর্মীদের দেখা করতে দেয়া হয়নি। উমর মুখতারের কক্ষে তাকে একটি খাট, একটি কম্বল দেয়া হয়। সাথে দেয়া হয় পা রাখার জন্য একটি কার্পেট।

জেনারেল গ্রাজিয়ানির প্যারিস সফরের কথা ছিল। কিন্তু সে সফর বাতিল করে বেনগাজি ছুটে আসে। উমর মুখতারের মুখোমুখি হয়। এই সাক্ষাতে উমর মুখতার নির্ভিকতার সাথে গ্রাজিয়ানির নানাপ্রশ্নের জবাব দেন। গ্রাজিয়ানি বললো, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন কেন?

জবাবে উমর মুখতার বলেন, কারন আমার দ্বীন আমাকে এটা করার আদেশ দেয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বারকাহর পুরাতন পার্লামেন্টে উমর মুখতারের বিভচারের কাজ শুরু হয়। এটা ছিল প্রহসনের বিচার। কারন বিচার শুরুর একদিন আগেই ইতালিয়ানরা ফাসির মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখেছিল। উমর মুখতারকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে নিয়ে আসা হয়। উমর মুখতার দৃঢ়ভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। সংক্ষিপ্ত বিচার সেরে উমর মুখতারের ফাসির রায় ঘোষনা করা হয়। আদালত মাত্র এক ঘন্টা ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।

১৬ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় বেনগাজির উত্তরে সালুক নামক এলাকায় উমর মুখতারের ফাসি কার্যকর করা হয়। ইতালি সরকার চাচ্ছিল সবার মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিতে। তাই তারা ফাসি দিয়েছিল উন্মুক্ত স্থানে। ফাসির দৃশ্য দেখানোর জন্য উপস্থিত করেছিল প্রায় ২০ হাজার মানুষকে। যাদের মধ্যে নানা শ্রেনীর মানুষ ছিলেন। উমর মুখতার কালিমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে ফাসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। তার চেহারায় খুশি ঝলমল করছিল। তিনি ফাসির মঞ্চে উঠার পর ইতালিয়ান হেলিকপ্টারগুলো মঞ্চের উপর বিকট শব্দে চক্কর দিতে থাকে যেন উমর মুখতার কিছু বললেও কেউ শুনতে না পারে। জল্লাদ যখন তার গলায় রশি

পড়াচ্ছিল তখন তিনি পড়ছিলেন এই আয়াত, হে প্রশান্ত আত্মা তোমার রবের কাছে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে যাও। সুরা ফাজর আয়াত ২৮

উমর মুখতারের পরেও মুজাহিদদের জিহাদ চলতে থাকে। তবে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এর গতি অনেক কমে যায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিবিয়ার মাটিতে ইতালির জুলুম নির্যাতন চলতেই থাকে। অবশেষে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল ইতালিয়ান বাহিনী লিবিয়া ছেড়ে চলে যায়।

জেবুন্নেসা বিনতে আলমগীর

মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী
অনুবাদ: ইমরান রাইহান

(আল্লামা শিবলী নোমানীর জন্ম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, ভারতের আযমগড়ে। তিনি প্রথমে মাওলানা মোহাম্মদ ফারুক সিয়ারাকোটির কাছে বিভিন্ন বিষয় পড়েন। পরে আরবে গমন করে বিভিন্ন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। দেশে ফিরে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পর তিনি আলীগড় থেকে চলে আসেন। কিছুকাল হায়দারাবাদে অবস্থান করেন। পরে তিনি আযমগড়ে দারুল মুসান্নেফিন প্রতিষ্ঠা করেন। গত শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান অবিস্মরনীয় অবদান রাখে। ইতিহাস বিষয়ে আল্লামা শিবলী নোমানী তার সময়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'সীরাতুন নবী' 'সীরাতুন নুমান' 'আল ফারুক' 'আল মামুন' 'আল গাজালী' 'মাওলানা রুমী' 'আলমগীর পর এক নজর' 'শেরুল আজম' 'ইলমুল কালাম' 'সফরনামা মিসর ও শাম'। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।)

পূর্বাভাস

মুম্বাই সফরে আমার এক বন্ধু আমাকে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ দেখান। প্রবন্ধটি জেবুন্নেসার জীবনি সম্পর্কিত। আমার বন্ধুটি পড়ুয়া মানুষ, বিশেষ করে ইংরেজ লেখকদের লেখার প্রতি তার বেশ টান। আমি প্রবন্ধটি পড়ে অবাক হই। জেবুন্নেসার ন্যায় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের জীবনি লেখা হয়েছে বাজারে প্রচলিত কিচ্ছা কাহিনীর উপর নির্ভর করে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আকিল খান রাজির গল্পটি, যা একাধারে বানোয়াট ও লজ্জাকর। আফসোসের বিষয় মুসলিম লেখকদের অনেকেও জেবুন্নেসার জীবনি লিখেছেন কিন্তু তারাও এইসব বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনীর গন্ডি থেকে বের হতে পারেননি। তাই আমার মনে হলো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের সাহায্যে জেবুন্নেসার জীবনি লেখা দরকার যেন, তার জীবনির উপর অপবাদ ও মিথ্যাচারের যে কুয়াশা জমেছে তা সরানো যায়।

জন্ম

জেবুন্নেসা মুঘল সম্রাট আলমগীরের বড় মেয়ে। তার মা দিলরাস বানু বেগম ছিলেন শাহ নেওয়াজ খানের কন্যা। শাহ নেওয়াজ খানের মূল নাম বদিউজ্জামান। তিনি

সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পরে তাকে শাহ্‌ নেওয়াজ উপাধী দেয়া হয়। বংশীয় ভাবে শাহ্‌ নেওয়াজ ছিলেন উচু ঘরানার। শাহজাহানের শাসনামলের দশম বছর, ১০৪৭ হিজরীতে, শাহ্‌ নেওয়াজ খানের কন্যার সাথে আলমগীরের বিবাহ্‌ হয়। বিয়েতে মোহর নির্ধারণ করা হয় চার লাখ মোহর।

১০৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) জেবুন্নেসার জন্ম হয়। জেবুন্নেসার বাল্যকাল কাটে হেসেখেলে। পড়ার বয়সে উপনিত হলে আলমগীর তার শিক্ষার জন্য আমীর এনায়েতুল্লাহ খানের মা হাফেজা মরিয়ম বেগমকে নিযুক্ত করেন। মরিয়ম বেগম কোরআনের হাফেজা ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন। জেবুন্নেসা মরিয়ম বেগমের কাছে পড়াশোনা শুরু করে।[১৫৬] প্রথমেই তাকে কোরআন হিফজ করানো হয়। জেবুন্নেসার হিফজ সমাপ্ত হলে সম্রাট আলমগির খুশি হয়ে কন্যাকে ত্রিশ হাজার স্বর্নমুদ্রা উপহার দেন।[১৫৭] প্রায় সকল ইতিহাসগ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে জেবুন্নেসা আরবী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এমনকি সেযুগের বড় বড় জ্ঞানীরাও নানা প্রয়োজনের জেবুন্নেসার দারস্থ হতেন। জেবুন্নেসার উস্তাদদের মধ্যে মোল্লা সাইদ আশরাফ উল্লেখযোগ্য।[১৫৮] মোল্লা সাইদ আশরাফ আলমগীরের শাসনামলের শুরুর দিকে ইরান থেকে ভারতবর্ষে আসেন। আলমগীর তাকে জেবুন্নেসার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেসময় জেবুন্নেসার বয়স একুশ বা বাইশ। এ থেকে বুঝা যায় আলমগীর তার এই কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে কতটা যত্নশীল ছিলেন। মোল্লা সাইদ আশরাফ কবি ছিলেন। মোল্লা সাইদের তত্ত্বাবধানেই জেবুন্নেসা কাব্যচর্চা করেন। প্রায় ১৩/১৪ বছর জেবুন্নেসা মোল্লা সাইদ আশরাফের তত্ত্বাবধানে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১০৮৩ হিজরীতে মোল্লা সাইদ আশরাফ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইরান গমনের মনস্থ করেন। সেসময় একটি কবিতার মাধ্যমে তিনি জেবুন্নেসার কাছ থেকে বিদায় নেন। কবিতাটি ছিল

একটিবারের জন্যেও মন এদেশ ছাড়তে সায় দেয় না, যদিও এখন আমার চলে যাওয়াটা অতীব জরুরি।

আমাদের জন্য সম্মুখ, নৈকট্য ও দূরত্বে কোনো ফারাক নেই,. সম্পর্ক যখন দুই হৃদয়ের, তবে দিল্লী ও ইস্পাহানের দূরত্বে কী আসে? হৃদয় সদা তোমার সম্মুখে, কাবুলে থাকি বা কান্দাহারে। *(অনুবাদ– Hemayet Ullah)*

---

[১৫৬] মাআসিরুল উমারা, ২য় খন্ড, ৮২৮ পৃষ্ঠা।

[১৫৭] মাআসিরে আলমগিরী, ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

[১৫৮] তাজকিরায়ে মোল্লা আশরাফ, ৬১ পৃষ্ঠা।

জেবুন্নেসা কাব্যচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। সারাদিন পড়াশোনাতেই ব্যস্ত থাকতেন। সমকালীন রাজনীতি থেকে ছিলেন দূরে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, তাকেও রাজনীতির মরণফাদে আটকা পড়তে হয়। ১০৯১ হিজরীতে রাজপুতরা বিদ্রোহ করে। আলমগীর এই বিদ্রোহ দমনের জন্য শাহজাদা আকবরকে সসৈন্যে যোধাপুর প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজপুতদের প্ররোচনায় শাহজাদা আকবর নিজেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। এইসময় জেবুন্নেসার সাথে শাহজাদার পত্রালাপ চলতো। এই পত্রালাপ রাজনৈতিক ছিল না, শুধুই ভাইবোনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের বহিপ্রকাশ। ঘটনাচক্রে দুয়েকটি পত্র ধরা পড়ে এবং আলমগীর জানতে পারেন জেবুন্নেসা ভাইয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আলমগীর ক্রোধে অগ্নিমর্শা হয়ে যান। জেবুন্নেসার বার্ষিক ভাতা, যা ছিল চার লাখ স্বর্নমুদ্রা, তা বন্ধ করে দেয়া হয়। জেবুন্নেসার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। জেবুন্নেসাকে সেলিমগড়ে বন্দী করা হয়। তবে শীঘ্রই জেবুন্নেসা নির্দোষ প্রমানিত হন। তাকে আবার সব ফিরিয়ে দেয়া হয়। সম্রাটের সাথেও তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ১০৯২ হিজরীতে রুহুল্লাহ খানের আম্মা হামিদা বানু বেগম ইন্তেকাল করলে আলমগীর জেবুন্নেসাকে হামিদা বানুর ঘরে প্রেরণ করেন। একই বছর আলমগীরের চতুর্থ ছেলে শাহজাদা কাম বখশের বিবাহতে জেবুন্নেসার মহলেও কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। জেবুন্নেসা বিবাহ করেননি। সাধারণত প্রচার করা হয় মুঘল শাহজাদীরা বিবাহ করতেন না। ইউরোপিয়ান লেখকদের কেউ কেউ এমনটা লিখেছেন। এর দ্বারা মোঘল শাহজাদীদের চরিত্রে কালিমা লেপনের মোক্ষম সুযোগ পেয়েছেন তারা। অথচ এই তথ্য নিতান্তই ভিত্তিহীন। স্বয়ং আলমগীরের দুই কন্যা যুবদাতুন্নেসা বেগম ও মেহেরুন্নেসা বেগম বিবাহ করেছেন। মাআসিরে আলমগীরিতে তাদের দুজনের বিবাহের তারিখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ননা আছে।

আলমগীর জেবুন্নেসাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বিভিন্ন সফরে নিজের সাথে রাখতেন। কাশ্মীরের কষ্টকর সফরেও জেবুন্নেসা পিতার সাথে ছিলেন। শাহজাদী কোনো সফর থেকে ফিরলে আলমগীর শাহজাদাদের প্রেরণ করতেন বোনকে অভর্থনা জানানোর জন্য। দক্ষিনাত্যের সফরে জেবুন্নেসা পিতার সাথে ছিলেন না। সম্ভবত দিল্লী ত্যাগ করলে নিজের পড়াশোনার ক্ষতি হবে এমন ভাবনাই তাকে এই সফরে অনাগ্রহী করে তোলে। এই সফরে আলমগীরের সাথে ছিলেন শাহজাদী জিনাতুন্নেসা। এইজন্য বিভিন্ন ঘটনাবলীতে জিনাতুন্নেসার উল্লেখ আছে।
১১১৩ হিজরীতে, আলমগীরের শাসনামলের ৪৮ বছর চলছে তখন, জেবুন্নেসা দিল্লীতে মৃত্যুবরন করেন। আলমগীর সেসময় দক্ষিনাত্যে , একের পর এক যুদ্ধে ব্যস্ত। প্রিয় কন্যার মৃত্যুসংবাদে তিনি ভেংগে পড়েন। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়ায়। শান্ত, ধীর স্বভাবের এই সম্রাট নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

পরে তিনি শায়খ আতাউল্লাহ, সাইয়েদ আমজাদ খান ও হাফেজ খানের কাছে লিখিত পত্রে মরহুমার ইসালে সওয়াবের জন্য দান খয়রাতের নির্দেশ দেন। এছাড়া মরহুমার কবর পাকা করারও নির্দেশ দেন।[১৫৯]

কলকাতা থেকে প্রকাশিত খফি খান রচিত মুন্তাখাবুল লুবাবে ১১২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেবুন্নেসার ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। এটা লিপিকারদের ভুল। তারা জিনাতুন্নেসার নামের সাথে জেবুন্নেসার নামকে গুলিয়ে ফেলেছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, জেবুন্নেসা আরবী ও ফার্সী ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তার হাতের লেখাও খুব সুন্দর ছিল। বিশেষ করে নসখ, নাস্তালিক ও শিকাস্তা লিপিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সাধারনত বলা হয়, তিনি মাখফি নামে লিখতেন এবং দিওয়ানে মাখফি নামক বইটি তার রচিত কবিতা সংকলন। তবে এটি সঠিক নয়। কোনো ইতিহাসগ্রন্থে জেবুন্নেসার কোনো দিওয়ানের তথ্য মেলে না। মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী 'ইয়াদে বাইদা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, জেবুন্নেসা রচিত দুটি পংক্তির সন্ধান মেলে। এরপর তিনি পংক্তি দুটি উল্লেখ করেছেন। যদি জেবুন্নেসার কোনো কাব্যগ্রন্থই থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই এর উল্লেখ করতেন। মাখজানুল গারায়েব একটি জীবনি গ্রন্থ। লেখক আহমদ আলী সান্ধিলভী। তিনি জেবুন্নেসার জীবনিতে লিখেছেন, জেবুন্নেসার নামে প্রচলিত কবিতাগুলোর অধিকাংশই তার উস্তাদ মোল্লা সাইদ আশরাফের রচনা। পরে এগুলো জেবুন্নেসার রচনা বলে প্রসিদ্ধি পায়।

জেবুন্নেসা কবি ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার কবিতাগুলো কালের আবর্তনে হারিয়ে গেছে। তাজকিরাতুল গারায়েব গ্রন্থে মোল্লা সাইদ আশরাফের জীবনিতে আছে, একবার তিনি পানির হাউজে পড়ে যান। সেখানে থেকেই তিনি চারটি পংক্তি আবৃত্তি করেন। পরে এ পংক্তিগুলো জেবুন্নেসার নামে প্রচলিত হয়। কোনো কোনো জীবনিকার এগুলোকে জেবুন্নেসার রচনা বলে চালিয়ে দেন, যদিও তা মোল্লা সাইদ আশরাফের রচনা। জেবুন্নেসার রচিত গ্রন্থ হিসেবে জেবুন নাশাআত এর নাম নেয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। তাজকিরাতুল গারায়েবের লেখক লিখেছেন, আমি বইটি দেখেছি। এটি জেবুন্নেসার পত্র সংকলন।

জেবুন্নেসা নিজে কোনো গ্রন্থ লিখুন বা না লিখুন তার তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মাওলানা গোলাম আলি আজাদ বিলগ্রামী লিখেছেন, জেবুন্নেসার তত্ত্বাবধানে একদল আলেম, সাহিত্যিক, কবি ও লিপিকার গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত

---

159 মাআসিরে আলমগিরি , ৪৬২ পৃষ্ঠা।

থাকতেন। জেবুন্নেসার দরবারকে একটি একাডেমি বলা যেতে পারে। তার তত্ত্বাবধানে প্রচুর বই রচিত হতো। এসব গ্রন্থ সাধারনত জেবুন্নেসার দিকে সম্পর্কিত করে নাম রাখা হতো। অর্থাৎ বইয়ের নামের প্রথম শব্দটি হতো জেব। এখানেই অধিকাংশ জীবনিকার ধোকা খেয়েছেন। তারা এসব বইয়ের নামের শুরুতে জেব দেখে এসবকে জেবুন্নেসার রচনা মনে করেছেন। জেবুন্নেসার তত্ত্বাবধানে যেসব গ্রন্থ রচনা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হলো জেবুত তাফাসির। এটি ইমাম রাজি রচিত তাফসিরে কাবিরের ফার্সি অনুবাদ। জেবুন্নেসা কাশ্মীরের বাসিন্দা মোল্লা সফিউদ্দিন আরদবেলিকে তাফসিরে কাবির অনুবাদের দায়িত্ব দেন। অনুবাদের পর জেবুন্নেসার নামে একে জেবুত তাফাসির নামকরণ করা হয়। অনেকে একে জেবুন্নেসার অনুবাদ মনে করলেও বাস্তবে এটি তার অনুবাদ নয়।[১৬০]
জেবুন্নেসা লেখালেখির যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেন তাতে তার একটি লাইব্রেরী দরকার ছিল, যা থেকে লেখক ও গবেষকরা উপকৃত হবেন। তিনি একটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেন। মাআসিরে আলমগীরির লেখক এই লাইব্রেরী দেখে এর ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।[১৬১]
জেবুন্নেসার সাহিত্যপ্রীতি ছিল। সম্রাট আলমগীর তার শাসনামলের শুরুর দিকেই সভাকবির আসন বিলুপ্ত করেন। কবিদেরকেও সুযোগ সুবিধা দেয়া বন্ধ করে দেন। জেবুন্নেসা ব্যক্তি উদ্যোগে কবিদের সাহায্য করতে থাকেন। কাব্যচর্চার ধুম পড়ে যায়। কবিরা দুয়েক পংক্তি লিখলেই জেবুন্নেসা তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। কবিদের পুরস্কৃত করার অনেক ঘটনা ইতিহাসগ্রন্থে বিদ্যমান।
জেবুন্নেসা যদিও রাজকীয় জীবনযাপন থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন তবু কখনো কখনো তিনি নিজের শাহী রুচির পরিচয় দিয়েছেন। কাশ্মীরে তিনি নিজের জন্য একটি মহল ও বাগান নির্মান করেন। ১০৭৩ হিজরীতে আলমগীর কাশ্মির সফরে গেলে জেবুন্নেসা পিতাকে নিজের বাগানে নিয়ে আসেন এবং অনেক উপহার দেন।[১৬২]১০৯০ হিজরীতে তিনি নিজের জন্য একটি রাজকীয় তাবু নির্মান করেন।

---

160 একই কথা লিখেছেন শায়খ আবদুল হাই হাসানি নদভীও। জেবুন্নেসার জীবনিতে তিনি লিখেছেন, জেবুত তাফাসিরের অনুবাদক শায়খ সফিউদ্দিন আরদবেলী। জেবুন্নেসার আদেশে তিনি এটি অনুবাদ করেন। (নুজহাতুল খাওয়াতির, ৭২৩ পৃষ্ঠা– শায়খ আবদুল হাই হাসানি নদভী। দার ইবনে হাজম, বৈরুত) — অনুবাদক।

161 মাআসিরে আলমগিরী, ৫৩৯ পৃষ্ঠা।

162 মাআসিরুল উমারা, ১ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা।

জেবুন্নেসা ভাইদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ১১০৫ হিজরীতে শাহজাদা আজম শাহ অসুস্থ হলে জেবুন্নেসা ভাইয়ের সেবায় মনপ্রান ঢেলে দেন। শাহজাদা আকবর যখন রাজপুতদের সাথে মিলে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন জেবুন্নেসা তখনো ভাইয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ রেখেছিলেন। এ কারনে তাকে পিতার রোষানলেও পরতে হয়।

জেবুন্নেসাকে নিয়ে মিথ্যাচার

জেবুন্নেসাকে নিয়ে কিছু মিথ্যা গল্প প্রচলিত আছে। ইউরোপিয়ান লেখকরা এসব গল্পকে আরো রঙ চড়িয়ে উপস্থাপন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গল্প হলো, আকিল খানের সাথে জেবুন্নেসার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। জেবুন্নেসা প্রায়ই আকিল খানকে নিজের মহলে ডেকে নিতেন। প্রেমালাপ করতেন। একবার আলমগীর জানতে পারেন আকিল খান জেবুন্নেসার মহলে এসেছে। তিনি ছুটে আসেন। আকিল খান গোসল খানায় ঢুকে পানি গরম করার ডেগের ভেতর লুকিয়ে পড়েন। আলমগীর টের পেয়ে প্রহরীদের আদেশ দেন পানি গরম করতে। এভাবে আকিল খানকে গরম পানিতে পুড়িয়ে মারা হয়।

মাআসিরুল উমারাতে আকিল খানের বিস্তারিত জীবনি আছে। তিনি কবি ছিলেন, একারনে সেকালে রচিত বেশিরভাগ জীবনিগ্রন্থে তার জীবনি এসেছে। কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ নেই। যেসকল নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে আকিল খানের জীবনি আছে তা হলো, আলমগীরনামা, মাআসিরুল উমারা, মাআসিরে আলমগীরি, খাজানায়ে আমেরা, তাজকিরায়ে সারখোশ, ইয়াদে বাইদা, সরদে আজাদ ইত্যাদী। কিন্তু এসব গ্রন্থের কোথাও এই ঘটনার সামান্য ইংগিতও নেই।

জেবুন্নিসাকে নিয়ে প্রচলিত আরেকটি গল্প হলো, একবার জেবুন্নেসা একটি পংক্তি রচনা করেন। পংক্তিটি হলো, আয হাম নমী শাওয়াদ যে হালাওয়াত জুদা লবম। অর্থ- শিরীন হতে আমার অধর পৃথক নাহি হতো।

জেবুন্নেসা এর পরের পংক্তি মিলাতে পারছিলেন না। তখন তিনি নাসির আলীর কাছে পংক্তিটি পাঠান। জবাবে নাসির আলী লিখেন, শায়দ রসীদ বর লবে যেবুন্নিসা লবম। অর্থ- জেবুন্নেসার অধর যদি আমার অধর ছুঁতো। *(অনুবাদ– Hemayet Ullah)*

এই গল্পেরও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আর যারা মুঘলদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপ সম্পর্কে অবগত তারা জানেন, নাসির আলী কখনোই এভাবে জবাব দেয়ার সাহস করবে না।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ

২১ নভেম্বর, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

লখনৌর বিখ্যাত পত্রিকা তিলসামে একটি সংবাদ ছাপা হয়। সংবাদটি অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। সংবাদটির ভাষ্য ছিল, সম্প্রতি এখানে আহমাদুল্লাহ শাহ নামে এক ব্যক্তির তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তার পোষাক দরিদ্র সুফীদের মত, কিন্তু চলাফেরা সম্ভ্রান্ত আমীরদের মত। তিনি মুতামিদ্দৌলার সরাইয়ের পাশে অবস্থান করেন। স্থানীয়দের মাঝে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সপ্তাহে দুয়েকদিন তার আস্তানায় মানুষের বেশ সমাগম হয়। তার মজলিসগুলোও সাধারণ মজলিসের মত হয় না। সেখানে খানিকটা অস্বাভাবিকতার ছাপ দেখা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে তিলসামে প্রকাশিত সংবাদটি সাধারণ সংবাদ। একজন নিরীহ সুফির পাশে লোকজন ভীড় করছে, বিশাল ভারতভূমিতে এটি সবযুগেই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু লখনৌর ঘটনা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর কিছুদিন আগেই লখনৌর শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর নবাবী কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এ নিয়ে জনমানুষের মনে জমে ছিল অসন্তোষ। সম্ভাবনা ছিল যে কোনো সময় এখানকার স্থানীয়রা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে পারে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়। স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয় আহমাদুল্লাহ শাহকে নজরে রাখতে ।

কে এই আহমাদুল্লাহ শাহ?

এক নজরে তার পরিচয় জেনে নেয়া যাক। মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহর জন্ম মাদরাজে, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে। স্থানীয় আলেমদের কাছে তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এসময় তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। কিছুকাল তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। অল্পসময়েই তিনি সমরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।

তারুণ্যের প্রথমদিকে কয়েকবার মারাঠা ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং সাহসিকতার প্রমাণ দেন। কিছুদিন হায়দারাবাদ অবস্থান করেন। পরে ইংল্যান্ড সফর করেন। ফেরার পথে হজ্ব আদায় করেন। এসময় তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। তার এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে কাজে এসেছিল।

দেশে ফিরে তিনি রাজস্থানের বিখ্যাত বুজুর্গ সাইয়েদ ফরমান আলী শাহর মুরিদ হন। পীরের নির্দেশ ছিল গোয়ালিয়র যেতে হবে। মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ গোয়ালিয়র চলে যান। ফরমান আলি শাহর ইন্তেকালের পর তিনি সাইয়েদ মেহরাব আলির মুরিদ হন। সাইয়েদ মেহরাব আলী ছিলেন বালাকোটের অমর যোদ্ধা সাইয়েদ আহমদ শহীদের সোহবত ধন্য। বুকের ভেতর লালন করতেন জিহাদের জযবা ও শাহাদাত লাভের অদম্য আগ্রহ।

নিজের মুরিদদের তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতেন। সাইয়েদ মেহরাব আলী বুকের ভেতর যে অগ্নিশিখা লালন করতেন, তা তিনি আহমাদুল্লাহ শাহর মধ্যেও সঞ্চার করেন। আহমাদুল্লাহ শাহ প্রচন্ড প্রভাবিত হন। সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জিহাদই হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

গোয়ালিয়র থেকে আহমাদুল্লাহ শাহ আগ্রা চলে যান। এখানে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন মাহফিলে উপস্থিত হতেন। জনসাধারণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রতি সোমবার লোকজনকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতেন। একজন সুফী হিসেবে খানকাহর অন্ধকার কোনে বসে থাকাটাই তার জন্য স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আহমাদুল্লাহ শাহ বেছে নিয়েছিলেন অন্য পথ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকেই বানিয়েছেন নিজের জীবনের মাকসাদ।

শীঘ্রই আহমাদুল্লাহ শাহ ইংরেজদের নজরদারীর শিকার হন। তিনি এবার লখনৌ চলে যান। সে সময় লখনৌর সদরুস সুদুর ছিলেন মাওলানা ফজলে হক খাইরাবাদী। তিনি ছিলেন ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল । যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করছিল, তাদের তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহর সাথে ফজলে হক খাইরাবাদীর বেশকবার সাক্ষাত ও দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই সাক্ষাতগুলোর প্রভাব ছিল দীর্ঘমেয়াদী।

অল্পকদিন পরেই ফজলে হক খাইরাবাদী দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং লখনৌ ত্যাগ করেন। তিনি তার আগের দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে লোকজনকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এই ফজলে হক খাইরাবাদিই পরে আন্দামানের কারাগারে বন্দী হন এবং কাফনের কাপড়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

লখনৌতে আহমাদুল্লাহ শাহর দাওয়াতি কার্যক্রম সহজ ছিল না। প্রথমদিকে বেশিরভাগ লোকজন তার জিহাদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের কথা ছিল শাসকের নির্দেশ ব্যতিত জিহাদ করা যাবে না। পরে অবস্থার উন্নতি হয়। ধীরে ধীরে তার পাশে লোকজন জমা হতে থাকে। এসময়ই তাকে নিয়ে তিলসামের সংবাদটি প্রকাশিত হয়। মাওলানা নজরবন্দীর শিকার হন। তিনি

লখনৌ থেকে ফয়জাবাদ চলে আসেন। এখানে দুদিন অবস্থান করার পর স্থানীয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে।

আহমাদুল্লাহ শাহ কারাগারে থাকতেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। অল্পসময়ের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন মিরাঠ, দিল্লী, বেরেলি, শাহজাহানপুর, ও বাদায়ুন হয়ে লখনৌ এবং ফয়জাবাদেও ছড়িয়ে পড়ে। ফয়জাবাদে বিদ্রোহ শুরু হতেই আহমাদুল্লাহ শাহকে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়। আহমাদুল্লাহ শাহ লখনৌ চলে আসেন। ফেরার পথে ৩০ জুন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সাথে সিপাহীদের প্রচন্ড লড়াই হয়। এই যুদ্ধে আহমাদুল্লাহ শাহ আহত হন।

লখনৌতে বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। নবাব ওয়াজিদ আলির আমিররা এখানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেও আহমাদুল্লাহ শাহকে কোনো পদ দেয়া হয়নি। এমনকি তার ব্যাপারে নবাব হজরত মহলের মন বিষিয়ে তোলা হয়। চাটুকাররা বলতে থাকে, আহমাদুল্লাহ শাহ শক্তিশালী হলে নিজেকেই শাসকের আসনে বসাবে। নতুন সরকারের সাথে আহমাদুল্লাহ শাহর দুরত্ব বাড়তে থাকে। এমনকি ইংরেজদের সাথে লড়াইয়েও সরকার তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে।

আহমাদুল্লাহ শাহ ষড়যন্ত্র ও হিংসার শিকার হন। যথাসময়ে সাহায্য না পেয়ে কয়েকটি লড়াইয়ে তিনি পরাজিত হন। ইংরেজরা লখনৌর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আহমাদুল্লাহ শাহ খুব অসুস্থ হন। এসময়ও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন। এসময় তিনি খোলা ময়দানে লড়াই করার চেয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে হামলা করা অগ্রাধিকার দেন। বারি নামক এলাকার নদীর পাশে তিনি তার ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই এলাকা ছিল লখনৌ থেকে ২০ মাইল দূরে। এখান থেকে তিনি হামলা চালাতেন।

কিন্তু ততদিনে তার দলে ইংরেজদের গোয়েন্দা ঢুকে গেছে। ফলে তার বেশিরভাগ হামলার খবর ইংরেজরা আগেই জেনে যেত। আহমাদুল্লাহর শাহর কাছে আধুনিক অস্থ খুব কম ছিল। তার বেশিরভাগ যোদ্ধা তরবারী দিয়েই লড়াই করতো। তিনি দুয়েক জায়গায় অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পত্র লিখলেও সাড়া পাননি।

এদিকে আহমাদুল্লাহ শাহর সংগ্রামের কাহিনী অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মুজাহিদদের একটি অংশ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, আহমাদুল্লাহ শাহর অসুস্থতা ততদিনে আরো বেড়েছে, অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি শাহজাহানপুরের একটি ইংরেজ ক্যাম্পে হামলা চালান।

ইংরেজ সরকার মাওলানার মাথার মূল্য ৫০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ঘোষণা করে। জুনের প্রথমদিকে পুবায়নের রাজা জঘন্নাথ সিং মাওলানার কাছে লিখিত একটি পত্রে বলেন, আপনি আমার এখানে আসুন। আপনার সাথে মিলে ইংরেজদের মোকাবেলা করতে যাই।

মাওলানা তার অল্পকিছু যোদ্ধাসহ ৫ জুন পায়াওয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পুবায়ন পৌছে তিনি অবাক হন। শহরের কেল্লার ফটক বন্ধ। দীর্ঘক্ষন পর রাজা জঘন্নাথ সিং তার ভাইসহ আসে। আলাপ চলাকালে আচমকা জঘন্নাথ সিং এর ভাই মাওলানার বুক বরাবর গুলি চালালে মাওলানা হাতির পিঠেই শহীদ হয়ে যান। মূলত গোটা ব্যাপারটিই ছিল সাজানো নাটক। মাওলানার মাথা কেটে ইংরেজ অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পরদিন সকালে মাওলানার কর্তিত মস্তক শহরের কোতোয়ালি দরজার উপর লটকে থাকতে দেখা গেল। মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ ছিলেন আউধের মানুষের শেষ ভরসা। তার ইন্তেকালের পর ইংরেজদের বাধা দেয়ার মত আর কেউ রইলো না।

তার সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক টি এইচ হাচিনসন লিখেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের এই নায়ক বিদ্রোহ শুরুর আগেই ভারতের বেশিরভাগ এলাকা ঘুরেছেন। এসব অঞ্চলে তার প্রচুর ভক্ত ছিল। তাদের তিনি জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এভাবেই তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

সূত্র

১। আঠারো সো সাত্তাওয়ান তারিখি, ইলমি আওর আদাবি পাহলু– মুহাম্মদ আকরাম চুগতাই
২। আঠারো সো সাত্তাওয়ান কে রাহনুমা — কওমি কাউন্সিল, নয়া দিল্লী।

ঈসা খান : ভাটিবাংলার মহানায়ক

ভাটিবাংলায় সূচিত হলো ১৫৭৮ সাল। নতুন বছরের শুরু থেকেই পরিস্থিতি ছিল থমথমে। মোগলরা সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছে, এমন একটা সংবাদ শোনা যাচ্ছিল। কবছর ধরে ভাটিবাংলার মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের সাথে মোগলদের দ্বন্দ্ব চলছে, কোনো নিষ্পত্তি হচ্ছে না। মোগলরা তাই এবার চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ঈসা খানও বসে ছিলেন না। তাঁর নৌবাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে। বর্ষার শুরুতে ভাটি অঞ্চল তার প্রকৃত চেহারা ফিরে পেল। বিস্তীর্ণ হাওর এলাকা পানিতে ভরে গেল, শুরু হলো স্থানীয়দের জলবন্দী জীবন। পরবর্তী চার মাস এভাবেই কাটবে তাদের। বাংলার সুবাদার মোগল সেনানায়ক খান জাহান অবস্থান করছিলেন ঝাড়খন্ড জেলার তান্ডা নগরে। বর্ষার শুরুর দিকে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে নৌপথে ভাটিবাংলার দিকে রওনা হলেন। ভাওয়াল পরগনার চৌরা[১৬৩]শহরে মোগল বাহিনী শিবির স্থাপন করে। এখান থেকে তিনি ঈসা খানের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেন।

মেঘনার পশ্চিম তীরে কাইথল[১৬৪] নামক স্থানে ঈসা খানের বাহিনীর মুখোমুখি হয় মোগল বাহিনী। দুই বাহিনীই তাদের নৌবহর নিয়ে প্রস্তুত ছিল। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লো নদীর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। বর্ষার প্রমত্তা মেঘনার বুকে অস্ত্রের ঝনঝনানি ও আহতদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। যুদ্ধের প্রথমদিকে খান জাহানের বাহিনী বিজয়লাভ করে। ঈসা খান কৌশলগত কারণে তাঁর বাহিনী নিয়ে পিছু হটেন। ঈসা খানের বাহিনীর ফেলে যাওয়া জাহাজ লুণ্ঠনে মোগলরা ব্যস্ত ছিল, এরইমধ্যে ঈসা খান তাঁর দুই সহযোগী মজলিশ দিলাওয়ার ও মজলিশ প্রতাপের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ করেন। মোগল বাহিনী এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। হামলার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তারা পিছু হটে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে তারা তান্ডায় ফিরে আসে। কাইথলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ঈসা

---

[১৬৩] বর্তমানে গাজিপুর জেলার কালিগঞ্জ থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান।

[১৬৪] বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন।

খানের মূল জমিদারী সরাইল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে জোয়ানশাহী পরগনার ভেতরে। মোগল বাহিনী এই প্রথম অনুভব করলো তারা এক শক্তিশালী সেনানায়কের মুখোমুখি হয়েছে, যিনি নিজের সীমানার বাইরে গিয়েও লড়াই করতে পারদর্শী।

২

সরাইল।

নিজের প্রাসাদের বারান্দায় বসে আছেন ঈসা খান। রাতে বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকে আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা। রোদ উঠলেও তাতে প্রখরতা নেই। চারপাশে পরিবেশ নীরব। কোনো হৈ চৈ নেই। দিনটি কোথাও ঘুরে আসার জন্য চমৎকার। অন্যসময় হলে ঈসা খান হয়তো তা-ই করতেন। কিন্তু আজ তাঁর ভেতর অস্থিরতা কাজ করছে। মোগল বাহিনীর প্রস্থান ঈসা খানকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। তিনি জানেন মোগলদের সাথে যে লড়াই শুরু হয়েছে, কোনো এক পক্ষের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই লড়াই থামবে না। 'তখত ইয়া তাজ' (সিংহাসন অথবা শবাধার) প্রাচীন মোগল প্রবাদটি মনে পড়লো তাঁর। ঈসা খান জানেন, মোগলরা আবার আসবে। আরো বেশি সামরিক শক্তি নিয়ে। সম্রাট আকবর, তৃতীয় মোগল, পিতার মতো ভাবালু ও রোমান্টিক নন, তিনি অবশ্যই বাংলাকে তাঁর করায়ত্ত করার সকল চেষ্টা চালাবেন।

ঈসা খান উঠে দাঁড়ালেন। দূরে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি দেখা যাচ্ছে। মাঠে লোকজন কাজ করছে। 'শক্তি অর্জনের জন্য ১৪ বছর বেশ দীর্ঘ সময়'—আনমনে ভাবলেন ঈসা খান। ১৪ বছর আগে, ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরাইলের জমিদারি লাভ করেন। এর আগে জীবন ছিল কঠিন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের পিতা সোলায়মানকে হত্যা করার পর ঈসা ও খান ও তাঁর ভাইকে তুর্কিস্তানের বণিকদলের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। ১৫৬৩ সালে চাচা কুতুবুদ্দিন তাঁর দুই ভাতিজাকে তুর্কিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনেন। শুরুতে কিছুদিন তিনি গৌড় সরকারের অধীনে কাজ করেন। কিছুদিন পর লাভ করেন সরাইলের জমিদারি। ১৫৬৪- ১৫৭৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঈসা খান তাঁর জমিদারি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এসময় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। সেসময় চলছিল কররানিদের শাসন। তারা বিহার ও উড়িষ্যা নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া মোগলদের সাথেও তাদের লড়তে হচ্ছিল, ফলে ভাটিবাংলা সম্পর্কে তারা ছিলেন অনেকটাই উদাসীন। ঈসা খান তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তবে নিজের জমিদারিতে তিনি ছিলেন স্বাধীন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান সোনারগাঁয়ে অবস্থানরত মোগল সেনাপতি শাহ বরদির বাহিনীকে আক্রমণ করে বিতাড়িত করেন। এর ফলে ঈসা খান মোগলদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে যান।

ইতিমধ্যে ১২ জুলাই ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানি পরাজিত ও নিহত হন।

৩

দাউদ খান কররানির পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ ঈসা খানকে বিচলিত করে তোলে। তিনি জানতেন মোগল বাহিনী এবার বাংলার দিকে হাত বাড়াবে। তখন পর্যন্ত ঈসা খান নিজের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। রাজমহলের যুদ্ধের কিছুদিন পর তিনি চট্টগ্রাম চলে যান। ফটিকছড়ির ঈশাপুর নামক পরগনায় কাজি সদর জাহান নামে একজন সুফিসাধকের কাছে কিছুদিন অবস্থান করেন। এসময় তিনি নিজের বাহিনী গঠনের কাজও চালিয়ে যান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, ১৫৭৬-১৫৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঈসা খান বেশ কয়েকবার চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন। তাঁর নামেই ঈশাপুর পরগনার নামকরণ করা হয়।[১৬৫]

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে কাইথলের যুদ্ধে পরাজিত মোগল বাহিনী ভাটিবাংলা ত্যাগ করে। পরবর্তী চার বছর তারা এদিকে নজর দেয়ার সুযোগ পায়নি। এর কারণ ছিল মোগল বাহিনীর একটি অংশ বিদ্রোহ করে বসে। এর ফলে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যায় বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবর এই বিদ্রোহ দমন করতেই ব্যস্ত ছিলেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে খান আযমকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই চলতে থাকে। বিদ্রোহীদের একজন নেতা মাসুম খান কাবুলি ঘোড়াঘাট থেকে পালিয়ে এসে ঈসা খানের বাহিনীতে যোগ দেন। মাসুম খান কাবুলি ও তাঁর দলকে পাশে পেয়ে ঈসা খানের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মোগলদের সাথে চারবছরের অলিখিত যুদ্ধবিরতি চলাকালে ঈসা খান নিজের শক্তি আরো বাড়িয়ে তোলেন। সোনারগাঁ, মহেশ্বরদি, জোয়ানশাহী, কতরাব– এসব এলাকা তিনি নিজের দখলে নিয়ে আসেন। ১৫৮৪ সালের মধ্যেই তিনি খিজিরপুর, সোনারগাঁ, এগারসিন্দু, বাজিতপুর এসব এলাকায় একাধিক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন ফেলেন। একইসাথে নিজের সদরদপ্তর সরাইল থেকে সরিয়ে সোনারগাঁতে নিয়ে আসেন। ঈসা খান দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ততদিনে তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে ঢাকা জেলার অর্ধাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সম্পুর্ণ।

৪

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

আরও একবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে চলেছিল ভাটিবাংলা। সে বছর মার্চ মাসে নতুন মোগল সুবাদার শাহবাজ খান তাঁর বাহিনী নিয়ে গঙ্গার পথ ধরে

[১৬৫] প্রবন্ধ বিচিত্রা ইতিহাস ও সাহিত্য, পৃ-৩২-৩৪ – আবদুল হক চৌধুরী। বাংলা একাডেমী।

ভাটির দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথমেই তিনি ঈসা খানের শক্তিশালী নৌঘাটি খিজিরপুর[১৬৬] দখল করেন। সেখানে মোগল ঘাঁটি স্থাপন করে তিনি এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। ততদিনে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। মেঘনার দুকূল ছাপিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে মোগলরা মাসুমাবাদ ও সোনারগাঁ দখল করে নেয়। ঈসা খান কার্যত তাদের প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। মোগলরা আরো এগিয়ে এগারসিন্দুরে হামলা করে। এখানে মাসুম খান কাবুলির বাহিনীর সাথে তাদের তীব্র লড়াই হয়। মোগলরা কাপাসিয়ার টোক গ্রামে দুর্গ নির্মাণ করে।

ঈসা খান তাঁর বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বাজিতপুরে। মোগল সেনাপতি তরসুন খান একটি বাহিনী নিয়ে বাজিতপুরের দিকে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে মাসুম খান কাবুলি অতর্কিতে হামলা করে তরসুন খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইতিমধ্যে ঈসা খান ব্রহ্মপুত্র নদীর পনেরোটি স্থানে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে দেন। একইসাথে শাহবাজ খানের সাথে সন্ধি নিয়ে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। বর্ষার তীব্রতা বেড়ে গেলে ঈসা খান বাঁধগুলো খুলে দেন। আচমকা পানির তোড়ে ভেসে যায় মোগল শিবির। মোগলরা যখন তাদের ডুবে যাওয়া শিবির টেকাতে ব্যস্ত তখনই ঈসা খান হামলা করে বসলেন। একদিকে ডুবন্ত শিবিরে দিশেহারা মোগল সেনারা, অপরদিকে ঈসা খানের যুদ্ধজাহাজগুলো একের পর এক গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে মোগল শিবিরে। এই যুদ্ধে মোগলরা নির্মমভাবে পরাজিত হয়। তাদের প্রচুর সেনা নিহত হয়। অনেক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতাশ শাহবাজ খান তাঁর বাহিনী নিয়ে তান্ডায় ফিরে যান। তিনি ফিরে যেতেই সাত মাসের যুদ্ধে তিনি যেসব দুর্গ ও শহর জয় করেছিলেন সব আবার ঈসা খানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

৫

ঈসা খান। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ভুঁইয়া। এবং তিনিই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভুঁইয়ারা ছিলেন স্বাধীন শাসক। মোগল আগ্রাসনের মুখে তারাই প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তুলেছিলেন। তাদের বাধার কারণে ভাটিবাংলা দখল করতে মোগলদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আকবরের আমলে বারো ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান। তিনিই মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আবদুল করিম লিখেছেন, এ সময় নেতাসহ ভুঁইয়াদের মোট সংখ্যা ছিল ১৩ জন। ঈসা খান বাদে অন্য ভুঁইয়ারা ছিলেন, ইবরাহিম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই, মজলিশ দিলাওয়ার, মজলিশ প্রতাপ, টিলা গাজি, বাহাদুর গাজি, চাঁদ গাজি, সুলতান গাজি, সেলিম গাজি, কাসিম গাজি, কেদার রায় ও শের খান।

---

[১৬৬] সোনারগাঁ থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

ঈসা খানকে পরাস্ত করতে না পারলে ভাটিবাংলা মোগলদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই থাকছিল। আবার ঈসা খানকে পরাজিত করাও সহজ ছিল না। তাঁর জমিদারির এলাকায় বছরে ৬ মাস পানি থাকে। এসময় হাওর-বিল, নদী-নালা সবগুলো পানিতে টইটম্বুর থাকে। মোগল সেনাদের জন্য এসকল নৌরুট ছিল বিপদজনক। তারা সবগুলো নৌপথের সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু প্রতিরোধকারীরা ছিলেন ভাটিবাংলার সন্তান। ফলে তারা যেকোনো নৌপথ বেছে নিয়ে মোগলদের আচমকা আক্রমণ করতে পারতেন।

শাহবাজ খান ফিরে যেতেই ঈসা খান নির্দেশ দিলেন দুর্গগুলোর সংস্কার করতে। এতদিন তিনি অবস্থান করছিলেন কতরাবু এলাকায়। এলাকাটি ছিল নদীর তীরে। যেকোনো সময় এখানে মোগলদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এজন্য ঈসা খান নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য একটি নিরাপদ এলাকা খুঁজছিলেন। খোঁজাখুঁজি করে এমন একটি এলাকা পেয়েও গেলেন। কিশোরগঞ্জ জেলার জংগলবাড়ি এলাকা। এখানে শাসন করছিলেন রামহাজড়া ও লক্ষণহাজড়া। ঈসা খান এখানে আক্রমণ করে এলাকাটি নিজের দখলে নিয়ে আসেন। এখানে মজবুত বাসস্থান নির্মাণ করে পরিবারের লোকজনদের এখানে নিয়ে আসেন। এসময় পুত্র মুসা খানকে তিনি আটিয়া পাঠান।

পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি নৌবাহিনী শক্তিশালী করেন। তার নৌবহর মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, বানার ও শীতলক্ষ্যায় ঘুরে বেড়াত। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে তার রাজ্যসীমা ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা, কুমিল্লার অর্ধেক, সিলেটের অর্ধেক ও ঢাকার উত্তর-পূর্বাংশ।

শাহবাজ খানের ব্যর্থ অভিযানের সংবাদ শুনে সম্রাট আকবর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী কয়েক বছর আকবর বারবার বাংলায় অভিযানের ইচ্ছা করলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মোগল বাহিনীকে এ সময় বিহার ও উড়িষ্যার শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এসময় যাদেরকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা ভাটিবাংলার দিকে আগানোর সাহস করেননি। ফলে এই সময়টায় ঈসা খান নিরুপদ্রব শাসন পরিচালনা করছিলেন।

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এর আগে তিনি ছিলেন বিহারে। সেখানকার বিদ্রোহ দমনে তিনি ছিলেন সফল। ফলে আকবর চাচ্ছিলেন তার মাধ্যমেই বাংলার ভুইয়াদের শায়েস্তা করতে।

৭ নভেম্বর ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ তান্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে রাজমহলে নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে তিনি বারো ভুঁইয়াদের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ঘোষণা দেন।

৬

সে বছর ডিসেম্বরে মানসিংহ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভাটিবাংলার দিকে রওনা হলেন। তিনি রাজশাহী অতিক্রম করে বগুড়ার শেরপুরে একটি পুরাতন দুর্গ সংস্কার করেন। ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হলে তিনি করতোয়া নদী অতিক্রম করে ঘোড়াঘাট শহরে অবস্থান করেন। সংবাদ পেয়ে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলি মোগলদের আক্রমণ করার জন্য তাদের বাহিনী নিয়ে ঘোড়াঘাটের বারো ক্রোশের মধ্যে পৌঁছে যান। এই সময়ে দুটি ঘটনা ঘটে। মানসিংহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অপরদিকে নদীর পানি দ্রুত কমে যায়। নদীতে নৌযান আটকে যাবে এই আশংকায় ঈসা খান তার বাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন। ফলে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই মোগলরা ঘোড়াঘাটে অবস্থান করতে থাকে।

পরবর্তী দুবছর কোনো পক্ষই শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। মানসিংহ এবার প্রেরণ করেন তার ছেলে দুর্জন সিংহকে। ৫ সেপ্টেম্বর ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এই যুদ্ধে মোগলদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। দুর্জন সিংহ নিহত হন। এই যুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল ঢাকার ডেমরা, খিজিরপুর, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীর আশপাশের এলাকা। পুত্রের শোকে শোকাহত মানসিংহ সম্রাট আকবরের কাছে কিছুদিন বিশ্রামের অনুমতি চান। সম্রাট সম্মত হলে মানসিংহ ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে বাংলা ত্যাগ করেন। সম্রাটের আদেশে তার ছেলে জগত সিংকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু যাত্রার শুরুতে আগ্রাতেইও তিনি মারা যান। পরে মানসিংহের পৌত্র মহাসিংহকে বাংলায় পাঠানো হয়। মানসিংহ অবস্থান করছিলেন আজমীরে।

৭

প্রায় তিন দশক ধরে মোগলদের যিনি ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন সেই স্বাধীন শাসক মসনদ-ই-আলা ঈসা খান মারা যান ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। এর কয়েক মাস আগে ১০ মে তারিখে অসুস্থ হয়ে মারা যান তার অন্যতম সেনাপতি মাসুম খান কাবুলি। বছরের পর বছর ধরে শক্তিশালী মোগল বাহিনী যাদের পরাজিত করতে পারেনি জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে তারা পাড়ি জমালেন পরকালের উদ্দেশ্যে। আকবরের দরবারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল এই মৃত্যুতে ছিলেন বেশ খুশি। আকবরনামায় আনন্দের সাথে এই তথ্য লিখতে ভুল করেননি তিনি। এখানে বলে রাখা ভাল, মানসিংহের সাথে ঈসা খানের অসিযুদ্ধের যে গল্প শোনা যায় তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাদের দুজনের কোনো সাক্ষাতই হয়নি কোথাও। ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভাটিবাংলার প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত হয়। যদিও ঈসা খানের মৃত্যুর সাথে সাথেই মোগলরা

ভাটিবাংলা অধিকার করতে পারেনি। দখলের জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো এক দশক। ঈসা খানের সুযোগ্য সন্তান মুসা খান পিতার পথ ধরে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন দীর্ঘদিন। শেষে মোগল সুবাদার ইসলাম খানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন তিনি।[১৬৭]

৮ বর্ষায় এখনো জোয়ানশাহী হাওর জলে টইটম্বুর হয়। পানিতে ভেসে থাকে সবুজ গ্রামগুলো। সাদা জ্যোৎস্নায় মেঘনার পানি চিকচিক করে ওঠে। কে বলবে সাড়ে চারশো বছর আগে এখানেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়েছিল মোগল আর ঈসা খানের বাহিনী!

---

[১৬৭] মসনদ-ই-আলা ঈসা খান- মাহবুব সিদ্দিকী। দিব্যপ্রকাশ।

সবুজ পোষাকের বীরাঙ্গনা ও ভিখারি শাহজাদা

মূল: খাজা হাসান নিজামী
অনুবাদ: ইমরান রাইহান

(খাজা হাসান নিজামির জন্ম দিল্লীতে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় আলী হাসান নিজামি। তবে পরে তিনি খাজা হাসান নিজামি নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুফী দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, সম্পাদক ও সাহিত্যিক। তার শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা ইসমাইল কান্ধলভী, মুফতি এলাহি বখশ কান্ধলভী, মুফতি রশিদ আহমদ গাংগুহি।
খাজা হাসান নিজামির বাল্যকাল কেটেছে ভাগ্যবিড়ম্বিত মুঘল শাহজাদাদের সাথে। তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন ১৮৫৭ সালের ইতিহাস জানতে। ভাগ্যবিড়ম্বিত মুঘলদের নিয়ে রচিত তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ বেগমাত কে আসু প্রকাশিত হলে হৈ চৈ পড়ে যায়। ১৯৪৪ সালে লেখকের জীবদ্দশাতেই বইটির ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ ফাতেমি দাওয়াতে ইসলাম, ইংরেজো কি পিতা , বাহাদুর শাহ কা মুকাদ্দামা, দিহলি কি জাঁ কুনি, দিহলি কি সাজা। ৩১ জুলাই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।)

সবুজ পোষাকের বীরাঙ্গনা

১

দিল্লীর যেসকল বৃদ্ধ ১৮৫৭ তে যুবক ছিলেন তারা এক সবুজ পোষাক পরিহিতা রমনীর গল্প করেন। বিদ্রোহের সময়টায় ইংরেজ বাহিনী টিলার উপর ক্যাম্প করেছিল। কাশ্মিরী দরজার দিক থেকে তারা শহরের বাজারে গুলি চালাতো। সেসময় সবুজ পোষাক পরিহিতা এক বৃদ্ধা মহিলা শহরের বাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতেন, চলো, আল্লাহ তোমাদের জান্নাতে ডেকেছেন।
তার কথা শুনে অনেকেই তার সাথে একত্রিত হতো। মহিলা সবাইকে নিয়ে কাশ্মিরী দরজার দিকে যেতো এবং ইংরেজদের উপর হামলা চালাতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা যুদ্ধ চলতো।

যারা স্বচক্ষে এই লড়াই দেখেছে তারা বলে, এই নারী ছিল অসম সাহসী ও নির্ভিক। মৃত্যুর ভয় তার ছিলই না। গুলিবৃষ্টির মধ্যেও সে সাহসি সিপাহিদের মতো সামনে এগিয়ে যেত। কখনো পায়ে হেটে, কখনো ঘোড়ায় চড়ে। তার হাতে থাকতো একটি বন্দুক, তলোয়ার ও একটি পতাকা। বন্দুক চালানোয় তার বেশ দক্ষতা ছিল। তার সাথে চলেছে এমন একজনের ভাষ্যমতে তলোয়ার চালানোতেও সে দক্ষ ছিল। অনেকবার সে সেনাদের সাথে তলোয়ার নিয়ে সামনাসামনি লড়েছে। এই নারীর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে শহরবাসী উদ্দিপ্ত হতো এবং তারাও এগিয়ে এসে লড়াই করতো। তবে যেহেতু কারোই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না তাই প্রায়ই তাদের পালাতে হতো। তারা পালাতে চাইলে এই নারী তাদের বাধা দিতো কিন্তু শেষে তাকেও সরতে হতো। কেউ জানতো না এই মহিলা কোথেকে আসে আর কোথায় যায়।

এভাবে একদিন এমন হল যে সে উত্তেজনার চোটে আক্রমন চালাতে চালাতে ইংরেজদের ঘাটি পর্যন্ত পৌছে গেল। এক পর্যায়ে আঘাত পেয়ে সে ঘোড়া থেকে পরে যায়। সেনারা তাকে গ্রেফতার করে। তারপর তার কোনো হদিশ মেলেনি। কেউ জানে না তার কী হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লী সরকার কিছু ইংরেজি পত্র প্রকাশ করেছে যা দিল্লী অবরোধের সময় ইংরেজ অফিসাররা লিখেছিল। এর মধ্যে একটি চিঠি আছে যার লেখক লেফট্যান্যাট উইলিয়াম হাডসন। দিল্লী ক্যাম্প থেকে ২৯ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে লিখিত এই চিঠি পাঠানো হয়েছিল আম্বালার ডেপুটি কমিশনার মিস্টার যে গিলসন ফরসাইথের কাছে। সেই চিঠিতে এই বৃদ্ধা সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। চিঠির ভাষ্য নিম্মরুপ

'প্রিয় ফরসাইথ। আপনার কাছে একজন মুসলমান বৃদ্ধাকে পাঠাচ্ছি। অদ্ভুত এই নারী। সবুজ জামা গায়ে দিয়ে লোকদের উত্তেজিত করতো এবং নিজেই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের উপর আক্রমন করতো। যেসব সেনারা তার সাথে লড়াই করেছে তাদের ভাষ্যমতে সে খুবই সাহসী, অস্ত্র চালনায় পারদর্শী এবং সে একাই ৫ পুরুষের সমান শক্তি রাখে। যেদিন তাকে গ্রেফতার করা হয় সেদিন সে ঘোড়ায় চড়ে বিদ্রোহীদের নিয়ে ফৌজি কায়দায় লড়ছিল। তার বন্দুক দিয়ে সে আমাদের অনেককে গুলি করে। অনেকে হতাহত হয়। পরে তার সাথিরা পালিয়ে যায় এবং সে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়। জেনারেলের সামনে তাকে আনা হলে তিনি সাধারণ নারী ভেবে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দেন। আমি জেনারেলকে বুঝিয়ে বলি একে মুক্তি দিলে সে আমাদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। সে শহরে ফিরে গেলে অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন লোকেরা একে কোনো অলৌকিক ঘটনা মনে

করবে। ফলে ফ্রান্সের সেই মহিলার মতো জটিলতা দেখা দিবে।[১৬৮] জেনারেল সাহেব আমার কথা মেনে নিলেন এবং তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। মহিলাকে আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনি একে বন্দী করবেন এবং পাহারায় রাখবেন। — ইতি হাডসন

২

দিল্লীর লোকমুখে প্রচলিত গল্পগুলোতে এই মহিলার উল্লেখ আছে। হাডসনের চিঠি থেকেও এই ঘটনার সত্যতা মেলে। কিন্তু এ থেকে মহিলার বিস্তারিত পরিচয় জানা জায় না। আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছি এই মহিলার প্রকৃত পরিচয় জানতে। কিন্তু কেউই তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানে না। যারা তাকে দেখেছে, তারাও শুধু তাকে লোক সমাগম করতে ও ইংরেজদের সাথে লড়তেই দেখতো। সে কে? কোথায় থাকে , কোথায় যায় এসব তথ্য তাদেরও অজানা। পরে একজনের কাছে আমি একটা গল্প শুনি। তার গল্পের সাথে সবুজ পোষাকের বীরংগনার মিল পাওয়া যায়। আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন রিয়াসত টুংকের এক লোক। তার পিতা ছিলেন হাজি লাল মুহাম্মদ চিশতি নিজামির মুরিদ। হাজি লাল মুহাম্মদ ছিলেন হযরত ফখরুদ্দিন চিশতি নিজামি দেহলভির খলিফা। তার কবর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

টুংকের সেই লোক আমাকে বলেছেন,

'আমার পিতা আজমীর শরিফে হাজি লাল মুহাম্মদের কাছে বায়াত হন। তখন পাশে এক মাযজুব ধরনের মহিলাও বসা ছিল। মহিলা বারবার হাজি সাহেবকে বলছিল, আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন শহীদ হতে পারি। তার কথাবার্তা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু চলাফেরায় তাকে খানিকটা উদভ্রান্ত মনে হতো। হাজি সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, যাও নফসের সাথে লড়াই কর। এটাও জিহাদ। মহিলা বললো, নফস কি আমাকে শহীদ করতে পারবে? বা আমি নফসকে হত্যা করতে পারবো? এই কথা শুনে হাজি লাল মুহাম্মদ মুচকি হাসেন। একটু পর তিনি বলেন, মেহেদির পাতা সবুজ কিন্তু ভেতরে লাল। যাও সবুজ ধারণ করে লাল হও। উপস্থিত কেউই হাজি সাহেবের এই কথা বুঝেনি। কিন্তু মহিলা খুব খুশি হয়। বারবার হাজি সাহেবের শুকরিয়া আদায় করে চলে যায়। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে যা চাইতে এসেছে তা পেয়ে গেছে। কয়েক মাস পর আমার বাবা এই মহিলাকে দরগাহে খাজা কুতুব সাহেবে দেখেন। মহিলা সেখানে হযরত ফখর সাহেবের

---

[১৬৮] ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময় জোয়ান অব আর্ক নামে এক নারী এমন সাহসিকতার সাথে লড়াই করতো। হাজার হাজার মানুষ তার পক্ষে লড়তো। সবাই ভাবতো সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। পরে শত্রুরা তাকে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনার দিকে ইংগিত—খাজা নিজামি

মাজারের পাশে বসে মুরাকাবা করছিল। তার মুরাকাবা শেষ হলে পিতা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাকে আজমির শরিফে দেখেছি মনে হচ্ছে। মহিলা জবাব দেয়, হ্যা। আমিই সেই মহিলা। তোমার পীর বোন'। এরপর পিতা তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে মহিলা নিজের পরিচয় দেয়।

৩

আমার দাদা ছিলেন আহমদ শাহ আবদালীর সেনাবাহিনীর সর্দার। পানিপথে মারাঠাদের সাথে আবদালীর যে লড়াই হয় দাদা তাতে উপস্থিত ছিলেন। সেই লড়াইয়েই তিনি শহীদ হন। আমার বাবাও আবদালীর বাহিনীতে ছিলেন। তবে সেসময় তার বয়স কম ছিল। যুদ্ধের পর তিনি তার মায়ের সাথে কিছুদিন লাহোর থাকেন। পরে ভাওয়ালপুর গিয়ে একটি চাকুরি নেন। সেখানেই বিবাহ করেন। সেখানে আমার দুই ভাই হয় কিন্তু তারা অল্পবয়সেই মারা যায়। এরপর আমার জন্ম হয়। আমার বাল্যকাল কাটে ভাওয়ালপুরেই। এরপর বাবামার সাথে জয়পুর চলে আসি। বাবা এখানে নতুন একটি চাকরি নেন। বাবা এখানেই মারা যান। রাজার এক মুসলমান কর্মচারীর সাথে আমার বিবাহ হয়। কিছুদিন পর আমার স্বামী খুব অসুস্থ হয়ে যায়। চিকিতসক তার বাচার আশা ছেড়ে দেন। একরাতে আমি তার পাশে বসে কাদছিলাম। দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ আমার স্বামীকে সুস্থ করে দেন। একটু পর আমার ঘুম আসে। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখি চারপাশে আগুন লেগে গেছে। লোকজন আগুন নিভাতে পানি ঢালছে কিন্তু সেই পানিও আগুন হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একপাশ থেকে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি আমাকে বলেন, তুমি শহীদ হয়ে যাও। আমি বলি কীভাবে শহীদ হবো। তিনি আমার গায়ে একটি সবুজ চাদর পরিয়ে দেন। আমি চাদর পরতেই চারপাশ থেকে শব্দ আসে সে শহীদ, সে শহীদ। আমার ঘুম ভেংগে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই আমার স্বামী ইন্তেকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুতে আমি খুব কষ্ট পাই। এরপর আমি আজমির শরিফ যাই এবং হাজি লাল মুহাম্মদ সাহেবের কাছে বায়াত হই। এখন আমি একা থাকি। বাবা মা আগেই মারা গেছেন। আমার বিশ্বাস স্বপ্নে যাকে দেখেছি তিনি খাজা আজমেরি। তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। তিনি আমাকে শহিদ হতে বলেছেন। এখন আমি দিল্লীতে বেড়াতে এসেছি। বেশিরভাগ সময় দাদা পীরের (হযরত ফখর সাহেব) মাজারের পাশেই কাটাই। পরশু দিন দাদাপীরকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনিও আমাকে বলেছেন তুমি সবুজ পোষাকের শহীদ। টুংকের সেই লোক বলেন, মহিলার কথা শুনে বাবা চলে আসেন। এর কিছুদিন পর বিদ্রোহ শুরু হয়। এই ঘটনা থেকে মনে হয় বিদ্রোহের সময় এই মহিলাই লোক জড় করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তেন।

৪ এই গল্প শুনে আমি ভাবতে থাকি। টুংকের লোক যার কথা বলেছে সেই কী দিল্লীর এই লড়াকু নারী? সেই মহিলার কথা অনুযায়ী তার দাদা যদিও আবদালির সেনাবাহিনীতে ছিলেন কিন্তু তার পিতা সারাজীবন অন্যের চাকুরি করে জীবন কাটিয়েছেন। মহিলাও জীবনে কোথাও বন্দুক চালনা কিংবা তলোয়ারবাজী শিখেছে এমন বর্ননা নেই। এমন একজন মহিলার পক্ষে লোক জড় করে সামরিক কায়দায় ইংরেজদের মোকাবেলা করা অনেকটাই অসম্ভব। অবশ্য এও হতে পারে সেই মহিলা বিদ্রোহের শুরুতে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয় এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষন নেয়। এই মহিলা যেই হোক না কেনো, তার অসামান্য কীর্তি অবশ্যই বলতে হবে। ১৮৫৭ সালের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার কথা উল্লেখ না করলে এক আকর্ষনীয় অধ্যায় আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যাবে। আমার বিশ্বাস যদি এই মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য কোনো কাজে লাগানো যেত তাহলে তার নামও চাঁদ সুলতানা[১৬৯], নুরজাহান[১৭০] ও রাজিয়া সুলতানার[১৭১] পাশে থাকতো।

হাডসনের চিঠির সাথে আমিও একমত। যদি এই মহিলাকে জেনারেল মুক্তি দিতেন তাহলে বিদ্রোহের আগুন আরো জ্বলে উঠতো। দলে দলে লোক এই মহিলার সাথে যোগ দিতো। এই মহিলা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু এখনো জানতে পারিনি। যদি কোনো ইংরেজী নথি বা দেশিয় লেখায় এই মহিলা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য মিলে তবে আমাকে জানানোর অনুরোধ রইলো। আমি এ নিয়ে বিস্তারিত লিখবো।

---

[১৬৯] খ্রিষ্টিয় ১৫৯৬ সনের ১ মার্চ দক্ষিণ ভারতের নিজাম-শাহী রাজবংশের পরিচালিত রাষ্ট্র আহমাদনগরে হামলা চালায় মুঘল সম্রাট আকবরের সেনারা। কিন্তু এই হামলা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেন রাজকন্যা চাঁদ সুলতানা। বিজাপুর রাষ্ট্রের সুলতান আলী আদেল শাহের বিধবা স্ত্রী চাঁদ সুলতানা (চাঁদ বিবি) এ সময় আহমদনগরের নাবালক সুলতান বাহাদুর নিজাম শাহের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এই সুলতান ছিলেন তারই ভাই বা বোনের নাতি। চাঁদ সুলতানা ছিলেন আহমদনগরের সাবেক বাদশাহ হুসাইন নিজাম শাহ (প্রথম)-এর কন্যা। চাঁদ সুলতানা বিজাপুর রাষ্ট্রেরও একই ধরনের অভিভাবক ছিলেন।-অনুবাদক

[১৭০] নুরজাহান বা জগতের আলো(জন্মঃ ৩১ মে, ১৫৭৭– মৃত্যুঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৬৪৫) হচ্ছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর এর স্ত্রী। নুরজাহান সম্রাটের দেয়া নাম। তার আসল নাম ছিল মেহেরুন্নিসা।– অনুবাদক

[১৭১] রাজিয়া সুলতানা (১২০৫ ,১২৪০) সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা ও ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শাসক। তিনি একাধারে একজন ভাল প্রসাশক ও সেনাপতি ছিলেন; তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে একজন দক্ষ সৈন্য হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। সুলতান ইলতুতমিশের সব থেকে যোগ্য পুত্র সুলতানের জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করলে সুলতান তার কন্যা রাজিয়া সুলতানাকে দিল্লীর শাসক হিসেবে মনোনিত করে যান। যখনই ইলতুতমিশের রাজধানী ছাড়তে হত, তিনি তখন তার কন্যা রাজিয়া সুলতানাকে শাসনভার বুঝিয়ে যেতেন। ইলতুতুমিশের পর তিনি ভারতের শাসক হন। —অনুবাদক।

আমি ব্রিটিশ অফিসারের মহত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তিনি এই মহিলাকে হত্যা করেননি যদিও এই মহিলা অনেক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করেছে। তিনি রাজকীয় ভদ্রতা ও মনুষত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[১৭২]

ভিখারি শাহজাদা

এই হলো দিল্লী। একে বলা হয় হিন্দুস্তানের দিল।একসময় এই শহর আবাদ ছিল, লাল কেল্লায় জ্বলছিল মুঘল প্রদীপ, মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ইসলামী ঐতিহ্য। শেষেরদিকে এই শহরের বাসিন্দারা বদলে গেল, তাদের আমলের খাতা শূন্য হয়ে গেল। পরিবর্তনটা এসেছিল শাসকদের হাত ধরে। প্রথমে তাদের আমল খারাপ হলো, তারপর শহরবাসী তাদের অনুসরণ করলো। পরিনতিতে শাসক ও শাসিত উভয়েই বরবাদ হলো, তাদের উপর নেমে এলো মুসিবতের দমকা হাওয়া। ইতিহাসের পাতায় উদাহরণ অনেক আছে, তবে এখানে আমি শুধু একটি ঘটনাই বলবো।

বিদ্রোহের এক বছর আগের ঘটনা। দিল্লীর বাইরে জংগলে কয়েকজন শাহজাদা শিকারে ব্যস্ত ছিল। সময়টা ছিল মধ্যদুপুর, গাছের ডালে ডালে চড়ুই পাখি ও ঘুঘুর দল বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। খেলার ছলে শাহজাদারা ঘুঘু ও চড়ুইগুলোকে নিশানা বানিয়ে গুলতি ছুড়তে লাগলো। এসময় ঝোপের আড়াল থেকে এক শুভ্রকেশ দরবেশ বের হয়ে এলেন।

‘কেন অবলা প্রানীগুলোকে কষ্ট দিচ্ছেন প্রিয় শাহজাদা। তাদেরও আমাদের মতো অনুভূতি আছে। তারাও ব্যাথা পায়, কষ্ট অনুভব করে কিন্তু তা প্রকাশের ভাষা তাদের নাই। আপনারা বাদশাহর সন্তান। বাদশাহ তো নিজের রাজত্বের প্রতিটি প্রানীর প্রতি দয়াবান হবে’ বললেন দরবেশ।

একথা শুনে বড় শাহজাদা, যার বয়স তখন আঠারো বছর, লজ্জিত হয়ে হাত থেকে গুলতি রেখে দিলেন। তবে ছোট শাহজাদা মির্জা নাসিরুল মুলক বিগড়ে বসলেন, ‘আমরা তো শিকার করতে এসেছি। শিকার করা দোষের কিছু নয়’। দরবেশ বললেন, ‘জনাব, শিকার করা অপরাধ নয়। অযথা প্রানীগুলোকে কষ্ট দেয়া অপরাধ’। দরবেশের কথা শুনে মির্জা নাসিরুল মুলক রাগে ফেটে পড়লো।

---

[১৭২] এই একটি ঘটনা দ্বারা ইংরেজদের মহত্ত্ব ও দয়া সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ভুল হবে। বিদ্রোহের পর দিল্লী ও অন্যান্য শহরে তারা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিবরন পেতে মৌলভী যাকাউল্লাহ রচিত ‘তারীখে হিন্দুস্তান’ এর দশম খন্ড এবং খাজা হাসান নিজামির ‘দিহলী কি জা কুনি’ দেখা যেতে পারে। — অনুবাদক

তাতক্ষনিক গুলতি হাতে নিয়ে দরবেশের হাটুতে ঢিল ছুড়লো। তীব্র ব্যাথায় দরবেশ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দরবেশকে মাটিতে পড়তে দেখে দুই শাহজাদা কেল্লার দিকে রওনা হয়ে গেল। দরবেশ হেচড়ে হেচড়ে পুরাতন কবরস্থানের দিকে আগান। তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, ‘যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা এতটা নির্দয় ও জালেম, তা আর কী করে টিকে থাকবে। শাহজাদা, তুমি আজ আমার পা ভেংগেছো, একদিন সময় আসবে খোদা তোমার পাও ভেংগে দিবেন। তুমিও সেদিন আমার মতো হেচড়ে চলবে’।

তোপ গর্জাচ্ছে। একের পর এক গোলা শূন্যে উঠে আবার নিচে নেমে আসছে। সাথে নিয়ে আসছে ধবংস ও তান্ডব। চারদিকে শুধু লাশের সারি নজরে আসছে। দিল্লীকে মনে হচ্ছে জনমানবহীন। মনে হচ্ছে মৃতের শহর। লাল কেল্লার দরজা খুলে কয়েকজন শাহজাদাকে বের হতে দেখা গেল। শাহজাদারা ঘোড় সওয়ার। তারা পালাচ্ছে পাহাড়গঞ্জের দিকে। একটু পরেই বিশ পচিশজন গোরা সেপাই তাদের ধাওয়া করলো। সেপাইরা শাহজাদাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ শাহজাদারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নিজেদের রক্তের মাঝে নিজেরা কাতরাতে থাকে। সেপাইরা কাছে এগিয়ে আসে। দেখা যায়, দুই শাহজাদা মারা গেছে। একজন জীবিত আছে এবং তার গায়ে গুলি লাগেনি।। শুধু ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় হালকা আঘাত পেয়েছে। সেপাইরা জীবিত শাহজাদাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্প ছিল পাহাড়ের উপর। বড় অফিসার শাহজাদাকে দেখে চিনতে পারেন। ইনি বাদশাহর নাতী নাসিরুল মুলক। সেপাইদের নির্দেশ দেয়া হয়, তাকে কয়েদ করতে।

বিদ্রোহী সিপাহীরা পরাজিত হয়ে পালাতে থাকে এবং ইংরেজ বাহিনী উল্লাস করতে করতে শহরে প্রবেশ করে। বাহাদুর শাহ জাফর গ্রেফতার হলেন হুমায়ুনের সমাধি থেকে। তৈমুরী রাজত্বের শেষ প্রদীপ এভাবেই নিভে যায়। শহরের বাইরে জংগলে আশ্রয় নেয় সম্ভ্রান্ত শহরবাসী। যে নারীদের চেহারা বাইরের কেউ দেখেনি কখনো, তারাও আজ বে আব্রু। দিল্লীতে চলছে খুনের উতসব। সন্তানের সামনে পিতাকে জবাই করা হচ্ছে। কন্যাকে হত্যা করা হচ্ছে মায়ের সামনে। এই বিশৃংখল সময়টাতে শাহজাদা নাসিরুল মুলককে হাত পা বেধে ফেলে রাখা হয়েছে পাহাড়ি ক্যাম্পে। এক পাঠান সিপাহী এসে বললো, বড় সাহেব আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। আপনি চলে যান। আবার কোনো বিপদে পড়ার আগে এই এলাকা ছেড়ে যান। শাহজাদার হাত পায়ের বাধন খুলে দেয়া হলো। শাহজাদা পাঠান সিপাহীর শুকরিয়া আদায় করে জঙ্গলের দিকে রওনা হলো। শাহজাদা হাটছে , কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা নেই তার। শাহজাদা প্রায় এক মাইল

হাটলো। মৃত্যুভয় ও ক্ষুধায় শরীর ক্লান্ত। হাটায় অনভ্যস্ত পা দুটো আর চলতে চাইছে না। গলা শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠনালীতে কাটার মতো বিধছে কিছু একটা। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত শাহজাদা এক গাছের ছায়ায় বসে পড়লো। কষ্টের দু ফোটা অশ্রু গালে বেয়ে পড়লো। 'খোদা, এ কোন মুসিবতে আমাদের ফেললে? আমরা এখন কোথায় যাবো? কোথায় আমাদের ঠিকানা?'এ একথা বলতে বলতে শাহজাদা আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকালো। শাহজাদার চোখ পড়লো গাছের ডালে।সেখানে ঘুঘু বাসা বুনেছে। আয়েশ করে ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছে। ঘুঘুর স্বাধিনতা ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন দেখে শাহজাদার মুখ থেকে বের হলো, ঘুঘু, তুমি আমার চেয়ে হাজারগুন সুখে আছো। তুমি তো নিশ্চিন্তে নিজের বাসায় বসে আছো। আর আমার জন্য আসমান জমিনের কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা নেই'। একটু দূরে একটা বসতি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে যাওয়ার জন্য শাহজাদা উঠে দাড়ালো। পা দুটো চলতে চাইছে না। কোনোমতে টেনে টেনে বসতিতে পৌছলো। বসতির বাইরে, বড় একটা গাছের নিচে অনেক লোক জমা হয়েছে।

গাছের নিচে চত্বরের মতো একটা জায়গায় এক কিশোরী বসে আছে। বাতাসে কিশোরীর চুল উড়ছে, তার দুকান রক্তে রঞ্জিত। গ্রাম্য লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা করছে। একইসময়ে মেয়েটির সাথে মির্জার চোখাচুখি হলো। দুজনেই চিতকার করে উঠলো। মেয়েটি আর কেউ নয়, মির্জার ছোট বোন। ভাই বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। দিল্লীর পতন আসন্ন বুঝতে পেরে মির্জার মা ও বোন রথ নিয়ে কেল্লা ছেড়ে কুতুব সাহেবের দিকে রওনা হন। মির্জার ধারনাও ছিলো না , তার মা ও বোন কোনো বিপদে পড়েছে। "বোন তোমার এ অবস্থা কেন' মির্জা জিজ্ঞাসা করলো। 'ভাইজান, আমাদের লুটপাট করেছে। চাকরদের মেরে ফেলেছে। আম্মাকে অন্য গ্রামে নিয়ে গেছে। আমাকে এই গ্রামে আনা হয়েছে। আমার চুল ধরে টেনেছে। একের পর এক থাপ্পড় বসিয়েছে গালে' বলতে বলতে শাহজাদী কেদে ফেললো। কান্নার দমকে তার কথা আটকে গেল। শাহজাদা বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলো। গ্রামবাসীদের সামনে হাত জোর করে শাহজাদিকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালো। 'আরে ভাগ এখান থেকে। নইলে এমন মার খাবি যে কল্লা উড়ে যাবে। ওকে আমরা পাশের গ্রাম থেকে কিনে এনেছি। দাম দে, নিয়ে যা' মাতবর গোছের একজন বললো। 'চৌধুরী সাহেব, একটু রহম করুন। দাম দিবো কীভাবে? আমি নিজেই তো এখন ভিক্ষুক। একটু দয়া করো। গতকাল তোমরা আমাদের প্রজা ছিলে। আমরা বাদশাহ ছিলাম। আজ সময়ের চাকা উলটে গেছে। যদি আবার আমাদের দিন ফিরে আসে, তাহলে তোমাদের অনেক ধন সম্পদ পুরস্কার দিবো' শাহজাদার কথা শুনে গ্রামবাসী হেসে দিল। 'তোর আর বাদশাহ হতে হবে না। তোকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিবো। আর এই

মেয়ে আমাদের গ্রামে থাকবে। আমাদের ঘর বাড়ি ঝাড়ু দিবে। ক্ষেতে কাজ করবে' বললো একজন। কথাবার্তা চলার ফাকেই কজন ইংরেজ সেনা এসে গ্রামবাসীকে ঘিরে ফেললো। সামান্য কথা কাটাকাটির পর চারজন গ্রামবাসী ও শাহজাদা শাহজাদিকে ইংরেজরা গ্রেফতার করে।

চাদনি চকে ফাসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে সন্দেহভাজনদের। যার ব্যাপারে ইংরেজ অফিসার ফাসির রায় দিচ্ছে তাকেই তাতক্ষনিক ফাসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন শত শত লোককে ফাসি দেয়া হচ্ছে। কাউকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। দিল্লীতে শুধুই খুনের উতসব। শাহজাদা মির্জা নাসির ও তার বোনকে বড় অফিসারের সামনে আনা হলো। কিছুক্ষন কথাবার্তা বলে অফিসার তাদের ছেড়ে দিলো। মুক্তি পেয়ে দুই ভাইবোন এক সওদাগরের বাড়িতে চাকরি নিলো। শাহজাদি সওদাগরের বাচ্চাদের দেখভাল করতো আর শাহজাদা ঘরের বাজার সদাই করতো। কিছুদিন পর শাহজাদি অসুস্থ হয়ে মারা যায়। শাহজাদা আরো কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরে চাকরের কাজ করে। পরে ইংরেজ সরকার তার জন্য মাসিক ৫ রুপি ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। সাথে ছোট একটা চাকরির সুবাধে মির্জার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

এক বছর আগের কথা। দিল্লীর বাজার, চিতলি কবর, কামরা বাংগিশ ও অন্যান্য এলাকায় এক বৃদ্ধ ভিখারীকে দেখা যেত। তার পা ছিল পক্ষাগাতগ্রস্ত। সে হাতে ভর দিয়ে হেচড়ে হেচড়ে চলাফেরা করতো। তার গলায় ঝুলানো থাকতো ভিখারীর ঝুলি। সে দু কদম এগিয়ে থামতো, আশপাশের পথিকদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতো। তার চোখে ফুটে উঠতো বোবা আকুতি। তার চেহারায় ছিল তৈমুরী বংশের ছাপ। দিল্লীর অনেকেই তাকে চিনতো। তাকে জিজ্ঞেস করলেও তার পরিচয় জানা যেত। তার নাম মির্জা নাসিরুল মুলক, শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের নাতী। পেনশনের সব অর্থ ঋনের কারনে শেষ করে ফেলে এখন ভিক্ষার ঝুলিই হয়েছে তার সম্বল। আমি যখনই তাকে দেখতাম, তখনই তার জীবন থেকে শিক্ষা নিতাম। আমার মনে পড়তো তার জীবনের শুরুর দিকের ঘটনাবলী, যার কিছুটা আমি তার মুখে এবং কিছুটা অন্য শাহজাদাদের মুখে শুনেছি। শাহজাদাকে দিল্লীর বাজারে হাতে ভর করে চলতে দেখলে আমার মনে পড়তে সেই দরবেশের কথা, যাকে শাহজাদা গুলতি মেরেছিল এবং তিনি বদদোয়া করে বলেছিলেন, 'একদিন খোদা তোমার পা'ও ভেংগে দিবেন'। আমার মনে হতো সেই দরবেশের বদদোয়া বাস্তবায়িত হয়েছে। শাহজাদাকে দেখলেই আমি খোদার ভয়ে কাপতে থাকতাম। কিছুদিন আগে এই শাহজাদা ইন্তেকাল করেছে।

এই সত্য ঘটনা থেকে আমাদের ধনী ভাইদের শিক্ষা নেয়ার আছে। অহংকারীর করুন পরিনতি তাদের সামনেই আছে, এরপরেও কি তারা অহংকার ত্যাগ করবে না ?

আমি পীর মাশায়েখদের সন্তানদেরকেও সতর্ক করতে চাই, যারা হাতের তালুতে বাবার মুরিদদের চুমু পেয়ে অভ্যস্ত এবং এটাই তাদের ঠেলে দেয় ধবংসের দিকে। তাদের মনে জমা হয় অহমিকা, দুনিয়ার কাউকে তারা আর মানুষই মনে করে না। নিজের পূর্বসুরিদের কীর্তির উপর ভরসা করে নিজে যোগ্যতা অর্জন না করে অযোগ্য থাকা, একদিন মানুষকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করে। সকল পীরজাদার উচিত তারা সেই যোগ্যতা অর্জন করবে যার কারনে তার পিতাকে পীর বলা হয়। মুরিদদের হাদিয়া তোহফার উপর ভরসা করে থাকা চুড়ান্ত পর্যায়ের আত্মমর্যাদাহীনতা। আমি অনেক পীরজাদাকে দেখেছি, তারা বাল্যকালেই শাহী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বাবার মুরিদদের নিজের দাস ভাবে। তাদের মনে রাখা উচিত, যেভাবে সময়ের পরিবর্তনে বাদশাহরা ক্ষমতা হারায় এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা হয় লাঞ্চিত, সেভাবেই পীরজাদাদের অহংকার ও বদদ্বীনি তাদের পতন ঘটাতে পারে যে কোন সময়। এজন্য সবার উচিত , কঠিন সময় আসার আগেই নিজের নিয়ত ও আমলের পরিবর্তন ঘটানো।

আমি এই কথাগুলোই বলছি এবং বলবো, যতদিন যবান ও কলম
সচল থাকে।

ফকির মির্জা আলি খান

মে, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ সেনা ছাউনি ফেললো ওয়াজিরিস্তানের গিরয়াওম এলাকায়। শাম নালার পাশে খোলা ময়দানে অবস্থান নিল ব্রিটিশ সেনারা। সাধারণত, ওয়াজিরিস্তানে বর্ষা শুরু হয় জুলাইয়ের শেষ কিংবা আগস্টের শুরুতে। আবহওয়া নিয়ে তাই ব্রিটিশ সেনারা নিশ্চিন্ত ছিল।
নদীর ভাটিতে অবস্থান করছিলেন ব্রিটিশদের শত্রু একজন উপজাতী নেতা। তার সাথে সেনাসংখ্যা ছিল চারশোরও কম। জনপ্রতি একটি রাইফেলের বেশি কোনো অস্ত্র ছিল না। এপাশে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ সেনা।
ব্রিটিশ কমান্ডার প্রতিনিধি পাঠালেন উপজাতি নেতার কাছে। 'এখনোও সুযোগ আছে আত্মসমর্পন করো। নইলে তোমার পাহাড়ি গুহা ও ক্যাম্প ধবংস করে দেয়া হবে'।
চল্লিশ বছর বয়সী উপজাতী নেতা এই বার্তা পেয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমাদের সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যতক্ষণ বেচে আছি আমি মোকাবিলা করবো'।

—

যেকোনো বিবেচনায় এটি ছিল একটি হাস্যকর ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। একদিকে চারশোরও কম উপজাতী আর অন্যদিকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ সেনা। এ লড়াই তো শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে। ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিনিধি বোঝানোর চেষ্টা করলেন উপজাতী নেতাকে। কিন্তু উপজাতী নেতা তার কথাতেই অনড় রইলেন।

—

এই উপজাতী নেতার নাম ফকির মির্জা আলি খান। ফকির ইপি নামে যিনি বিখ্যাত। ওয়াজিরিস্তানের টোচি উপত্যকায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। বাল্যকাল থেকেই নিতান্ত সাদাসিধে , অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বানুর একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত তাকে প্রকাশ্য কোনো কর্মকান্ডে আসতে দেখা যায়নি। এসময় তিনি নীরব জীবনযাপন করছিলেন।
১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রামকোড়ি নামে এক হিন্দু যুবতী ইসলাম গ্রহন করে। তার নাম রাখা হয় ইসলাম বিবি। সাইয়েদ আমির নুর আলি নামে এক মুসলমানের সাথে তার বিয়ে হয়। মেয়ের পরিবার আদালতে মামলা করে। তাদের দাবী ছিল মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এখন তাদের হাতে তুলে দেয়া হোক। পশতুনদের কথা ছিল, প্রকাশ্য মজলিসে মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করা হোক তাকে কেউ জোর করেছে কিনা।

ব্রিটিশরা পশতুনদের কথায় কান দেয়ার প্রয়োজন দেখেনি। মেয়েকে তুলে আনা হয়। সাইয়েদ আমির আলীকে পাঠানো হয় কারাগারে।
পুরো ওয়াজিরিস্তানে জ্বলে উঠে ক্রোধের আগুন। এবার সামনে আসেন ফকির মির্জা আলি খান।তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেন। তার পাশে খুব অল্প মানুষই পেয়েছিলেন, কিন্তু এদের নিয়েই তিনি ইংরেজদের উপর গেরিলা হামলা চালাতে থাকেন। একের পর এক হামলায় ইংরেজরা হয়ে উঠে বিপর্যস্ত। ফকির মির্জা আলিকে দমন করার জন্যই ইংরেজরা মে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে।[১৭৩]

—

ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিনিধি ক্যাম্পে ফিরে এলো। জানালো ফকির ইপি বলেছেন লড়াই চালিয়ে যাবেন। উপস্থিত সেনা অফিসাররা এই কথা শুনে অট্টহাসি দিল। দ্রুত আক্রমনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনা অফিসারদের দেয়া হয় যুদ্ধের নির্দেশনা। পরের বিবরণ ব্রিটিশ বাহিনীর একজন সদস্য মেজর জেনারেল আকবর খানের কাছেই শোনা যাক। তিনি লিখেছেন, বৈঠক শেষ করে সবাই নিজ নিজ তাবুতে ফিরছিলেন এসময় আকাশের কোনে মেঘ দেখা যায়। সবাই খুশি হয়ে উঠে। যাক, গরমের প্রচন্ডতা কমে যাবে। দ্রুত শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। লোকজন সবাই শিল কুড়াতে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই শুরু হলো প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি। দেখতে দেখতে পাশের পাহাড় সাদা চাদরে ঢেকে গেল। একটু পরে শিলার স্তুপ টিলার আকার নিয়ে আমাদের ক্যাম্পের দিকে ধেয়ে এল এবং নিম্মাঞ্চলে অবস্থিত বেশিরভাগ তাবু ছিড়ে গেল। এই ঝড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর অস্ত্র ও রসদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার রসদ ও অস্ত্রের এক বিশাল অংশ বাতাসের তোড়ে ফকির ইপির ক্যাম্পের দিকে চলে যায়। এসব অস্ত্র ও রসদের মালিক হয়ে যায় ফকির ইপির লোকজন।
হতাশ ব্রিটিশ বাহিনী ছাউনি তুলে ফিরে যায়।[১৭৪]

—

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফকির ইপির লড়াই চলতেই থাকে। এ সময় যুদ্ধে তার দুই ছেলেও নিহত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও ফকির ইপি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমরা তো সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়েছি। এই স্বাধীনতার মূল্য কী? এখনো এখানে আমরা ইসলামি নেজাম প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি।
দীর্ঘদিন অ্যাজমায় ভুগে ১৬ এপ্রিল ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

---

[১৭৩] পশতুনো কি তারিখ, পৃষ্ঠা ৩৭৩ (উর্দু সংস্করণ)– প্রফেসর আনোয়ার রুম্মান।
[১৭৪] মহানবী (সা) এর প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃষ্ঠা ১৭০– মেজর জেনারেল আকবর খান।

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভীর

১

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ ।

জং, পাকিস্তান। রাত ৮টা।

কাউকে হত্যা করার জন্য রাতের অন্ধকারই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। রিভলবার হাতে চার আততায়ী অপেক্ষা করছে মোক্ষম সময়ের। তারা দাঁড়িয়ে আছে একজন মাওলানার ঘরের সামনে। মহল্লার একজনের বিয়েতে শরিক হওয়ার জন্য মাওলানা ঘর থেকে বের হবেন। আর তখনই হামলা চালানো হবে।

৮ টা পনেরো মিনিট।

৩৮ বছর বয়স্ক মাওলানা ঘর থেকে বের হলেন। তার স্ত্রী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাকে। স্ত্রীকে সালাম জানিয়ে হাঁটা শুরু করলেন তিনি। স্ত্রী দরজা আটকে ঘরে ফিরে গেলেন। মাওলানা সাহেব সামনে এগুলেন। কয়েক কদম সামনে এগুতেই চার খুনি একযোগে গুলি শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুকে, মাথায় ও পেটে গুলিবিদ্ধ হন। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তার শরিরের চারপাশে রক্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আরো কয়েক রাউন্ড গুলি করে খুনিরা দ্রুত সরে পড়ে।

–

এক ঘন্টা পর পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ম্যানচেস্টার ইসলামিক একাডেমির অফিসের ফোন বেজে উঠে। মাওলানা জিয়াউল কাসেমি এগিয়ে এসে ফোন রিসিভ করেন। 'আমরা এতিম হয়ে গেলাম। মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী শহিদ হয়ে গেছেন' ফোনের ওপাশে কেউ একজন বলে উঠে। মাওলানা জিয়াউল কাসেমির রিসিভার ধরা হাত অবশ হয়ে যায়। তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

২

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভীর আলোচনায় পরে আসবো। আপাতত আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে সংঘঠিত ইরানি বিপ্লবের ফলে শিয়াদের মধ্যে নতুন এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। ফেব্রুয়ারীতে আয়াতুল্লাহ খোমেনি ফ্রান্স থেকে ফিরে আসেন। তাকে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইরানি বিপ্লবের ঢেউ লাগে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও। সেখানকার শিয়ারা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তারা দাবী তোলে পাকিস্তানের আদালতে শিয়াদের জাফরি ফিকহ চালু করতে হবে। এ সময় শিয়াদের লেখা বইপত্র জোরেশোরে প্রচার করা হয়। এসবের বেশিরভাগ ছিল ইরান থেকে প্রকাশিত। এসব বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল প্রচন্ড

আপত্তিকর। প্রায় প্রতিটি বইতেই প্রথম তিন খলিফা ও উম্মুল মুমিনিন আয়শা সিদ্দিকা (রা) কে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়া হয়েছিল। তাদের চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের চেষ্টা ছিল। দুই একজন বাদে প্রায় সকল সাহাবাকে কাফের বলা হয়েছিল কয়েকটি বইতেই। পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম শুরু থেকেই এসব বইপত্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেন। তারা এসব বইপত্র নিষিদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু প্রশাসন শিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে উলামায়ে কেরামের উপর মামলা ও নির্যাতন চালাতে থাকে।

প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে শিয়াদের মজবুত অবস্থান ছিল। ফলে উলামায়ে কেরাম ছিলেন কার্যত অসহায়। শিয়াদের এসব কাজের বিরোধিতা করার কারনে মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকিকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে ইরানী গোয়েন্দাদের যাতায়াত ছিল। তারা স্থানীয় শিয়াদের অস্ত্র সরবরাহ করতো। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুনে কোয়েটাতে শিয়াদের হামলায় ৪৪ জন পুলিশসহ মোট ৭৬ জন নিহত হয়। বিবিসিতে নিউজ করা হয়, একজন ইরানির লাশ পাওয়া গেছে। তার পকেটে পাসদারানে ইনকিলাবের (ইসলামিক রেভুলেশনারি গার্ড ক্রপস) সদস্যপদ ছিল। প্রশাসন তৎক্ষণাৎ কোয়েটার বাজার থেকে সন্দেহভাজন ২৩১ জন ইরানি নাগরিককে গ্রেফতার করলেও পরে তাদের সসম্মানে মুক্তি দিয়ে ইরান পাঠিয়ে দেয়। এই হত্যাকান্ডের তদন্তও আর আগাতে পারেনি।

এক অস্থির সময় পার হচ্ছিল তখন। একদিকে প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনিনকে গালি দেয়া হচ্ছে, আবার এর প্রতিবাদ করলে প্রশাসন খড়গহস্ত হচ্ছে। এই সময়ে দরকার ছিল একজন রাহবারের, যিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবেন, যিনি কারো পরোয়া না করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবেন, সর্বোপরি যিনি সাহাবায়ে কেরামের আযমতের কথা আলোচনা করে আহলুস সুন্নাহর অন্তরগুলোকে প্রশান্ত করবেন। সবাই অপেক্ষায় ছিল এমন এক নেতৃত্বের, কিন্তু কারোই জানা ছিল না কে হবেন তিনি।

জং এর এক তরুণ মাওলানা, হক নেওয়াজ জংভীই ছিলেন সেই রাহবার, যিনি এগিয়ে এসেছিলেন এক ক্রান্তিলগ্নে। শত জুলুম-নির্যাতনও তাকে টলাতে পারেনি, শিয়াদের বিরুদ্ধে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন জুলকারনাইনের প্রাচীরের মত দৃঢ়তা নিয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলতেন, টানা বিশ বছর শিয়াদের নিয়ে পড়াশোনা করে কথা বলতে এসেছি আমি, অবশেষে জং এর রাস্তায় পড়ে থাকা তার নিথর দেহ সাক্ষ্য দিচ্ছিল আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়নের।

৩

আশির দশকের শুরুতে মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী পরিচিত ছিলেন একজন

তরুণ আলোচক হিসেবে। এসময় তিনি বিভিন্ন জলসায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতেন। শিয়া মতবাদের অসারতা নিয়ে কথা বলতেন। শিয়াদের ক্রমবর্ধমান অপতৎপরতা নিয়ে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। তিনি দেখছিলেন, আলেমরা সাধ্যমত প্রতিবাদ করছেন কিন্তু এই প্রতিবাদের কোনো প্লাটফর্ম নেই, ফলে কথাগুলো সবার কানে যাচ্ছে না। প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে আঘাত করা হচ্ছে কিন্তু এর জোরালো প্রতিবাদ করা যাচ্ছে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম তৈরী করতে হবে। এই চিন্তা থেকেই ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিপাহে সাহাবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন।
পরে নিজের এক বন্ধুকে বলেছিলেন তিনি, 'আমি দেখলাম পাকিস্তানের মাটিতে আমার মাকে গালি দেয়ার সাহস কারো নেই, অন্য কারো মাকে গালি দেয়ার সাহসও পায় না কেউ, কিন্তু উম্মাহাতুল মুমিনিনদেরকে প্রকাশ্যে গালি দেয়া হচ্ছে, তাদের সম্মানে আঘাত করা হচ্ছে অথচ সবাই চুপ। কেউ কিছু বলছে না। আমার ঈমান আমাকে আর চুপ থাকার অনুমতি দিল না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে এর বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। বিনিময়ে আমাকে জান দিতে হলে তাতেও প্রস্তুত আমি'।

-

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী যখন সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ছিলেন একা। তার পেছনে কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, কারো ছত্রছায়ায় থেকে এই সংঘঠন প্রতিষ্ঠা করেননি তিনি। সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল দুটি। প্রথমত, সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা মানুষের সামনে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, শিয়াদের কুফর মানুষের সামনে স্পষ্ট করার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

৪

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সিপাহে সাহাবার আয়োজনে প্রথম দিফায়ে সাহাবা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সিপাহে সাহাবার প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ। মাওলানা জিয়াউল কাসেমি, মাওলানা আবদুস সাত্তার তিউনেসির মত বরেণ্য আলেমরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকেই সম্মেলনস্থলে লোকজন আসতে থাকে। জুমার পর সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আচমকাই পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। সম্মেলনে আগত প্রায় ৪০ হাজার মানুষ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকির মুক্তির দাবীতে রোড ব্লক করে দেয়। মাওলানা ফারুকি এর তিনদিন আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং তখন তিনি চিনিউট কারাগারে অবস্থান করছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দফায় দফায় আলোচনা করেও কোনো সমাধান করতে না পারায় রাত এগারোটার দিকে মাওলানা

ফারুকিকে মুক্তি দেয়া হয়। প্রশাসনের গাড়িতে করে ৯০ কিলোমিটার দূর থেকে মাওলানা ফারুকিকে সম্মেলনস্থলে পৌছে দেয়া হয়।পুরো ময়দান নারায়ে তাকবির ধবনীতে কেঁপে উঠে। হাজারো জনতে সানন্দে খোশ আমদেদ জানাতে থাকে। বরেণ্য আলেম ও স্কলাররা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা জংগভী এগিয়ে এসে মাওলানা ফারুকিকে অভ্যর্থনা জানান। পুরো সমাবেশ নিজেদের দাবি পূরন হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে।
রাত সোয়া দুইটার দিকে মাওলানা ফারুকি মঞ্চে উঠেন। এ সময় তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, 'আজ থেকে আমি সিপাহে সাহাবার সকল কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করছি। আমৃত্যু আমি সাহাবায়ে কেরামের সম্মান রক্ষায় কাজ করে যাব'। এই বক্তব্যের মাধ্যমে মাওলানা ফারুকি আনুষ্ঠানিকভাবে সিপাহে সাহাবাতে যোগ দেন। এর আগ পর্যন্ত তিনি এই দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

-

সিপাহে সাহাবার সৌভাগ্য, শুরু থেকেই একদল সাহসী ও মেধাবী আলেম এই দলের সাথে যুক্ত হয়ে যান। মাওলানা আজম তারিক, মাওলানা ইসারুল কাসেমি, মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি, মাওলানা আলি শের হায়দারি প্রমুখ ছিলেন একাধারে সুবক্তা ও দক্ষ সংঘঠক।
সিপাহে সাহাবার উদ্যোগে সারা দেশে একের পর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এসব সমাবেশে বক্তারা দালিলিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা আলোচনা করতেন। একইসাথে শিয়াদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাদের কুফর ও তাহরিফের নমুনা দেখাতেন। তারা দাবী জানাতেন শিয়াদের বইপত্র নিষিদ্ধ করা হোক। তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা হোক।

-

শিয়াদের বিরুদ্ধে চৌদ্দশত বছর ধরেই আলেমরা কাজ করে গেছেন। ইবনে তাইমিয়া থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী সবাই তাদের মতবাদ সম্পর্কে লিখেছেন। সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠার সত্তর বছর আগেও মাওলানা আবদুশ শাকুর লখনভী শিয়াদের নিয়ে বিস্তৃত কাজ করে গেছেন। সিপাহে সাহাবা শিয়াদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ফতোয়া চালু করেনি, তারা কেবল আগের উলামাদের বক্তব্যগুলোই প্রচার করেছে। পাশাপাশি শিয়াদের বইপত্র থেকে তাদের কুফরের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন।
সিপাহে সাহাবার সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, তারা শিয়াদের কুফরের বিষয়গুলো সহজ ভাষায় জনসাধারণের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এতদিন যা ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিকতার জগতে সীমাবদ্ধ, তা তারা নিয়ে আসেন খোলা ময়দানের আলোচনায়। একইসাথে তারা বয়ান ও আলোচনার জগতে এক নতুন যুগের সূচনা

করেন। এর আগে বেশিরভাগ ওয়াজ মাহফিলে আলোচনার ধাঁচ ছিল সুরেলা ও গল্প-কাহিনী নির্ভর। তারা এ থেকে বের হয়ে আসেন। সিপাহে সাহাবার কল্যাণে মানুষ শুনলো মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকির আলোচনা। একটানা দাঁড়িয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন, কখনো এডওয়ার্ড গিবনের 'দ্য ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার' থেকে রেফারেন্স টানছেন, আবার কখনো দলিল দিচ্ছেন তারিখে ইবনে আসাকির থেকে, এ ছিল এক মুগ্ধকর দৃশ্য। । সিপাহে সাহাবার কল্যাণে বিকশিত হলেন মাওলানা আযম তারিকের মত তুখোড় বক্তা। পাকিস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ ও ভারতেও তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।
এতদিন পর্যন্ত উলামায়ে কেরাম শিয়াদের অভিযোগের জবাব দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সিপাহে সাহাবা অভিযোগের জবাব দেয়ার বদলে পালটা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিল। এতদিন যা ছিল রক্ষণাত্মক প্রতিরোধ, তাকে তারা পরিণত করলো আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে।

৫

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভীর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ডক্টর আল্লামা খালেদ মাহমুদ যথার্থই বলেছেন, 'চৌদ্দশ বছর ধরে শিয়ারা সাহাবায়ে কেরামকে বিচারের কাঠগড়ায় বসিয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলে যেত। আহলুস সুন্নাহর আলেমরা এসব অভিযোগের জবাব দিতেন। কিন্তু মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী এসে এই ধারা বদলে দিলেন। তিনি শিয়াদেরকেই বিচারের কাঠগড়ায় তুলে দিলেন। সরাসরি অভিযোগ তুললেন তাদের ঈমান নিয়ে। তিনি বললেন, আবু বকরের (রা) আলোচনায় পরে আসো, আগে তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান প্রমাণ করো। সাহাবায়ে কেয়ারমের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে নিজেরদের ঈমানের প্রমাণ দাও। তার এই আক্রমণের সামনে শিয়ারা ছিল অসহায়। এবার তারা অভিযোগ তোলার বদলে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে ব্যস্ত হয়ে গেল'।

-

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভীর এই মিশন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একইসাথে এর কর্মীদেরকে প্রচুর ত্যাগ ও কোরবানির মুখোমুখি হতে হয়। একদিকে ইরানের চাপ অন্যদিকে প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা শিয়া কর্মকর্তা, এই দুয়ে মিলে সিপাহে সাহাবার কর্মিদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। ১৯৯৬ সালে, সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠার এগারোতম বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারী বাহিনী ও শিয়াদের হাতে নিহত সিপাহে সাহাবার কর্মীর সংখ্যা প্রায় পৌনে চারশো। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আহত হয়েছেন প্রায় ৭ হাজার কর্মী। তাদের বিরুদ্ধে মোট মামলা হয়েছে এগারো হাজার। কারাবরণ করেছেন ১৪ হাজার কর্মী। এর

প্রতিষ্ঠাতা হক নেওয়াজ জংভীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল ৩০০। এর মধ্যে তিনটি ছিল খুনের মামলা।

-

প্রশাসন ও শিয়ারা মাওলানা জংভীর কণ্ঠরুদ্ধ করার সকল চেষ্টাই চালাচ্ছিল। বিভিন্ন জেলায় তাকে নিষিদ্ধ করা হয়। অপরদিকে একের পর এক মামলা চাপানো শুরু হয়। কিন্তু মাওলানা জংভী এসবের বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। তিনি বারবার বলতেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে সাহাবাদের সম্মানের কথা বলেই যাব।

-

মাওলানা জিয়াউল কাসেমি লিখেছেন, সেবার ভাওয়ালপুর জেলার আহমাদপুরে মাওলানা জংভীকে নিষিদ্ধ করা হয়। সেখানে আগ থেকেই আমাদের অনুষ্ঠান ছিল। প্রশাসন কোনোভাবেই মাওলানাকে যেতে দিবে না। নির্দিষ্ট দিনে মাওলানা ঠিকই ছদ্মবেশে শহরে প্রবেশ করলেন এবং মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বয়ান শুরু করলেন। তিনি বয়ান শুরু করতেই শ্রোতাদের মধ্যে 'তালাক হয়ে গেছে, তালাক হয়ে গেছে' বলে হৈচৈ শুরু হলো। মাওলানা বয়ান থামিয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন জানা গেল, এলাকার এক পেশাদার বক্তা কয়েকদিন বলেছিল, হক নেওয়াজ এই এলাকায় আসার সাহস নেই। যদি সে আসতে পারে তাহলে আমার স্ত্রী তালাক'। এই ঘটনা অনেকের জানা ছিল। তাই মাওলানা বয়ান শুরু করতেই তারা এটা বলতে থাকে।

৬

মাওলানা জংভী একাধিকবার কারাবরণ করেন। প্রতিবার তাকে প্রচন্ড নির্যাতন করা হয়। একবার রাত দুটো বাজে পুলিশ তার ঘরে হানা দেয়। ঘরেই তাকে প্রচন্ড মারধোর করা হয়। তারপর তাকে মিয়ানওয়ালি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কারাগার ছিল পুরো পাকিস্তানের সবচেয়ে ভয়ংকর কারাগার। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই কারাগার ছিল কুখ্যাত। ইতিপূর্বে আতাউল্লাহ শাহ বুখারি, মুফতি কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা যফর আলি খান, মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি, আগা সুরেশ কাশ্মিরী প্রমুখকে এখানেই কারাবন্দী করা হয়েছিল। গাজি ইলমুদ্দিন এখানে বন্দি ছিলেন এবং এখানেই তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যখন মাওলানা জংভীকে কারাগারে প্রবেশ করানো হয় তখন তার শরীরে কোনো কাপড়ই ছিল না। পুরো শরিরে ছিল রক্তাক্ত। মারের কারণে তার হাত ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা হাত শরিরের সাথে লটকে ছিল। একজন কারা কর্মকর্তার মনে দয়ার উদ্রেক হলে তিনি মাওলানাকে ছোট একটি কাপড় দেন। মাওলানা জংভী তা পরে কোনোভাবে সতরের হেফাজত করেন। এ সময় তাকে প্রায় আট মাস কারাবাস করতে হয়। তাকে ছোট একটি কুঠুরিতে বন্দি করা হয়। যেখানে

গরম ও শীত থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই ছিল না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ওই কুঠুরিতে সারতে হত, আবার সেখানেই থাকতে হত। মাওলানা জংভী এতে বিন্দুমাত্র মনোবল হারাননি। তিনি কারাগারে বসেই শিয়াদের নতুন প্রকাশিত বইপত্র সংগ্রহ করতে থাকেন, এবং এসব বইয়ের উপর নোট করতে থাকেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দ্বিগুন উৎসাহে আবারও শিয়াদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে থাকেন।

মাওলানা জংভীর বয়ানের ভাষা শুনে মনে হতো তিনি খুবই কঠোর স্বভাবের মানুষ। তবে তার এই কঠোরতা ছিল কুফরের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খুবই নরম মেজাজের মানুষ। একবার এক কর্মচারী তাকে বলে, আপনার হাতের ঘড়িটি সুন্দর। আমিও যদি এমন একটা পেতাম। কয়েকদিন পর সেই কর্মচারীর সাথে দেখা হলে তিনি মাফ চেয়ে বলেন, আমার ঘড়িটি আনতে মনে নেই। তখনই তিনি একজনকে পাঠিয়ে একটি নতুন ঘড়ি কিনে আনান, এবং কর্মচারীকে তা উপহার দেন।

মাওলানা জংভীকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন তাদের ভাষ্য হলো, তার মাথায় সবসময় সাহাবায়ে কেরামের সম্মান রক্ষার বিষয়টিই ঘুরতো। এছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না তার। এই এক মিশন নিয়েই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সর্বত্র। গ্রেফতার হয়েছেন, ১৪৪ ধারার মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু পিছপা হননি একটুও, সরে আসেননি নিজের অবস্থান থেকেও। মাওলানা জংভীর তিন সন্তান ছিলেন। তিনজনের জন্মের সময়ই মাওলানা জংভী ছিলেন কারাগারে। শিয়া নেতা সরদার যফর আব্বাস ঘোষণা করেছিল, মাওলানা জংভীর মাথা এনে দিলে ৬ লাখ রুপি ও দুই টুকরো জমি উপহার দেয়া হবে। তবুও মাওলানা জংভী বিন্দুমাত্র আতংকিত হননি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সর্বশেষ জুমার বয়ানে তিনি বলেছিলেন, জীবন আর মৃত্যু আমার কাছে এক সমান। কোনো ভয় দেখিয়ে আমাকে এই পথ থেকে সরানো যাবে না।

৭

মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জং জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজের এলাকায় সমাপ্ত করেন। এরপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া খাইরুল মাদারিস মুলতান থেকে দাওরা হাদিস সমাপ্ত করেন। মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারান। তিনি ছিলেন আলেমদের স্নেহধন্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের চোখের মনি। তার মৃত্যুর সাথে সাথে প্রশাসন কারফিউ জারি করে। সামরিক বাহিনী শহরে প্রবেশের পথগুলো আটকে দেয়। প্রশাসন চাচ্ছিল জানাযায় বেশি মানুষের উপস্থিতি না হোক। কিন্তু এরই মধ্যে প্রায় এক লাখ মানুষ উপস্থিত হয়ে যায়।

প্রশাসনের নজর এড়িয়ে মাওলানা আযম তারিক, মুহাম্মদ মক্কি সবাই চলে আসেন।
মাওলানা মুহাম্মদ মক্কি স্মৃতিচারণ করেছেন, 'আমি পৌঁছে দেখি মাওলানার কাফনে মোড়ানো লাশ একটা চৌকির উপর রাখা। আমি এগিয়ে গেলাম। কাফনের মুখ খুলে তার চেহারার দিকে তাকালাম। বুকের ভেতরটা হু হু করে কেঁদে উঠলো। আমার মনে পড়লো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দিক (রা) এসে নবিজিকে দেখে চুমো দিয়েছিলেন (এই মর্মে সহীহ বুখারীতে হাদিস এসেছে)। আমার মনে পড়লো, মাওলানা জংভী সারাজীবন সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবেসেছেন। তাদের সম্মানেই জীবন দিয়েছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও হজরত আবু বকরের অনুসরণ করব। আমি মাওলানার চেহারায় চুমু দিলাম। তারপর আবার কাফনের কাপড়ে চেহারা ঢেকে দিলাম'।
মাওলানা আযম তারিক সব ভীড় থেকে দূরে চলে যান। মাওলানা জংভীর জন্য সদ্য খোঁড়া কবরের পাশে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে থাকেন।
মাওলানার জানাযার ইমামতি করেন হাফেজুল হাদিস শায়খ আবদুল্লাহ দরখাস্তি।
জানাযার পর মাওলানা জংভীকে গুলশানে জংভী শহিদ চত্বরে দাফন করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে মাওলানা জংভীর কবরের পাশে গড়ে উঠেছে আরো অনেকগুলো কবর। তার পাশেই দাফন করা হয়েছে তার সহযোদ্ধা মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি, মাওলানা ইসারুল কাসেমি, মাওলানা মুখতার আহমদ, ইজহারুল হক ও মাওলানা আযম তারিককে। তারা প্রত্যেকেই সাহাবায়ে কেরামের সম্মানের কথা বলতে গিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন।
মাওলানা জংভীর শাহাদাতের মাধ্যমে কোরবানির যে সিলসিলার শুরু পরবর্তী দিনগুলোতে তা আরো দীর্ঘ হয়েছিল।

সূত্র

১। মাওলানা হক নেওয়াজ শহিদ- মাওলানা জিয়াউল কাসেমি।
২। মেরা জুরম কিয়া হ্যায়- মাওলানা আযম তারিক।
৩। তারিখে আযিমত, ১ম খন্ড – আবু উসামা মাহমুদ।
৪। ফির ওহি কাইদে কাফাস- জিয়াউর রহমান ফারুকি।

মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি

১

১৮ জানুয়ারী ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। সেশন কোর্ট চত্বর, লাহোর। দুপুর বারোটা।
বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। চারপাশে বিরাজ করছে অদ্ভুত নীরবতা। মাওলানা আযম তারিক, সিপাহে সাহাবার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা, উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কোর্টের চত্বরে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে, কানে তালা লেগে গেছে। বিস্ফোরণের পর কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি। 'আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে' ভাবলেন মাওলানা আযম তারিক। অনেক কষ্টে উঠে বসলেন তিনি। বাতাসে এখনো সাদা ধোঁয়া উড়ছে। আশপাশে অনেক মানুষের লাশ পড়ে আছে। একটু দুরেই দেখা যাচ্ছে সিপাহে সাহাবার প্রধান মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। আযম তারিক নিজের দিকে তাকালেন। পায়ের বুটজোড়া বোমার আঘাতে উড়ে গেছে। বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল চামড়ার সাথে লটকে আছে। হাটুর নিচে পাজামা গায়েব, সেখানে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে। দুই হাতও রক্তাক্ত। পেটের অংশে জামা ছিঁড়ে গেছে। চামড়ায় ছোপ ছোপ রক্ত। শোরগোল শোনা যাচ্ছে।
'কায়েদিন, কায়েদিন' বলে চিৎকার করছে কারা যেন। 'ওরা সিপাহে সাহাবার কর্মী' মনে মনে ভাবলেন আযম তারিক। চেষ্টা করলেন জিয়াউর রহমান ফারুকির দিকে এগিয়ে যেতে। দূর্বল শরির সায় দিল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সিপাহে সাহাবার কর্মীরা ছুটে এসেছে। মাওলানা আযম তারিককে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হলো। অন্য গাড়িতে তোলা হলো জিয়াউর রহমান ফারুকিকে। হাসপাতালে পৌঁছতেই মাওলানা আযম তারিককে জরুরী বিভাগে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তাররা জানান দ্রুত অপারেশন করতে হবে। মাওলানাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসা হয়।

মাওলানা আযম তারিক বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, ফারুকি সাহেবের কী অবস্থা? উনি কেমন আছে।
'তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন। দ্রুতই সেরে যাবেন' এই বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয়।
'ফারুকি সাহেব চলে আসবেন। আমরা আবার পাশাপাশি বসে কথা বলবো' ভাবলেন মাওলানা আযম তারিক।
অপারেশন শেষ হলো। মাওলানা আযম তারিক বলেন, আমাকে ফারুকি সাহেবের কাছে নিয়ে চলুন। একটু পরে নেয়া হবে, এই বলে ডাক্তাররা চলে যান। কয়েক

ঘন্টা পার হয়। মাওলানা আযম তারিক অধৈর্য হয়ে উঠেন। তিনি বারবার বলেন, আমি ফারুকি সাহেবের কাছে যাব। উপস্থিত একজন এগিয়ে এসে আযম তারিকের মুখ দুহাতে আঁকড়ে ধরে। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে উঠে, 'মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি শহিদ হয়ে গেছেন। হাসপাতালে আনার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন'

২

মাওলানা আযম তারিকের শারিরিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে তাকে মাওলানা ফারুকির মৃত্যুসংবাদ জানাতে বিলম্ব করা হয়েছিল। কিন্তু এর আগেই পুরো পাকিস্তান জেনে গেছে সিপাহে সাহাবার প্রধান মুওয়াররিখে ইসলাম মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি বোমা বিস্ফোরণে শহিদ হয়ে গেছেন। এই হামলায় নিহত হয়েছে আরো ২৬ জন।

এই সংবাদ জেনে গেছেন মক্কা শরিফে অবস্থানরত শায়খ মুহাম্মদ মক্কিও। মসজিদে হারামের চত্বরে অশ্রুসজল চোখে বসে আছেন তিনি। একের পর এক স্মৃতিরা হানা দিচ্ছে। বুকের ভেতর তীব্র কষ্ট দলা পাকাচ্ছে। তার মনে পড়ে কয়েক বছর আগে হংকং সফরের কথা। মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকিও ছিলেন তার সাথে সেই সফরে। একদিন তিনি মাওলানা ফারুকিকে বলেছিলেন,

'মাওলানা, আপনার নামে একটা অভিযোগ কানে এসেছে। শুনেছি, আপনি নাকি সিপাহে সাহাবার ফান্ডের টাকা সরিয়ে নিজের জন্য জমি কিনেছেন'

'হজরত, আমি এমন একজন মানুষ যে প্রতিমূহুর্তে শত্রুর বুলেটের অপেক্ষায় থাকি। আমি জানি না, কোথায়, কখন, কার বুলেটের আঘাতে আমার মৃত্যু হয়। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ভাবি আজই হয়তো আমার শেষদিন। এখনই হয়তো গুলি চালানো হবে আমার উপর। আপনিই বলুন, এমন একজন মানুষ যে সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সে সিপাহে সাহাবার ফান্ড তসরুফ করে কী করবে? আপনি যে জমির কথা শুনেছেন সেটা আমার এলাকার এক লোকের। সেই লোকের নামও ফারুকি। শত্রুরা এই সুযোগ নিয়ে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে' মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন মাওলানা ফারুকি।

'হায়, আমি যদি সেদিন তাকে এই কথা না বলতাম। এই বিশ্রি অভিযোগ তাকে না শোনাতাম। মানুষটা চলে গেছেন, এমন মানুষের সন্ধান সহজে মেলে না' কাঁদতে কাঁদতে ভাবলেন শায়খ মুহাম্মদ মক্কি।

৩

শায়খ মুহাম্মদ মক্কিকে মাওলানা ফারুকি যে কথা বলেছিলেন তা থেকেই তার জীবনের গতিবিধি স্পষ্ট। তিনি নিজেই লিখেছেন, আমাদের জীবনের স্বস্তির

দিনগুলি হারিয়ে গেছে, আমরা বেছে নিয়েছি এক কঠিন পথ। এখন একে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে আমাদের দিনগুলি। আমাদের প্রতিটি কাজই এখন জীবনের এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য। আমি এই কন্টকাকীর্ন পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। আমি এই পথে আসার আগেই মাকে বলে দিয়েছি এই পথে আমাকে শাহাদাতের অলংকার পরতে হবে। কানে বাজবে হাতকড়ির ঝংকার। এই পথের দাবিই এটি।

-

মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকির জন্ম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে, ফয়সালাবাদের সামুন্দরিতে। জামিয়া বাবুল উলুমে তার পড়াশোনা শুরু হয়। শুরু থেকেই একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। মাওলানা ফারুকি নিজের আত্মজীবনিতে লিখেছেন, ছাত্রজীবন ছিল এক আশ্চর্য বসন্তকালের মত। আমি সেই সময়কে এখনো স্মরণ করি। আমি চাই আবার সেই সময় ফিরে আসুক। গভীর রাত পর্যন্ত দরসি ও গায়রে দরসি বইপত্র পাঠ করা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমিয়তে তলাবায়ে ইসলামের ব্যস্ততা এবং মাদরাসার পাঠ্যক্রমের পড়াশোনার বাইরেও দিনে গড়ে একশো পৃষ্ঠা পাঠ করা আমার অভ্যাস ছিল। জীবনে কখনো খেলাধুলা করিনি। অবসরেও কোনো কাজে ব্যস্ত থাকাই ছিল আমার অভ্যাস।

মাওলানা ফারুকির এই বিস্তৃত অধ্যয়ন পরবর্তী দিনগুলিতে তার লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশকাতে পড়ার সময় তিনি নবিজির জীবন নিয়ে রাহবার ও রাহনুমা নামে একটি সীরাতগ্রন্থ রচনা করেন। এসময় তিনি তিন মাসে প্রায় একশোটি উর্দু, ফার্সী ও আরবী সীরাতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখি ও বক্তৃতার জগতে তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এক সমাবেশে জুলফিকার আলি ভুট্টোর বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ায় তিনি গ্রেফতার হন।

অল্পবয়সেই মাওলানা ফারুকি সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে তিনি সারাদেশে সফর করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। একইসাথে লেখালেখিও অব্যাহত রাখেন। শুরু থেকেই তিনি শিয়া ও বেরেলভিদের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতেন। এসব বক্তৃতার কারনে বারবার তাকে প্রশাসনিক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি মোট আটবার কারাবরণ করেন।

৪

ছাত্রজীবন থেকেই মাওলানা ফারুকির সাথে মাওলানা জংভীর সখ্যতা ছিল। দুজনেই ছিলেন সমবয়সী এবং চিন্তার দিক থেকেও কাছাকাছি। সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠার আগে দুজনে একসাথেই সারাদেশে বিভিন্ন সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। মাওলানা জংভী এক বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সিপাহে সাহাবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা ফারুকি শুরু থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সিপাহে সাহাবা প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পর ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যে সিপাহে সাহাবায় যোগদানের কথা জানান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সিপাহে সাহাবার সাথে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সম্মান রক্ষায় কাজ করে গেছেন।

-

২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজ বাসভবনের সামনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন সিপাহে সাহাবার প্রধান মাওলানা হক নেওয়াজ জংভী। তার ইন্তেকালের পর সিপাহে সাহাবার প্রধান নিযুক্ত হন মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি। তার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন মাওলানা ইসারুল কাসেমি। ১০ জানুয়ারী ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ইসারুল কাসেমিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তখন তার স্থানে মাওলানা আযম তারিককে নিয়োগ দেয়া হয়।
মাওলানা ফারুকির নেতৃত্বের যুগে সিপাহে সাহাবা এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। একদিকে তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিয়াদের ভ্রান্তি নিয়ে সতর্ক করছিলেন, আবার লেখনির মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের কাছে শিয়াদের ভুলগুলো তুলে ধরছিলেন। নব্বই দশকের শুরুতে নওয়াজ শরিফের সরকার একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল তারা সকল পক্ষের সাথে কথা বলে শিয়াদের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত জানাবে। এই কমিটির উদ্যোগে পাকিস্তানের ইসলামি সকল ঘরাণাকে নিয়ে তিনটি আলোচনা হয়। মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকিও এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চলাকালে তিনি শিয়াদের বিভিন্ন বইপত্র থেকে তাদের বিকৃতি ও বেয়াদবির দলিল তুলে ধরে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত তারিখি দস্তাবেজ নামে একটি নথি পেশ করেন। সকল পক্ষের মতামত পর্যালোচনা শেষে কমিটি সিপাহে সাহাবার অবস্থানকে সমর্থন জানায় এবং শিয়াদের বইপত্র নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু প্রশাসন এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি।

৫

মাওলানা ফারুকি সিপাহে সাহাবার অবকাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজান। এ সময় সিপাহে সাহাবার কর্মীসংখ্যা ২০ লাখে উন্নিত হয়। পাকিস্তানের বাইরেও প্রায়

২৭টি দেশে এর শাখা খোলা হয়। মাওলানা ফারুকি বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন। বক্তব্য রেখেছিলেন।

-

মাওলানা ফারুকির কর্মকান্ডে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়ে উঠে। স্থানীয় শিয়ারাও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। মাওলানাকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দুও সরে আসেননি। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় এলেন বেনজির ভুট্টো। এসময় প্রশাসন সিপাহে সাহাবার উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়ানোর অভিযোগে সিপাহে সাহাবার নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হতে থাকে। গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারায় অনেকে। অথচ সিপাহে সাহাবার শুধু সাহাবায়ে কেরামের সম্মান রক্ষার কথা বলছিল। শিয়াদের বিকৃত বইপত্র নিষিদ্ধের দাবী জানাচ্ছিল।

-

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে প্রশাসন সিপাহে সাহাবার উপর চুড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। সিপাহে সাহাবার ৩০০০ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২১ নভেম্বর মিয়া শাহনেওয়াজের খুনের মামলায় গ্রেফতার করা হয় মাওলানা আযম তারিক ও মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকিকে। সিপাহে সাহাবার প্রধান দুই নেতাকে গ্রেফতারের পাশাপাশি সারাদেশে কর্মীদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। মাওলানা ফারুকিকে ৭ দিনের রিমান্ড দেয়া হয়। এরপর তাকে মুলতান কারাগারে পাঠানো হয়। মাওলানা ফারুকি কারাগারেও দাওয়াতি কাজ চালাতে থাকেন। তিনি শেষরাতে জেগে উঠতেন। তাহাজ্জুদ ও তিলাওয়াত শেষে ফজরের সালাত আদায় করতেন। এরপর বন্দীদের নিয়ে দরসে কোরআনের মজলিস করতেন। এ সময় তিনি তাওহিদ, রেসালাত, শানে সাহাবা ইত্যাদী বিষয়ে আলোচনা করতেন। তার এই মজলিসের কারনে কারাগারের পরিবেশ বদলে যায়। এমনকি কয়েকজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে।

-

মাওলানা আযম তারিক ও মাওলানা ফারুকিকে যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তা ছিল মিথ্যা মামলা। এর সাথে তাদের কোনো সম্পৃক্ততাই ছিল না। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাওলানা জিয়াউল কাসেমিকে ডেকে পাঠানো হয়। তার মাধ্যমে প্রশাসন একটি সমঝোতা প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি ছিল, সিপাহে সাহাবা তাদের দাবী থেকে সরে আসবে, এবং বেনজির সরকারকে সমর্থন জানাবে। তাহলে সিপাহে সাহাবার নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেয়া হবে। মাওলানা জিয়াউল কাসেমি কারাগারে এই প্রস্তাব নিয়ে মাওলানা

ফারুকির সাথে আলোচনা করেন। মাওলানা ফারুকি সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
ইতিমধ্যে শোনা যায়, ইরান সরকার চাচ্ছে সিপাহে সাহাবার শীর্ষ দুই নেতাকে ফাঁসি দেয়া হোক। এজন্য তারা পাকিস্তান সরকারের সাথে গোপনে লবিং করছে। এই সংবাদ শুনে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ডক্টর আল্লামা খালেদ মাহমুদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি কারাগারে গিয়ে মাওলানা ফারুকির সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, ইরান সরকার তোমাদেরকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। এই খুনের মামলাতেই তোমাদেরকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। প্রশাসনের সাথে সমঝোতা করে নেয়াই এখন মঙ্গল।
মাওলানা ফারুকি স্পষ্ট বলে দেন, সরকারের শর্ত মেনে মাথা নিচু করার চেয়ে ফাঁসির মৃত্যু আমাদের অধিক প্রিয়। এটা আমাদের আদর্শিক লড়াই। আমরা এ লড়াই থেকে এক বিন্দু পিছু হটবো না। আমরা কোনো সমঝোতাও করবো না। মাওলানা আযম তারিকও মাওলানা ফারুকিকে সমর্থন জানান। ডক্টর আল্লামা খালেদ মাহমুদ কান্না করতে থাকেন। কিন্তু সিপাহে সাহাবার শীর্ষ দুই নেতা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।
ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আলেমদের প্রতিনিধিরা কারাগারে এসে মাওলানা ফারুকির সাথে দেখা করেন। আফগানিস্তান থেকে তালেবানের প্রতিনিধিদল এসে কারাগারে মাওলানা ফারুকির সাথে দেখা করে। তখনো কাবুল তালেবানদের দখলে আসেনি। তালেবানদের প্রতিনিধি আমিরুল মুজাহিদীন মোল্লা উমরের পত্র নিয়ে এসেছিলেন। সেই পত্রে মোল্লা উমর সিপাহে সাহাবা ও এর নেতৃবৃন্দের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করেছিলেন।

৬

কারাগারে বসে মাওলানা ফারুকি নিজের আত্মজীবনি লেখা শুরু করেন। এই আত্মজীবনিতে তিনি শুধু নিজের কারাবাসের অভিজ্ঞতাগুলোই বর্ননা করেছেন।
১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৭।
সেদিন লাহোর সেশন কোর্টে মাওলানা আযম তারিক ও মাওলানা ফারুকির হাজিরা ছিল। কোনো এক বিচিত্র কারণে মাওলানা ফারুকি আদালতে যাওয়ার পূর্বেই নিজের এই আত্মজীবনি লিখে শেষ করেন। এই পান্ডুলিপির শেষ লাইনে তিনি লিখেছিলেন, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বেনজির প্রশাসনের সকল পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেছে। (এর দুই মাস আগে বেনজির ভুট্টোকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন)। পান্ডুলিপির শেষে তিনি নিজের নাম ও তারিখ লিখেছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি মাওলানা আযম তারিকসহ আদালতে যান। সেখানেই বোমার বিষ্ফোরণে তিনি শহীদ হন। এই আত্মজীবনিই

ছিল তার লেখা শেষ বই। মৃত্যুর আনুমানিক তিন ঘন্টা আগে তিনি এটি লিখে শেষ করেন। পরে এটি ফের ওহি কইদে কফস নামে প্রকাশিত হয়। মাওলানা ফারুকি বক্তৃতার পাশাপাশি লেখালেখিতেও সক্রিয় ছিলেন। শিয়াদের জবাবে তিনি লিখেছিলেন ৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত তালিমাতে আলে রাসুল। আশির দশকের শেষদিকে জিয়াউল হকের আমলে কারাগারে বসে লিখেছিলেন, ৫৩৬ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থ 'পয়গামে ইসলাম, আকওয়ামে আলম কে নাম'। এছাড়া তার বক্তব্যগুলো সংকলিত হয়েছে 'খুতুবাতে ফারুকি' ও 'খুতুবাতে মিম্বর ও মেহরাব' নামে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে মাওলানা ফারুকির গভীর পড়াশোনা ছিল। তার বক্তব্য ও লেখায় প্রকাশ পেত। এজন্য তাকে মুওয়াররিখে ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মাওলানা ফারুকির ইন্তেকালের পর তার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল স্বামীকে নিজ এলাকা সামুন্দরিতে দাফন করা হোক। কিন্তু মাওলানা আযম তারিক বললেন, আমার ইচ্ছা, মাওলানা ফারুকিকে মাওলানা জংভীর কবরের পাশেই দাফন করা হোক। মাওলানা ফারুকির স্ত্রী তা মেনে নিলেন। মাওলানা জংভীর কবরের পাশেই দাফন করা হয় মাওলানা ফারুকিকে। কয়েক বছর পর মাওলানা আযম তারিককেও তাদের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছিল।

৭

মাওলানা ফারুকি লিখেছিলেন, যদি সিপাহে সাহাবা ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত কোনো আন্দোলন হতো তাহলে হক নেওয়াজ জংভীর মৃত্যুর সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে যেত। কিংবা ইসারুল কাসেমির লাশের সাথেই তা দাফন হয়ে যেত। মাওলানা মুখতার আহমদ সিয়াল কিংবা মাওলানা সাইদুর রহমানের শাহাদাতের সাথেই এই গল্প হারিয়ে যেত। কিন্তু না, এই আন্দোলনের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে এক সুউচ্চ মিশন ও চিন্তা নিয়ে , তাই লোহার হাতকড়া কিংবা তপ্ত বুলেট এর কর্মিদের দমাতে পারবে না।

নিজের জীবন দিয়ে মাওলানা ফারুকি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

মাওলানা আজম তারিক

১.

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২। ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান।

সিপাহে সাহাবার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পয়গাম্বরে ইনকিলাব কনফারেন্স। শুরু থেকেই পরিস্থিতি থমথমে। সভাস্থলের পাশেই শিয়াদের ইমামবাড়া। শিয়ারা হুমকি দিয়েছিল, সিপাহে সাহাবার অনুষ্ঠানে শিয়াদের ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না। ইরানের শিয়া বিপ্লব নিয়েও চুপ থাকতে হবে। এর অন্যথা হলে তারা আক্রমন করবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে প্রশাসন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে।

এশার নামাজের পর মঞ্চে উঠলেন একজন তরুণ আলেম। ত্রিশের কোঠায় বয়স। তিনি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। শিয়াদের লিখিত বইপত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনিনদের যে অসম্মান করা হয়েছে, তা বলতে থাকেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। তিনি বলেন, ইরানের শিয়া বিপ্লব কখনোই মুসলমানদের আদর্শ হতে পারে না।

আচমকা গুলির শব্দ শোনা যায়। একের পর এক গুলি এগিয়ে আসে সভাস্থলের দিকে। দুয়েকটি বুলেট মঞ্চের একেবারে কাছে এসে পড়ে। গুলি আসছে ইমামবাড়ার দিক থেকে। গুলি শুরু হতেই পুলিশবাহিনী সরে যায়। সিপাহে সাহাবার নিয়োজিত নিরাপত্তারক্ষিরা পালটা জবাব দিতে থাকে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে আকাশ বাতাস ভরাট হয়ে আসে।

আলোচক আলেম বিন্দুমাত্র চমকালেন না। আলোচনাও থামালেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে চললেন, ভয়ের কিছু নেই। এই গুলি , শাহাদাত এসব আজ নতুন নয়। আমরা সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলেই যাব। এই গুলি, হাতকড়া, কারাগার আমাদের থামাতে পারবে না।

(সেই সম্মেলনের ভিডিও লিংক-

https://www.youtube.com/watch?v=byrBCIOF৩kc

৫২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাবে)

২.

বক্তৃতার মঞ্চে আকাশ কাঁপানো শ্লোগান দেয়া সহজ, কিন্তু গুলির মুখে দৃঢ়তা দেখানো কঠিন। ফয়সালাবাদের অনুষ্ঠানে এই আলেম দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি এর আগেও বহুবার গুলির মুখোমুখি হয়েছেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আফগান রনাংগনে লড়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। তিনি

শুনেছিলেন ক্লাশিনকভের শব্দ, মাথার উপর গর্জাচ্ছিল বোমারু বিমান, নিচে পাথুরে ভূমি দিয়ে এগিয়ে আসছিল সোভিয়েতদের ট্যাংকবহর, আর তখন, জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থান করে তিনি রবের সাথে কৃত ওয়াদা আবার সত্যায়ন করে নিচ্ছিলেন। প্রচন্ড মার খেয়ে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু খোস্ত তখনো মুজাহিদদের হাতে আসেনি। খোস্ত বিজিত হয়েছিল ১৯৯১ এর শুরুর দিকে। ১৯৯০ এর মাঝামাঝি থেকে তিনি লড়ছিলেন খোস্ত রনাংগনে। এখানেও তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন।

৩.

৩ মে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। কওমি এসেম্বলি, পাকিস্তান।

আমাদের সেই সাহসি আলেম এসেছেন সংসদে। সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিবেন তিনি। স্পিকার শপথ করাবেন। আলেমের সামনেও শপথের কাগজ দেয়া হয়েছে। আলেম পুরো শপথ একবার পড়লেন। এক অংশে লেখা আছে, আমি পাকিস্তানের আইন-কানুন মেনে চলবো। তিনি পকেট থেকে কলম বের করে এই অংশ কেটে দিলেন। পাশে লিখলেন, পাকিস্তানের যেসকল আইন কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, আমি তা মেনে চলবো। এরপর সাক্ষর করলেন। শপথ শুরু হলো। স্পিকার শপথ করাচ্ছেন। স্পিকার শপথের এই অংশে এসে বললেন, আমি পাকিস্তানের আইন-কানুন মেনে চলবো। আলেম বললেন, পাকিস্তানের যেসকল আইন কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, আমি তা মেনে চলবো। স্পিকার চমকে গেলেন। সংসদের ইতিহাসে কখনো কেউ শপথবাক্যে পরিবর্তন করেনি। আলেমের দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু আলেমের চেহারার দৃঢ়তার সামনে টিকতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিলেন। শপথ পড়ানো শেষ করলেন। এদিকে সংসদ সদস্যরা অর্ডার অর্ডার বলে হট্টগোল শুরু করে। সবার এক কথা, আলেম তাঁর শপথে পরিবর্তন এনেছেন। তাই শপথ হয়নি। আবার পড়াতে হবে। আলেম দাঁড়িয়ে গেলেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমাকে যদি একশো বারও শপথ পড়ানো হয় আমি এই কথাই বলবো। আলেমের ভরাট কণ্ঠে গমগম করে উঠলো পুরো সংসদ। স্পিকার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, শপথ আর নেয়ার দরকার নেই। শপথ হয়ে গেছে।

(এই শপথপাঠের অডিও শুনতে –
https://www.youtube.com/watch?v=JZPCmvjGLbY)

৪.

এই আলেমের নাম মাওলানা আজম তারিক। ১০ জুলাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে তাঁর জন্ম। পড়াশোনা করেছেন জামিয়া উলুমিল ইসলামি বিন্নুরি টাউনে।

এখানে তাঁর সহপাঠি ছিলেন শায়খ মাসউদ আজহার। পড়াশোনা শেষে তিনি মাওলানা হক নেওয়াজ জংগভির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে হক নেওয়াজ জংগভি, জিয়াউর রহমান ফারুকি, ইসারুল কাসেমি প্রমুখ সিপাহে সাহাবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শিয়াদের পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনিনদের চরিত্রের উপর যে মিথ্যা অপবাদ লেপন করা হয় তার জবাব দেয়া। মাওলানা আজম তারিক শুরু থেকেই এই জামাতের সাথে ছিলেন। অন্যান্য আলেমদের সাথে তিনিও সারাদেশ সফর করতে থাকেন। একের পর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উন্মোচিত করা হয় শিয়াদের ষড়যন্ত্রের নানারুপ। এ সময় সিপাহে সাহাবার সদস্যরা শিয়াদের আক্রমন ও হামলার শিকার হতে থাকে। বহিরাগত শক্তির চাপে প্রশাসনও সিপাহে সাহাবার উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজের বাসভবনে আততায়ীর হামলায় নিহত হন হক নেওয়াজ জংগভি। (আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন)। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয় ইসারুল কাসেমিকে। মাওলানা আজম তারিকের উপর একাধিকবার হামলা হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর সেশন কোর্টে তাঁর উপর হামলা হয়। তিনি আহত হলেও বেঁচে যান। করাচিতে হামলা করা হলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠেন। আবার সারাদেশে সফর শুরু করেন। তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংসদে তিনি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তেজদীপ্ত ভাষণ দিতেন। এ সময় তাঁর কণ্ঠ চড়ে যেত। একবার সংসদে একজন সংসদ সদস্য উঁচু গলায় বক্তব্য রাখলে স্পিকার তাকে বলেন, এত জোরে কথা বলছেন কেন? আপনি তো আজম তারিক নন।
মাওলানা আজম তারিক তাঁর সারাজীবন ব্যয় করেছেন সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা প্রচারের কাজে। সামনে হাজারও বাঁধা এসেছে কিন্তু তিনি পিছু হটেননি। তাকে একাধিকবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি গ্রেফতার হলেই তাঁর জন্য পেরেশান হয়ে উঠতেন সবাই। তিনি ছিলেন দেওবন্দি ঘরানার আলেম। কিন্তু কারাগারে তাকে দেখতে ছুটে যেতেন জামাতে ইসলামি ও আহলে হাদিস ঘরানার আলেমরাও। তাকে দেখার জন্য কারাগারে ছুটে গিয়েছিলেন ডক্টর আল্লামা খালেদ মাহমুদের মত বরেণ্য ব্যক্তিত্বরাও। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থাতেই ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কারাগার থেকে ইমারতের প্রতি আনুগত্যের চিঠি লিখেন।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহে সাহাবার তৎকালীন আমির জিয়াউর রহমান ফারুকি আততায়ির হামলায় নিহত হলে দলের দায়িত্ব নেন মাওলানা আজম তারিক। এরপর তাকে হত্যার জন্য একাধিকবার হামলা চালানো হয়। এমনকি এ সময়ে

ইরানি গোয়েন্দাসংস্থার একটি হামলার পরিকল্পনার কথাও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছুতেই ভয় পেতেন না।

৫.

৫ অক্টোবর, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

রাত একটা। পীর আজিজুর রহমান হাজারবি ফোন করলেন মাওলানা আজম তারিককে। মাওলানা আজম তারিক অবাক হলেন।

'হজরত , এত রাতে আপনি? জরুরি কোনো বিষয়?'

'মাত্র একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল তোমাকে জানানো দরকার। আমি একটু আগে স্বপ্নে দেখলাম ইসলামাবাদের রাস্তায় আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান আপনি এখানে কেনো? আম্মাজান বললেন, আমি আমার সন্তান আজম তারিককে নিতে এসেছি। এরপর আমার ঘুম ভেংগে যায়'

একথা শুনে মাওলানা আজম তারিক কাঁদতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে বলেন, হজরত আপনি তো এ স্বপ্ন আজ দেখেছেন। আমি গত আট রাত ধরে প্রতিরাতেই আম্মাজানকে স্বপ্নে দেখছি।

৬.

৬ অক্টোবর ২০০৩। কাশ্মির হাইওয়ে, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। বিকাল ৪ টা ২৫ মিনিট।

মাওলানা আজম তারিক জং থেকে ফিরছিলেন। গাড়িতে তাঁর সাথে আরো চারজন সফরসঙ্গী ছিলেন। শহরের প্রবেশের সময় থেকেই একটি সাদা পাজারো তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করছিল। শহরের টোল প্লাজা অতিক্রম করতেই পাজারোটি মাওলানা আজম তারিকের গাড়ির পাশে চলে আসে। একে ফোরটি সেভেন থেকে একের পর এক গুলি চলতে থাকে মাওলানার গাড়ির উদ্দেশ্যে। ড্রাইভার আহত হন।

মাওলানার গাড়ি থেমে যায়। পাজারো থেকে তিনজন অস্ত্রধারী নেমে আসে। তারা ৩/৪ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে মাওলানার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। মাত্র ২/৩ মিনিটেই প্রায় দুইশো রাউন্ড গুলি করা হয়। এরপর দ্রুত গাড়িতে উঠে পালিয়ে যায়। মাওলানা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মাওলানা আজম তারিকের শরির ঝাঁঝরা হয়ে যায় বুলেটের আঘাতে। ময়নাতদন্তে দেখা যায় তাঁর শরিরে ৪৩ টি বুলেট লেগেছিল।

৭.

সিপাহে সাহাবার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের হত্যাকান্ডের মতই এই হত্যাকান্ডেরও কোনো বিচার হয়নি। তবে সিপাহে সাহাবার নেতৃবৃন্দের দাবী এই হামলায় সরাসরি ইরান জড়িত ছিল।

এই হত্যাকান্ডের চার্জশিটে এসেছে শিয়া নেতা সাজিদ আলি নকবির নাম। শুধু এই হত্যাকান্ড নয়, অন্তত বিশটি হত্যাকান্ডের মামলায় তাঁর নাম আছে। তবু কোনো একশন নেয়া হচ্ছে না তাঁর বিরুদ্ধে। এদিকে ঐক্যের আহবানে তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছেন জমিয়ত নেতা ফজলুর রহমান।

দিনশেষে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ক্ষমতাই হয়ে উঠে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা তৈরির মাপকাঠি।

মুজাফফর শাহ হালিম

৯২৩ হিজরী।

মালোয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন মন্ত্রী মন্দলি রায়। প্রাণভয়ে ভীত সুলতান মাহমুদ শাহ রাতের আধারে পালিয়েছেন নিজের রাজ্য থেকে। ক্ষমতার চাবি পেয়ে মন্দলি রায় হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য। রাজ্য থেকে ইসলামী নিদর্শনগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। পৌত্তলিক প্রথার প্রচার করা হয় ব্যাপকভাবে। নিজের রাজ্য ও জনগণ নিয়ে চিন্তিত মাহমুদ শাহ ভাবলেন, এর বিহিত করা দরকার। কিন্তু কে তাকে সাহায্য করবে? কার কাছে যাবেন? ভাবতে ভাবতে আশার আলো দেখলেন তিনি। একটাই সমাধান চোখে পড়লো তার। গুজরাট যাওয়া যায়। সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের সাথে দেখা করে তাকে সব জানাতে হবে। তিনি নিশ্চয় বসে থাকবেন না। কিছু একটা পদক্ষেপ নিবেনই।

মাহমুদ শাহ গুজরাটে পৌছলেন। দেখা করলেন সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের সাথে। মালোয়ার বৃত্তান্ত শুনে ব্যথিত হলেন সুলতান। দ্রুত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে রওনা হলেন মালোয়ার দিকে।

সুলতানের বাহিনী ঝড়ের গতিতে মান্ডো পৌছে। সুলতান এখানের কেল্লা অবরোধ করেন। টানা কয়েকদিন থেমে থেমে যুদ্ধ চলছিল। আচমকা কেল্লার ফটক খুলে যেত। কয়েকজন অশ্বারোহী বের হয়ে সুলতানের বাহিনীতে হামলা চালিয়ে দ্রুত আবার কেল্লায় ফিরে যেত। এসব হামলায় দুপক্ষেই হতাহত হতো। মন্দলি রায় ভেবে দেখলো সুলতানের বাহিনীর সাথে লড়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে রানা সংঘের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখে। রানা সংঘ সুলতানের মুকাবিলা করার জন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হয়। সুলতান মুজাফফর শাহ এ সংবাদ শুনে আদিল খান ফারুকি, ফাতাহ খান ও কওয়াম খানকে রানা সংঘের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। রানা সংঘ সারেঙ্গপুরের কাছাকাছি এসে সুলতানের বাহিনীর কথা জানতে পেরে আর সামনে এগুনোর সাহস করেনি। সে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

কয়েকদিন যুদ্ধের পর সুলতান দুর্গ জয় করেন। সুলতানের বাহিনী কেল্লার ভেতর প্রবেশ করে। সুলতান আমীরদের সাথে নিয়ে কেল্লার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। এসময় তারা মালোয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ধনভান্ডার সম্পর্কে অবগিত হন। আমিরদের একজন জানতে চাইলো, সুলতান, এখন এ রাজ্য নিয়ে কী করবেন? সুলতান জবাব দিলেন, মাহমুদ শাহকে ফেরত দিব।

আমিরদের কেউ কেউ সাহস করে বলে ফেলে, এ যুদ্ধে আমাদের প্রায় দুহাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছে। আপনার উচিত এ রাজ্য নিজের করে নেয়া। মাহমুদ শাহকে ফিরিয়ে দেয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। একথা শুনে সুলতান দূর্গ পরিদর্শন বন্ধ করে কেল্লার বাইরে চলে আসেন। তিনি মাহমুদ শাহকে বলেন, আমার সাথীদের কাউকে আর কেল্লার ভেতর প্রবেশ করতে দিবেন না। মাহমুদ শাহ সুলতানকে কয়েকদিন কেল্লায় অবস্থান করার আমন্ত্রন জানান কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

অনেকদিন পর সুলতান তার এক প্রিয়জনকে বলেছিলেন, আমি এই জিহাদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম। কিন্তু আমিরদের বক্তব্য শুনে মনে হলো শীঘ্রই হয়তো আমার নিয়ত বদলে যাবে, ইখলাস নষ্ট হবে। আমি সুলতান মাহমুদের কোনো উপকার করিনি, তিনিই আমার উপকার করেছেন। তার কারনে আমি জিহাদে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

এই হলেন গুজরাটের সুলতান মুজাফফর শাহ হালিম। তিনি শুধু নিছক একজন শাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফকিহ ও মুহাদ্দিস। সুলতান মুজাফফর শাহ হালিমের জন্ম ৮৭৫ হিজরীতে, গুজরাটে। তিনি মাজদুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ এলায়জির কাছে পড়াশোনা করেন। হাদিস পড়েন শায়খ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন উমরের কাছে। বাল্যকাল থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ৯১৭ হিজরীতে তিনি গুজরাটের সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলতান অনেক গুনের অধিকারী ছিলেন। তার হাতের লেখা ছিল সুন্দর। সাধারণত তিনি খত্তে নসখ ও খত্তে সুলুসে লিখতেন। তিনি নিজ হাতে কোরআনুল কারিমের অনুলিপি তৈরী করে মদীনায় প্রেরণ করেন। আলেমদের সম্মান করতেন। সবসময় অজু অবস্থায় থাকতেন। জামাতে নামাজ পড়তেন। কখনো মদ স্পর্শ করেননি। যৌবনের শুরুতেই কুরআন হিফজ করেছিলেন।

মুজাফফর শাহ হালিম ইন্তেকাল করলেন ৯৩২ হিজরীর জমাদিউস সানিতে। দিনটি ছিল শুক্রবার। কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার সকালে গোসল করলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়ে মহলে এলেন। স্ত্রীর সাথে সামান্য কথা বলে দরবার ডাকলেন। সবাই উপস্থিত হলে বললেন, আল্লাহর শোকর, আমি কুরআন হিফজের পাশাপাশি প্রতিটি আয়াতের তাফসির, শানে নুযুল ও মর্মকথা আয়ত্ত করি। উস্তাদ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন উমরের কাছ থেকে যেসব হাদিসের সনদ নিয়েছি তার সনদ, মতন এবং রাবীদের জীবনি এখনো আমার স্মরণে আছে। আল্লাহর শোকর তিনি আমাকে ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানদান করেছেন , যার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যান কামনা করেন তাকে ফিকহের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী)

আমি আল্লামা বাগাভীর তাফসিরগ্রন্থ মাআলিমুত তানযিল একবার পড়েছি। আবার পড়া শুরু করে অর্ধেকে পৌছেছি। আশা করছি জান্নাতে গিয়ে বাকিটা শেষ করবো। ধীরে ধীরে তার মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ইতিমধ্যে জুমার আযান হয়। তিনি বলেন, আজ আযান অনেক আগে দিচ্ছে মনে হয়। আসাদুল মুলক এসময় সুলতানের পাশে ছিলেন । তিনি বললেন, আজ শুক্রবার জুমার আযান দিচ্ছে। একথা শুনে সুলতান জোহরের নামাজ পড়ে নেন। সবাইকে মসজিদে যাওয়ার আদেশ দেন। বলেন জোহর পড়েছি, আল্লাহ চাহে তো আসর জান্নাতে গিয়ে আদায় করবো।

এরপর শুয়ে তিনি সুরা ইউসুফের এই আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন,

হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলি ও জমিনের স্রস্টা, আপনিই ইহকালে ও পরকালে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। *(সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০১)*

তিনি কয়েকবার এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর কালিমা পড়েন। তার দেহ স্থির হয়ে যায়। শাহী মসজিদে তখন খতিব সাহেব খুতবা দিচ্ছিলেন।

(নুজহাতুল খাওয়াতির, ৪৩২-৪৩৫ পৃষ্ঠা– আল্লামা আবদুল হাই হাসানি নদভী। দার ইবনে হাজম)

বাংলায় মগ জলদস্যু

ওরা এলো শেষরাতে। মেঘনা তীরের গ্রামটি তখন নীরব, নির্জন। নিশ্চিন্ত গ্রামবাসী ছিল ঘুমে বিভোর। মাঝে মাঝে দুয়েকটা বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছিল। দুঃস্বপ্ন দেখে কান্না করছিল ওরা। নদীতীরে থামলো ছোট একটি জাহাজ। চাঁদের আলোতে দেখা গেল জাহাজের পাটাতন বেয়ে মাটিতে নামছে বেশ কজন লোক। সবার হাতেই দেশীয় অস্ত্র। নিজেদের মধ্যে অচেনা ভাষায় কথা বলছে। দ্রুত গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল তারা। একটু পর গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল আতংকিত মানুষের চিৎকার ও কান্না। আরো কিছুক্ষণ পর আকাশে দেখা গেল লেলিহান শিখা। পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। ভোরের দিকে দলটা ফিরে এল। তাদের সাথে নিয়ে এসেছে প্রচুর জিনিসপত্র। গ্রামবাসীদেরকেও নিয়ে এসেছে বন্দী করে। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষ সবার হাতের তালু ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে পাতলা বেত। এই বেত বেঁধে দেয়া হয়েছে অপর বন্দীর হাতে ঢুকানো বেতের সাথে। হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। চোখে জমেছে অশ্রু। সবাইকে জাহাজে ওঠানো হলো। পাটাতনের নিচে ঢুকিয়ে ফেলা হলো সবাইকে। আগামী দুদিন তারা আর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখবে না। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাদের এক মুঠো করে চাল দেয়া হবে। তা খেয়ে যদি বাঁচতে পারে, বেঁচে থাকবে। মরে গেলেও কোনো আপত্তি নাই। দুদিন পর সন্দ্বীপ পৌঁছবে এই জাহাজ। যারা জীবিত থাকবে তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যারা মারা যাবে তাদের লাশ ফেলে দেয়া হবে সমুদ্রে। সূর্য মাথার উপর উঠতেই জাহাজটি পাল তুলে রওনা হলো সন্দ্বীপের দিকে। পেছনে রেখে গেলে মৃত্যুর চিহ্ন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলায় এটি ছিল বেশ পরিচিত দৃশ্য। চট্টগ্রাম থেকে ফরিদপুর, সুন্দরবন থেকে যশোর, কোনো এলাকাই তখন নিরাপদ ছিল না। এসব এলাকার গ্রামে গ্রামে নিয়মিত হামলা করছিল জলদস্যুরা। জলদস্যুতার সূচনা করে মগরা, পরে তাদের সাথে এসে যুক্ত হয় পর্তুগিজরা। এই পর্তুগিজদের বড় অংশই ছিল দাগি অপরাধী। যাদেরকে তাদের নানা অপরাধের কারণে গোয়া এবং হুগলি থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল। শুধু অপরাধীরাই নয় বরং পাদ্রীরাও জড়িত ছিল এসব দস্যুতার সাথে। ফ্রেই ভিসেন্তে নামক একজন পাদ্রী ছিলেন দস্যুদলের নেতা।

যামিনীমোহন ঘোষ মগদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—মগরা মূলত আরাকানের বাসিন্দা, যারা চট্টগ্রামের কাছাকাছি বসবাস করে।[১৭৫] ড. আহমদ শরিফও এই মত দিয়েছেন। আরাকানের এই বাসিন্দারা যখন পর্তুগিজদের সাথে হাত মিলিয়ে দস্যুতা শুরু করে তখন থেকেই তারা মগ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

পর্তুগিজ জলদস্যুরা সন্দ্বীপ দখল করে জলদস্যুতা শুরু করে। তাদের সাথে জোট বাঁধে আরাকানি মগরা। এই দুয়ে মিলে গড়ে ওঠে এক নৃশংস জলদস্যু বাহিনী। যদিও তাদের মধ্যে নানা কোন্দল ছিল, এবং শেষদিকে পর্তুগিজরা মগদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু টানা কয়েক দশক ধরে এই সম্মিলিত বাহিনী বাংলার মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। পর্তুগিজ বংশোদ্ভুত এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, সপ্তদশ শতকে পূর্ববংগে পর্তুগিজদের কর্মকাণ্ডের যতই নিন্দা করা হোক না কেন তা যেন তাদের অত্যাচার বর্ণনা করার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। সে সময় তারা শয়তানের রাজত্ব কায়েম করেছিল।[১৭৬]

বাংলায় মোগল শাসনের সূচনার দিকে, যখন বারো ভূঁইয়ারা দুর্বল ছিল এবং মোগলরাও নিজেদের ক্ষমতা শক্ত করতে পারেনি, সে সময় মগ জলদস্যুরা বেপরোয়া হয়ে উওঠে। মোগল আমলেই মগরা ঢাকায় তিনবার আক্রমণ করে। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে আরাকান রাজা ও পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেসের সম্মিলিত বাহিনী ভুলুয়া আক্রমণ করে। ভুলুয়ার মোগল থানাদার আব্দুল ওয়াহিদ তাদের প্রতিহত করতে না পেরে পিছু হটেন। জলদস্যুদের বাহিনী ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। তারা ডাকাতিয়া নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পরে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে তারা পিছু হটে।

১৬২০ খ্রিস্টাব্দে মগরা ঢাকা শহরে ব্যাপক হামলা চালায়। সে সময় সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজং বীরত্বের সাথে তাদের প্রতিহত করেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মগরা ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের শাহবাজপুরে হামলা করে। ইবরাহিম খান দ্রুত তার নৌবহর নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। মগরা পালিয়ে যশোরের দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে প্রায় ১৫০০ নারী-পুরুষকে বন্দী করে। ১৬২১-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মগ-ফিরিংগিদের হাতে প্রায় ৪২০০০ মানুষ বন্দী হয়। পর্তুগিজরা এদের মধ্যে ২৮ হাজার জনকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে।

---

[১৭৫] Magh Raiders In Bengal, p-১৭ – jamini mohan ghosh. Bookland private limited, allahabad

[১৭৬] হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেংগল, পৃ. ১৪৮- জোয়াকিম জোসেফ এ ক্যাম্পোস। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

বাকিদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। ১৬২৫ সালে মগরাজ শ্রীসুধর্ম ঢাকায় আক্রমণ করলে ঢাকার মোগল সুবাদার খানজাদ খান আতংকে ঢাকা ছেড়ে রাজমহলে পালিয়ে যান। মগরা বিজয়ীর বেশে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। তিনদিন ধরে তারা শহরে চালায় নির্মম লুণ্ঠন ও হত্যা। সুবাদারের প্রাসাদ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। ফেরার সময় মগদের সঙ্গী হয় অসংখ্য যুদ্ধবন্দী ও বিপুল ধন-সম্পদ।

মগদের আক্রমণে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের লিখেছেন, মগ জলদস্যুদের আক্রমণে সমুদ্র উপকূলীয় অনেক দ্বীপ এখন জনশূন্য। এখন এই সব দ্বীপ দেখলে মনেই হয় না এককালে এখানে লোকালয় ছিল। ধূ ধূ করছে জনমানবশূন্য এসব গ্রাম। [১৭৭]

মগ দস্যুদের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম মানবশূন্য হয়ে পড়ে। রাতের বেলা নদীর দুই তীরে থাকত ঘন অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর মতো কেউ ছিল না। মগদের হামলা থেকে বেঁচে গেলেও নিস্তার ছিল না। হিন্দু সমাজে তাকে অস্পৃহ ঘোষণা করা হত। বিশেষ করে মগদের হাত থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু মহিলাদের সমাজ গ্রহণ করতো না। তাদেরকে মগ-পরিবাদ বলে ডাকা হত।

মগরা হামলা করতো নদীপথে। যেখানে নদী নেই সেখানে তারা হামলা করতো না। তবে বর্ষাকালে বাংলার ফসলের মাঠ আর নদী সব পানিতে ভেসে যেত ফলে তখন তারা আরো ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পেত। বিশেষ করে বিয়ে বা অন্য উৎসবের দিনে তারা হানা দিত। নগদ অর্থের হাতছানি, সাথে অনেককে বন্দী করার সুযোগ। এসব বন্দীকে তারা নিজেদের এলাকায় চাষের কাজে লাগাতো কিংবা অন্যদের কাছে বিক্রি করে দিত। যাত্রাপথে বন্দীদের খাবার দেয়া হত না। শুধু সকাল আর সন্ধ্যায় এক মুঠো চাল দেয়া হত। ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন তালিশ মগ দস্যুদের এসকল নির্যাতনের মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন।

জলদস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন মহাকবি আলাওল। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান যাত্রাকালে মগদের হামলায় তার পিতা নিহত হন। তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নিজের কবিতায় এই অভিজ্ঞতা এভাবে ব্যক্ত করেছেন– কার্য্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন,হার্মাদের নৌকা সংগে হৈল দর্শন।[১৭৮]

---

[১৭৭] মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে, পৃ. ২১৫ – এনায়েত রসুল। স্বরবৃত্ত প্রকাশন, ঢাকা

[১৭৮] বঙ্গে মগ ফিরিঙ্গি ও বর্গির অত্যাচার, পৃ. ২১- মুহাম্মদ আবদুল জলিল। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার মীর জুমলা ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এই দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করা। এই দুর্গের তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই রয়েছে চারটি নদী। ইছামতি, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, মেঘনা। এই নদী পথে মগরা নিয়মিত হামলা চালাত।

মগদের দমন করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন শায়েস্তা খান। ১৬৬৪ সালে ক্ষমতায় এসেই তিনি মগদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।
সে সময় চট্টগ্রামে ছিল মগদের মূল ঘাটি। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে চট্টগ্রাম মুসলিম শাসকদের অধীনে আসে। পরে আফগান-মোগল দ্বন্দ্বের সময় আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম দখল করে নেন। সেই থেকে এটি ছিল মগদের শক্তিশালী কেন্দ্র। তাদের হাতে ছিল প্রচুর জলবা। এগুলো ছিল দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজ। শায়েস্তা খান জানতেন মগদের সাথে ফিরিংগিদের সম্পর্কের কথা। তাই তিনি প্রথমে কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ফিরিংগিদের সরিয়ে নিলেন। এমনকি ফিরিংগিদের একাংশকে নিজের বাহিনীতেও সম্পৃক্ত করে নিলেন। মগরা একা হয়ে গেল। তবে তাদের সাহায্যে ছিল আরাকানরাজ। তার স্বার্থ ছিল এখানে। কারণ মগরা বাংলা থেকে যে সম্পদ লুট করতো তার একটা ভাগ তাকেও দেয়া হত।
চট্টগ্রাম জয়ের জন্য শায়েস্তা খানকে সন্দ্বীপ দখল করতে হবে। এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। ১২ নভেম্বর ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের বাহিনী সন্দ্বীপ দখল করে। এরপর ঢাকা, নোয়াখালী ও ফেনী থেকে তিনটি মোগল সেনাদল এগিয়ে যায় চট্টগ্রামের দিকে। শায়েস্তা খান এই অভিযানকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে সারাদিন বাহিনীর তদারকি করতেন। ফেনী নদী দিয়ে মোগল বাহিনী রওনা হয়। ঘন জংগল কেটে সাফ করা হয় বাহিনীর চলার সুবিধার্থে। ২৩ জানুয়ারী, ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে সীতাকুণ্ডের কুমিরার কাছে মগদের সাথে মোগল বাহিনীর সরাসরি সংঘর্ষ হয়। মগদের প্রায় ৫৫টি যুদ্ধজাহাজ ছিল। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রে। তীব্র বাতাসে যুদ্ধজাহাজগুলো কাত হয়ে যাচ্ছিল, এর মধ্যেই একে অপরের প্রতি গোলাবর্ষণ করছিল। সারাদিন তীব্র লড়াইয়ের পর পরদিন তারা পিছু হটে কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করে। তাদের সহায়তায় নতুন বাহিনী এগিয়ে আসে। মগদের ধাওয়া করে মোগল বাহিনী। তীব্র লড়াইয়ের পর মগরা এখানে পরাজিত হয়। তাদের প্রচুর সেনা নিহত হয়, অনেকে বন্দী হয়। তাদের ১৩৫টি যুদ্ধজাহাজ মোগলদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধের পর মগরা পালাতে থাকে। তাদের কয়েকটি দুর্গ মোগলদের হাতে আসে। বাঁশ ও কাঠনির্মিত এসব দুর্গে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এ সময় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকটি হাতি মোগলদের

হাতে আসে। অসংখ্য অপহৃত কৃষককে এসব কেল্লা থেকে উদ্ধার করা হয়। জীবিত মগরা পালাতে থাকে। এসময় মুসলমান কৃষকদল, যারা মগদের হাতে বন্দী ছিল, তারা নির্বিচারে মগদের হত্যা করতে থাকে। এক মগ নেতার দুই হাত কেটে মোগল সেনাপতির সামনে নিয়ে আসা হয়।

২৭ জানুয়ারী উম্মেদ খান সাধারণ ঘোষণা দ্বারা জানমালের নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। মগদের ধাওয়া করার জন্য মীর মুর্তজার অধীনে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনী মগদের ধাওয়া করে কক্সবাজারের রামুতে পৌঁছে যায়। এই এলাকা ছিল আরাকান রাজার ভাই রাউলির অধীনে। তার কাছে থেকে এই এলাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়। বহু মুসলমানকে এখানে বন্দী করা হয়েছিল। তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে চট্টগ্রাম দখল পর্যন্ত পুরো অভিযানে সময় লেগেছিল এক মাস দুই দিন। এই যুদ্ধের পর মগরা আর কখনোই তাদের হারানো শক্তি ফিরে পায়নি। ২৯ জানুয়ারী ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের কাছে বিজয়ের সংবাদ পৌঁছে। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। গরিবদের মাঝে দুহাতে দান-সদকা করেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের উত্তম পোষাক ও হাতি-ঘোড়া উপহার দেন।[১৭৯]

শায়েস্তা খানের এই অভিযানের পর মগরা আর কখনোই তাদের হারানো শক্তি ফিরে পায়নি। চট্টগ্রামের উপরও তাদের নিরংকুশ আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। তবে এর পরেও দুয়েকবার তারা হামলা করেছিল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তারা সমুদ্র উপকূল এলাকায় হামলা করে প্রায় ১৮০০ মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ১৭৭৮ খ্রিসাব্দে নোয়াখালীর ভুলুয়াতে লবনচষীরা মগদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হন।

মগ দস্যুরা অতীতের অংশ হয়ে গেছে। তবে রয়ে গেছে তাদের নির্যাতনের দুঃসহ স্মৃতি। সমুদ্র উপকূলের জনপদগুলোতে কান পাতলে শোনা যায় নির্যাতিতদের আর্তনাদ। এখনো সুন্দরবনের ভেতর বয়ে চলা বাতাসে শোনা যায় মগদের পালটানা জাহাজের খসখসে শব্দ।

---

[১৭৯] মুঘল আমলে বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস, পৃ. ১৩৫-১৪২- ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলী। মেধা বিকাশ প্রকাশন, ঢাকা

বাবাক খুররামি : নৃশংস এক অপরাধীর উপাখ্যান

সামাররা[১৮০], ইরাক। ২২৩ হিজরি। ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ। খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ তাকিয়ে আছেন বন্দির দিকে। বন্দির হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মধ্যবয়সী লোকটির চেহারায় এখনো ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। বন্দি সুঠামদেহী, সুদর্শন। খলিফা একটু আনমনা হয়ে গেলেন। প্রায় ২০ বছর ধরে চলা লড়াইয়ের শেষ হতে চলেছে। খলিফা মামুন যা সমাপ্ত করতে পারেননি, অবশেষে এখন তা সমাপ্তির মুখ দেখবে।

'তার হাত পা কেটে দেও' গম্ভীর স্বরে বললেন খলিফা। জল্লাদ নুদ আদেশের অপেক্ষায় ছিল। সে এগিয়ে এসে বন্দির হাত কেটে ফেললো। বন্দি দ্রুত হাতের অক্ষত অংশ চেহারায় ডলতে লাগলো। পুরো চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

'এমন করছো কেন?' জল্লাদ জিজ্ঞেস করলো।

'আমি চাই না আমার চেহারা ফ্যাকাসে হোক আর তোমরা তা দেখে ফেলো' বন্দি শান্তকণ্ঠে বললো।

জল্লাদ এবার বন্দির দুই পা কেটে ফেললো। বন্দি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। পুরো শরির থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তার মুখ থেকে সামান্য আহ শব্দও বের হল না। জল্লাদ এবার তার মাথা কেটে ফেললো।

'তার মাথা খোরাসানে পাঠিয়ে দাও। সেখানকার লোকজনকে দেখাও। আর শরির সামাররার সেনা শিবিরের পাশে লটকে রাখো' আদেশ দিলেন খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ।

নিহত এই ব্যক্তি সাধারণ কোনো অপরাধী ছিল না। সে ছিল ইতিহাসের ভয়ংকর এক অপরাধী। টানা ২০ বছর সে আব্বাসী খিলাফাহর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাবারীর বর্ননামতে, এ সময়ে তার হাতে নিহত মানুষের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৫ হাজার। তার সাথে লড়াই করতে গিয়ে খলিফা মামুন হারিয়েছিলেন আহমাদ বিন জুনাইদ ও মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসির মত বিখ্যাত সেনাপতিদের।

---

[১৮০] এটি বাগদাদ থেকে ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি শহর। ২২১ হিজরিতে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ এই শহর নির্মাণ করেন। তখন এর নাম ছিল সুররা মান রআ। মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে এখানে নিয়ে আসেন।

একের পর এক পরাস্ত হয়েছিলেন আব্বাসি খিলাফাহর বিখ্যাত সেনাপতি ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ, মুহাম্মদ বিন আবি খালেদ, ইবরাহিম বিন লাইস প্রমুখ। তবু তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২২২ হিজরিতে হায়দার বিন কাউস আল আফশিনের নেতৃত্বে তাকে পরাস্ত ও গ্রেফতার করে খলিফার দরবারে নিয়ে আসা হয়।[১৮১] ইতিহাসের কুখ্যাত এই খুনির নাম বাবাক খুররামি।

—

বাবাক খুররামির পিতা আবদুল্লাহ ছিল মাদায়েনের একজন তেলবিক্রেতা। পরে সে আজারবাইজান চলে আসে। এখানে এক মেয়ের সাথে তার প্রেম হয়। পরে তারা বিবাহ করে নেয়। এখানেই ১৮২ হিজরিতে বাবাক খুররামির জন্ম। বাবাকের জন্মের কিছুদিন পর তার বাবা নিহত হয়। বাবাক কিছুদিন তাবরিয ও অন্যান্য শহরে আমিরদের গৃহে কাজ করে। কিছুদিন পর সে আজারবাইজানের একটি অঞ্চলের শাসক জাভেদানের গৃহে সে কর্মচারী হয়।

জাভেদান ছিল খুররামিয়্যাহ[১৮২] ফিরকার একজন গুরু। তারা বিশ্বাস করতো পৃথিবীতে দুজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। একজন ভালো বিষয়ের দেখভাল করেন। অন্যজন মন্দের। এরা সকল নারীকে নিজের জন্য বৈধ মনে করতো। জাভেদান বাবাককে তার একান্ত শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলে। বাবাক অগ্নিপূজকদের ধর্মে দীক্ষিত হয়। গুজব আছে, জাভেদানের স্ত্রীর সাথে বাবাকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং দুজন মিলে জাভেদানকে বিষপানে হত্যা করে। বাস্তবতা যাই হোক, জাভেদানের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বাবাকের নিয়ন্ত্রনে বিশাল এলাকা ও জনবল চলে আসে। জাভেদানের স্ত্রীকে সে বিয়ে করে।

২০১ হিজরিতে সে আজারবাইজানের বাদিন পাহাড়ে নিজের ঘাটি মজবুত করে। এরপর সে আশপাশের বিভিন্ন দুর্গ দখল করতে থাকে। একই সময়ে মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। সে আব্বাসি খিলাফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ২০৪ হিজরিতে খলিফা মামুনুর রশিদ আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসক ঈসা বিন মুহাম্মদকে পাঠান বাবাককে দমন করতে। ঈসার উপর আদেশ ছিল বাবাককে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক বাগদাদে পাঠাতে হবে। ঈসা এই অভিযানে পরাজিত হন। বাধ্য হয়ে ২০৯ হিজরিতে খলিফা মামুন তার বিশ্বস্ত সেনাপতি যারিককে আজারবাইজান প্রেরণ করেন।

---

[১৮১] তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরী), তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, ৯/৫৪ (দারুল মাআরিফ, কায়রো)

[১৮২] অগ্নিপূজক জরথ্রুস্টিয় ধর্মের একটি শাখা। ইসলামের পূর্বযুগ থেকেই ইরানে এই ফিরকার লোকেরা বসবাস করতো।

যারিক তার সঙ্গী আহমাদ বিন জুনাইদকে নিয়ে বাবাকের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। এক যুদ্ধে আহমাদ বিন জুনাইদ বন্দি হন। বাবাক তাকে হত্যা করে। এই সংবাদে খলিফা মামুন ক্রোধান্বিত হন। তিনি যারিককে অপসারণ করে ইবরাহিম বিন লাইসকে পাঠান। কিছুদিন পর তিনি পাঠান মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসিকে। ২১২ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসির তীব্র আক্রমনে বাবাক পিছু হটতে বাধ্য হয়। সে পাহাড়ের আরো ভেতরের দিকে চলে যায়। মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসি তাকে ধাওয়া করে পর্বতমালার ভেতরের দিকে চলে যান। ইতিমধ্যে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা বাবাকের সেনারা তীব্র আক্রমন চালায়। মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসি নিহত হন।
এই সংবাদে খলিফা মামুন ব্যথিত হন। তিনি বাবাকের উপর চূড়ান্ত আক্রমনের পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজত্বের নানা ঝামেলায় ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি অভিযান মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। পরবর্তী ৬ বছর মামুন আর কোনো অভিযান প্রেরণ করতে পারেননি। এই সুযোগে বাবাক নিজের রাজত্ব আরো বড় করে নেয়। ধর্মবিশ্বাসে যদিও সে অগ্নিপূজক ছিল কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে নিজেকে মুসলমানও সাজাতো।

ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদি লিখেছেন, বাবাক ও তার অনুসারীরা পাহাড়ে মসজিদ নির্মাণ করেছিল। সেখানে আযান দেয়া হত। তবে তারা সালাত ও সিয়াম পালন করত না। ঈদের রাতে তারা নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে মদপান করত। তারপর সবাই উন্মুক্ত ব্যাভিচারে লিপ্ত হত। বাবাক ও তার অনুসারীরা নিজেদের ধর্মকে জাহেলি যুগের এক ব্যক্তি শারউইনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল এই ব্যক্তি সকল নবীদের চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী।[১৮৩]
২১৮ হিজরিতে খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর খলিফা হন মুতাসিম বিল্লাহ। তিনি আবার নতুন করে বাবাকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। তিনি নিজের বিশ্বস্ত সেনাপতি হায়দার বিন কাউস আল আফশিনকে বাবাকের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। আফশিন টানা চার বছর বাবাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বাবাকের সুবিধা ছিল সে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ঘাটি করেছিল। বাগদাদ থেকে আসা সেনাদলের জন্য এই অপরিচিত এলাকায় লড়াই করা বেশ কষ্টকর ছিল। তবুও তারা লড়াই অব্যাহত রাখে। ২২২ হিজরির শুরুর দিকে বাবাকের শক্তি হ্রাস পায়। এমনকি মুসলিম বাহিনী তার কেল্লা দখল করে ফেলে। সে অল্পকিছু সহচর সহ আরেমেনিয়ার দিকে পালিয়ে যায়।

---

[১৮৩] বাগদাদি, আবু মানসুর আবদুল কাহের তাহের বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৪৬৯ হিজরি), আল ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ-২৩৭,২৩৮ (মাকতাবাতু ইবনি সিনা, কায়রো)

কিছুদিন সে আত্মগোপন করে থাকে। কিন্তু আফশিনের গোয়েন্দারা তাকে খুঁজে বের করে। তাকে বন্দি করে আফশিনের কাছে নিয়ে আসা হয়। আফশিন খলিফাকে পত্র লিখে বিস্তারিত জানান। খলিফা আফশিনের পত্র পড়ে খুশিতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি আফশিনকে বলেন বাবাককে সামাররা শহরে নিয়ে আসতে। আফশিন বাবাককে নিয়ে আজারবাইজান থেকে রওনা হন। বাবাকের শেষ ইচ্ছা ছিল তাকে নিজের জন্মস্থানে একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে। আফশিন এই শর্ত মেনে তাকে নিয়ে তার গ্রামে যান। সেখানে একদিন অবস্থান করেন। এরপর সামাররার পথ ধরেন।
তিনি শহরের কাছাকাছি আসতেই খলিফার ছেলে ওয়াসিক বিল্লাহ আমিরদের সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হন। আফশিনকে অভিনন্দন জানান। ততদিনে ২২৩ হিজরি শুরু হয়েছে। আফশিন বাবাককে নিয়ে খলিফার দরবারে উপস্থিত হন। খলিফা আফশিনকে ২০ লাখ দিরহাম উপহার দেন। খলিফার আদেশে বাবাককে হাতির পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘুরানো হয়। শহরবাসী বাবাকের উপর ক্ষিপ্ত ছিল। কেউ কেউ তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে। বাবাক শান্তস্বরে বলে, অচিরেই তোমরা আমার সাহস ও দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করবে।

বাবাক নিজের কথায় অটল ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত সে একবারও ভেঙ্গে পড়েনি। ক্ষমাও চায়নি। সে ছিল সত্যিকারের এক দুর্ধর্ষ অপরাধী।[১৮৪]

---

[১৮৪] তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরী), তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, ৯/২০-৫৪ (দারুল মাআরিফ, কায়রো)

হাসান বিন সাব্বাহ : ফিরে দেখা ইতিহাস

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ। মিসরে তখন ফাতেমি সাম্রাজ্য ছড়াচ্ছে শিয়া মতবাদের বিষবাষ্প। নামে ফাতেমি হলেও এটি ছিল মূলত উবাইদিয়্যাহ সাম্রাজ্য। তারা ইসলামকে বিকৃত করছিল। প্রতিনিয়ত তাদের হাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমরা হচ্ছিলেন নির্যাতিত। সে সময় পারস্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় নতুন এক শক্তি। এরাও স্বপ্ন দেখছিল ফাতেমিদের মতো আরেকটি শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বেছে নেয় এক নতুন পথ। এর আগে যে পথ অবলম্বন করেনি আর কেউ। শুরুতে এরা পরিচিত ছিল ইসমাইলিয়্যাহ নামে। তবে পরে নানা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। মুলাহিদা, তালিমিয়্যাহ, বাতেনিয়্যাহ–সবকটি নামে এরা কুখ্যাতি অর্জন করে। ক্রুসেডের সময় শামে এদেরকে বলা হতো হাশিশিয়্যাহ। তবে এরা কুখ্যাতি পেয়েছে বাতেনিয়্যাহ নামেই।

মাত্র কয়েক বছরে এরা পুরো মুসলিম বিশ্বে নিজেদের প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। ইসমাইলি ফিরকার এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নিজেও এক রহস্যমানব। ইতিহাস যাকে চেনে হাসান বিন আলি আস-সাব্বাহ নামে। সংক্ষেপে হাসান বিন সাব্বাহ। আধুনিককালে প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর প্রাণপুরুষ বলা যায় তাকেই। তার আবিষ্কৃত নানা কূটকৌশল আজও অনুসরণ করছে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো।[১৮৫]

হাসান বিন সাব্বাহর জন্ম ৪৩০ হিজরিতে। তুস শহরে। তার পিতা সাব্বাহ ছিলেন একজন রাফেজি ফকিহ। হাসান বিন সাব্বাহর বাল্যকাল কাটে তুস শহরেই। ছিল মেধাবী। ছাত্রজীবনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও জাদুবিদ্যাতেও সে দক্ষতা অর্জন করে। সাধারণত বলা হয় বাল্যকালে হাসান বিন সাব্বাহ নিজামুল মুলক তুসি ও উমর খৈয়ামের সহপাঠী ছিল। তবে আধুনিক গবেষকরা এ বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছেন[১৮৬]। একই সময় হাসান বিন সাব্বাহ আবদুল মালিক বিন আত্তাশের সান্নিধ্যলাভ করে। আবদুল মালিক

---

[১৮৫] আবদুল্লাহ ইনান, তারাজিমু ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা ৩৮, (কায়রো, মাকতাবাতুল খানজি, ১৩৯০ হিজরী)
[১৮৬] The Encyclopaedia Of Islam, ৩/২৫৩,২৫৪, (E J Brill, ১৯৮৬)

বিন আত্তাশ ছিলেন ইসমাইলিদের অন্যতম ধর্মীয় গুরু। সে-সময়ে ইসমাইলিদের মূল কেন্দ্র ছিল মিসরে। ৪৬৭ হিজরিতে হাসান রায় থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে সফর করে। ৪৭১ হিজরিতে মিসরে পৌঁছে। মিসরে ৮ মাস অবস্থান করে। এ সময় সে ফাতেমী খলিফা মুস্তানসিরের সাথেও সাক্ষাত করে। খলিফা মুস্তানসির হাসানকে শাহি প্রাসাদে মেহমান করে রাখেন। তাকে প্রচুর উপহার দেন। মিসরে অবস্থানকালে হাসান ফাতেমিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। খলিফা মুস্তানসির পারস্য ও খোরাসানে ইসমাইলিদের দাওয়াত প্রচার করার জন্য হাসানকে প্রেরণ করে। সে-সময় হাসান খলিফাকে জিজ্ঞেস করে আপনার পর আমরা কাকে অনুসরণ করব? খলিফা বললেন, আমার পুত্র নিজারকে। হাসান পারস্যে এসে তার দাওয়াত প্রচার করতে থাকে। সে সবাইকে নিজারের দিকে আহবান করতে থাকে। সেই থেকে হাসানের অনুসারীরা পরিচিত লাভ করে নিজারিয়া নামে। ৪৭৩ হিজরিতে হাসান ইস্ফাহানে পৌঁছে ইসমাইলি ফিরকার দাওয়াত দিতে থাকে। কিছুদিন পর সে চলে যায় কাজভিনে। এখানে সে আলামুত দুর্গ দখল করে নেয় এবং তার অনুসারীদেরসহ সেখানেই অবস্থান করতে থাকে। এটা ৪৮৩ হিজরির ঘটনা। হাসান নিজেকে দাবি করত খলিফা মুস্তানসিরের নায়েব বলে। একইসাথে সে পরিচিত হয়ে ওঠে শায়খুল জাবাল নামেও। হাসানের সাথে ছিল একটি বালক। সে তার অনুসারীদের বলত সবার জন্য শিক্ষক আবশ্যক। আর তোমাদের শিক্ষক হলো এই বালক। তার আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। সে সন্তুষ্ট হলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। তার আনুগত্য ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই।[১৮৭]

হাসান বিন সাব্বাহর অনুসারীরা নিজেদের ফিরকার প্রচার শুরু করে জোরেশোরে। এই ফিরকার প্রচারকরা নিজেদের ফিরকার প্রচার করতো নানা কৌশলে। প্রথমেই তারা খুঁজে নিত এমন লোকদেরকে, যাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান নেই। তারপর তার সাথে কথা শুরু করতো। এ ক্ষেত্রে তারা কথা শুরু করতো অন্ধকার কক্ষে। যেখানে আলো আছে সেখানে কখনো আলাপ করতো না। আলোচনার শুরুতে তারা নানা প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করে দিত। যেমন বিভিন্ন সুরার শুরুতে থাকা হুরুফে হিজার অর্থ জিজ্ঞেস করতো। বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে শ্রোতারা জবাব দিতে পারতো না। তখন বাতেনিরা কৌশলে নিজেদের মতবাদ ও বিশ্বাস আলোচনা করতো। হাসান বিন সাব্বাহ অল্পদিনেই প্রচুর অনুসারী জুটিয়ে ফেলে। একইসাথে গঠন করে তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ

---

[১৮৭] কাযভিনি, যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (মৃত্যু ৬৮২ হিজরী), আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, পৃ-৩০১-৩০২, (বৈরুত, দার সাদের)

ফেদায়ি বাহিনী। এ সময় আলামুতের আশপাশের কয়েকটি কেল্লাও সে দখল করে। হাসান বিন সাব্বাহর তৎপরতা সম্পর্কে সুলতান মালিক শাহ্ সেলজুকি নিয়মিত সংবাদ পাচ্ছিলেন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি হাসানের সাথে বিতর্ক করার জন্য ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুলাইমানকে আলামুতে পাঠান। তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহর একজন বিশিষ্ট আলেম ও ফকিহ। তিনি হাসান বিন সাব্বাহ'র সাথে কয়েকটি বিতর্কের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু কোনো নিষ্পত্তি ছাড়াই এ আলোচনা সমাপ্ত হয়। মালিক শাহ্ সেলজুকি আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। তিনি হাসানকে চূড়ান্ত পত্র দেন। পত্রের ভাষ্য ছিল এমন–হাসান, তুমি এক নতুন দীনের সূচনা করেছ। মানুষকে ধর্মের নামে ধোঁকা দিচ্ছ। একদল মূর্খকে একত্রিত করে পাহাড়ে বসে তাদের সাথে আড্ডা দিচ্ছ। দীন ও মিল্লাতের প্রহরী আব্বাসি খলিফাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিচ্ছ। নিজেকে এবং নিজের অনুসারীদের ধবংসের মুখে ঠেলে দিও না। মনে রেখো, তোমার কেল্লা যদি আসমানের গম্বুজের উপরেও থাকে তাহলেও আমরা আল্লাহর সাহায্যে তা ধবংস করে ফেলবো।

সুলতানের পত্রের জবাবে হাসান একটি দীর্ঘ পত্র লিখে জবাব দেয়। সেখানে সে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস স্পষ্ট করে এবং সে এই বিশ্বাস থেকে যে ফিরে আসবে না তাও জানিয়ে দেয়। উপায় না দেখে সুলতান মালিক শাহ্ ৪৮৫ হিজরিতে আরসালান তাশের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী এসে আলামুত দুর্গ অবরোধ করে। সে-সময় কেল্লার ভেতরে হাসানের সাথে সর্বসাকুল্যে ৭০ জন লোক ছিল। কিন্তু হাসান বিন সাব্বাহ অবরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রয়োজনীয় রসদও তার সংগ্রহে ছিল। এদিকে কেল্লা ছিল দুর্গম পাহাড়ের উপর। ফলে সালজুকি সেনাদের বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছিল। অবরোধ কয়েক মাস দীর্ঘ হয়। আরসালান তাশ হাসানকে আত্মসমর্পণ করে কেল্লা মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে বলছিলেন। জবাবে হাসান পত্র লিখে বলে, তোমাদের কী হয়েছে? কেন আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছ? আমরা এই সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে চাই। এই সমাজ দূষিত হয়ে গেছে। আমরা এখান থেকে জুলুমকে বিদায় জানাতে চাই। চাই মানুষের মাঝে ভালোবাসা তৈরি করে দিতে।

চারমাস অবরোধ শেষে আরসালান তাশ সেনাবাহিনী নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। কারণ তিনি অবস্থান করছিলেন দুর্গম অঞ্চলে। রসদের ব্যবস্থাও সহজ ছিল না। এদিকে যুদ্ধও কোনো ফলাফল দিচ্ছিল না।[১৮৮] সালজুকি বাহিনী বিদায় নিলে হাসান বিন সাব্বাহ নতুন করে তার বাহিনীকে ঢেলে সাজায়। ইতিমধ্যে নিজস্ব

---

[১৮৮] *উসমান খাশত, হারাকাতুল হাশশাশিন, পৃ- ৬৯-৭২, (কায়রো, মাকতাবাতু ইবনি সিনা, ১৪০৮ হিজরী)*

মতবাদ প্রচারের পাশাপাশি সে গড়ে তোলে ফেদায়ি বাহিনী। সহজ ভাষায় বললে ভাড়াটে খুনী। এই বাহিনীর কর্মীরা ছিল হাসানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। হাসানের ইশারায় তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল। এরা টাকার বিনিময়ে হত্যা করতো। আবার হাসান বিন সাব্বাহর আদেশ পেলে কারণ ছাড়াই যে-কাউকে হত্যা করে ফেলতো। এমনকি হাসানের আদেশ পেলে নিজেকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না। হাসানকে তারা বলতো শায়খুল জাবাল, পাহাড়ের শায়খ। তাদের সম্পর্কে ইবনু খালদুন লিখেছেন, হাসান বিন সাব্বাহর অনুসারীরা যে কাউকে হত্যা বৈধ মনে করতো। এরা ছিল ছদ্মবেশ ধরতে পটু। কাউকে হত্যার আদেশ পেলে তাকে খুজে বের করতো। সাধারণত দুইজন বা তিনজন একসাথে থাকতো। শিকারের কাছাকাছি গিয়ে তার উপর আঘাত হানতো। প্রথমজন ব্যর্থ হলে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয়জন আঘাত হানতো। সাধারণত তাদের বেঁচে ফেরার কোনো ইচ্ছা থাকতো না, তাই তারা খুব কমই ব্যর্থ হতো। সাধারণত তারা নামাজ চলাকালীন হামলা চালাতো। তাদের পরনে থাকতো সাদা জুব্বা, কোমরে রক্তলাল কোমরবন্ধ। লুকিয়ে রাখতো বাকা ছুরি। অল্পদিনেই তারা মুসলিম বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার করে। সালজুকি আমিরদের অনেকেই তাদের হাতে নিহত হয়। অনেক সময় সুলতানরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার জন্য এদের সাহায্য নিতেন। যেমন সুলতান বরকিয়া রওক তাঁর ভাই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ার সময় এদের সাহায্য নিয়েছেন।[১৮৯]

হাসান বিন সাব্বাহর অনুসারীদের নানা নামে ডাকা হতো। টাকার বিনিময়ে হত্যা করতো বলে এদের বলা হতো ফেদাইয়ি। এরা নিজের ধর্মবিশ্বাস গোপন রাখতো তাই তাদেরকে বাতেনিও বলা হতো। যেহেতু এরা ছিল ধর্মত্যাগী তাই কোথাও কোথাও এরা মুলাহিদা নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এদেরকে মুলাহিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইসমাইলি নামে এরা পরিচিত ছিল কারণ তারা মূলত ইসমাইলিয়াদেরই একটি শাখা। আবার নিজারের দিকে আহ্বান করতো বলে নিজারিয়াও বলা হতো। তবে এরা নিজেদের পরিচয় দিত আসহাবুদ দাওয়াতিল হাদিয়্যাহ নামে।[১৯০]

হাসান বিন সাব্বাহ পারস্যে অনেক দুর্গ দখল করে। এসব দুর্গের আশপাশে তারা প্রচুর লুটপাট করতো। এসব দুর্গ দুর্গম স্থানে অবস্থিত হওয়ার কারণে সেনাবাহিনীও হাসানের বিরুদ্ধে তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

---

[১৮৯] ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান (মৃত্যু ৮০৮ হিজরী), তারিখ ইবনি খালদুন, ৪/১২১-১২৫, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪২১ হিজরী)

[১৯০] কলকাশান্দি, আবুল আব্বাস আহমাদ (মৃত্যু ৮২১ হিজরী) , সুবহাল আ'শা, পৃ-১১৯, (কায়রো, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৪০ হিজরী)

সাধারণত প্রচলিত হলো, হাসান তার অনুসারীদের হাশিশ পান করিয়ে মাতাল করতো। তবে কেউ কেউ এই মত প্রত্যাখান করেছেন।[১৯১]
হাসান ছিল খুবই প্রতিভাধর এক অপরাধী। তার সম্পর্কে ইমাম জাহাবি লিখেছেন, সে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণায় কুখ্যাত। তার মধ্যে আল্লাহ কোনো বরকত রাখেননি। সে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।[১৯২]
হাসানের অনুসারীরা ছিল তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। সুলতান মালিক শাহ একবার হাসানকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। জবাবে হাসান সুলতানের দূতের সামনেই তার কয়েকজন অনুসারীকে ডেকে আনে। সে তাদেরকে বলে, তোমরা পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দাও। সাথে সাথে সবাই পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে মারা যায়। এরপর হাসান সুলতানের দূতের দিকে তাকিয়ে বলে, সুলতানকে বলো, আমার কাছে এমন ২০ হাজার যোদ্ধা আছে।[১৯৩]
এরপর থেকে মালিক শাহও বাতেনিদের বেশি ঘাটাননি। ৪৮৫ হিজরিতে বাতেনিদের হাতে সালজুকি সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলক নিহত হন। ৪৯৪ হিজরিতে সুলতান বরকিয়া রওক বাতেনিদের হত্যার আদেশ দেন। এরপর থেকে এদের হত্যা করা হতে থাকে। কিন্তু এতে তাদের শক্তি খুব একটা খর্ব হয়নি। ৪৯৮ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ হাসানের হাত থেকে বেশকিছু দুর্গ উদ্ধার করেন। ৫১৮ হিজরিতে হাসান বিন সাব্বাহ মারা গেলে বাতেনিরা বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে তাদের শক্তি খর্ব হয়নি। বরং তারা সিরিয়ায় বেশকিছু কেল্লা দখল করে একটি রাজ্য গঠন করে। পারস্যের বাতেনীদের উপর প্রাথম কার্যকর হামলা করেছিলেন সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ। তিনি তাদের অনেকগুলো কেল্লা গুড়িয়ে দেন। ক্রুসেডের সময় সিরিয়ার বাতেনিরা ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলায়। তখনকার শায়খুল জাবাল রশিদুদ্দিন সিনান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উপর হামলা করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠালেও তারা ব্যর্থ হয়।[১৯৪]

১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান আলামুতে হামলা করে রুকনুদ্দিন খোরশাহকে পরাজিত করে এবং বাতেনিদের স্বপ্নের দুর্গ চিরতরে ধবংস করে দেয়। সিরিয়ার

---

[১৯১] The Encyclopaedia Of Islam, ১/৩৫২-৩৫৩, (E J Brill, ১৯৮৬)
[১৯২] যাহাবী, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন উসমান (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী), মিযানুল ইতিদাল, ১/৫০০
[১৯৩] ইবনুল জাওযি, আবুল ফারায আবদুর রহমান বিন আলি বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী), আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ১৭/৬৪, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা)
[১৯৪] ইবনু কাসির, ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৬/৫১২, (মারকাযুল বুহুস লিদদিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ)

বাতেনিদের উপর চূড়ান্ত আঘাত করেছিলেন সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স। তাঁর আক্রমণে তাদের সিরিয়ার ঘাটি ধবংস হয়। বেশিরভাগ বাতেনি নিহত হয়। অল্প যে কজন বেঁচে ছিল তারা পাড়ি দেয় ভারতবর্ষে।

হ্যাঁ, বাতেনিরা এসেছিল ভারতবর্ষে এবং তাদের সন্তানরাই এখন আছে বেশ দাপটের সাথে। পাকিস্তানের আগাখানিরাই হলো সিরিয়ার বাতেনিদের বংশধর।[১৯৫] আগাখানিদের ইতিহাসও জানা দরকার। তবে সে আলোচনা পরে কখনো।

---

[১৯৫] যিরিকলি, খাইরুদ্দিন (মৃত্যু ১৩৯৬ হিজরী), আল আলাম, ২/১৯৩-১৯৪, (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালায়িন, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ)

আমি যাহরা বলছি

আমি যাহরা বলছি। মাদিনাতুয যাহরা।
আমার জন্ম আব্দুর রহমান আন নাসেরের শাসনামলে, ৩২৫ হিজরীতে।
কুরতুবা, রাযী যাকে বলেছেন সকল শহরের মা, সেই স্বচ্ছ নহর ও মজবুত সেতুর বিখ্যাত শহরের খুব কাছেই আমার অবস্থান।
আমার নির্মানকাজে কর্মরত ছিল ১০ হাজার শ্রমিক। ভারবহনের কাজে লেগেছে প্রায় দু হাজার উট ও খচ্চর। জ্যাসপার পাথর আনা হয়েছিল কার্থেজ ও তিউনিসিয়া থেকে। প্রতিদিন প্রয়োজন হতো ৬ হাজার পাথর। আবদুল্লাহ বিন ইউনুস, হাসান কুরতুবী ও আলী বিন জাফরের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠা আমার। পূর্ব-পশ্চিমে আমার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৭০০ গজ। উত্তর-দক্ষনে ১ হাজার ৭০০ গজ । ২৮০ একর জমি জুড়ে তিন স্তরে গড়ে উঠি আমি। প্রথম ধাপে খলিফার প্রাসাদ, পরের ধাপে বাগান তারপর কর্মচারী, দাসদাসীদের আবাসগৃহ, অভ্যর্থনা কামরা এবং মসজিদ, হলকক্ষ। মসজিদের পাশেই বয়ে যেতো গোয়াদেল কুইভারের নীলাভ ঢেউ। প্রাসাদে ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার নানা উজ্জ্বল রঙের মার্বেল পাথরের স্তম্ভ। দরবার কক্ষের প্রতি পাশে ছিল আটটি করে আবলুস কাঠের দরজা। প্রতিদিন সকালে সূর্যের আলো আবলুস কাঠের দরজা পেরিয়ে ঢুকে পরতো দরবারের ভেতর। বাহারী পাথরের স্তম্ভগুলোতে তখন আলোর ঝিকিমিকি।
এখানে একদিন কোলাহল ছিল, ছিল ব্যস্ততা
ইবনে হাইয়ানের কথা হয়তো তোমাদের মনে থাকবে। 'যাহরা প্রাসাদ সৌন্দর্যের শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো স্থাপনা মুসলিম বিশ্বে নেই' বলেছিলেন তিনি।
আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন ড. ইকবাল, আহমদ শাওকি।

(কখনো সময় সুযোগ পেলে লিলিপুটটি বড় হবে। ইনশা আল্লাহ)

তথ্যসূত্র :

১. নাফহুত তীব মিন গুসনীল উন্দুলুসির রাতিব — আল্লামা মুকরী ২. তারিখুস সাক্বাফাতুল ইসলামিয়া — ওয়াজেহ রশীদ নদভী ৩. আল বায়ানুল মাগরিব ফি ইখতিসারি আখবারী মুলুকিল উন্দলুস ওয়াল মাগরিব — আহমাদ বিন মুহাম্মদ মারাকেশী

যুদ্ধসমূহ

শাকহাবের যুদ্ধ

শাকহাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৭০২ হিজরির ২ রমাদানে। খ্রিস্টিয় হিসেবে সময়টা ছিল ২০ এপ্রিল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ। যুদ্ধের পটভূমির সূচনা হয় ৭০২ হিজরির রজব মাসে, যখন হালাব থেকে কায়রোতে একটি পত্র আসে। এই পত্র এসেছিল সুলতান নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের নামে। পত্রে লেখা ছিল, তাতারসম্রাট মাহমুদ গাযান তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন পত্র পড়ে চিন্তিত হলেন। মাহমুদ গাযান তাতার ইলখানাতের সম্রাট। তিন বছর আগে থার্ড ব্যাটল অব হোমসে মামলুক বাহিনী পরাজিত হয়েছিল মাহমুদ গাযানের বাহিনীর হাতে। সুলতান দেখলেন, সুযোগ এসেছে তাতারদের পরাজিত করার। তিনি দ্রুত তার আমির দ্বিতীয় বাইবার্সকে[১৯৬] তিন হাজার সেনা ও কয়েকজন আমিরসহ সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন।

শাবানের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় বাইবার্স দামেশকে উপস্থিত হলেন। ততদিনে চারদিকে তাতার-আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। হামা ও হালাব থেকে দলে দলে লোকজন পালিয়ে দামেশকে চলে আসছে। এমনকি দামেশকের লোকরাও পালানোর চিন্তা করছে। আতংক ঠেকানোর জন্য দ্বিতীয় বাইবার্স ঘোষণা দিলেন, কেউ যদি দামেশক থেকে পালাতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তার সম্পদ লুট করা হবে। এই ঘোষণার ফলে লোকজন বাধ্য হয়ে বাড়িতেই অবস্থান করে। দ্বিতীয় বাইবার্স দ্রুত সুলতানের কাছে পত্র লিখে তাকে সিরিয়ায় আসার আহ্বান জানান। এদিকে মাহমুদ গাযান তার সহকারী কুতলু শাহকে বিশাল বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। কুতলু শাহ তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে এলো। পথে সে সংবাদ পেলো সুলতান নাসির মুহাম্মদ এখনো মিসর থেকে বের হননি। তাই সে এগিয়ে এসে হামার উপর আক্রমন করলো। এখানে সে অনেককে হত্যা করে। তাদের সম্পদ লুটপাট করে। ভাগ্যবানরা পালিয়ে দামেশকে চলে আসেন।

দামেশকে তখন নানা অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের ভীড়। সবাই প্রস্তুত ছিল আসন্ন যুদ্ধের জন্য। কেউ কেউ অপেক্ষা করতে চাইছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল, শহর থেকে বের হয়ে তাতারদের মুখোমুখি হবে। অপরদিকে অন্যরা চাচ্ছিল সুলতানের আগমনের অপেক্ষা করতে। এই সিদ্ধান্তহীনতায় সময় কাটছিল ওদিকে এগিয়ে আসছিল কুতলু শাহর বাহিনী। এর মধ্যে রমাদানের চাঁদ দেখা গেল।

---

[১৯৬] পুরো নাম আল মালিকুল মুযাফফর রুকনুদ্দিন বাইবার্স জাশনাকির। তিনি ছিলেন দ্বাদশ মামলুক সুলতান। তার শাসনকাল ১৩০৮-১৩০৯ খ্রিস্টাব্দ।

রমাদানের প্রথমদিন পার হলো। রাতের বেলা পুরো শহরে দোয়া শুরু হয়। ঐতিহাসিক মাকরেজি লিখেছেন, রাতেরবেলা শহরবাসী দামেশকের জামে মসজিদে অবস্থান করে দোয়া করছিল। এই সময় দামেশকে অবস্থান করছিলেন হিজরী অষ্টম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন আলেম। তিনিও লোকদের জিহাদের জন্য উজ্জীবিত করছিলেন। ইতিহাস এই আলেমকে চেনে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা নামে। তিনি বারবার বলছিলেন, এই যুদ্ধে তোমরাই বিজয়ী হবে। কেউ কেউ তাকে বললো, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ চাহে তো যুদ্ধে তোমাদের বিজয় অবশ্যই হবে, কেউ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এরপর তিনি আয়াত তেলাওয়াত করেন

— —

এটাই প্রকৃত অবস্থা। যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার সমপরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপর তার উপর আবার নিপীড়ন করা হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

সুরা হাজ্জ ৬০

তখনো অনেকের মনে তাতারদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারে দ্বিধা ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল তাতারদের অনেকেই বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুসারী। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ঠিক হবে কিনা। ইবনু তাইমিয়্যা বললেন, এরা হলো সেই খারেজিদের মতো, যারা হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এর পর তিনি বললেন, যদি তোমরা দেখো আমি মাথায় কোরান নিয়ে তাতারদের বাহিনীর সামনে আছি তাহলে আমাকেও হত্যা করো।[১৯৭]

রাত পার হলো। পরদিন সকালে সুলতান বাহিনীসহ দামেশকে প্রবেশ করলেন। সুলতানের আগমনে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। তারা সুলতানের বাহিনীকে স্বাগতম জানান। এদিকে কুতলু শাহর বাহিনী তখন একেবারে নিকটে চলে এসেছে। সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সিদ্ধান্ত হয় দামেশক থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণে শাকহাব নামক সমতলভূমিতে তাতারদের মোকাবেলা করা হবে।[১৯৮] দ্রুত বাহিনীকে প্রস্তুত করা হয়। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন ইয়াস হানাফির বর্ননামতে,

---

[১৯৭] ইবনু কাসীর, ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর (মৃত্যু ৭৭৩ হিজরি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/২৩, (মারকাযুল বুহুস, ১৪১৯ হিজরি)

[১৯৮] মাকরেজি, তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আলি (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি), আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ২/৩৫৫, ৩৫৬, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৮ হিজরি)

এ সময় মামলুক বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ।[১৯৯] অপরদিকে তাতারদের সেনাসংখ্যা ছিল দুই লাখেরও বেশি। সুলতান অবস্থান করছিলেন বাহিনীর মাঝখানে। তার সাথে ছিলেন কারীরা। তারা কোরান তিলাওয়াত করছিলেন এবং সেনাদেরকে জিহাদের জন্য উজ্জিবিত করছিলেন। সুলতানের পক্ষ থেকে ঘোষকরা বারবার বলছিল, হে সেনারা তোমরা তোমাদের সুলতানের কথা ভেবে যুদ্ধ করো না। তোমরা তোমাদের নবির দ্বীনের কথা ভেবে লড়াই করো। সেনারা কান্না করে দোয়া করছিল। বাহিনীর পেছনদিকে দাসদের রাখা হয়েছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল কেউ পালাতে চাইলে তাকে হত্যা করতে। বিনিময়ে তার অস্ত্র ও ঘোড়া হত্যাকারী পাবে।

তাতাররা দ্বিপ্রহরে শাকহাব ময়দানে এসে পৌছে। কুতলু শাহ তার দশ হাজার সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মামলুকদের ডান বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় প্রচন্ড লড়াই। আহতদের চিৎকার ও তরবারীর ঝনঝনানিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। তীব্র লড়াইয়ে মামলুকদের ডানভাগের সেনানায়ক হুসামউদ্দিন নিহত হন। বাম ভাগ ও মাঝের অংশের দায়িত্ব ছিলেন বাইবার্স জাশনাকির। তিনি এবার ডানভাগের সহায়তায় নিজের সেনাসহ এগিয়ে আসেন। প্রচন্ড লড়াই চলতে থাকে। মামলুক সেনারা তাকবীর দিচ্ছিল। একইসাথে দোয়া চলতে থাকে। কুতলু শাহ ময়দানের পাশের একটি পাহাড়ে আরোহণ করে। সে নিশ্চিত ছিল তাতাররাই বিজয়ী হবে। তাই জয় উপভোগ করার জন্য সে পাহাড়ে উঠে। কিন্তু পাহাড়ে উঠার পর পুরো ময়দানের দৃশ্য তার সামনে আসে। এই প্রথম তার মনে হলো মামলুকদের সাথে সহজে জয়ের কোনো আশা নেই। কুতলু শাহ পাহাড় থেকে নেমে আসে। প্রথমদিন কোনো নিষ্পত্তি ছাড়াই লড়াই সমাপ্ত হয়। রাতেরবেলা দুই শিবিরেই আহতদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। আমিররা ঘুরে ঘুরে সেনাদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছিলেন। পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এদিনের যুদ্ধে তাতাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পানির নিয়ন্ত্রন ছিল মামলুক বাহিনীর হাতে। পিপাসার্ত তাতাররা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছিল। ধীরে ধীরে জয়ের পাল্লা মামলুকদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দ্বিপ্রহরের সময় তাতাররা পালাতে থাকে। মামলুকরা অনেকদূর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। মাকরেজির লিখেছেন, তাতারদের বেশিরভাগই নিহত হয়। কুতলু শাহ খুব অল্প কিছু সেনাসহ পালাতে পেরেছিলেন।

মুসলিম শিবিরে বিজয়ের উল্লাস শুরু হয়। দ্রুত আমির বদরুদ্দিনকে মিসরে পাঠানো হয় জয়ের সুসংবাদ দিয়ে। সুলতান তার বাহিনীসহ দামেশকে ফিরে

---

[১৯৯] মুহাম্মদ বিন ইয়াস হানাফি (মৃত্যু ৯৩০ হিজরি), বাদাইউয বুহুর ফি ওয়াকাইউদ দুহুর, ১/৪১৩

আসেন। শহরবাসী আনন্দে কান্না করছিল। এ বিজয় তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। সুলতান এখানে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত অবস্থান করেন। শাওয়ালের তিন তারিখে তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ওদিকে কুতলু শাহ পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে হামাদান পৌঁছে। মাহমুদ গাযান তখন এখানে অবস্থান করছিল। পরাজয়ের সংবাদ শুনে মাহমুদ গাযান প্রচন্ড আঘাত পায়। মাকরেজি লিখেছেন, পরাজয়ের সংবাদ শুনে গাযানের নাক থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। সে আদেশ দেয় কুতলু শাহকে হত্যা করার। পরে অবশ্য এ আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই যুদ্ধের পর গাযান আর কখনো সিরিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। এর পরের বছর ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে সে মারা যায়।[২০০]

এক নজরে এ যুদ্ধ

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২০-২১ এপ্রিল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে।
পক্ষ- মামলুক বাহিনী
সেনাপতি- সুলতান নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন, রুকনুদ্দিন বাইবার্স জাশনাকির, সাইফুদ্দিন সালার, সাইফুদ্দিন কারাই।
সেনাসংখ্যা- ২ লাখ
ক্ষয়ক্ষতি- ২১৭ জন আমির নিহত, এছাড়াও অসংখ্য সেনা নিহত।
বিপক্ষ- তাতার বাহিনী ও তাদের সাথে থাকা আরমেনিয়ার অল্পসংখ্যক ক্রুসেডার
সেনাপতি- কুতলু শাহ
সেনাসংখ্যা- ২ লাখের বেশি।
ক্ষয়ক্ষতি- এক লাখের বেশি সেনা নিহত

২০০ মাকরেজি, তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আলি (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি), আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ২/৩৫৭-৩৬০, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৮ হিজরি)

আম্মুরিয়ার যুদ্ধ

(আম্মুরিয়ার যুদ্ধকে বিবেচনা করা হয় আব্বাসি খেলাফতের সবচেয়ে বড় লড়াই হিসেবে। রোমান বাহিনীর হাতে বন্দী এক মুসলিম নারীর আর্তনাদের জবাবে ইতিহাসের অন্যতম এ যুদ্ধের দামামা বাজান আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ। একজন মাত্র মুসলিম নারীর আর্তনাদের দাম মুসলিম সিপাহসালার ও সেনাবাহিনীর কাছে কত বেশি, খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন পৃথিবীকে। রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত অজেয় শহর আম্মুরিয়া অবরোধ করেন তিনি ৬ রমজান। ১৭ রমজান ছিনিয়ে আনেন বিজয়। আজ ৬ রমজানে আম্মুরিয়া অবরোধের স্মরণে ফাতেহে পাওঠকদের জন্য এ অভিযানের সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকেছেন ইমরান রাইহান।)

মৃত্যুর আগে খলিফা মামুনের অসিয়ত ছিল, যেভাবেই হোক বিদ্রোহী বাবাক খুররামিকে শায়েস্তা করতে হবে। মামুন নিজে বহুবছর চেষ্টা করেছেন বাবাককে দমন করতে, কিন্তু তিনি সফল হননি, বরং হারিয়েছেন নিজের বিখ্যাত সেনাপতিদের অনেককে। পরবর্তী খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ শাসনক্ষমতা পেয়েই বাবাকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। ২২২ হিজরির দিকে বাবাক কোণঠাসা হয়ে যায়। সে রোমান সম্রাট তোফাইল বিন মিখাইলকে পত্র লিখে আব্বাসি সাম্রাজ্যে হামলার আহ্বান করে। বাবাকের পত্রের ভাষ্য ছিল এমন–'খলিফার বাহিনী এখন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আপনি আব্বাসিদের এলাকায় হামলা করে তা দখল করে নিন।'

তোফাইল বিন মিখাইল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জিবাত্রা শহরে হামলা করে। তাবারির বর্ণনা মতে, এ সময় তোফাইলের বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। এই বাহিনী জিবাত্রা শহরে প্রচণ্ড লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা অনেক মুসলমানকে বন্দী করে নাক-কান কেটে দেয়। প্রায় এক হাজার মুসলমান মহিলাকে বন্দী করে[২০১]। বন্দী মহিলাদের মধ্যে একজন হাশেমি মহিলাও ছিলেন। তাঁকে বন্দী

---

[২০১] তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি), তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, ৯/৫৫ (কায়রো, দারুল মাআরিফ, ১৩৮৭ হিজরি)

করার সময় তিনি ওয়া মু'তাসিমা, ওয়া মু'তাসিমা (হায় মু'তাসিম, হায় মু'তাসিম) বলে চিৎকার দেন[২০২]।

রোমানরা ফিরে যায়। এদিকে বাবাকের পতন ঘটে। তাকে বন্দী করে সামাররায় এনে হত্যা করা হয়। ২২৩ হিজরিতে খলিফা মু'তাসিম সামাররা শহরে অবস্থান করছিলেন। বাবাককে হত্যার কয়েকদিন পরেই তাঁর কাছে জিবাত্রার পতনের সংবাদ পৌঁছে। একই সঙ্গে তাঁকে সেই হাশেমি নারীর চিৎকারের কথাও বলা হয়। ইবনু খালদুন লিখেছেন, 'এই কথা শুনে মু'তাসিম লাব্বাইক লাব্বাইক বলে সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যান। তিনি তখনই যুদ্ধের প্রস্তুতির ঘোষণা দেন। দ্রুত তিনি আলেম ও আমিরদের ডেকে পাঠান। বাগদাদের কাজি আবদুর রহমান বিন ইসহাকও উপস্থিত হন। খলিফা সবার সামনে নিজের সম্পদের তালিকা করেন। সম্পদ তিন ভাগ করে এক ভাগ সন্তানদের জন্য, আরেক ভাগ খাদেমদের জন্য এবং অপরভাগ ওয়াকফ করে দেন। কাগজপত্র লিখে ফেলা হয়[২০৩]। খলিফা যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেন।' ইবনু কাসির লিখেছেন, 'খলিফা এমন বাহিনী প্রস্তুত করেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ করতে সক্ষম হয়নি। বাহিনীর সাথে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র নেয়া হয়। এত বেশি সরঞ্জাম নেয়া হয় যার কথা ইতিপূর্বে কেউ শোনেওনি[২০৪]।

২২৩ হিজরির জমাদিউল উলার ২ তারিখে এই বাহিনী দজলা নদীর পশ্চিম প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে। বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন উজাইফ বিন আনবাসা, জাফর ইবনু দিনার ও আফশিন। এই বাহিনী ঝড়ের বেগে জিবাত্রা শহরে উপস্থিত হয়। ততদিনে রোমানরা সেই এলাকা ত্যাগ করেছে। খলিফা রাগে ফুঁসছিলেন। তিনি সভাসদদের জিজ্ঞেস করেন, রোমানদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত শহর কোনটি? সবাই বললো, রোমানদের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ও সুরক্ষিত শহর হলো আম্মুরিয়া। এই শহর তাদের কাছে কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও সম্মানিত।

---

[২০২] ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি), তারিখু ইবনি খালদুন , ৩/৩২৭, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪২১ হিজরি)

[২০৩] প্রাগুক্ত, ৩/৩২৮

[২০৪] ইবনু কাসীর, হাফেজ ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনু উমর (মৃত্যু ৭৭৩ হিজরি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৫২, (দার হিজর, ১৪১৯ হিজরি)

ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানেরা কখনো এই শহর নিজেদের আয়ত্তে নিতে পারেনি[২০৫]।

'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আম্মুরিয়া। এই শহরকে আমরা দখল করবো।'—দৃঢ় কণ্ঠে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ।
মুসলিম বাহিনী চলল আম্মুরিয়ার উদ্দেশ্যে। আম্মুরিয়ার বর্তমান নাম আমোরিয়াম। এটি তুরস্কের ফ্রিজিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গেল রোমানদের সীমান্তে। সালুকিয়া নামক স্থানে পৌঁছে সিন নদীর তীরে শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে একদিন অবস্থান করে মুসলিম বাহিনী আবার রওনা হয়। শাবানের ২৫ তারিখে রোমানদের হাত থেকে আনকারা শহর জয় করা হয়। এখানে খলিফা বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বাম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আশনাসকে। আফশিন ছিলেন ডান বাহিনীর নেতৃত্বে। খলিফা নিজে থাকেন মধ্যবর্তী বাহিনীতে। এই তিন বাহিনী রওনা হয় আম্মুরিয়ার দিকে। প্রতিটি বাহিনী একে অপরের থেকে দুই ক্রোশ দুরত্ব বজায় রাখছিল। সবার উপর আদেশ ছিল আনকারা থেকে আম্মুরিয়ার মধ্যবর্তী সকল এলাকা নিজেদের দখলে নিতে হবে।

এই তিন বাহিনীর মধ্যে আফশিনের বাহিনী প্রথম আম্মুরিয়া পৌঁছে। এরপর খলিফা ও আশনাসের বাহিনী পৌঁছে। রোমানরা শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা শহর অবরোধ করেন। দিনটি ছিল রমজানের ৬ তারিখ। অবরোধ চলতে থাকে। এ সময় শহরের একজন বাসিন্দা মুসলিম শিবিরে চলে আসেন। তাবারির বর্ণনামতে, এই লোকটি আগে মুসলমান ছিল। পরে ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। সে মুসলিম সেনাপতিকে জানায়, শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের একাংশ বন্যার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। সেখানে হামলা করলে সহজেই প্রাচীর ভেঙে ফেলা যাবে। খলিফা আদেশ দেন প্রাচীরের সেদিকে মিনজানিক স্থাপন করার জন্য। এরপর প্রাচীরের সেই অংশে একটানা পাথর নিক্ষেপ চলতে থাকে। এ সময় শহরবাসী রোমান সম্রাটের কাছে সাহায্য চেয়ে দুজন দূত প্রেরণ করে। তারা দুজনই মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। এবং দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করে।

---

[২০৫] তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি), তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, ৯/৫৭ (কায়রো, দারুল মাআরিফ, ১৩৮৭ হিজরি)

এদিকে খলিফার নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ জোরদার করা হয়। একদিন বিকট শব্দে প্রাচীরের একাংশ ধ্বসে পড়ে।

প্রাচীরের একাংশ ধ্বসে যাওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রাচীরের বাইরের পরিখা পার হওয়া। পরিখা বেশ গভীর ও প্রশস্ত ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য খলিফা একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। মুসলিম বাহিনী রসদ হিসেবে প্রচুর ভেড়া নিয়ে এসেছিল। খলিফার আদেশে সবগুলো ভেড়া জবাই করে গোশত সংরক্ষণ করা হয়। এরপর ভেড়ার চামড়ার ভেতর মাটি ঢুকিয়ে চামড়া সেলাই করে ফেলা হয়। এরপর মাটিভর্তি চামড়াগুলোকে পরিখায় ফেলা হয়। পরিখার কিছু অংশ ভরাট হয়ে গেলে মুসলিম সেনাদের চলার পথ হয়ে যায়। পরদিন মুসলিম সেনারা এই পথে শহরে প্রবেশের চেষ্টা চালান। শহরবাসী তির নিক্ষেপ করে তাঁদের আটকে দেয়ার চেষ্টা করে। সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই হয়। দু পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা বাড়ছিল। যুদ্ধে কোনোপক্ষই সুবিধে করতে পারছিল না। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে (১৭ রমজান ২২৩ হিজরি, ১২ আগস্ট ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। অল্পসময়ে পুরো শহর তাদের দখলে চলে আসে। খলিফার আদেশে পাইকারি হারে রোমান সেনাদের হত্যা করা হয়। গির্জার দরজা পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইবনু খালদুন লিখেছেন, একেকজন মুসলমান সেনা পাঁচ-ছয়জন রোমান সেনাকে বকরির মতো বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। খলিফার আদেশ ছিল যা বহন করা যাবে তা সাথে নিতে আর বাকি সব জ্বালিয়ে দিতে। রোমানদের অস্ত্রশস্ত্রও জ্বালিয়ে দেয়া হয়[২০৬]। ২৫ দিন আম্মুরিয়াতে অবস্থান করে শাওয়ালের শেষদিকে খলিফা তরতুসের পথ ধরেন। ঐতিহাসিকরা আম্মুরিয়ার যুদ্ধকে গণনা করেছেন আব্বাসি শাসনামলের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হিসেবে।

এক নজরে আম্মুরিয়া যুদ্ধ

পক্ষ : আব্বাসিয়া বাহিনী

সেনাপতি : খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ, আফশিন, আশনাস

---

206 প্রাগুক্ত, ৯/৫৮-৬০

সেনাসংখ্যা : ৮০ হাজার

নিহতের সংখ্যা : অজ্ঞাত

বিপক্ষ : রোমান বাহিনী

সেনাপতি : তোফাইল বিন মিখাইলের প্রতিনিধি

সেনাসংখ্যা : ৩০ হাজার

ক্ষয়ক্ষতি : প্রায় সকল সৈন্য নিহত

* মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন ৮ম আব্বাসি খলিফা। ৮৩৩ সাল থেকে ৮৪২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। খলিফা মামুনের মত তিনিও ছিলেন মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী। নিজের মতবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল সহ আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য আলেমদের উপর তিনি প্রচন্ড নির্যাতন চালান।

ইসলামী ইতিহাসের খন্ডচিত্র

আমাদের ইতিহাসের হারানো পাতা

মূল : শায়খ হাবিবুর রহমান আজমী রহ.
রুপান্তর : ইমরান রাইহান

১

সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাশ ৬০৭ হিজরী থেকে ৬৩৩ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মালফুজাত 'ফাওয়ায়েদুস সালেকিনে' তার প্রশংসা করা হয়েছে।ফা ওয়ায়েদুস সালেকিনের ভাষ্যমতে, তিনি সআধারণত রাতে ঘুমাতেন না। কখনো ঘুম এলে একটু পরেই সজাগ হয়ে যেতেন। উঠে অযু করে নামাজ পড়তেন। চাকর-বাকর কাউকে ডাকতেন না। বলতেন, যারা আরামের ঘুমে আছে তাদের কষ্ট দেয়ার কী দরকার? কখনো কখনো রাতের বেলা আশরাফী ভর্তি থলে নিয়ে রাজধানীর অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন। গরীব দুস্থদের ঘরে গিয়ে তাদের খোজখবর নিতেন। বলতেন, কারো কোনো সাহায্য প্রয়োজন হলে কিংবা কেউ জুলুমের শিকার হলে, প্রাসাদের সাথে সংযুক্ত শিকল ধরে টান দিয়ো। আমি তোমাদের খবর নিবো। *(ফাওয়ায়েদুস সালেকিন, ২৯)*

২

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি ইন্তেকাল করেন ৬৩৩ হিজরীতে। মৃত্যুর পুর্বে তিনি অসিয়ত করে যান, আমার জানাজা এমন কেউ পড়াবে যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে।
ক। সে কখনো কোন গায়রে মাহরামের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি
খ। কখনো তার আসরের সুন্নত কাজা হয় নি।
গ। সে সবসময় তাকবিরে উলার সাথে জামাতে নামাজ পড়েছে।
শায়খের জানাজা প্রস্তুত করা হলো। ঘোষনা করা হলো শায়খের শেষ অসিয়ত। কেউ এগিয়ে আসলো না। অনেকক্ষণ পর সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাশ সামনে এগিয়ে এলেন।মৃদুস্বরে বললেন, শায়খ আপনি আমার গোপন আমল ফাস করে দিলেন। *(খাজিনাতুল আসফিয়া , ২৭৫)*

৩

সুলতান আলতামাশের ছেলে নাসিরুদ্দিন মাহমুদও পিতার মত আবেদ, যাহেদ ছিলেন। তিনি ৬৪৪ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার ঘরের কাজের জন্য কোন চাকরবাকর রাখেন নি। একদিন তার স্ত্রী অভিযোগ করলেন, রুটি সেকতে সেকতে আমার হাত পোড়া গেছে, একজন দাসীর ব্যবস্থা করুন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বললেন, দুনিয়া কষ্টের জায়গা। একটু ধৈর্য ধরো। ইনশাআল্লাহ, আখেরাতে এর প্রতিদান পাবে। *(বাদায়ুনি, ৯০)*

৪

গিয়াসুদ্দিন বলবনের পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি প্রথমে দু রাকাত নামাজ পড়েন। তারপর আহমাদ হাবিব নামে এক উজিরকে নিয়ে গিয়াসুদ্দিন বলবনের প্রাসাদে যান। আহমাদ হাবিব বললো, সুলতান। আপনি এখন থেকে এখানেই থাকবেন।জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ জবাব দিলেন, গিয়াসুদ্দিন বলবন সুলতান হ ওয়ার পূর্বে এই প্রাসাদ নির্মান করেন, তাই এখানে আমার কোনো অধিকার নেই। তার পরিবারের লোকদের এর মালিকানা বুঝিয়ে দাও।

৫

সুলতান বাহলুল লোধি ৮৫৫ হিজরীতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। রাজত্বকালে তিনি সবসময় জামাতে নামাজ পড়তেন। প্রজাদের অভিযোগ নিজেই খতিয়ে দেখতেন। ন্যায়বিচার করতেন। কখনো সিংহাসনে বসতেন না। আমীরদেরকেও তার সামনে দাড়াতে দিতেন না। সেনাপতি কিংবা উযিরদের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। যুদ্ধের ময়দানে দু রাকাত নামাজ পড়ে আক্রমন শুরু করতেন। সিংহাসনে আরোহনের পর প্রথম যেদিন তিনি জামে মসজিদে যান, সেদিনের খুতবায় খতীব সাহেব আফগানদের নিন্দা করছিলেন। সুলতান নিজ জাতীর নিন্দা শুনেও নীরব ছিলেন। নামাজ শেষে খতীবকে বললেন, ভাই, এরাও তো আল্লাহর বান্দা। এতটা না বললেও হতো। *(তারীখে দাউদি, ১১)*

৬

আহমেদ নগরের শাসনকর্তা আহমদ নিজামুদ্দিন শাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার, পরহেযগার প্রকৃতির মানুষ। রাস্তায় চলাচলের সময় তিনি দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতেন। এক আমীর এর কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, আমি পথে বের হলে নারী পুরুষ সবাই রাস্তার পাশে চলে আসে। আমি চাই না আমার দৃষ্টি কোন গায়রে মাহরামের উপর পড়ুক। *(তারীখে ফেরেশতা, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)*

৭

সিকান্দর লোদির শাসনকাল। সাম্ভল নামক এলাকার জনৈক ব্যক্তি মাটি খুড়তে গিয়ে পনেরো হাজার আশরাফী ভর্তি একটি থলে পেল। সাম্ভলের শাসনকর্তা মিয়া কাসেম ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে থলে নিয়ে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং এই আশরাফীগুলো কী করা হবে তা জানতে চাইলেন। সুলতান মিয়া কাসেমকে পত্র পাঠিয়ে বললেন, আশরাফী যে পেয়েছে তাকেই দিয়ে দাও। মিয়া কাসেম আবার পত্র পাঠালো, সুলতান, এই ব্যক্তি এত বড় পরিমানের অর্থ পাওয়ার যোগ্য নয়। সুলতান জবাব দিলেন, যিনি তাকে দিয়েছেন তিনিই ভালো জানেন সে যোগ্য কিনা। তাই তাকেই ফিরিয়ে দাও। *(তারিখে দাউদি, ৪২)*

৮

সুলতান মাহমুদ বিগ্রা। ৮৬২ হিজরী থেকে ৯১৭ হিজরী পর্যন্ত তিনি গুজরাট শাসন করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি খুব কান্না করতেন। একজন আমীর তাকে কান্নার কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, প্রতি মূহূর্তে জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হচ্ছে। যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। জানি না, আমার পরিনতি কী হবে। যদি আমার পরিনতি মাহমুদ (প্রশংসিত) না হয় এই ভয়ে আমি কান্না করি। *(মিরআতে সিকান্দরী, ৭৯)*

শাহজাদাদের খুন

মূল : গোলাম রসুল মেহের
অনুবাদ: ইমরান রাইহান

(লেখক পরিচিতি : গোলাম রসুল মেহেরের জন্ম ১৩ এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে , ভারতের জলান্ধরে। জলান্ধর মিশন হাই স্কুল ও লাহোর ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা করেন। ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন।গালিব ও ইকবাল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জামাতে মুজাহেদিন' 'নকশে আজাদ' 'মেহের বিতী' 'গালিব' 'মাতালিবে বালে জিব্রিল'। ১৬ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন)

প্রারম্ভিকা

১৮৫৭ সালে দিল্লীর প্রতিটি ঘটনাই ছিল মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। তবে শাহজাদাদের নির্মম হত্যাকান্ড অন্যসব ঘটনার নির্মমতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এমন নয় যে, শাহজাদারা খুবই যোগ্য ছিলেন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ইতিহাসে এর কোনো প্রমান মেলে না, বরং ইতিহাসের বর্ননামতে শাহজাদারা এর বিপরীত ছিলেন। তবু শাহজাদাদের হত্যকান্ড আমাদের ব্যাথিত করে কারন তারা ছিলেন নিরপরাধ।

ঘটনার ঘনঘটা

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী জেলখানার সামনে হাডসন[২০৭] যে নির্মম হত্যাকান্ড চালায় তা ভাবলে যে কেউ শিউরে উঠবে। এই হত্যাকান্ডের পর যেসকল শাহজাদাকে ফাসি দেয়া হয়, তারা সকলেই ছিল নির্দোষ। ইতিহাস সাক্ষী, দ্বিতীয় শাহ আলম, দ্বিতীয় আকবর শাহ ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এবং তাদের উত্তরাধীকারিদের আচলে অসহায়ত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তৈমুরী বংশের পূর্বসুরীরা যেখানে নিজেদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দিয়ে নতুন নতুন ইতিহাস গড়েছেন, উত্তরসুরীরা সেখানে হানাদার ইংরেজদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পন ছাড়া আর কোনো উপায় পায় নি।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে হুমায়ুনের সমাধী থেকে গ্রেফতার করা হয়।

---

[২০৭] পুরো নাম উইলিয়াম স্টিফেন রেইকস হাডসন। (১৮২১-১৮৫৮)। তিনি হুমায়ুনের সমাধি থেকে বাহাদুর শাহ জাফরকে গ্রেফতার করেন। –অনুবাদক

সেখানে তখন তিন শাহজাদা অবস্থান করছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফরের দুই পুত্র মির্জা মোঘল ও খিজির সুলতান এবং সম্রাটের নাতী মির্জা আবু বকর। বাহাদুর শাহ জাফরের গ্রেফতারীর পরেও তারা সেখানে নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন। কোন ভরসায় তারা ময়দানে বের হয়ে লড়ার চেয়ে আত্মগোপন করে থাকাকেই বেছে নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাস নির্বাক। মির্জা মোঘল ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি জড়িত ছিলেন এবং সিপাহীরা বাহাদুর শাহের অবর্তমানে তাকে স্থলাভিষিক্ত করতে প্রস্তুত ছিল। মির্জা আবু বকরও একটি লড়াইয়ে অংশ নেন । মির্জা খিজির সুলতান ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির এক শাহজাদা। গালিব তাকে নিয়ে লিখেছিলেন,

'সৃষ্টিকর্তা তোমাকে তরতাজা রাখুক,
শাহের বাগানের এই ফুলটি বড়ই চমৎকার।'

মির্জা খিজির সুলতান কবিতা লিখতেন। তিনি ও তার ভাই মির্জা ফাতহুল মুলক গালিবের শিষ্য ছিলেন।

হাডসন শাহজাদাদের খোজখবর জানার জন্য দু ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছিল। এই দুজন হলো, এলাহী বখশ ও রজব আলি। মির্জা এলাহী বখশ বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতো। বাদশাহর নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাধে কেল্লায় তার অবাধ যাতায়াত ছিল এবং কেল্লার অভ্যন্তরের সকল সংবাদ সে ইংরেজদের কাছে পাঠাতো। বিদ্রোহ শুরু হলে সে যিনাত মহলকে[২০৮] বুঝাতে চেষ্টা করে বিদ্রোহ করে লাভ নেই, ইংরেজদের সাথে সন্ধি করা ভালো হবে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন নথিপত্র থেকে বুঝা যায়, বিদ্রোহ চলাকালীন যিনাত মহল বেশ কয়েকবার ইংরেজদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এ ধরনের প্রস্তাব মির্জা এলাহী বখশ ইংরেজদের কাছে পৌছাত।
সাইয়েদ রজব আলীর সাথে দিল্লীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উঠাবসা ছিল। তাই বিদ্রোহের শুরু থেকেই হাডসন তাকে গোয়ান্দাগিরিতে নিযুক্ত করে। তার কাজ ছিল দিল্লীতে কী ঘটছে তা জানানো। মাওলানা যাকাউল্লাহ[২০৯] লিখেছেন, গোয়েন্দা

---

[২০৮] বাহাদুর শাহ জাফরের স্ত্রীদের একজন। কেল্লায় তিনি খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। বিদ্রোহের পর বাহাদুর শাহ জাফরের সাথে তিনিও রেংগুনে নির্বাসিত হন। বাহাদুর শাহ জাফর মারা যান ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। জিনাত মহল মারা যান ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। সম্রাটের পাশেই রয়েছে তার সমাধি। –অনুবাদক

[২০৯] পুরো নাম মাওলানা যাকাউল্লাহ দেহলভী। জন্ম ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। ১০ খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছেন তারীখে হিন্দুস্তান নামে। এটি একটি অসাধারণ বই। বলা যেতে পারে ফার্সিতে রচিত সকল ইতিহাস গ্রন্থের নির্যাস চলে এসেছে এ বইতে ।–অনুবাদক

হওয়ার সকল যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল। তার উপর ইংরেজদের আস্থা ছিল এবং সেও ইংরেজদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। কারো পেট থেকে কথা বের করার আশ্চর্য যোগ্যতা ছিল তার।

এই দুই ব্যক্তি হাডসনের সাথে হুমায়ুনের সমাধিতে যায়। তাদের সাথে একশো অশ্বারোহী সেনা ছিল। সমাধির সামনে পৌছে হাডসন রজব আলী ও এলাহী বখশকে ভেতরে পাঠালো। তাদের দায়িত্ব শাহজাদাদের আত্মসমর্পন করতে রাজী করানো। প্রায় দুই ঘন্টা আলাপ চললো। শাহজাদাদের সংগীরা আত্মসমর্পনের বিরোধী ছিলেন। তাদের মত ছিল বাইরে বের হয়ে ইংরেজদের সাথে মোকাবেলা করা। চুপচাপ আত্মসমর্পন করা তৈমুরী খান্দানের জন্য অবমাননাকর। সংগীরা বারবার বলছিল, চুপচাপ মরে যাওয়ার চেয়ে লড়ে মরা ভালো। মৃত্যুই যখন হবেই বীরের মৃত্যুই শ্রেয়।
শাহাজাদারা মির্জা এলাহী বখশ ও রজব আলীর কথায় প্রভাবিত হয়। দু ঘন্টা পর তারা আত্মসমপর্নের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।
হাডসন নিজেই লিখেছে, আমি গ্রেফতারীর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। সমাধির সকল প্রবেশপথ আটকে দেয়া হয়। মির্জা এলাহী বখশ ও রজব আলীকে আগেই বলে দিয়েছি, আমি শাহাজাদাদের গ্রেফতার করার জন্য এসেছি এবং যেকোন মূল্যে তা বাস্তবায়ন করেই ছাড়বো।

শাহজাদারা অস্ত্রসমর্পন করেন। তারা প্রানভিক্ষা চাইলেও হাডসন তা কবুল করেনি। তাদের সাথে বেশকিছু তলোয়ার ও বন্দুক ছিল। সেগুলো ইংরেজ বাহিনী জমা নেয়। শাহজাদাদের হাডসনের বাহিনীর সাথে চলার আদেশ দেয়া হয়। বন্দী শাহজাদাদের নিয়ে হাডসনের বাহিনী দিল্লীর দিকে রওনা হয়। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করার পর হাডসন বাহিনীকে থামায়। তারা ততক্ষনে দিল্লী দরজার কাছে পৌছে গেছে। শাহজাদাদের ঘোড়া থেকে নামানো হয়। হাডসন তার সিপাহিদের লক্ষ্য করে বলে, এরাই সেই অপরাধী যারা দিল্লীতে ইংরেজ নারী শিশুদের হত্যা করেছে। মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি। এই বলে সে বন্দুক হাতে কয়েকবার গুলি করে। তিন শাহজাদা সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান ।
পরবর্তীতে হাডসন গল্প ফেদে বসেন যে, জনতার জটলা শাহজাদাদের অনুসরণ করছিল[২১০]। তারা ইংরেজদের উপর হামলা করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু এ যুক্তি

---

[২১০] গবেষক আসলাম পারভেজ লিখেছেন, শাহজাদাদের গ্রেফতার করার পর জনতার একাংশ ইংরেজ বাহিনীর পিছু নেয়। তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ইংরেজ বাহিনীকে অনুসরন করতে থাকে। (বাহাদুর শাহ জাফর, ২৫৩ পৃষ্ঠা)– অনুবাদক

খোপে টেকে না। যদি জনতা হামলা করতেই চাইতো তাহলে হুমায়ুনের সমাধি থেকে বের হওয়ার সময়ই হামলা করতো। কিংবা পথেই হামলা করতো। এমন কোনো প্রমান নেই।[২১১] আর শাহজাদাদের দিক থেকে হামলার আশংকা তো অনর্থক। যারা বিন্দুমাত্র না লড়ে অস্ত্র সমর্পন করেছে পরে তারা খালি হাতে লড়বে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মাওলানা যাকাউল্লাহর বিবরণ অনুযায়ী প্রায় একদিন শাহজাদাদের লাশ বাজারে লটকিয়ে রাখা হয়।[২১২] হাডসন এবার অন্য শাহজাদাদের দিকে মনোযোগ দেয়। দিল্লীর আশপাশ থেকে আরো ২৯ শাহজাদাকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ, অসুস্থ সবাই ছিল। এদের বেশিরভাগই বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলেন না। যেমন দ্বিতীয় আকবর শাহের[২১৩] ভাই মির্জা কায়সার। তিনি ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। বেশিরভাগ সময় তার হুশ থাকতো না। এমনই আরেকজন শাহজাদা মির্জা মাহমুদ শাহ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শাহের নাতী। তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ।কারো সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারতেন না। তাকেও গ্রেফতার করা হয়। এদের সবাইকেই নির্মমভাবে ফাসি দেয়া হয়।
মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের রেকর্ড থেকে জানা যায়, ১৩ অক্টোবর বাদশাহর দুই ছেলেকে ফাসি দেয়া হয়। ১৪ অক্টোবর আরো তিন শাহজাদাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ নভেম্বর ২৪ শাহজাদাকে ফাসি দেয়া হয়। এদের দুজন ছিল বাহাদুর শাহের ভাগনে, দুজন শ্যালক এবং অন্যরয়া ভাতিজা ও অন্যান্য আত্মীয়। এছাড়া কারাগারে বন্দী অবস্থায় মারা গেছে এমন শাহজাদাদের তালিকাও দীর্ঘ।

---

[২১১] আগেরদিন বাহাদুর শাহ জাফর ও যিনাত মহলের গ্রেফতারীতেও জনতা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সেখানে শাহজাদাদের জন্য তাদের হামলার গল্প অনেকটাই হাস্যকর। তখন সবার মানসিক অবস্থা ছিল আগে নিজেকে বাচাতে হবে। খাজা হাসান নিজামি লিখেছেন, বিদ্রোহের পরের সময়টায় দিল্লীবাসি নিজেকে বাচাতেই ব্যস্ত ছিল। বিদ্রোহী কিংবা বাদশাহর প্রতি সকল সমর্থন তারা প্রত্যাহার করে নেয়। তাদের কাজকর্মে মনে হচ্ছিল তারা শুরু থেকেই এই বিদ্রোহের বিরোধী ছিল। (মুকাদ্দামায়ে বাহাদুর শাহ, ১৬ পৃষ্ঠা) -অনুবাদক

[২১২] তারীখে উরুজে ইংলিশিয়া, ২২১।

[২১৩] বাহাদুর শাহ জাফরের পিতা। দ্বিতীয় আকবর শাহের জন্ম ২২ এপ্রিল ১৭৬০, মৃত্যু ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । শাসনকাল ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ – ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর দ্বিতীয় আকবর শাহ ইংরেজদের পেনশনভোগী হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ নিরাপত্তায় তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান ছিলেন । ইংরেজরা তাকে মাসিক এক লাখ রুপি ভাতা দিত। –অনুবাদক

নিযামুল মুলকের হত্যাকান্ডঃ একটি সরল পর্যালোচনা

শুরুর আগের কথা

ইসলামী পয়গাম ঈদসংখ্যা পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে। তাই শুরু করলাম ইশতিয়াক আহমাদের 'যেভাবে খুন হলেন নিযামুল মুলক' দিয়ে। সাবলীল লেখা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গতি ধরে রেখেছেন। হোচট খেলাম একেবারে শেষে এসে। লেখক লিখেছেন, লোকটি কাছে আসতেই নিযামুল মুলক দেখলেন, লোকটি হাসান ইবনে সাবা। নিজামুল মুলকের কাছাকাছি আসতেই তার হাতে বেরিয়ে এলো দুধারী খঞ্জর। হাসান ইবনে সাবা নিজামুল মুলককে জাপটে ধরে তার বাম বুকে দুটি এবং গলার কাছে একটি আঘাত করে। মুহূর্তেই ঘটে গেল ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক একটি হত্যাকান্ড।

একটা ধাক্কা খেলাম। নিযামুল মুলককে হাসান বিন সাবাহর দলের লোকেরা হত্যা করেছে সত্য। কিন্তু স্বয়ং হাসান বিন সাবাহ, নিযামুল মুলকের খুনী এমন তথ্য কোথাও পাইনি। ভাবলাম ইতিহাসগ্রন্থগুলো একটু নেড়ে দেখা যাক। সামান্য অনুসন্ধানে যা পেয়েছি তা নিয়ে এই লেখা। বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নিযামুল মুলক ও হাসান বিন সাবাহর পরিচয় জেনে আসা যাক।

নিযামুল মুলক

নিযামুল মুলকের জন্ম ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে (৪০৮ হিজরী)। তুস শহরে। ১১ বছর বয়সে হিফজ শেষ করেন। এরপর তাফসীর, হাদিস ও শাফেয়ী ফিকহে পান্ডিত্য অর্জন করেন।[২১৪] প্রথমদিকে তিনি গজনীর সুলতানদের অধীনে চাকরি করতেন। পরে সেলজুকি সাম্রাজ্যের উজির হন। আলপ আরসালান (১০৬৩-১০৭২) ও মালিক শাহ সেলজুকির(১০৭২-১০৯২) রাজত্বকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে

---

[২১৪] **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, ১৬শ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ।

ছিলেন। উজিরের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।
বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে স্থাপিত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম প্রধান কীর্তি। আলেমদের খুব সম্মান করতেন। আজানের শব্দ শুনলে সব কাজ থামিয়ে দিতেন।[২১৫] রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর লিখিত তার সিয়াসতনামা গ্রন্থটি তার পান্ডিত্যের প্রমান বহন করে। ৪৮৫ হিজরির ১০ রমজান (১৪ অক্টোবর ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ইসফাহান থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

হাসান বিন সাবাহ

হাসান বিন সাবাহর জন্মসাল সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থগুলো নীরব। কারো কারো মতে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। তার পিতা ছিলেন শিয়াদের ইসনা আশারা মতবাদে প্রভাবিত। হাসান পিতার
কাছ থেকে এই মতবাদ গ্রহন করে। পরে আরেক বরেন্য ইসমাইলী ব্যক্তিত্ব আব্দুল মালেক বিন আত্তাশের কাছে বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি এই মতবাদের দীক্ষা নেয়। ৪৭১ হিজরীতে সে মিসরে সফর করে। ফিরে এসে সে একটি গুপ্তঘাতক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। এর সদস্যদের হাশিশ নামক মাদক পান করানো হতো তাই তার অনুসারীদের হাশাশিন বলা হতো। সে সেলজুকি সাম্রাজইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে।
পারস্যের আলামুত নামে একটি পার্বত্য দুর্গ দখল করে একে তার অনুসারিদের জান্নাত ঘোষনা দেয়। অনেক লড়াই ও যুদ্ধ করেও তাকে দমানো যায়নি। ১২ জুন ১১২৪ (২৬ রবিউস সানি ৫১৮ হিজরি) তে হাসান বিন সাবাহ মারা যায়। তার মৃত্যতে হাশাশিনরা, যাদেরকে ফেদাইনও বলা হতো, তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।[২১৬]
নিযামুল মুলকের একটি প্রাচীন অসিয়ত থেকে জানা যায়, উমর খৈয়াম, হাসান বিন সাবাহ ও নিযামুল মুলক বাল্যকালে একই মক্তবে পড়াশোনা করতেন।উর্দু উপন্যাসিকদের অনেকেই এই তথ্য বেশ জোরের সাথে প্রচার করেছেন। যেমন উর্দু উপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ তার ‘ফিরদাউসে ইবলিস’ গ্রন্থে, আলমাস এম এ তার ‘হাসান বিন সাবাহ’ গ্রন্থে, ইলিয়াস সীতাপুরী তার ‘রাগ কা বদন’ গ্রন্থে এমন তথ্য দিয়েছেন।

---

[২১৫] **আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত,** ১২শ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা– সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সফাদি। দার এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

[২১৬] নিযামুল মুলক, ৩১৪-৩১৫ পৃষ্ঠা — ড. আব্দুল হাদি মুহাম্মদ রেজা। দারুল মিসরিয়্যা, কায়রো।

তবে গবেষকদের মধ্যে এই তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। হাসান বিন সাবাহর সাথে নিযামুল মুলকের বয়সের পার্থক্যের কারনে তিনজনের সহপাঠী হওয়ার সম্ভাবনা কম। নিযামুল মুলকের অসিয়তে উল্লেখিত হাসান অন্য কেউও হতে পারেন। এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করে
ছেন সাইয়েদ সোলাইমান নদভী তার 'উমর খৈয়াম' গ্রন্থের ২০-৩০ পৃষ্ঠা এবং ড. আব্দুল হাদি মুহাম্মদ রেজা তার 'নিযামুল মুলক' গ্রন্থের ৩০৭-৩০৯ পৃষ্ঠায়।

নিযামুল মুলকের খুনী

নিযামুল মুলকের হত্যাকান্ড ঘটে ৪৮৫ হিজরীর ১০ রমজানে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য দেখা যাক।

ইবনে কাসীর লিখেছেন, ৪৮৫ হিজরীর রমজানে সুলতান মালিক শাহ সেলজুকি ইস্ফাহান থেকে বাগদাদের দিকে রওনা হন। এসময় তার সাথে ছিলেন নিযামুল মুলক। কাফেলা নিহাওয়ান্দের কাছে এক গ্রামে এসে পৌছায়। নিযামুল মুলক বলেন, হজরত উমরের (রা) শাসনামলে এখানে অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছেন। কতই না উত্তম তারা।
১০ম রোজায় ইফতার শেষে নিযামুল মুলক তাবুর দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় এক কুর্দী বালক এসে তার কাছে সাহায্য চায়। তিনি বালকের দিকে এগিয়ে যেতেই সে নিযামুল মুলকের পেটে ছুরি মারে। নিযামুল মুলক মাটিতে পড়ে যান। বালক পালাতে গিয়ে তাবুর রশিতে পা আটকে পড়ে যায়। তাকে ধরে ফেলা হয় এবং হত্যা করা হয়। এই বালক ছিল ফেদাইন। সুলতান মালিক শাহ সংবাদ পেয়ে নিযামুল মুলকের তাবুতে ছুটে আসেন। সুলতানের সামনেই নিযামুল মুলক প্রাণত্যাগ করেন।[২১৭]
হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবীও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, সেরাত ছিল জুমার রাত। আহত হওয়ার পর নিযামুল মুলকের প্রথম কথা ছিল আমার খুনিকে তোমরা কিছু বলো না। আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি।[২১৮] অন্যত্র তিনি

---

[২১৭] **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, ১৬শ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা।

[২১৮] **সিয়ারু আলামিন নুবালা,** ১৯শ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

লিখেছেন, এই হত্যার পেছনে সুলতান মালিক শাহ সেলজুকি জড়িত বলে গুজব আছে।[২১৯]

ইবনে আসীর হত্যাকান্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তার বর্ননাতেও ভিক্ষার পাত্র হাতে উপস্থিত কুর্দি বালকের কথাই আছে।[২২০]

ইবনুল জাওযি এই হত্যাকান্ডের বিবরণে কুর্দি বালকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিও লিখেছেন সুলতান মালিক শাহ নিযামুল মুলকের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই হত্যায় তার যোগসাজশ থাকতে পারে।[২২১]

ইবনে খালদুন লিখেছেন, নিযামুল মুলক রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করতেন। সম্ভবত এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুলতান তাকে হত্যা করেন। তার হত্যার বিবরনেও কুর্দি বালকের উল্লেখ আছে।[২২২]

ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, এই হত্যাকান্ডে সুলতানের হাত আছে।[২২৩]

ঐতিহাসিক সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সাফাদিও কুর্দি বালকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই হত্যাকান্ডের সাথে খলীফার যোগসাজশ ছিল। নিযামুল মুলকের দীর্ঘ হায়াতে খলিফা বিরক্ত ছিলেন।[২২৪]

ইবনে তাগরি বারদি লিখেছেন, কুর্দি বালকের হাতে একটি ভিক্ষার পাত্র ছিল।[২২৫]

---

[২১৯] **তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম,** ৩৩শ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত।

[২২০] **আল কামেল ফিত তারিখ**, ৮ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা– ইবনুল আসীর জাযারি। দাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[২২১] **আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম**, ১৬শ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা– আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[২২২] **তারীখে ইবনে খালদুন,** ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা– আবদুর রহমান ইবনে খালদুন। উর্দু অনুবাদ, নাফিস একাডেমী, করাচি।

[২২৩] **ওফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান,** ২য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা– আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে খাল্লিকান। দার সাদের, বৈরুত।

[২২৪] **আল ওয়াফি বিল ওফায়াত**, ১২শ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা– সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সাফাদি। দার এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২২৫] **আন নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা,** ৫ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা– ইবনে তাগরি বারদি। ওয়াজারাতুস সিকাফাহ, কায়রো।

আবদুল্লাহ বিন আসআদ ইয়ামানি হত্যার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, তাজুল মুলকের সাথে নিযামুল মুলকের দ্বন্দ ছিল। অনেকের মতে তাজুল মুলকই এই হত্যাকান্ড ঘটায়।[২২৬]

প্রখ্যাত আরব লেখক ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবীও নিযামুল মুলকের হত্যাকান্ডের ঘটনায় কুর্দী বালকের কথা উল্লেখ করেছেন।[২২৭]

নেপথ্যে কে?

ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি থেকে পরিস্কার , নিযামুল মুলকের হত্যাকারী এক কুর্দী বালক যে কিনা ফেদাইন গ্রুপের সদস্য ছিল। হাসান বিন সাবাহ, নিযামুল মুলকের হত্যাকারী নয়। ফেদাইনরা ছিল গুপ্তঘাতক। তারা রাজনৈতিক কারনে ও নগদ অর্থের বিনিময়ে হত্যা করতো।[২২৮]

নিযামুল মুলকের হত্যায় ভাড়াটে খুনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। আড়ালে কে রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। ঐতিহাসিকরা নানা অনুমান করেছেন, যেমনটা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সকল বর্ননা পর্যালোচনা করে ড. আব্দুল হাদি মুহাম্মদ রেজা সন্দেহের তীর ছুড়েছেন তিনজনের দিকে। তাজুল মুলক, হাসান বিন সাবাহ ও সুলতান মালিক শাহ।[২২৯]

নিযামুল মুলকের সাথে তাদের তিনজনেরই দ্বন্দ ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। মূল বিষয় এটাই যে হাসান বিন সাবাহ নিজে সরাসরি নিযামুল মুলককে হত্যা করেনি। এই তথ্য কোনো ইতিহাসগ্রন্থ ও কিংবা ঐতিহাসিক সমর্থন করেন না।

---

[২২৬] **মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান ফি মারিফাতি মা ইউতাবারু মিন হাওয়াদিসিজ জামান,** ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা– আবদুল্লাহ বিন আসআদ বিন আলী বিন সোলাইমান ইয়ামানী। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[২২৭] **দাওলাতুস সালাজিকা,** ১২৪ পৃষ্ঠা– ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী। দার ইবনুল জাওযি।

[২২৮] **হারাকাতুল হাশশাশিন**, ৩৫ পৃষ্ঠা- মুহাম্মদ উসমান খশত। মাকতাবা ইনসানিয়্যা, কায়রো।

[২২৯] **নিযামুল মুলক**, ৫৬১-৫৬২ পৃষ্ঠা — ড. আব্দুল হাদি মুহাম্মদ রেজা। দারুল মিসরিয়্যা, কায়রো।

মুসলিম শাসনামলে পুলিশ বিভাগ

মুসলিম শাসনামলে পুলিশ বিভাগ ছিল খুবই শক্তিশালী। এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল জনগনের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপরাধীদের শায়েস্তা করা। মুসলমানদের পূর্বে মিসর ও রোম সভ্যতায় এ ধরনের বিভাগের অস্তিত্ব ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যে শাসকরা এই বিভাগকে ঢেলে সাজান। একে করে তোলেন শক্তিশালী।

বিভিন্ন বর্ননা থেকে দেখা যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর থেকেই মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তখন পুলিশবিভাগের সুশৃংখল ও নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো না থাকলেও বিভিন্ন সময় সাহাবিরা এমনকিছু দায়িত্ব পালন করেছেন যা এই বিভাগের কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।যেমন শুরুর দিকে কয়েকজন সাহাবি, নবিজির ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন। বিভিন্ন সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা পাহারা দেয়ার জন্য অনেক সাহাবিকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সহিহ বুখারিতে আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ননা এসেছে, কাইস ইবনু সাদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এরুপ থাকতেন, যেভাবে আমিরের (রাষ্ট্রপ্রধান) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।[২৩০]

এই হাদিসের ব্যখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানি (র) লিখেছেন, নবিজির যুগে পুলিশ বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না। এর শুরু বনু উমাইয়ার শাসনামলে। হাদিসের

---

[২৩০] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৭১৫৫- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি। দার ইবনু কাসির, ১৪২৩ হিজরি।

বর্ননাকারী আনাস বিন মালেক (রা) শ্রোতাদের সামনে কাইস ইবনু সাদের প্রকৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য পুলিশ প্রধানের সাথে তুলনা করেছেন।[২৩১]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে আমরা দেখি, হজরত উমর (রা) নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করতেন। রাতের বেলা মদিনার অলিগলিতে হেটে বেড়াতেন।

হজরত মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে এই বিভাগকে তিনি সুশৃঙ্খল কাঠামো দেন। তিনি তার দরবারে প্রহরী নিযুক্ত করেন। উমাইয়া খলিফারা এই ধারা অব্যাহত রাখেন। ১১০ হিজরিতে খালেদ বিন আবদুলাহ্ বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩২] ১৩২ হিজরিতে সালেহ বিন আবদুলাহ্ আসকার শহর নির্মাণ করলে সেখানে তিনি পুলিশ বিভাগের জন্য পৃথক একটি ভবন নির্মাণ করেন। এই ভবনের নাম ছিল দারুশ শুরতাহ্।

আব্বাসি শাসনামলে এই বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা হয়। খলিফা আবু জাফর মানসুর একবার বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত রাখেন চারজন। কাজি, যিনি সঠিক ফায়সালা করতে নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেন না। পুলিশ প্রধান, শক্তিশালীদের দূর্বলের উপর জুলুম করা থেকে আটকান। খেরাজ আদায়কারী, যিনি প্রজাদের উপর জুলুম করেন না। ডাক বিভাগের প্রধান, যিনি সাম্রাজ্যের সকল খবরাখবর সঠিকভাবে পৌছে দেন।

সেকালে পুলিশ বিভাগের কাজ এ যুগের মতই ছিল। তারা খলিফা ও আমিরদের নিরাপত্তা দিতেন, রাতের বেলা শহর পাহারা দিতেন, অপরাধিদের গ্রেফতার করতেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে টহল দিয়ে দেখতেন কেউ শরিয়াহ বিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত আছে কিনা। ফাতেমি সাম্রাজ্যে পুলিশরা আগুন নেভানোর কাজও করতেন। অনেক সময় তারা এশার নামাজের পর মশাল জ্বেলে জেগে থাকতেন। তাদের সাথে থাকতো ভিস্তিওয়ালা। যদি রাতের বেলা কোথাও আগুন লাগে, তাহলে যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া যায়, সেজন্য প্রায়ই পুলিশের কিছু কিছু সদস্য জেগে থাকতেন। পুলিশ-প্রধানের পদটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় পুলিশ-প্রধানকে বলা হতো হাকিম। আন্দালুসে বলা

---

[২৩১] ফাতহুল বারি, ১৩/১৩৫ - আহমাদ বিন আলি বিন হাজার আসকালানি। আল মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা।

[২৩২] মা যা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম, পৃ- ৫০৩- ডক্টর রাগেব সিরজানি। মুআসসাসাতু ইকরা, ১৪৩০ হিজরি।

হত সাহিবুল মদিনা বা নগর-রক্ষক। মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় তাদের বলা হতো ওয়ালি।

পুলিশ-প্রধান নিয়োগের সময় সাধারণত আলেম ও ফকিহদের প্রাধান্য দেয়া হত। কখনো কখনো সেনাপতিদেরকেও নিয়োগ দেয়া হত। এসময় তাদের সাহসিকতা, কঠোর স্বভাব ও দৃঢ়তার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হত। পুলিশ কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ, বাগদাদের পুলিশ প্রধান মুহাম্মদ বিন ইয়াকুত কে অপসারণ করেছিলেন কারণ তার চারিত্রিক সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । এছাড়া বিভিন্ন সময় জুলুমের সাথে তার সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছিল। এই বিভাগে নিয়োগ দেয়া হত সতর্ক ও বিচক্ষণ লোকদের। বিচক্ষণতা ও কাজের উপর ভিত্তি করে অনেকসময় তাদের পদোন্নতি হত। উমাইয়া খলিফাদের কেউ কেউ তাদের পুলিশ-প্রধানকে পরে কাজি নিয়োগ দিয়েছিলেন।

মুসআব বিন আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরি ছিলেন খলিফা মারওয়ান বিন হাকামের সময় পুলিশ-প্রধান। তাঁর কর্মস্থল ছিল মদীনা। ইকরামা বিন রিবয়ির দায়িত্ব ছিল ইরাকে। তাকে নিযুক্ত করেছিলেন বাশার বিন মারওয়ান। কা'কা বিন যারার ছিলেন কুফার পুলিশ-প্রধান। তিনি মদ্যপদের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর ছিলেন। দানশীল বলে তাঁর সুনাম ছিল। ওমর বিন যায়দ আসাদি ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পুলিশ-প্রধান। কৃপণ বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। একদিন শহরের বেশকিছু মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসে। তিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি আগন্তুকদের খেজুর সাধলেন না। শহরবাসী কিছু দাবী নিয়ে এসেছিল তিনি তা পূরণ করলেন না। আগত এই দলে ছিলেন হাকাম বিন আদল নামে এক কবি। তিনি ওমর বিন যায়দ আসাদির কৃপণতাকে কটাক্ষ করে লিখলেন

'পেয়ালা ভরা খেজুর ছিল, আমরা যখন তার কাছে যাই,

খেতে দাওয়াত দেয়নি ওমর, দেয়ার কোনো ইচ্ছেও নাই।

তার দেহে দুই পোষাক ছিল, ইতরতা আর ভীরুতা,

কৃপণ যদি না হতো সে, তবে হত সবার নেতা'।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফও শুরু জীবনে কিছুদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করেছেন। সে সময়ও জুলুমের কারনে তার কুখ্যাতি ছিল। আবদুর রহমান তামিমি ছিলেন হাজ্জাজের আমলে কুফার পুলিশপ্রধান। মালিক বিন মুনজিরকে খালিদ বিন আবদুল্লাহ পাঠিয়েছিলেন বসরার পুলিশ প্রধান নিযুক্ত করে। তার উপর আদেশ

ছিল কবি ফারাযদাককে বন্দি করতে হবে। তিনি এই আদেশ বাস্তবায়ন করেছিলেন। তবে কিছুদিন পরে তাকে অপসারিত করে বন্দি করা হয়। ১১০ হিজরিতে কারাগারেই তিনি মারা যান।

ইসহাক বিন ইবরাহিম দীর্ঘসময় বাগদাদের পুলিশপ্রধান ছিলেন। তিনি একাধারে খলিফা মামুন, মুতাসিম, ওয়াসিক ও মুতাওয়াক্কিলের সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খলিফাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তার সুনাম ছিল। ২১৫ হিজরিতে খলিফা মামুন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে ইসহাক বিন ইবরাহিমকে তিনি বাগদাদ শহরের দায়িত্ব দিয়ে যান। বাবাক খুররামির সাথে লড়াইয়ের সময় খলিফা মুতাসিম তাকে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। ২৩৫ হিজরি তথা ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্রকে তার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

আল্লাম মাকরেজি। মিসরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তার লিখিত 'আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার' এবং 'আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক' এখনো মামলুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানার জন্য আকর গ্রন্থ বলে পরিচিত। তিনি বিভিন্ন সময় প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে চাকরি করেছেন। কিছুদিন তিনি পুলিশবিভাগেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এসময় তিনি বাজার ও নগর ব্যবস্থাপনা তদারকি করতেন। আহমান বিন ইবান ছিলেন আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম। খলিফা হাকাম বিন মুস্তানসিরের শাসনামলে তিনি কর্ডোভার পুলিশপ্রধান ছিলেন। এমনই আরেকজন আলেম ছিলেন আবদুর রহমান বিন খালেদ। হাদিস শাস্ত্রে তিনি দক্ষ ছিলেন। ১০৯ হিজরিতে তাকে মিসরের পুলিশপ্রধান নিযুক্ত করা হয়।[২৩৩]

পুলিশপ্রধানদের নিয়োগ দুই পদ্ধতিতে হতো। কখনো খলিফা সরাসরি নিয়োগ দিতেন। আবার কখনো উযির বা গভর্নররা নিয়োগ দিতেন। খলিফা কাউকে নিয়োগ দিলে খলিফার মৃত্যুর পরেও তাকে অপসারণ করা হতো না। তবে উযিরদের মাধ্যমে নিয়োগ পেলে খলিফার মৃত্যুর পর তাদেরকে সেই পদ থেকে সরানো হত।

সেসময় পুলিশবিভাগের সদস্যদের মধ্যে বেশকিছু গুনের দিকে লক্ষ্য করা হত। ইবনু আবির রবি খলিফা মুতাসিমের জন্য একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এর নাম সুলুকুল মালিক ফি তাদরিবিল মামালিক। সেখানে তিনি পুলিশপ্রধানের গুনাবলি

---

[২৩৩] আশ শুরতাহ ফিল ইসলাম, ১৩-২৮

আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তাকে হতে হবে ধৈর্য্যশীল, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তিনি হাসবেন কম, চিন্তা করবেন বেশি। পাপাচার থেকে দূরে থাকবেন। শহরে কারা আসছে এসব সম্পর্কে অবগত থাকবেন। হুদুদ ও ফারায়েজগুলো তার জানা থাকবে।

পুলিশের লোকেরা এক ধরনের বড় ছুরি বহন করতেন সাথে। একে তবারজিন বলা হত। এছাড়া তাদের সাথে অস্ত্র বলতে থাকতো, তরবারী, বর্শা, তীর, চাবুক ও দড়ি। পুলিশ বাহিনীর কাছে মিনজানিকও থাকতো। তবে তা ব্যবহার করা হতো বড় কোনো লড়াই বা বিদ্রোহ সামাল দেয়ার সময়। যেমন খলিফা আমিন ও মামুনের মধ্যকার লড়াইয়ে মিনজানিক ব্যবহার করা হয়েছিল।[২৩৪]

মুসলিম শাসনামলে পুলিশবিভাগের জন্য বড় অংকের বাজেট বরাদ্দ ছিল। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসুরের সময় এই বিভাগের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫ লাখ দিরহাম। খলিফা হারুনের শাসনামলেও বরাদ্দের পরিমান এমনই ছিল। খলিফা মুতাসিমের শাসনামলে পুলিশদের মাসিক বেতন ছিল ৫০ দিনার। তখন এই বিভাগে মাসিক ৬ হাজার দিনার ব্যয় করা হত। বেতনের বাইরেও পুলিশপ্রধানদেরকে খলিফা হাদিয়া দিতেন।। খলিফা মাহদি একবার তার পুলিশপ্রধান আবদুল্লাহ বিন মালিককে ৪০ হাজার দিরহাম উপহার দেন।[২৩৫]

পুলিশপ্রধান হতেন তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারি। এমন এক পুলিশপ্রধানের ঘটনা লিখেছেন ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা তার ‘আত তুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, খলিফা মুকতাফির শাসনামলে চুরি বেড়ে গেল। প্রচুর চুরি হচ্ছিল। খলিফা পুলিশপ্রধানকে আদেশ দিলেন যে করে হোক চোরদেরকে গ্রেফতার করো। আদেশ পেয়ে পুলিশপ্রধান একা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে থাকেন। একদিন তিনি একটি সংকীর্ণ, নিরিবিলি গলিতে প্রবেশ করেন। গলির একটি বাড়ির সামনে প্রচুর মাছের কাটা দেখলেন। একইসাথে মাছের মেরুদন্ডের বড় একটি কাটাও পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে যে কাঁটা দেখা যাচ্ছে এই মাছটির দাম কেমন হবে? লোকটি জবাব দিল, এক দিনার। পুলিশপ্রধান বললেন, এই গলিতে মানুষের জীবনযাত্রার যে মান তাদের পক্ষে এক দিনার দিয়ে এই মাছ ক্রয় করা

---

[২৩৪] নাশআতুন ওয়া তাতওয়ারু জিহাযিশ শুরতাহ ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ- ২০১-২০৩ – ডক্টর ইসমাইল হুসাইন মুস্তফা। আম্মান, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩৫] আন নাফাকাত ওয়া ইদারাতুহা ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যা, পৃ-৩৭২,৩৭৩ – ডক্টর যাইফুল্লাহ ইয়াহইয়া যাহরানি। মাকতাবাতুত তালিবিল জামি, ১৪০৬ হিজরি, মক্কা মুকাররামা।

সম্ভব নয়। এখানে মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচই কুলিয়ে উঠতে পারে না। এত বড় মাছ খাওয়ার সুযোগ কই তাদের। এখানে কোনো রহস্য আছে। সেই রহস্য জানা লাগবে আমার। এই বলে তিনি গলির আরেকটি বাড়িতে গেলেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিল। তিনি পানি চাইলেন। মহিলা পানি এনে দিলে পুলিশপ্রধান মহিলার সাথে গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বাড়িতে কে থাকে? বলে তিনি যে বাড়ির সামনে মাছের কাঁটা দেখেছেন সেই বাড়ির দিকে ইশারা করলেন।

মহিলা বললেন, এই বাড়িতে ৫ জন যুবক থাকে। সম্ভবত তারা ব্যবসায়ী। তারা একমাস ধরে এখানে আছে। দিনের বেলা তাদেরকে দেখাই যায় না। তাদের কেউ বের হলেও দ্রুত আবার ফিরে আসে। তারা সারাদিন ঘরেই থাকে। আড্ডা দেয়, দাবা খেলে। তাদের খেদমতের জন্য অল্পবয়সী একজন চাকরও আছে। রাতের বেলা তারা কারখ শহরে তাদের আরেক বাড়িতে চলে যায়। এই বাড়িতে শুধু সেই চাকর থাকে। ভোরের দিকে তারা ফিরে আসে।

পুলিশপ্রধান মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ১০ জন পুলিশসহ সেই বাড়িতে যান। দরজায় টোকা দিতেই এক বালক ভৃত্য দরজা খুলে দেয়। পুলিশ সদস্যরা দ্রুত সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সেই পাঁচজন যুবকের সবাইকেই আটক করা হয়। ঘর তল্লাশি করতেই নিশ্চিত হলেন এরাই কিছুদিন ধরে শহরে চুরি করে আসছিল। এভাবে পুলিশপ্রধানের বুদ্ধিমত্তায় একটি রহস্যের মীমাংসা হলো।[২৩৬]

---

[২৩৬] মা যা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম, পৃ- ৫০৬- ডক্টর রাগেব সিরজানি। মুআসসাসাতু ইকরা, ১৪৩০ হিজরি।

দরিয়ারে সাইহুন (সাইর নদী) , আর দরিয়ায়ে যাইহুনের (আমু দরিয়া) মধ্যবর্তী অঞ্চল। এর আরেক নাম ট্রান্স অক্সিয়ানা। ম্যাপে যতবার এই এলাকা দেখি, বুকের ভেতর আবেগ ছলকে উঠে। এই পুরো অঞ্চলের সাথে মিশে আছে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বর্নালী অংশ।

এখানেই অবস্থিত সমরকন্দ, যেখানে জন্মেছেন ফকিহ আবু লাইস সমরকন্দির মত বিখ্যাত ফকিহ। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ইমাম বুখারীর জন্মস্থান বুখারা। এই শহরেই ইলমের অন্বেষনে ছুটে এসেছিলেন ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি। পরবর্তীকালে যিনি লিখেছিলেন বাদাইয়ুস সানায়ের মত জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। বুখারা ও সমরকন্দের মাঝে দেখা যাচ্ছে সুগদ। ৭২১ হিজরীতে সাইদ বিন আমর আল হারাশি এখানে যুদ্ধ করেছেন। তেজোদীপ্ত ভাষণ দিয়ে সেনাবাহিনীকে চাংগা করেছেন। আমু দরিয়ার যে অংশ আফগানিস্তানের সাথে মিলেছে তার পাশেই অবস্থিত ইমাম তিরমিযির জন্মস্থান তিরমিয। তিরমিযের দক্ষিণে কাবুল, কাবুলের দক্ষিণে গজনী। সুলতান মাহমুদ গজনবীর শহর। হাকিম সানাইর সুরের লহরী খেলা করতো যেখানে। সাইর নদীর অপর প্রান্তে দেখা যায় শাস, উসুলুশ শাসীর প্রণেতা নিজামুদ্দিন শাসীর জন্মস্থান। শাস থেকে বেশ দূরে ফারগানা। যে শহর জন্ম দিয়েছিল শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দিন মারগিনানিকে। তিনি লিখেছেন ফিকহে হানাফির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়া। দূরে কাশগড়, যেখানে মিশে আছে কুতাইবা বিন মুসলিমের স্মৃতি। আমু দরিয়ার এপাশে নিশাপুর। ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের শহর। এখানেই জন্মেছেন হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী। আল মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইনের লেখক। বেশ উত্তরে খাওয়ারেজম। ৯৩ হিজরীতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তার সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিমকে পাঠিয়েছিলেন খাওয়ারেজম জয় করতে। রক্তপাত ছাড়াই জয় হয়েছিল এই অঞ্চল। এখানেই শাসন করেছেন সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ। তাতারী ঝড়ের মুখে যিনি পাথরের প্রাচীর হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই অঞ্চল হাজারো মুহাদ্দিসের জন্মভূমি। হাজারো ফকিহর আবসস্থল। এখানকার খানকাহগুলো সজীব রেখেছিলেন নকশবন্দী তরিকার সুফিরা।

মুসলিম বিশ্বে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি

মূল: মানাজির আহসান গিলানী র.
রুপান্তর: ইমরান রাইহান

(মানাজির আহসান গিলানীর জন্ম বিহারের গিলান নামক গ্রামে, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। পড়াশোনা করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দে। তার উস্তাদদের মধ্যে আছেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী, মুফতি আজিজুর রহমানের মত বরেন্য আলেমগন। আল্লাহ তাকে অসাধারণ লেখনি শক্তি দান করেছিলেন। ইতিহাসে তার ব্যাপক পড়াশোনা ছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে লিখিত 'হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত' বইটি তার অবিস্মরনীয় কীর্তি। এছাড়া 'আন নাবিয়্যুল খাতিম' 'ইমাম আবু হানিফা কি সিয়াসি জিন্দেগী' 'তাদবীনে ফিকহ' 'মুসলমানো কি ফিরকাবন্দিয়ো কা আফসানা' 'তাজকিরায়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ' 'হাজার সাল পেহলে' 'সাওয়ানেহ কাসেমী' ইত্যাদী তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তার সাওয়ানেহ আবু জর গিফারী পড়ে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করেছিলেন, একজন ধীমান গবেষকের আগমনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তার সম্পর্কে শায়খ আবুল হাসান আলি নদভীর মূল্যায়ন হলো, তিনি লেখকদের লেখক, গবেষকদের গবেষক, ঐতিহাসিকদের ঐতিহাসিক। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।)

পূর্বাভাস

আমরা এখানে ভারতবর্ষের এমন কজন আলেমের আলোচনা করবো যারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে সুনাম কুড়িয়েছেন। নিজের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহন করেছেন কিন্তু পড়াশোনা করেছেন অন্য অঞ্চলে এমন আলেমদের আলোচনা এখানে আসবে না। এখানে শুধু তাদের আলোচনাই আসবে যাদের শিক্ষাজীবনের পুরোটাই কেটেছে ভারতবর্ষে। চলুন এমন কজন আলেমের সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

মিসরে এক ভারতীয় আলেম

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মিসর। মিসরে ইসলামের আগমনের পর থেকেই বড় বড় আলেমরা জন্ম নিয়েছেন মিসর ভূমিতে। বিশেষ করে আমরা যে সময়ের কথা বলছি অর্থাৎ হিজরী সপ্তম শতাব্দী, সেই সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা ইবনে খালদুনের বক্তব্য হচ্ছে, 'বর্তমান সময়ে (অর্থাৎ হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী) মিসর

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সবার শীর্ষে অবস্থান করছে'।[২৩৭] সেই সময়ের কথা। ভারতের একজন আলেম পৌছলেন মিসরে। তার নাম সিরাজ হিন্দী। আল্লামা তাশ কুবরাযাদাহ লিখেছেন, 'সিরাজ হিন্দী পড়াশোনা করেছেন ভারতবর্ষে। তার উস্তাদদের মধ্যে ওয়াজিহ রাজি, সিরাজ সাকাফী ও রোকন বাদায়ুনি উল্লেখযোগ্য'।[২৩৮]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তিনি যখন কায়রোতে উপস্থিত হন তখনো তার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয়নি।[২৩৯] তাশ কুবরাযাদাহ তার মিসরে আগমনের যে সাল বর্ননা করেছেন তার সাথে জন্মসাল মিলিয়ে বুঝা যায় তখন সিরাজ হিন্দীর বয়স ছিল ছত্রিশ বছর।

ভারতবর্ষের এই আলেম, যার পড়াশোনা হয়েছে ভারতবর্ষের পাঠ্যক্রমেই তিনি আসকার অঞ্চলের কাজী নিযুক্ত হন। তার এই কাজী নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর আগমনের পর থেকেই মিসরে শাফেয়ী আলেমদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালে আলেমরা তরহা নামক একপ্রকার চাদর মাথায় বেধে নিতেন, যা ছিল তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিক। মিসরে শুধু শাফেয়ী মাজহাবের আলেমদেরই এই চাদর পরিধানের অধিকার ছিল। রাজধানী কায়রোতে যদিও হানাফী মাজহাবের আলেমদের কাজি নিযুক্ত করা হতো কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে শুধু শাফেয়ী আলেমরাই কাজি নিযুক্ত করার অধিকার রাখতেন। এছাড়া এতিমদের সম্পদের দেখভালের দায়িত্বও শুধু শাফেয়ী কাজিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।সিরাজ হিন্দীই প্রথম হানাফী আলেম যিনি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই নিয়ম ভেংগে দেন। তার ইলম ও ব্যক্তিত্বে শাসকরাও প্রভাবিত হয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, 'সিরাজ হিন্দী সকলের মনোযোগ আকর্ষন করেন, তিনিও শাফেয়ী আলেমদের মত মিসরের অন্যান্য অঞ্চল কাজি নিযুক্ত করা শুরু করেন, তিনি তরহা পরেন এবং এতিমদের সম্পদের দেখভাল শুরু করেন।[২৪০]

এই ভারতীয় আলেম মিসরে হৈ চৈ ফেলে দেন। ইবনে হাজার আসকালানী লিখছেন, 'সিরাজ হিন্দী জামে আহমাদ ইবনে তুলুনের দেখভালের বিষয়ে প্রশাসনের সাথে আলাপ করেন। তিনি নকীব আশরাফের কাছ থেকে এর ওয়াকফ

---

[২৩৭] আল মুকাদ্দিমা, ৪৭৯ পৃষ্ঠা, মিসর।

[২৩৮] মিফতাহুস সাআদাহ, ৫৯ পৃষ্ঠা।

[২৩৯] আদ দুরারুল কামিনা, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

[২৪০] আদ দুরারুল কামিনা, ৩য় খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

দেখভালের দায়িত্ব ফিরিয়ে নেন'[২৪১]। ইবনে হাজার আসকালানী আরো লিখেছেন, ৮৮১ হিজরীতে সিরাজ হিন্দী জামে আহমাদ ইবনে তুলুনে তাফসিরের দরস দেয়া শুরু করেন। সিরাজ হিন্দী আরবী ভাষায় কথা বলতে পারংগম ছিলেন। স্বয়ং ইবনে হাজার আসকালানী তার বাগ্মীতার প্রশংসা করেছেন। সিরাজ হিন্দী হেদায়ার একটি শরাহ লেখার কাজ শুরু করেন কিন্তু এটি শেষ করে যেতে পারেননি। এছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি বেশকিছু বইপত্রে রচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইমাম মুহাম্মদ রচিত জামে কাবির ও জামে সগিরের দুটি শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

দামেশকে এক ভারতীয় আলেমের অবিস্মরনীয় কীর্তি

হিজরী সপ্তম শতকেরই কথা। তাতারী হামলায় বিপর্যস্ত মুসলিমবিশ্ব। পতন ঘটেছে দারুল খিলাফাহ বাগদাদের। বুখারা, সমরকন্দ, মার্ভের মতো ঐতিহ্যবাহী শহরগুলো লন্ডভন্ড। গোবী থেকে ধেয়ে আসা তাতারী ঝড় থেকে শুধু মিসর ও সিরিয়া নিরাপদ ছিল। সিরিয়া তখন ইলমের মারকায। শাইখুল ইসলাম হাফেজ তকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাভী, হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসিরের মত বরেণ্য আলেমরা তখন দামেশকে ইলমের আলো ছড়াচ্ছেন। চারপাশে শুধু ইলমের চর্চায় নিমগ্ন সাধকদের দেখা মিলছে। এসময় এক ভারতীয় আলেম পৌছলেন দামেশকে। তার নাম শায়খ সফিউদ্দিন। জন্ম ৬৪৪ হিজরীতে। শিক্ষাজীবনের পুরোটাই কেটেছে ভারতবর্ষে। যার পাঠ্যক্রমে হাদিসের শুধু মিশকাত কিতাব পড়ানো হত। ফিকহে শরহে বেকায়া ও হেদায়া এবং তাফসিরে শুধু জালালাইন পড়ানো হত। ২২ বছর বয়সে শায়খ সফিউদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইয়ামানে পৌছান। ইয়ামানে তখন আল মালিকুল মুজাফফরের শাসন চলছে। তিনি শায়খ সফিউদ্দিনের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন। ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন, আল মালিকুল মুজাফফর তাকে অনেক সম্মান করেন এবং নয়শো আশরাফী উপহার দেন।[২৪২]

ইয়ামান থেকে তিনি মক্ককায় যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে কায়রোর পথ ধরেন। সেখান থেকে যান আনোতোলিয়া। এভাবে দীর্ঘ সফর শেষে তিনি দামেশকে আসেন এবং এখানেই স্থায়ী হন। একটু আগেই আমরা বলেছি দামেশকে তখন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমরা অবস্থান করছেন, দরস দিচ্ছেন। শায়খ সফিউদ্দিন এতসব প্রতিভার ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। বরং নিজের যোগ্যতায় সমুজ্জ্বল হয়েছেন। ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, তিনি দামেশকের জামে

---

[২৪১] আদ দুরারুল কামিনা, ৩য় খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

[২৪২] আদ দুরারুল কামিনা, ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

উমাভীতে দরস দিতেন। এছাড়া রওয়াজিয়া, আতাবেকিয়া, জাহেরিয়া ও জাওয়ানিয়া মাদরাসায় দরস দিতেন। [২৪৩]

সে যুগে জামে উমাভীতে দরস দেয়া ছিল অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এ থেকেই শায়খ সফিউদ্দিনের ইলম ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লামা তাজ উদ্দিন সুবকি লিখেছেন, তিনি উসুলে ফিকহ ও ইলমে কালামে গভীর জ্ঞান রাখতেন। আরেকটু এগিয়ে তিনি লিখেন, শায়খ সফিউদ্দিন দামেশকের মানুষকে ইলমচর্চায় ব্যস্ত করে দেন। তিনি বেশকিছু কিতাব লেখেন। এরমধ্যে ইলমে কালামে যুবদা, উসুলে ফিকহে আন নিহায়া ও ওফায়েক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাবইয়্যাহ নামেও তিনি একটি কিতাব লেখেন। দামেশকের আলেমরা তাকে কেমন সম্মানের চোখে দেখতেন তা সুবকির এই বক্তব্য থেকে প্রমানিত হয়। তিনি লেখেন, আমাদের উস্তাদ যাহাভী তার থেকে বর্ননা করেছেন।

তবে শায়খ সফিউদ্দিনের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতা বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট নয়। এজন্য এমন একটি ঘটনা উপস্থাপন করবো যা থেকে পাঠক অনুমান করতে পারবেন এই দুখী ভারতবর্ষের সামান্য পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করা এই আলেম কতটা যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

#

শায়খ সফিউদ্দিন যখন দামেশকে অবস্থান করছিলেন সে সময় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া নিজের প্রতিভার আলো ছড়াচ্ছেন। বেশ কয়েকটি মাসআলায় নতুন মত দিয়ে বেশ হৈ চৈ বাধিয়ে ফেলেছেন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাসআলা হলো হামাভিয়্যার ফতোয়া। এই ফতোয়া দামেশকের ইলমি অংগনে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। দামেশকের উলামাদের একাংশ ইবনে তাইমিয়ার সাথে বিতর্কসভার আয়োজন করেন। দামেশকের বড় বড় সব আলেম একত্র হন। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া তো ইবনে তাইমিয়াই, মুসলমানদের শাইখুল ইসলাম। কারো সাহস হচ্ছিল না তার সামনে কথা বলবে। তাজউদ্দিন সুবকি লিখেছেন, উপস্থিত উলামারা সিদ্ধান্ত নেন শায়খ সফিউদ্দিনকে ডাকা হবে। তিনি আলোচনা করবেন।

শায়খ সফিউদ্দিনকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি এসে উপস্থিত হন। আল্লামা সুবকি লিখেছেন, শায়খ সফিউদ্দিন উপস্থিত আলেমদের মধ্যমনি ছিলেন। তিনি আলোচনা শুরু করেন। তার আলোচনার ধরন বৈচিত্রময়। যেসব কথায় আপত্তি উঠতে পারে, আলোচনার ভেতরেই সেগুলোর জবাব দিচ্ছিলেন। কখনো

---

[২৪৩] আদ দুরারুল কামিনা, ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

বিস্তারিত বলছিলেন আবার কখনো শুধু ইশারা দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিলেন। শায়খ সফিউদ্দিনের আলোচনা শেষ হলে ইবনে তাইমিয়া আলোচনা শুরু করেন। তিনি স্বভাবজাত দ্রুততায় কথা বলছিলেন। এক প্রসংগ থেকে অন্য প্রসংগে চলে যাচ্ছিলেন।

যারা ইবনে তাইমিয়ার বইপত্র পড়েছেন তারা শাইখুল ইসলামের মেধা ও ইলমের গভীরতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। তিনি যখন লিখতেন তখন একের পর এক বিষয় ও দলিলাদি একত্র করে ফেলতেন। একইসাথে আল্লাহ তাকে অসাধারণ বাগ্মীতা দান করেছিলেন। সন্দেহ নেই, তিনি বাগ্মীতার জোরে শায়খ সফিউদ্দিনকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু শায়খ সফিউদ্দিন, যিনি এই ভারতবর্ষের পাঠ্যক্রমেই নিজের ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেছেন, তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে বলেন, ইবনে তাইমিয়া, আপনি শুধু চড়ুই পাখির মত এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ছেন।

আল্লাহই জানেন সেই মজলিসের অবস্থা কেমন ছিল, তবে সুবকির বর্ননা থেকে জানা যায়, ইবনে তাইমিয়া শেষপর্যন্ত শায়খ সফিউদ্দিনের সাথে এটে উঠতে পারেননি। সুবকি লিখেছেন, আমির সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শায়খ সফিউদ্দিনের পক্ষে ফয়সালা করেন। ইবনে তাইমিয়ার যে সকল ছাত্ররা প্রশাসনের কোনো পদে ছিলেন, তাদের অপসারন করা হয়। এমনকি এই মাসআলার কারনে ইবনে তাইমিয়াকে বন্দী করা হয়। [২৪৪]
এই মাসআলায় কার মতটি সঠিক ছিল তা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ মাফ করুক, ইবনে তাইমিয়ার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে খাটো করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই যে ভারতীয় পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করা একজন আলেমের জ্ঞানের গভীরতা তুলে ধরা।

ভারতীয় আলেম আরবভূমিতে

মক্কা ও মদীনায় সর্বযুগেই বড় বড় আলেমরা জন্ম নিয়েছেন। ইলমের চর্চা করেছেন। তাদের দরসে বসার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা ছুটে এসেছে। ভারতবর্ষের অনেক আলেম আরবে গমন করে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র বইয়ের আকার ধারন করবে। এখানে সংক্ষেপে একটু ইশারা দেয়ার চেষ্টা করবো। শায়খ আলী মুত্তাকি রহিমাহুল্লাহ একজন ভারতীয় আলেম। ভারতবর্ষেই পড়াশোনা শেষ

---

[২৪৪] তবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা, ৯ম খন্ড, ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা।

করেছেন। আল্লামা শারানি লিখেছেন, তিনি ৯৪৭ হিজরীতে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। আল্লামা শারানীর সাথে এই ভারতীয় আলেমের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তার সম্পর্কে আল্লামা শারানীর বক্তব্য হলো, মক্কাতে আমি তার মতো আর কাউকে দেখিনি।[২৪৫]

হিজরী অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয় আলেমদের এক জামাত মক্কা মদীনায় অবস্থান করে ইলমচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন মোল্লা সাদুল্লাহ, শায়খ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল হিন্দী, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী, শায়খ হায়াত সিন্ধী এই বরকতময় কাফেলারই সদস্য। শায়খ হায়াত সিন্ধী ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামীর উস্তাদ। মাওলানা বিলগ্রামী তার কাছ থেকে হাদিসের সনদ নেন। তার সম্পর্কে মাওলানা বিলগ্রামী লিখেছেন, মিসর ও সিরিয়া থেকে আগত শিক্ষার্থীরা তার দরসে বসতো।

কনস্টান্টিনোপলে এক ভারতীয় আলেম

ইংরেজরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের আগ থেকেই এ অঞ্চলে তাদের মিশনারীরা কাজ করে যাচ্ছিল। ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পর এ কাজ আরো জোরদার হয়। এসময় ইউরোপ থেকে ফান্ডার নামে একজন পাদ্রী ভারতবর্ষে আগমন করে। আরবী ও ফার্সী ভাষায় সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তার গভীর পড়াশোনা ছিল। সে বিভিন্ন এলাকায় সফর করে ইসলামের উপর বিভিন্ন আপত্তি তুলতো এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতো। শুরুর দিকে উলামায়ে কেরাম তাকে নিয়ে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। ডা উযির খান নামে বিহারে একজন চিকিতসক ছিলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ইউরোপে গমন করেন। ইংরেজি ও গ্রীক ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফেরার সময় ইংরেজিতে রচিত খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই ডাক্তারের সাথে মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী নামে এক আলেমের সম্পর্ক হয়। মাওলানা সাহেব ডাক্তারের কাছে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেন। তিনি এ পরিমান দক্ষতা অর্জন করেন যে ফান্ডারের সাথে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করে ফান্ডারকে পরাজিত করেন। ফান্ডার অপমানিত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে কন্সটান্টিনোপল গমন করে। এদিকে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানভী আরবে চলে যান এবং মক্কায় অবস্থিত সাওলাতিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। পাদ্রী ফান্ডার কনস্টান্টিনোপল পৌছে সেখানকার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে থাকে। তখন খলীফা আবদুল

---

[২৪৫] তবাকাতুস সুফিয়াতিল কুবরা।

আযিয খানের শাসনকাল (১৭৬০-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। খলিফা নিজেও ফান্ডারের কর্মকান্ডে বিচলিত হন। তুরস্কের কোনো আলেম তখন ফান্ডারের মোকাবিলা করার সাহস পাচ্ছিলেন না। খলীফা হেজাজের গভর্ণরকে পত্র লিখলেন, যদি আপনাদের ওখানে এমন কোনো আলেম থাকেন যিনি খ্রিস্টান পাদ্রীর মোকাবিলা করতে পারবেন তাহলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিন। মক্কার গভর্ণর লিখলেন, এখানে এমন একজন ভারতীয় আলেম আছেন যিনি কিছুদিন আগে ফান্ডারকে প্রকাশ্য বিতর্কসভায় পরাজিত করেছেন। খলিফা আদেশ দেন তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথীর মর্যাদা দিয়ে কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করতে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানভী ইস্তাম্বুল পৌছেন। তার আগমনের সংবাদ শুনেই পাদ্রী ফান্ডার গোপনে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করে। এই ঘটনায় খলীফা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তিনি মাওলানাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। মাওলানাকে রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বিসাম মাজিদি'তে ভূষিত করা হয়। তার জন্য মাসিক ৫০০ তুর্কি স্বর্নমুদ্রা ভাতা নির্ধারণ করা হয়।

হাজার বছর আগে ১

মূল- সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী রহ.

রুপান্তর- ইমরান রাইহান

মুসলিম পর্যটক ও ভূগোলবিদরা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে। তাদের লেখায় তারা তুলে ধরেছিলেন সেসময়কার মুসলিমদের জীবনযাত্রা ও শহরগুলির বিবরণ। আবু মুহাম্মদ আল হাসান হামদানি, আবুল কাসিম ইবনু হাওকাল, আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু খোরদাদবেহ, মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ শামসুদ্দিন আল মাকদিসি প্রমুখের লেখায় আমরা পাই সে সময়কার এক নিখুঁত বিবরণ।

তারা লিখেছেন, মুসলমানরা তাদের শহরগুলিতে প্রচুর উদ্যান ও নহর নির্মাণ করত। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেত এসব নহর (লেক)। পাশেই থাকতো মনোরম উদ্যান। বিকেল কিংবা অবসরে শহরবাসী ঘুরে বেড়াতো এসব নহরে এবং উদ্যানে। বসরা শহর সম্পর্কে ইবনে হাওকাল লিখেছেন,

‘আমি যখন এ শহরের প্রশংসা শুনতাম, বিশ্বাস করতে মন চাইতো না। কিন্তু যখন নিজের চোখে এ শহর দেখলাম তারপর তা বর্ননা না করে পারছি না। বসরার আবদাসি থেকে আবাদান পর্যন্ত প্রায় দেড়শো মাইলের দূরত্ব। এ পথে কিছুদুর পর পর রয়েছে বিশ্রামাগার। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। লোকেরা এসব বাগানে ঘুরতে আসে। এখানে আছে বড় বড় দিঘী। বারো মাইল লম্বা উবাল্লা নহর এখানেই অবস্থিত। বসরা থেকে উবাল্লা, দীর্ঘ পথের দুধারে রয়েছে মনোরম সব উদ্যান। এগুলো একটা অপরটার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর অবস্থান দেখলে মনে হয় কেউ ফিতা দিয়ে মেপে মেপে সীমানা নির্ধারণ করেছে। পুরো এলাকায় অন্তত

এক হাজার নহর রয়েছে এমন, যার ভেতর দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারে। *(সুরাতুল আরদ, ১৬০)*

তুলনামূলকভাবে ইরাক শুষ্ক এলাকা। এই এলাকাকেই মুসলমানরা এমন গাছগাছালিপূর্ণ বাগান বানিয়ে ফেলেছিল। মুসলিমদের এই প্রবনতা থেকে বাদ পড়েনি কোনও শহরই। ইবনে হাওকাল বোখারা সম্পর্কে লিখেছেন,

'বুখারার কেল্লার উপর উঠে দাড়াও, তারপর নজর বুলাও চারদিকে। চারদিকে সবুজ, দূরে নেমে এসেছে নীলাভ আসমান। মনে হবে সবুজ কার্পেটের উপর নীল শামিয়ানা টেনে দিয়েছে কেউ। শহরের ঝলমলে মহলগুলোকে মনে হবে আসমানের তারা। সুজলা সুফলা এক শহর। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট ছোট নহর। কোথাও পানির কোনো অভাব নেই। আংগুর, আখরোট, আপেল আর গোলাপের বাগান সর্বত্র। সাগা নদীর দূরত্ব বুখারা থেকে আট দিনের। নদীর দুপাশে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত শস্যভরা মাঠ। এগুলোকে বেষ্টন করে আছে ছোটবড় অসংখ্য নহর। নহরগুলো যেন এসব এলাকার বসতবাড়ি ও বাগানের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। এমন কোনো সড়ক, বাজার ও গ্রাম নেই যেখানে এসব নহরের পানি পৌছাচ্ছে না। প্রতিটি বাড়ির সামনেই শোভা বাড়াচ্ছে পানিভর্তি হাউজ। ফারগানা, শাশ, আশরোসানা ও মাওয়ারাউন্নাহারের সর্বত্র এই একই দৃশ্য। এখানকার পাহাড়ে জন্মে আঙ্গুর, আখরোট, আপেল ও অন্যান্য সুস্বাদু ফল। বাগানে ফুটে গোলাপ, এসব গোলাপ টিকে থাকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত। ফল ও ফুলের মূল্য এখানে সস্তা। যার ইচ্ছা, যত ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। বাঁধা দেয়ার কেউ নেই। পাহাড়ে রয়েছে পেস্তার বাগান। লোকেরা বিনামূল্যেই নিয়ে যায় । *(সুরাতুল আরদ, ৩৪৭)*

মাওয়ারাউন্নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) তো এমনিতেই সুজলা-সুফলা ভূমি। এখানে মুসলমানদের কাজ সহজ হয়েছিল। অপরদিকে বিষুব রেখার কাছাকাছি অবস্থিত শহরগুলো, সূর্য যেখানে আগুন ঝরায়, মাটি হয়ে উঠে উত্তপ্ত কড়াইয়ের মত, সেখানে মনোরম উদ্যান ও নহর নির্মাণ সহজ ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা শহর নির্মাণ করেছিল শিল্পীর হাত দিয়ে, সবকিছু সাজিয়েছিল নিখুঁত করে। তাদের হাতের ছোঁয়ায় পাথরেও ফুটেছিল ফুল। আল ইদরিসের শাসনামলে আফ্রিকায় আল হাজার নামে একটি বসতি স্থাপন করা হয়। এ শহর সম্পর্কে ইবনে হাওকালের মূল্যায়ন নিম্মরুপ-

'শহরটি নির্মাণ করা হয়েছে সুউচ্চ এক পাহাড়ের উপর। এখানে চাষ করা হয় জাফরান। পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি টেনে নেয়া হয়েছে শহরের ভেতর। এসব

নহর থেকেই জাফরানের বাগানে পানি দেয়া হয়। পশ্চিম আফ্রিকার আরেকটি পাহাড়ি শহর জাবালে নফুসা। পাহাড়ের নিম্মদেশ থেকে এর চূড়ায় উঠতে সময় লাগে তিনদিন। এখানেও রয়েছে নহর ও বাগান। এখানে চাষ করা হয় আঙ্গুর ও ডুমুর। এখানকার যবের রুটি খুবই সুস্বাদু। *(সুরাতুল আরদ, ৯২)*

মুসলমানদের মধ্যে নহর ও উদ্যান নির্মাণের প্রবনতা কেন জেগে উঠেছিল সে সম্পর্কে মাকদিসীর একটা অনুমান আছে। তার মতে, কোরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যেসব বিবরন এসেছে সেখানে রয়েছে উদ্যান ও নহরের কথা। এ সব বর্ননা থেকে মুসলমানরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ফলে তাদের নির্মিত শহরগুলিতেও তারা উদ্যান ও নহর নির্মাণ করে। *(আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, ৪৪৫)*

মূলে কারণ যাই হোক, এসব নহরের কারণে মুসলমানদের সেচব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। নিশাপুরের বর্ননা দিতে গিয়ে ইবনে হাওকাল লিখেছেন,

‘এ শহরে ভূগর্ভস্থ নালার মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। এসব নালা নির্মাণ করা হয়েছে শহরবাসীর বাসগৃহের নিচে। শহরের প্রয়োজন শেষ করে পানি চলে যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ও বাগানে। কোথাও কোথাও এসব নালা একশো গজ পর্যন্ত গভীর। এসব নালার সংরক্ষণ ও দেখাশোনার জন্য একজন কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মার্ভ শহরেও দেখেছি, মোরগাব নদী থেকে খাল কেটে আনা হয়েছে। এ খালের পানি নিয়ে আসা হয়েছে শহরের মাঝখানে। সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে পানি বন্টন কেন্দ্র। এখান থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। এখানেও রয়েছে ভূগর্ভস্থ নালা। এসব নালার কোথাও মেরামত করা দরকার হলে শ্রমিকরা তাতে প্রবেশ করে কাজ করে। শীতের দিনে তারা শরিরে মোম মাখিয়ে নেয়, এটা করা হয় সতর্কতা হিসেবে। *(সুরাতুল আরদ, ৩১৫)*

মুসলিম শাসনামলে জনগনের নিরাপত্তার দিকে প্রশাসকদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে তারা দ্বিধা করতেন না। ইবনে হাওকাল পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম সফর করেছেন। তিনি বেশ নির্মোহভাবে এসব অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, আমার জানামতে আমি মজলিস জমানোর জন্য কোনো মুখরোচক তথ্য দেইনি, কিংবা কোনো এলাকাকে খাটো করার জন্যও কিছু লিখিনি। যা লেখার সংকল্প করেছিলাম ঠিক তা-ই লিখেছি।

ইবনে হাওকাল চোর, ডাকাত ও লুটতরাজের কথা লেখেননি। এ থেকে বোঝা যায় সে সময় (ইবনে হাওকালের মৃত্যু ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে) পর্যন্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। শুধু খোরসানের মরুভূমি সম্পর্কে লিখেছেন, সেখানে কিছু

ডাকাতদের আস্তানা ছিল। এর কারণ হলো, সেই অঞ্চলটি নির্দিষ্ট কোনো প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনে ছিল না। উমাইয়া যুগের শুরুর দিকে এন্টিয়ক ও লাসিসার মধ্যবর্তী স্থানে বাঘের সংখ্যা বেড়ে যায়। পথচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকে। এ সংবাদ শুনে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক আদেশ দেন দ্রুত এসব বাঘকে হত্যা করতে। ঐতিহাসিক আবু মুহাম্মদ আল হাসান হামদানি লিখেছেন, খলিফার আদেশ পেয়ে বাঘ হত্যার প্রস্তুতি নেয়া হয়। রাস্তার মাঝে গর্ত করে মহিষ রেখে দেয়া হয়। বাঘ এসব মহিষকে আক্রমন করে গর্তে পড়ে যায়। ফাঁদে বন্দি হয়। এভাবে প্রচুর বাঘ ধরা হয়। এ কাজে টোপ হিসেবে প্রায় চার হাজার মহিষ লেগেছিল।

দজলা নদীর একটি মোহনা মিলিত হয়েছিল উবাল্লা নহরের সাথে। মিলনস্থলটি ছিল গভীর। সবসময় পানি ফুঁসতে থাকতো সেখানে। বেশিরভাগ জাহাজ ও নৌকা এই ঘূর্ণিপাকে আটকে যেত। ডুবে যেত। এই নৌপথটি ছিল খুবই বিপদজনক। কিন্তু এই পথ ব্যবহারে দূরত্ব কমে যেত। ফলে এই পথটি নিরাপদ করাও দরকার ছিল। আর একাজে এগিয়ে এলেন একজন মুসলিম নারী। হ্যা, ঠিক শুনছেন একজন মুসলিম নারী। এই নারী হলেন, আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী যুবাইদা খাতুন। তিনি আদেশ দেন পাথর নিক্ষেপ করে এই স্থানের গভীরতা কমিয়ে ফেলতে। তাই করা হয়। দিনের পর দিন এই স্থানে পাথর ফেলা হয়। ফলে গভীরতা কমে যায়। পানির ঘূর্ণিপাকও চলে যায়। *(সুরাতুল আরদ, ১৬০)*

নিরাপত্তা চৌকি ছিল সর্বত্র। সাথে ছিল মুসলিম সেনাছাউনি। বিজয়ী বেশে মুসলিমরা যে এলাকায় গিয়ে থামতো তাঁকে বলা হত সাগুর। আর শত্রুদের দিকে মুখ করে যে সেনাছাউনি নির্মাণ করা হত তাঁকে বলা হত রিবাত। নিয়মিত সেনাবাহিনীর বাইরেও সাধারণ জনগন যখন জিহাদে সময় ব্যায়ের ইচ্ছা করত তখন তারা এসব রিবাতের কোন একটিতে চলে যেত। সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, ফলে সাধারণ মানুষ চাইলেই সহজে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারত। এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবরাহিম বিন আদহাম ও অন্যান্য আলেমদের জীবনিতে আমরা দেখি তারা বছরের কয়েক মাস এসব সীমান্ত চৌকিতে অবস্থান করে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

ইবনে হাওকাল তরতুস শহরের রিবাত ঘুরে দেখেছিলেন। সেখানে তখন এক লাখ সেনা অবস্থান করছিল। তিনি লিখেছেন, রিবাতে অবস্থানকারী মুজাহিদদের সাথে স্থানীয় জনগনের সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। তারা মন খুলে মুজাহিদদের দান করে। নেতৃস্থানীয় ও ধনী ব্যক্তিরা রিবাতের জন্য তাদের সম্পদ ওয়াকফ করেন। সেনা

ছাউনিতে ইমারত ও দালানকোঠা নির্মাণ করা হত। ঐতিহাসিক হামদানি সিরিয়ার হারুনিয়া শহরের সীমান্তচৌকিতে এমন অনেক দালান দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, প্রতি পনেরো জন সেনার জন্য এখানে দুটি করে কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। *(তারিখে হামদানি, ১৬৪)*

মুসলিমরা আবাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সুরুচির পরিচয় দিত। এ সময় তারা আরাম ও রুচি দুটির সমন্বয় করার চেষ্টা করত। ঐতিহাসিক হামদানি লিখেছেন,

'টিলা বা এ ধরণের উঁচু স্থান হচ্ছে ঘর নির্মাণের জন্য আদর্শ জায়গা। ঘরের দরজা ও খিড়কি নির্মাণের জন্য পূর্ব দিক উত্তম। কারণ, এ ধরণের ঘরে সূর্যের কিরণ সহজেই প্রবেশ করতে পারে, যা সুস্থতার জন্য উপকারি। *(তারিখে হামদানি, ১০৩)*

সাধারণোত বেশিরভাগ সময়ে মাটির ঘর বানানো হত। এসব ঘরের উপকারিতা হলো, গ্রীষ্মকালে তা উত্তপ্ত হয় না, এবং শীতকালেও মাত্রাতিরিক্ত শীত থেকে এর বাসিন্দাদের নিরাপদ রাখে। ঘর নির্মাণের সময় মেহমানদের কথা চিন্তা করে কিছু প্রশস্ত কক্ষ নির্মাণ করা হত। সে সময় মুসলমানরা মেহমানদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হত। আল্লামা মাকরেজি লিখেছেন,

'মিসরের মুসলমানদের রীতি হল তারা রান্না করার সময় বেশি করে রান্না করে। যেন মেহমান আসলে তাদের আপ্যায়নে ত্রুটি না হয়। মেহমান না আসলে চাকররা এসব খাদ্য নিয়ে যায়। নিজের পরিবারে বন্টন করে বা বাজারে বিক্রি করে দেয়। *(আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ১/৩১৮)*

ইবনে হাওকাল মাওয়ারাউন্নাহারের মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, এখানের বাসিন্দাদের সবাই তাদের গৃহে মেহমানদের জন্য কক্ষ সাজিয়ে রেখেছে। কোনো ভিনদেশী মুসাফির এখানে এলে কে তাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবে এ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। সবাইই আগন্তুককে নিজের মেহমান বানাতে চায়। *(সুরাতুল আরদ, ৩৩৮)*

ইবনে হাওকাল তেফলেসের মুসলিমদের এক অবিশ্বাস্য ঘটনা লিখেছেন। কোনো এক কারনে তিনি কসম করেছিলেন এই শহরে তিনি কারো মেহমান হবেন না। তার এই কসমের কথা জানতে পেরে শহরের গন্যমান্য ব্যক্তি ও কাজি একত্র হয়ে একটি সভার আয়োজন করে। ইবনে হাওকালও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষ অংশে কাজি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের শহরের নিয়ম হচ্ছে মুসাফির ও তার চাকরবাকর আমাদের ঘরে অবস্থান করবে। এটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা নিয়ম। যদি এটি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। তাহলে আপনাকে দেখে আমাদের জে

কষ্ট জাগবে তা থেকে আমরা নিরাপদ থাকবো। আর কসমের ক্ষেত্রে কথা হলো, এর কাফফারা দেয়ার সুযোগ আছে। আমরা সবাই মিলে আপনার কসমের কাফফারা আদায় করে দিতে প্রস্তুত। *(সুরাতুল আরদ, ২৪৪)*

ভারতবর্ষের মুসলমানরাও এ প্রবনতা থেকে মুক্ত ছিল না। মাওলানা গোলাম আলি আযাদ বিলগ্রামি লিখেছেন, হুসাইন আলি খান যখন আলমগিরের সুবাদার নিযুক্ত হন তখন তার রন্ধনশালায় এত বেশি রান্না করা হত, লোকেরা চাইলেই এক পয়সা দিয়ে বড় এক থালা বিরিয়ানি সংগ্রহ করতে পারত।

এত দূরে যাওয়ার দরকার কী? আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও (শায়খ গিলানি এই লেখা লিখেছিলেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) হায়দারাবাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের রান্নাবান্না যারা দেখেছেন তারা জানেন, অতীতে ধনাঢ্য মুসলিমদের রন্ধনশালা ছিল মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত। এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। যতদিন এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েনি , ততদিন আপনি হায়দারাবাদে বড় বড় হোটেল ও ক্যাফেটেরিয়া দেখেননি।

বলছিলাম, সেকালে মুসলিমরা তাদের ঘর নির্মাণ করত প্রশস্ত করে। ঘরে কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট থাকতো। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ, বাচ্চাদের পড়ার জন্য পৃথক কক্ষ, চাকরবাকরদের থাকার জন্য আলাদা কক্ষ।

ইতিহাস থেকে পাওয়া

এলোমেলো ১

ইতিহাস আমাদের কিছু ঘটনাবলীর বিবরণ জানায় মাত্র। ইতিহাস আমাদের ভালো মানুষের কথা জানায়, ইতিহাস আমাদের খারাপ মানুষের কথাও জানায়। ইতিহাস আমাদের জানায় তাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মের কথা। তবে কোন কাজটি খারাপ আর কোন কাজটি ভালো সে বিষয়ে ইতিহাস চুপ থাকে। ইতিহাসের কাজ তথ্য সরবরাহ করা। সেটা বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব আপনার আমার।

অতীতের কোন কাজটি ভালো ছিল, আর কোনটি খারাপ ইতিহাস তা বলে দিবে না। কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের সাহায্যে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জনীয়। যদি ইতিহাসের কোনো ঘটনা দেখেই তাকে দলিল বানানো হয় তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। কারণ ইতিহাস শুধু ঘটনাটি উল্লেখ করেছে, সেই ঘটনায় বর্নিত কাজটি ঠিক হয়েছে নাকি ভুল হয়েছে তা উল্লেখ করেনি।

আজকাল এক নতুন ধারা চালু হয়েছে। কিছু হলেই ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা টেনে এনে দলিল বানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের বক্তব্য খতিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখছে না কেউ।

এক সময় অনেককে দেখতাম, তারা বলে বেড়াত ইসলামে দূত হত্যা জায়েজ। দলিল হলো, সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয হালাকু খানের দূতকে হত্যা করেছেন। এই এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে এত বড় সিদ্ধান্তে পৌছে গেল অথচ আগে দেখা দরকার ছিল এ বিষয়ে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ কী বলে? দেখা দরকার ছিল, সুলতান কুতুযের কাজটি ঠিক হয়েছে নাকি ভুল? ইতিহাসে সব ধরণের ঘটনাই আছে। সুলতান কুতুয দূত হত্যা করেছিলেন এটা যেমন আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাইলামার দূতকে হত্যা না করে বলেছিলেন, 'দূত হত্যা বৈধ হলে তোমাদেরকে হত্যা করতাম' এটাও আছে।

একটি ইসলামি দলে অমুসলিম সদস্য নেয়া হয়েছে, ব্যস এটা বৈধ করার জন্য ইতিহাস থেকে দলিল টেনে দেয়া হলো যে অনেক মুসলিম শাসক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অমুসলিমদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের এসব সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কী ভুল ছিল, এবং এসব নিয়োগের ফলে ইসলামি সালতানাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিনা

সেসবের কোনো বিশ্লেষণ নেই। শুধু উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হলো। মুশকিল হলো, এসব রাজা বাদশাহদের অনেকে তো ব্যাপক অশ্লীলতার সাথেও জড়িত ছিলেন। তাহলে সেটাও কি দলিল বানাতে হবে?

(ইসলামি দলে অমুসলিমদের কর্মী বানানো যাবে কিনা এই বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমগনই সিদ্ধান্ত দিবেন। এখানে শুধু ভুল উৎস থেকে দলিল খোঁজার প্রবণতার দিকে ইংগিত করলাম)

ইতিহাস কাউকে আকিদা শেখায় না। বরং আকিদা দিয়ে ইতিহাসকে মাপতে হয়। ইতিহাসের কোনো ঘটনা থেকে শরিয়াহর বিধান প্রমাণিত হয় না। বরং শরিয়াহর বিধান বর্ননা করে ইতিহাস থেকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাগুলো খুঁজে নিতে হয়।

ইতিহাস সম্রাট আকবরের কর্মকান্ড জানিয়ে চুপ থাকে। এসব কর্মকান্ডকে মাপতে হয় কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে।

ইতিহাসে কোনো বর্ননা পেলেই যদি সেটাকে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়, তাহলে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। মূলকথা হলো, ইতিহাসের ঘটনা থেকে বিধান সাব্যস্ত হয় না।

ইবনু খশশাব হাম্বলির মত বিখ্যাত আলেম রাস্তায় দাঁড়িয়ে বানরের খেলা দেখতেন। এ থেকে সব আলেমের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে বানরের খেলা দেখা ওয়াজিব হয়ে যায় না। শাজারাতুদ দূর মিসর শাসন করেছেন, এজন্য সবখানে মহিলাকে নেতৃত্বে বসিয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে যায় না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা চত্বরে মিনজানিক থেকে পাথর ছুড়েছে এজন্য অন্য শাসকদেরকেও এই কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

ইতিহাসের কোনো বর্ননা সামনে এলে প্রথমে দেখতে হবে বর্ননাটি বিশুদ্ধ কিনা। এরপর দেখতে হবে, এই ঘটনার শরয়ী অবস্থান কী? শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি সঠিক নাকি ভুল? এরপর আসে এই ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়।

কিন্তু এখন এসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। ইতিহাসের বইপত্র খুলে নিজের পক্ষে দলিল বানানোর মত ঘটনা খোঁজা হচ্ছে। আর ইতিহাসে এমন ঘটনার অভাব নেই। ফলে সবাইই ইতিহাস থেকে নিজের পক্ষে দলিল খুঁজে পাচ্ছে।

এ এক নৈরাজ্যকর অবস্থা

এলোমেলো ২

রবিউল আউয়াল, ৬০৬ হিজরি। ১২০৯ খ্রিস্টাব্দ।

সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ প্রস্তুত হচ্ছিলেন সমরকন্দ আক্রমণ করার জন্য। কদিন তিনি কারাখানিদ সাম্রাজ্যের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন বুখারা। এবার তার দৃষ্টি সমরকন্দের দিকে। ৫৮ বছর আগে যখন আব্বাসি খিলাফাহ ও সালজুকি সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন কারাখানিদরা মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নেয় বুখারা ও সমরকন্দ। এখানকার মুসলমানদের উপর চালাতে থাকে নির্মম নির্যাতন। সে সময় এখানকার মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস ছিল না কারো।

৬০৫ হিজরিতে হেরাত জয়ের মাধ্যমে ঘুরী সাম্রাজ্যে খাওয়ারেজম শাহের দখলে আসে। এরপর তিনি নজর দেন বুখারা ও সমরকন্দের দিকে। খুব সহজেই খাওয়ারেজমের বাহিনী বুখারা দখল করে নেয়।

এবার টার্গেট সমরকন্দ। সুলতানের আদেশ ছিল যুদ্ধযাত্রা শুরু হবে শুক্রবারে। মসজিদের মিম্বরে খতিব সাহেব দোয়া করবেন, "আল্লাহ আপনি মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করুন'। এই দোয়ার পরেই সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করবে। এক শুক্রবারে জুমার পর খাওয়ারেজমের বাহিনী হামলা করে সমরকন্দে। তীব্র লড়াইয়ে তারা কারাখানিদদের হাত থেকে সমরকন্দ কেড়ে নেয়।

সমরকন্দ বিজয়ের পর খাওয়ারেজম শিবিরে চলতে থাকে আনন্দ-উল্লাস। কিন্তু সাইয়েদ মুরতাযা বিন সদরুদ্দিন নামে এক বুজুর্গ বসে বসে কাঁদছিলেন। সবাই অবাক হয়ে তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এই কারাখানিদ রাজ্য ছিল আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রাচীরের মত। এতদিন তারা ছিল বলে আমরা নিরাপদ ছিলাম। এখন এই দেয়াল টুটে গেছে। এই সুযোগে গোবী মরুভূমি থেকে এক নতুন বিপদ ধেয়ে আসবে আমাদের দিকে।

সবাই ছিল আনন্দ-উল্লাসে ব্যস্ত। সাইয়েদ মুরতাযার এই কথা গুরুত্ব দেয়নি কেউ। কিন্তু তার এই কথা বাস্তবায়ন হয়েছিল দশ বছর পরে। ৬১৬ হিজরিতে যখন চেংগিস খান খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যে হামলা করে বসে।

কারাখানিদরা বসে ছিল না। তারা সমরকন্দ পুনরুদ্ধারের জন্য পালটা হামলা চালায়। সুলতান আলাউদ্দিন তখন সমরকন্দে অবস্থান করছিলেন। হামলার তীব্রতায় সুলতানের বাহিনী পালাতে থাকে। সুলতান তার একজন আমির ইবনে

শিহাবুদ্দিন মাসউদ সহ একটি সেনাদলের হাতে বন্দি হন। সুলতানের বাহিনী পিছু হটে এসে খেয়াল করলো সুলতান তাদের সাথে নেই। কেউ কেউ বললো, সুলতান নিহত হয়েছেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানের লাশ দেখেছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করেও সুলতানের কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। সবাই ধরে নিল সুলতানের নিহত হওয়ার সংবাদ সত্য। সুলতানের ভাই তাজউদ্দিন আলি শাহ নিজেকে সাম্রাজ্যের নয়া সুলতান ঘোষণা দিলেন।

সুলতান যে বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন তারা সুলতানের পরিচয় জানতো না। আমির মাসউদ বললেন, সুলতান, একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। এটা কাজে লাগাতে হবে। আপনি নিজের পরিচয় কাউকে দিবেন না। বরং সবাইকে জানাবেন আপনি আমার গোলাম।

সুলতান এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। পরের কয়েকদিন তিনি আমির মাসউদের সেবা যত্নে ব্যস্ত রইলেন। একজন গোলামের মতই তার সেবাযত্ন করতে থাকেন। কারাখানিদ সেনারা অবাক হয়। তারা আমির মাসউদকে জিজ্ঞেস করে, এই লোক তোমার এত সেবা করে কেন?

'আমি খাওয়ারেজম দরবারের আমির মাসউদ। এই লোক আমার গোলাম। এজন্য আমার সেবা করে' আমির মাসউদ বললেন।

আমিরের পরিচয় পেয়ে কারাখানিদরা তাকে সমীহের চোখে দেখতে থাকে। কয়েকদিন পর আমির মাসউদ তাদেরকে বললেন, দেখো, আমার প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু আমি যে এখানে বন্দি তা কেউ জানে না। তোমরা আমার জন্য একটা মুক্তিপণ নির্ধারণ করে আমার এলাকায় লোক পাঠাও। আমার ভাই মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

সেনারা ভেবে দেখলো ভালো প্রস্তাব। তারা আমির মাসউদের কাছ থেকে তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সেখানে লোক পাঠাতে প্রস্তুত হল। আমির বললেন, শুধু তোমাদের লোক গেলে আমার বাড়ির লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না। এক কাজ করা যাক, তোমাদের লোকের সাথে আমার এই বিশ্বস্ত গোলামও চলে যাক। সে তোমাদের কথা বললে তখন আমার বাড়ির লোকজন বিশ্বাস করবে।

সেনারা এই প্রস্তাব মেনে নিল। কয়েকজন লোকের সাথে রওনা হলেন গোলামের বেশধারী সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ। তারা এসে পৌছলেন খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে । বর্তমান উজবেকিস্তানের সীমান্তবর্তী আরগেঞ্চ শহর ছিল খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যের রাজধানী। সুলতান শহরে প্রবেশ করতেই লোকজন তাকে চিনে ফেলে। সুলতানের ভাই ক্ষমতা ছেড়ে সরে গেলেন। আমিরের বুদ্ধিমত্তায় মুক্তি পেলেন সুলতান। *(তারিখে ইবনে খালদুন)*

এলোমেলো ৫

‘আপনার প্রিয় শহর কোনটি?’

‘আরগেঞ্চের প্রতি আমার রয়েছে আলাদা টান। আর আমি প্রেমে পড়েছি বুখারার। বুখারা সম্পর্কে ইবনে হাওকাল কী বলেছেন মনে আছে?’

‘মনে আছে। তিনি বলেছেন, বুখারার কেল্লার উপর উঠে দাড়াও, তারপর নজর বুলাও চারদিকে। চারদিকে সবুজ, দূরে নেমে এসেছে নীলাভ আসমান। মনে হবে সবুজ কার্পেটের উপর নীল শামিয়ানা টেনে দিয়েছে কেউ। শহরের ঝলমলে মহলগুলোকে মনে হবে আসমানের তারা। সুজলা সুফলা এক শহর। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট ছোট নহর। কোথাও পানির কোনো অভাব নেই। আংগুর, আখরোট, আপেল আর গোলাপের বাগান সর্বত্র’

‘তিনি বাড়িয়ে বলেননি। আমাদের সময়ে এমনই ছিল বুখারা। জানো, বেশ উদাস উদাস লাগে। পুরনো স্মৃতিগুলো তাড়া করে এখনো। সবকিছু কত বদলে গেছে। আমাকেও তোমরা ভুলে গেছ’

‘না সুলতান। আমরা আপনাকে ভুলিনি। তাতারদের বিরুদ্ধে আপনার অসামান্য ভূমিকা এখনো মনে রেখেছি আমরা। ঐতিহাসিকরাও বারবার বলেছেন আপনার কথা। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, সুলতান জালালউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহকে তাতাররা ভয় পেত। আমি আর কোনো সুলতান সম্পর্ক জানি না, যিনি এত বিস্তৃত এলাকা প্রদক্ষিণ করেছেন। সুলতানের ঘোড়া হিন্দুস্তানের সীমানা অতিক্রম করেছে, আবার ছুটে গিয়েছে মাওয়ারাউন্নাহার। তারপর অতিক্রম করেছে পারস্য, কিরমান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও ইরাকের ভূমি। ইবনুল ইমাদ হাম্বলি লিখেছেন, সুলতান জালালউদ্দিন ছিলেন মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে প্রাচীরের ন্যায়। তার মৃত্যুর সাথে সাথে এই প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে। ইবনু তাগরি বারদি লিখেছেন, কখনো কখনো সুলতান একটানা দশদিন তাতারদের সাথে লড়াই করেছেন, বিশ্রাম করার সুযোগ পাননি। অমুসলিম লেখক হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন, জালালউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ বিভক্ত মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে তাতারদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন’

‘আমি চেষ্টা করেছিলাম। কখনো সফল হয়েছি, কখনো ব্যর্থ। তবে আমি হাল ছাড়িনি। এটাও সত্য, অন্য মুসলিম শাসকরা আমাকে খুব একটা সাহায্য করেননি। তাদের সাহায্য পেলে আমার জন্য আরো সহজ ছিল’

‘আপনি একাই তো তাতারদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। ৬২৫ হিজরিতে তাদেরকে পরাজিত করে প্রায় তিনশো কিলোমিটার ধাওয়া করেছিলেন। ৩৩ বছর পর তাতাররা আবার এমন ধাওয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। আইন জালুত যুদ্ধের পর রুকনুদ্দিন বাইবার্স তাতারদেরকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ধাওয়া করেছিলেন। আপনি তাতারদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আপনিই ছিলেন তাদের সামনে শক্ত প্রতিপক্ষ’

‘চেংগিস খানও আমাকে ভয় পেত। বাগ নিলাবের যুদ্ধে সে আমাকে দেখে মন্তব্য করেছিল, পিতার জন্য এমন যোগ্য সন্তানই দরকার’

‘বহুদিন পর্যন্ত তাতারদের মনে আপনার ভয় জমে ছিল। এমনকি আপনার অন্তর্ধানের দুই দশক পরেও তারা আপনার ভয়ে ভীত ছিল’

‘বলো কী?’

‘সত্য। ‘তারিখু মুখতাসারিদ দুওয়াল’ গ্রন্থে ৬৫২ হিজরির একটি ঘটনা এসেছে। আমু দরিয়ার পাশে অবস্থিত তাতারদের সীমান্ত চৌকিতে একটি বানিজ্যিক কাফেলা আটক করা হয়। এই কাফেলায় একজন বৃদ্ধকে জালালউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ সন্দেহ করে তাতাররা হত্যা করে। অথচ ৬২৮ হিজরী থেকেই আপনি নিখোঁজ। আপনার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাতাররা দীর্ঘসময় পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে ভীত ছিল’

‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। এভাবেই তিনি কাফেরদের মনে মুমিনদের ব্যাপারে ভীতি ছড়িয়ে দেন’

‘ইমাম যাহাবী লিখেছেন, আপনি কখনো অট্টহাসি দেননি। প্রয়োজন হলে মুচকি হাসতেন। এর কারণ কী?’

‘আমি যে সময়ে জন্মেছি তখন হাসি-ঠাট্টার বা বিনোদনের সময় ছিল না। পুরো উম্মাহ ছিল বিভক্ত ও আক্রান্ত। খলিফা নাসির লি দিনিল্লাহ ছিলেন বেখবর। সেই কঠিন সময়ে হাসাহাসির সুযোগ কোথায়? তখন তো উম্মাহর জন্য নিজেকে কোরবান করে দেয়ার সময়’

‘আপনার ভেতর এ অনুভূতি জাগার কারণ কী? মুসলিম সালতানাতের বেশিরভাগ যুবরাজ তো এসব থেকে বেখবর ছিলেন তখন’

‘আমার সৌভাগ্য, যৌবনের শুরুতেই আমি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজির দরসে বসার সুযোগ পেয়েছি। তার সোহবতই আমার ভেতরে উম্মাহর জন্য নিজেকে কোরবান করার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। একজন সত্যিকারের শিক্ষক ও তার সান্নিধ্যই তিলে তিলে গড়ে তোলে মানুষকে’

‘আপনি শুরু থেকেই নানা ত্যাগ ও কুরবানির মুখোমুখি হয়েছিলেন। আপনার সাত বছরের সন্তানকে টুকরো টুকরো করেছে তাতাররা, স্ত্রী ও মাতাকেও বাঁচাতে পারেননি, ক্ষুধা-পিপাসায় ভুগেছেন, সেনাবাহিনী হারিয়ে একা হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সিন্ধুতে স্থানীয় হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে আবার নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে চাইলেই নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু আপনি কেন আবার এই এলাকা ও নিজের রাজত্ব ত্যাগ করে চলে গেলেন ইরানের দিকে। কেন নিজেকে ঝুঁকির মুখে ফেললেন?’

‘সিন্ধুতে রাজত্ব করাতো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল এখানে নিজের বাহিনী প্রস্তুত করেই আবার বের হব। তাতারদের সাথে লড়াই করব। বাহিনী প্রস্তুত হতেই তাই যুদ্ধের ময়দানে চলে যাই’

‘সুলতান, আপনার উপর একটা অভিযোগ আছে। আপনার সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য রচনা হয়নি। শিল্প-সাহিত্য চর্চায় আপনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এমন প্রমাণও নেই’

‘অভিযোগ সত্য। আমি এমন কিছুতে সম্পৃক্ত ছিলাম না। কাউকে পৃষ্ঠপোষকতাও করিনি। দেখো, এসব তো তখন করা সাজে যখন মুসলিম ভূমির সীমান্ত নিরাপদ থাকে। যখন মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা থাকে। খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনুর রশিদ এসব করতে পেরেছিলেন, কারণ তাদের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের ভীত মজবুত ছিল। বাগদাদের পত্র পেলে তখন নাইসিফোরাসের মত সম্রাটরাও কেঁপে উঠতো। আমার সময়ে তো পরিস্থিতি এমন ছিল না। মুসলিমদের একের পর এক শহরে হামলা করছিল তাতাররা, বইছিল রক্তগঙ্গা। তখন, শক্তিকে শক্তি দিয়ে মোকাবিলা না করে শুধু ‘বুদ্ধিবৃত্তিক’ লড়াই চালানো ছিল হাস্যকর বোকামি। শোনো, শক্তিকে শক্তি দিয়েই মোকাবেলা করতে হয়। আর শক্তি না থাকলে ‘বুদ্ধিবৃত্তিক’ মোকাবেলা করাও সম্ভব হয় না। আব্বাসি খিলাফাহ দূর্বল হয়েছে, একইসাথে ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে বাইতুল হিকমাহ। মাদরাসা নিজামিয়ার কাঠামো ততদিন শক্তিশালী ছিল, যতদিন সেলজুকরা শক্তিশালী ছিল। যখন মুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা থাকে না, কুফফাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর, তখন শক্তিকে শক্তি দিয়ে মোকাবেলা না করে ঘরে বসে ‘বুদ্ধিবৃত্তিক’ প্রতিরোধ করাকে তোমরা বেশ চমৎকার সিদ্ধান্ত মনে করলেও, আমাদের সময় আমরা একে ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলেই বিবেচনা করতাম’

এলোমেলো ৪

সন্ধ্যা নেমেছে বেশ আগে। আমু দরিয়ার এ পাশটা নীরব। নদীতে পানির মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। একটু শীত শীত লাগছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় দুয়েকটা নিশাচর পাখি। পাশে বসা মানুষটির দিকে তাকাই। আবছা অন্ধকারে তাঁর চেহারা অস্পষ্ট দেখায়। তবে তাঁর বসার ভঙ্গিতে একটা দৃঢ়ভাব দেখা যাচ্ছে।
'আমু দরিয়া। জান্নাতের নদী' আনমনে বলে উঠি।
'ঠিক বলেছ। কত সাম্রাজ্য ও জনপদের উত্থান-পতন দেখেছে এই নদী তাঁর হিসেব নেই। নদীর ওই পাড়েই ছিল কাছ শহর। কুতাইবা বিন মুসলিম এই অঞ্চল জয় করার পর এর নাম রেখেছিলেন আল মানসুরিয়্যাহ। পরে এই সমৃদ্ধ শহরটি হারিয়ে যায় আমু দরিয়ার ভাঙ্গনে'। শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরার গলায় বিষাদের সুর।ছোট একটা পাথর কুড়িয়ে নেই। নদীতে ছুঁড়ে মারি। ছলাত শব্দ করে পানি ছলকে উঠে।
'আপনি কিছু একটা অনুমান করেছিলেন। তাতার হামলার কিছুদিন আগে আপনি মুরিদদেরকে বলেছিলেন, পূর্বদিক থেকে আগুন আসছে। মুসলিম উম্মাহর উপর এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর আসেনি' গায়ে চাদরটা শক্ত করে চেপে ধরে বলি।'বলেছিলাম। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। যারা গাফলতের ঘুমে বিভোর ছিল তাদের সেই ঘুম ভাঙ্গেনি'
'আমার ভাবলে অবাক লাগে। ৬১৮ হিজরিতে চেংগিস খান সমরকন্দ বিজয় করে ধেয়ে আসছিল আরগেঞ্চের দিকে। জিহাদের ডাক দিলেন সুলতান জালালউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ। তিনি ব্যস্ত ছিলেন সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে। আর তখন সুলতানের ভাই কুতুবুদ্দিন প্রস্তুত হচ্ছিলেন সুলতানের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে। তিনিও বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। তবে তাতারদের সাথে লড়াই করতে নয়। নিজের ভাইয়ের সাথে লড়াই করতে। কী অদ্ভুত'
'পরের ঘটনা জানা আছে?'
'হ্যা। সুলতান ভাইয়ের প্রস্তুতির কথা জেনেছিলেন। তার সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিল। হয় তিনি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন অথবা কোন সমাধান বের করে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে যাবেন। চাইলে সুলতান প্রথম পথ অবলম্বন করে বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন, তখন তার সেই সামর্থ্য ছিল। কিন্তু সুলতান অন্তর্কোন্দলে জড়িয়ে সেনাবাহিনীকে দূর্বল

করতে চাচ্ছিলেন না। আবার একইসাথে রাজধানীর প্রতিরক্ষাও ছিল গুরুত্বপূর্ন। সবদিক বিবেচনায় তিনি এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নিলেন, ইতিহাসে যার নজির বিরল। তিনি ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে রাতের আধারে মাত্র তিনশো সৈন্য নিয়ে গোপনে শহর ছেড়ে পূর্বদিকে নাসা শহরের পথ ধরলেন। তার বাহিনী পড়ে রইলো রাজধানীতেই , তাতারদের প্রতিরোধ করার জন্য। তিনি নিজের ভাইয়ের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত রইলেন, আবার একইসাথে রাজধানীর প্রতিরক্ষার জন্য নিজের বাহিনীও দিয়ে আসলেন। পথে পদে পদে বিপদের আশংকা ছিল, কারন তাতারদের ছোট ছোট দল তখন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব দলের মুখোমুখি হলে সুলতানের এই ছোট দলটি টিকতেই পারবে না, কিন্তু তিনি এসবের পরোয়া করলেন না। সুলতান চাচ্ছিলেন তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকুক’

‘কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তাতাররা শহরের কাছাকাছি আসতেই কাপুরুষ কুতুবুদ্দিন তাঁর পরিবার ও গয়নাপত্র নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। শহরে অবশিষ্ট থাকে সুলতান জালালউদ্দিনের রেখে যাওয়া সেই জানবাজ বাহিনী। তারা তাতারদের মোকাবিলা করতে থাকে। প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত চেংগিস খানের বাহিনীকে তারা শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি’ চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। শায়খকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাঁর কন্ঠ শুনতে পাচ্ছি।

‘শায়খ, আমার মনে পড়ে অবরোধের সেই দিনগুলিতে চেঙ্গিস খান আপনার কাছে পত্র লিখেছিল। সে লিখেছিল, আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমি আপনাকে সম্মান করি। আপনি আপনার দশজন মুরিদ নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারেন। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিলাম। জবাবে আপনি বলেছিলেন, এখানে আমার মুরিদরা থাকে। তাদের ছেড়ে গেলে আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব। এরপর চেঙ্গিস খান এক হাজার লোকের নিরাপত্তা দিতে চায়। আপনি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। আপনি বলেন, আমি এখানেই থাকছি। আমি তোমাদের সাথে লড়বো। এবং আপনি শহরেই থেকে যান। আপনার এ সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। কারণ, আপনি কোনো সেনাপতি বা যোদ্ধা নন। আপনি তো খানকাহে বসা সুফি। আপনার জন্য এটাই উত্তম ছিল যে আপনি এসব ফিতনা ফাসাদে জড়াবেন না। নিরাপদ গন্তব্যে চলে যাবেন। মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিবেন’ বলতে বলতে শায়খের দিকে একটু সরে বসি।

‘কী বললে? ফিতনা-ফাসাদ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমাদের যুগের কিছু কিছু সুফিদের কথাবার্তা দ্বারা তুমি বেশ প্রভাবিত। আরে, ফিতনা-ফাসাদ তো

করছিল চেংগিস খান। আর আমরা তাঁর এই ফিতনা থামানোর জন্য জিহাদ করছিলাম। আমাদের লড়াই তো ফিতনা ফাসাদ নয়' শায়খ একটু রেগে যান।

'শায়খ, মাফ করবেন। আসলে আমি এভাবে বলতে চাইনি। আসলে সুফি বলতে আমরা বুঝি তারা হবেন সবার প্রিয়ভাজন। তারা খানকাহয় অবস্থান করবেন। তারা কারো সাথে বিবাদে জড়াবেন না। সারা দুনিয়ার সব কাফিরের জন্য হেদায়াতের দোয়া করেই তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন। তারা মানুষকে ভালোবাসার কথা শোনাবেন। সকল হানাহানি, লড়াই ও যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে বলবেন' সাফাই গাইলাম।

'সুফিরা খানকাহয় থাকবেন, এটা তো তখনকার কথা যখন নগরী নিরাপদ থাকবে। কুফফারদের সাথে লড়াইয়ের সময় তো আর বসে থাকার সুযোগ নেই। আমি তো আমার সময়ের সব সুফিদের মুরব্বী ছিলাম। কিন্তু আমিও নিজের মুরিদদের সাথে নিয়ে তাতারদের সাথে লড়েছি'

'হ্যা জানি সেকথা। ইবনুল ইমাদ হাম্বলি বিস্তারিত লিখেছেন। তাতাররা যেদিন শহরে প্রবেশ করছিল সেদিন আপনি মুরিদদের ডেকে বলেন, সবাই চলো। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ো। এরপর আপনি নিজের কক্ষে যান। পীরের দেয়া খিরকাহ পরে নেন। এক হাতে নেন পাথরভর্তি থলে। অন্য হাতে তীর। তারপর বাইরে এসে তাতারীদের বিরুদ্ধে তীর ছুড়তে থাকেন। মাঝে মাঝে পাথরও নিক্ষেপ করছিলেন। আপনার তীরের আঘাতে কয়েকজন তাতার সেনা নিহত হয়। হঠাত একটি তীর এসে আপনার বুকে লাগে। আপনি মাটিতে পড়ে যান। আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, আল্লাহ আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট। তাতারদের পতাকাবাহী এক সেনা আপনার দিকে এগিয়ে আসে। আপনি আচমকা উঠে তার উপর হামলা পড়েন। তার পতাকা টেনে নেন। তাতার অনেক চেষ্টা করেও পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় আপনি ইন্তেকাল করেন। আপনার ইন্তেকালের পরেও হাত থেকে পতাকা টেনে নেয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে তাতাররা পতাকাটি কেটে ফেলে। আপনাকে রিবাতাহ এলাকায় দাফন করা হয়'

'সুফিদের জন্য আলাদা কোনো শরিয়াহ নেই। উম্মাহ বিপর্যস্ত থাকবে আর তারা আলিশান খানকাহে থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই। নগর পুড়লে খানকাহ রক্ষা পায় না। কুফফারদের অস্ত্র যখন উন্মুক্ত হয় তখন কে সুফি আর সুফি নয়, সেই ভেদাভেদ করে না। আমাদের সময় আমরা এই সত্য ভালো করেই উপলব্ধি করতাম।' শায়খ বললেন।

নির্মল জীবন ১

৬১৭ হিজরি।

আগের বছর তাতারদের হাতে পতন ঘটেছে খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যের। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তাতার ত্রাস। ইবনুল আসীর লিখেছেন, মুসলমানদের মাঝে তাতার ভীতি এত প্রকট ছিল যে, একজন তাতার একটি গলিতে প্রবেশ করে। সেখানে একশোজন মুসলমান ছিল। সেই তাতার একে একে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে। কিন্তু তারা কেউই তাকে প্রতিরোধ করার চিন্তাও করেনি।

৬১৭ হিজরিতে তাতাররা আজারবাইজানের একাংশ দখল করে ফেলে। এসময় শোনা যায় তারা উত্তর ইরাকের মসুলে আক্রমণ করবে। দূর্বল আব্বাসি খলিফা নাসির লিদিনিল্লাহ এবার তাতারদের ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেন। তিনি তাতারদের মোকাবেলা করার জন্য বাহিনী গঠন করেন।

তার সেই বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল মাত্র ৮০০ জন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি এর চেয়ে বেশি সেনা যোগাড় করতে পারেননি। এই ক্ষুদ্র বাহিনী দেখে তাতাররাও বিশ্বাস করতে পারেনি। তারা ভেবেছিল এই ছোট বাহিনীর পেছনে আব্বাসিদের মূল বাহিনী এগিয়ে আসবে। তাই তারা লড়াই না করেই ফিরে যায়।[২৪৬]

এ ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। কেনো খলিফা চেষ্টা করেও ৮০০ জনের বেশি সেনা যোগাড় করতে পারেননি? কেনো কেউ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি ছিল না? বাগদাদের তরুণ ও যুবকরা কোথায় ছিল?

প্রথমত, তাতারদের ব্যাপারে সবার মনে তীব্র আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, সে সময় সবার ভাবনা ছিল নিজেকে ঘিরে, নিজের শহরকে ঘিরে। বাগদাদ নিরাপদ আছে, দজলায় কিশতিতে করে ভ্রমণ করা যাচ্ছে, তুর্কী দাসিদের সৌন্দর্য চক্ষু শীতল করছে, দানানির বারমাকিয়্যা ও মাহবুবার সুললিত কণ্ঠে গান শোনা যাচ্ছে, অযথা উত্তর ইরাকের মসুলে কী হচ্ছে তা নিয়ে পেরেশান হওয়ার কী দরকার?

এক বছর ধরে মুসলিম ভূখন্ডে তাতাররা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল, তা নিয়ে বাগদাদের লোকজনের কোনো চিন্তা বা পেরেশানি ছিল না। বরং আমিরদের কেউ কেউ এর থেকে বেশি পেরেশান ছিল তাদের গায়ক গোলামদের নিয়ে। একজন

---

[২৪৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১০/৪১৩- ইবনুল আসীর।

তো বলেই বসেছিল, এই গোলামকে হারানো আমার জন্য বাগদাদ হারানোর চেয়েও বেশি কষ্টকর। এমনকি ইরাক হাতছাড়া হলেও আমার এতটা কষ্ট লাগবে না।[২৪৭]

খিলাফাহর রাজধানী ব্যস্ত ছিল মদ-নারী ও গানবাজনা নিয়ে। হালাকু খান যখন মোসুলের আমির বদরুদ্দিনের কাছে মিনজানিক চেয়ে দূত পাঠিয়েছিল, একই সময় খলিফা মুস্তাসিম দূত পাঠিয়ে কয়েকজন গায়িকা দাসী চেয়েছিলেন। এমনকি তাতাররা যখন বাগদাদের কাছে চলে এসেছে খলিফা মুস্তাসিম তখনো আরাফা নামক দাসীর নাচ দেখতে ব্যস্ত।[২৪৮]

মুসলিম ভূখন্ডে তাতারদের আক্রমণ শুরু হয় ৬১৬ হিজরিতে। আর তাদের হাতে বাগদাদের পতন হয় ৬৫৬ হিজরিতে। মাঝের ৪০ বছরে একের এক শহরে নির্বিচারে তারা আক্রমণ চালিয়েছে তারা। কিন্তু খিলাফাহর পক্ষ থেকে তাতারদের প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। বিভিন্ন শহরের মুসলমানদের অবস্থাও ছিল স্বাভাবিক। নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তাদের।

-

কয়েক শতাব্দী পর ইতিহাসের এসব বিবরণ আমাদেরকে সে সময়কার মানুষজনের প্রতি বিরক্ত করে তোলে। তাদের বোকামি ও গাফলতির বিবরণ পড়ে আমরা তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হই। কিন্তু যদি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আমাদের অবস্থাও সেকালের লোকজনের চেয়ে ভালো কিছু নয়। একের পর এক ফিতনা ধেয়ে আসছে, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শত্রুর আবির্ভাব ঘটছে, আমরা এখনো অনর্থক বিনোদন, পারস্পরিক বিভেদ এসবে ব্যস্ত। সময়গুলো কাটছে অবহেলায়, অলসতায়।

আশপাশের সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবগত নই, এটা বলা ভুল হবে। আমরা বেশ ভালোভাবেই অবগত চারপাশে কী হচ্ছে। কিন্তু এখনো আমরা অসচেতন। সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা শুধু মজলিসের জৌলুস বৃদ্ধি করে কিংবা অন্যকে আক্রমণ করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। এখনো আমাদের কাছে সমস্যাগুলো দূরের সমস্যা, কাছের নয়।

দুরের কথা বাদই থাক। নিজ জনপদের মানুষদের ঈমান-আকিদা নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে। কখনো কাদিয়ানি, কখনো হিজবুত তাওহিদ, কখনো মিশনারীরা হামলা করে অল্পমূল্যে তাদের ঈমান-আকিদা কিনে নিচ্ছে। মানুষ

---

[২৪৭] আত তাতার বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার, পৃ- ৪২ – আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি।

[২৪৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৭/৩৫৬- ইবনু কাসির।

জানতেও পারছে না কত অল্প দামে সে কত মূল্যবান জিনিস বিকিয়ে দিচ্ছে। আধিপত্যবাদীরা কড়া নাড়ছে দুয়ারে, একের পর এক সংকেত দিচ্ছে তারা। আমরা এখনো ব্যস্ত আমোদ-প্রমোদে। যেভাবে তাতার হামলার সময় কবুতরের খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন খলিফা নাসির লিদিনিল্লাহ। এডেসায় রোমানদের আক্রমণের সময় শিকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বুওয়াইহি শাসক বখতিয়ার।

মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সামাজিক নৈতিকতার কাঠামোগুলো ভেঙ্গে গেছে, পারিবারিক বন্ধন প্রতিনিয়ত হালকা হচ্ছে, সবকিছু এক অশনী সংকেত নির্দেশ করছে।

এখনই সময় সচেতন হওয়ার। নিজেকে তৈরী করার। নিজেকে ঈমান-আমল-তাকওয়ার গুনে সজ্জিত করার।

তাতার হামলার প্রাক্কালে বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ নাজমুদ্দিন রাজি তার লিখিত মিরসাদুল ইবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছিলেন, অভিশপ্ত তাতাররা আমাদেরকে যে ফিতনা-ফাসাদে ডুবিয়ে দিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। এখনো যদি আমাদের নেতৃত্ব সচেতন না হন, সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে না তোলেন, তাহলে অচিরেই মুসলিম ভূখন্ডে তাতারদের বিজয় নিশান উড়বে।

নাজমুদ্দিন রাজি এ আহবান জানিয়েছিলেন শাসকদের প্রতি। বর্তমানে তার এ আহবান সবার জন্য প্রযোজ্য। এই ক্রান্তিকালে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে। অলসতা ও অবহেলার ঘূর্নিপাক থেকে বের হয়ে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই কেবল রক্ষা পাব আমরা। নইলে আমাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে করুণ পরিণতি।

ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়।

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা ১

একজন পরামর্শ দিলেন, বিয়ে করবেন ভেবেচিন্তে। যোগ্য একজন মেয়ে খুঁজে নিবেন। যিনি আপনার কথা বুঝতে পারবেন। পরামর্শ যিনি দিয়েছেন তিনি আমার প্রতি আন্তরিক। পরামর্শটাও দিয়েছেন আমার ভালোর জন্যই। সমস্যা হলো, তিনি ধরে নিয়েছেন বিয়ের পর আমি বউয়ের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলবো। যে কথা বউ বুঝবে না সেই কথা বউকে বলারই বা কী দরকার। আর বউ কিছু বুঝবে না এটাই বা কেমন কথা? বউরা তো সবই বুঝে। চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে সব। আরেকজন পরামর্শ দিলেন, ভাই একটু শান্ত মেয়ে দেখে নিবেন। অনেক মেয়ে আছে খুব রাগী। স্বামীকে একেবারে করায়ত্ত করে রাখে। এইটাও তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ না। একটু-আধটু করায়ত্ত থাকলে কী এমন অসুবিধে। আলাউদ্দিন কাসানির মতো জগদ্বিখ্যাত ফকিহও তো স্ত্রীর কথার এদিক-সেদিক করতেন না। আলাউদ্দিন কাসানি। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাদায়িউস সানায়ে'র লেখক। মূলত এই গ্রন্থটি হলো তার উস্তাদ ও শ্বশুর মুহাম্মদ সমরকন্দীর লেখা তুহফাতুল ফুকাহা গ্রন্থের ব্যখ্যাগ্রন্থ। তার বিয়ের মোহরই ছিল এই গ্রন্থটি। স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন ফিকাহশাস্ত্রে দক্ষ। আলাউদ্দিন কাসানিও স্ত্রীকে সম্মান করতেন। আলাউদ্দিন কাসানি বসবাস করছিলেন হালাবে। স্ত্রী বললেন, চলুন, আমরা কাসান ফিরে যাই। আলাউদ্দিন কাসানি মেনে নিলেন এই আবদার। সংবাদ পেয়ে চমকে গেলে সুলতান নুরুদ্দিন জেংগি। ডেকে নিলেন আলাউদ্দিনকে। বললেন , এ হতে পারে না। আপনি এখানেই থাকুন। আলাউদ্দিন কাসানি বললেন, আমার স্ত্রী এখানে থাকতে চাচ্ছেন না। তিনি আমার উস্তাদের মেয়ে। আমি তার ইচ্ছার বিরোধিতা করব না। সুলতান একজন মহিলাকে পাঠালেন ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ সমরকন্দীর কাছে। শেষে ফাতেমা রাজি হলেন হালাবে থাকতে। আলাউদ্দিনও আর নড়লেন না। হালাবেই থেকে গেলেন মৃত্যু পর্যন্ত।[২৪৯]

আলাউদ্দিন কাসানির ঘটনা থেকে বুকে বল পাচ্ছি। মানে একটু-আধটু বউয়ের ন্যাওটা হওয়া মন্দ কিছু নয়। এখন কথা হলো বউ স্বামীর ন্যাওটা হবে কিনা তা বুঝা যাচ্ছে না। উস্তাদ তানভীর আহমেদকে এ প্রশ্ন করে সদুত্তর পাইনি। কিন্তু বেশি ন্যাওটা হলেও সমস্যা। পড়াশোনা লাটে উঠবে। এমনিতেই বিশরে হাফি বলে গেছেন, _ _ _ _ _ _ _ _ _ । কী কঠিন আরবীরে বাবা। তরজমা করলে আইডি

---

[২৪৯] আদ দাওলাতুয যিংকিয়্যাহ, ৩২২ পৃষ্ঠা-- আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবি।

থাকবে না। কাছাকাছি ধরণের কথাই বলেছেন ইমাম সুফিয়ান সাওরিও। তিনি বলেছেন, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ।[২৫০] এটাও তরজমা করার সাহস পাচ্ছি না। এর চেয়ে আবু নসর সিযযির কথাটাই বলা যাক। তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এক মহিলা। জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি সিজিস্তান থেকে বের হয়েছি ইলমের জন্য। এখন বিয়ে করলে তালিবুল ইলমের খাতা থেকে আমার নাম বাদ পড়বে।[২৫১]

এটুকু শুনেই যারা ভয়ে কেঁপে উঠেছেন তাদের বলছি, ভয়ের কিছু নেই। বিয়ের পরেও ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এমন উদাহরণও আমাদের সামনে আছে। বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থের লেখক ইবনে রুশদের কথাই ধরা যাক। তার জীবনিতে এসেছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর শুধু দুইটি রাতে তিনি পড়াশোনা বাদ দিয়েছিলেন। একটি তার পিতার মৃত্যুর রাত। অপরটি তার বাসর রাত।[২৫২]

কিন্তু কথা হলো বউ আপনাকে পড়তে দিবে কিনা কে জানে। এমনিতেই মাহমুদুদ্দৌলা ইবনে ফাতিকের বউ ছিল তার উপর ক্ষেপা। ইবনে ফাতিক সারাদিন বই পড়তেন, বউকে সময় দিতেন কম। স্বামী জীবিত থাকতে কিছু বলতে পারেননি। স্বামী মারা গেলে সব বই ফেলে দিয়েছেন হাউজের পানিতে।[২৫৩] দেখা যাচ্ছে ‘পড়ুয়া মেয়েটিকে বধুয়া করো’ শ্লোগান যারা দিচ্ছেন তারা আমাদের কাছে কিছু কিছু বিষয় আড়াল করছেন। বধুয়া আর পড়ুয়ার আলাপ বাদ। মুজতবা আলী যে পয়লা রাতে বিড়াল মারতে বললেন, সেটার কী হবে? সম্ভবত এটা কোনো কাজের কথা নয়। কারণ, প্রতিদিন এত মানুষ বিয়ে করার পরেও রাস্তাঘাটে এখনো এত বিড়াল দেখা যাচ্ছে কীভাবে?

আধুনিক গবেষকদের অনেকের মতে (যাদের মধ্যে উস্তাদ তানভীর আহমাদও আছেন) জীবনের সবচেয়ে চ্যাতা সময় হলো যখন বিয়ের জন্য কথাবার্তা শুরু হয়। সেটা নাকি অন্য এক জগত। পরে একদিন সেই জগত থেকেও আমরা ঘুরে আসবো।

---

[২৫০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা-- হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

[২৫১] আল উলামাউল উযযাব, পৃষ্ঠা ৬৩-- শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ।

[২৫২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১শ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা-- হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

[২৫৩] আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ, ২৯৫ পৃষ্ঠা-- ড. ইয়াহইয়া ওহাইব জুবুরি।

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা ২

বিয়ে নিয়ে আগের পর্বে কিছু কথা হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সেখানে বিয়ের চেয়ে বউ নিয়েই কথা ছিল বেশি। এবার বিয়ের আলাপে আসা যাক। বিয়ে করতে কমবেশি সবাইই আগ্রহী। এমনকি যারা করে ফেলেছেন তারাও বিয়ে নিয়ে লেখা পড়তে আগ্রহী। বিশ্বাস না হলে আগের পোস্টের কমেন্টবক্স দেখতে পারেন। কিন্তু বিয়ে করা কি এতই সহজ? আমাদের সমাজে বিয়ে মানে কাড়ি-কাড়ি টাকার খেলা। এজন্য তরুণ তুর্কীরা এক কদম আগায় তো দশ কদম পেছায়। তবে সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মত শ্বশুর পেলে বিয়ে করা সহজই হয়ে যায়। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আলি ইবনুল মাদিনী যার সম্পর্কে বলেছেন, তাবেয়ীদের মধ্যে এত প্রশস্ত ইলমের অধিকারী আর কাউকে চিনি না। কাতাদাহ বলেছেন, আমি তার চেয়ে বড় কোনো আলেম দেখিনি। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, অসামান্য সাহসিকতার অধিকারী এই তাবেয়ী কখনো অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি। জাবির বিন আসওয়াদ যখন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পক্ষে বাধ্যতামূলক বায়াত নেয়া শুরু করেন, তখন সাইদ কঠোরতার নিন্দা জানান। পরিনামে জাবির তাকে বেত্রাঘাত করেন। তখনো তিনি হকের পক্ষে অনড় ছিলেন। জাবিরের ছিল চার স্ত্রী, পরে এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইদ্দত চলাকালীন পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেন, যা ছিল স্পষ্ট হারাম। সাইদ নির্যাতিত অবস্থাতেও এই অনাচারের প্রতিবাদ করেন। এই সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন তার ছাত্র আবু ওয়াদাআর কাছে। আবু ওয়াদাআর প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। এই কারনে তিনি কয়েকদিন দরসে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি দরসে উপস্থিত হলে সাইদ নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেন। আবু ওয়াদাআ আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু সাইদ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের মেয়েকে তুলে দেন তার হাতে। মেয়েও যেমন তেমন মেয়ে নয়। আবু ওয়াদাআ নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, আমার সৌভাগ্য আমি এমন স্ত্রী পেয়েছি যিনি হাফেজা এবং হাদীস শাস্ত্রেও পারদর্শী। সৌন্দর্যেও অতুলনীয়া। সাইদের এই মেয়ের জন্য উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের ছেলে ওয়ালিদের বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। সাইদ তা ফিরিয়ে দেন।[২৫৪]

---

[২৫৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪র্থ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা-- হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

এই সুযোগে আমরা একটু সিরিয়াস আলাপ করে ফেলি। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের ছেলের প্রস্তাব সাইদ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে ওয়ালিদের বিশেষ যোগ্যতা ছিল দুটি। প্রথমত, তিনি মুসলিম বিশ্বের যুবরাজ। দ্বিতীয়ত, তিনি 'বড় আলেমের ছেলে' (সহজ ভাষায় বলতে গেলে সাহেবজাদা)। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা কথা থাকতে পারে কিন্তু ইলমি দুনিয়ায় তিনি যে শাহেনশাহ ছিলেন তাতে কারো দ্বিমত নেই। তার সম্পর্কে ইবনু উমর বলেছেন, মারওয়ানের ছেলে একজন ফকিহ। তোমরা তাকে প্রশ্ন করো (অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞেস করো)[২৫৫]। তো এমন একজন পিতার সন্তান হিসেবে ওয়ালিদ বাড়তি সুবিধা পাবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব যেহেতু দুনিয়াদার নন, তাই হয়তো যুবরাজের প্রতি আগ্রহ দেখাননি এটা স্বাভাবিক। কিন্তু 'বড় আলেমের ছেলে' হিসেবে তো ওয়ালিদ এগিয়ে ছিল। কিন্তু সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এটাকেও গুরুত্ব দেননি। আমাদের সমস্যা দুইটাই। পয়সাওয়ালা দেখলেই আমরা চমকে যাই। আমাদের অবস্থান হলো, টাকা-পয়সা আছে? ওকে বিয়ে দাও। পরে দোয়া করবো যেন দ্বীনদার হয়ে যায়। অনেকে এই পয়েন্টে বেঁচে যান কিন্তু তারা ধরা খান শেষে এসে। বড় আলেমের ছেলে এই কারণে মেয়ে তুলে দেন 'বড় আলেমের অযোগ্য ছেলে'র হাতে। কয়েক মাস আগে কাপাসিয়ার এক নির্জন চরে হাটতে হাটতে উস্তাদ Ajmal Hossain Khan সাহেবের সাথে এই বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল। সে সময় উস্তাদ বলেছিলেন, বড় আলেমের ছেলে বা মেয়ে দিয়ে কী হবে? বড় আলেম দেখে কী হবে। সে তো বাবা। ছেলে বা মেয়ে কী তা দেখতে হবে।

একজন অবিবাহিত হয়ে এতসব ভারী ভারী আলাপ করছি, কাজটা বেমানান। আমি নিজেই লজ্জিত। তবু সামান্য কয়টা লাইক-কমেন্টের লোভে এসব লেখতে হচ্ছে। চলুন এবার হালকা আলাপে যাই। হালকা আলাপের সারকথা হলো বিয়ে করে ফেলুন। অশান্তি লাগছে? বিয়ে করুন। অর্থাভাবে আছেন? বিয়ে করুন। ফেসবুকে বেশি সময় নষ্ট করছেন? বিয়ে করুন। এই লেখাটা ভালো লাগছে? বিয়ে করুন। বিয়ে করা মানে আরেকজনের দায়িত্ব নেয়া (এটা অবশ্য আমি বলার আগ থেকেই আপনারা জানেন। আমি বললাম ফরমালিটি রক্ষা করার জন্য)। আসল কাহিনী কিন্তু বিয়ের পরেই। সব কাজ করতে হবে উনাকে খুশি করে। উনি বেজার হলেই সব শেষ। আবার উনি খুশি হবেন কী করে তা বোঝাও কঠিন। আপনি যেটাকে উত্তম ভাবছেন, তিনিও সেটাকে উত্তম ভাববেন এমন কোনো কথা নেই। মাইসুন

---

[২৫৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪র্থ খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা-- হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী।

বিনতু বাহদালের কথাই ধরা যাক। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন শামের মুক্ত প্রকৃতিতে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) শামে এলে মাইসুনকে বিবাহ করেন। তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কিন্তু মাইসুন বিনতু বাহদাল এই প্রাসাদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তার মনে হত দম বন্ধ হয়ে আসছে।[২৫৬] সুতরাং, হে যুবক, তোমাকে (এবং আমাকেও) হতে হবে সতর্ক। বুঝতে হবে অপরজনের মনস্তত্ব। অপরজনের মনস্তত্ব না বুঝে অযথাই অভিযোগ করা যাবে না। মনস্তত্ব না বুঝলে অযথাই কষ্ট পেতে হবে। কষ্ট পেয়েছিলেন খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহও। বাসররাতে নববধূ কতরুন নাদা তাকে রেখে চলে আসেন কামরার বাইরে। মাঝরাতে খলিফার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পাশে স্ত্রীকে না পেয়ে অবাক হন তিনি। উঠে দেখেন স্ত্রী পাশের কামরায়। প্রশ্ন করতেই স্ত্রী জানালেন, আমি পাশে থাকলে যদি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য উঠে এসেছি[২৫৭]। খলিফা শান্ত হলেন। কিন্তু আমাদের অশান্ত মনে ঠিকই ঘুরঘুর করছে একটা প্রশ্ন। খলিফা কেনো বাসর রাতে ঘুমাতে গেলেন? আমরা হলে তো ইমরাউল কায়েসের কবিতা পড়তাম, ইয়া লাইলু তুল, ইয়া নাউমু যুল (রাত লম্বা হ, ঘুমের বাচ্চা ঘুম ভাগ)। খলিফাকে বাসরঘরে রেখে আমরা একটু ভিন্ন আলাপে যাই। বাসরঘর শুনলেই যারা শিহরিত হয় সেইসব তরুণদের বলছি, সেখানে কিন্তু বিপদের আশংকাও আছে। বহুবার এই ভূমিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আরবী বইয়ের উপর বাংলা বই রাখা জায়েজ আছে কিনা?

(আগের পর্ব পড়ে Gazi Sanaullah ভাই এক বেলা নাস্তার দাওয়াত দিছেন। এইজন্য এই পর্ব লিখে ডিনারও কনফার্ম করার চেষ্টা আর কী)

[২৫৬] নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা, ৫৪৩ পৃষ্ঠা-- আহমদ খলিল জুমআ
[২৫৭] নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা, ৪৫১ পৃষ্ঠা-- আহমদ খলিল জুমআ

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা ৫

কলেজে পড়ার সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একরাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার বিয়ে হচ্ছে। গাড়িতে করে নববধূ সহ কোথাও যাচ্ছি। ঘুম থেকে উঠার পর মেয়েটার চেহারা চোখে ভেসে রইলো। এই মেয়েকে কখনো দেখিনি, পরিচিত কেউও নয়, কিন্তু স্বপ্নে দেখা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। কয়েকদিন খুব বিষন্ন ছিলাম। ক্লাস বাদ দিয়ে আটি আর ওয়াশপুর গিয়ে একা একা হাটাহাটি করলাম। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। যাকে দেখিনি কখনো, যার অস্তিত্বই নেই, তার প্রেমে পড়ে গেলাম। ব্যাপারটা কখনো কারো সাথে শেয়ার করিনি। লোকে পাগল ভাববে, এই ভয়ে। তখন জানা ছিল না, ইবনু হাযম আন্দালুসি প্রায় এক হাজার বছর আগে এ বিষয়ে লিখে গেছেন। তিনি প্রেম-ভালোবাসার নানা প্রকারের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, প্রত্যেক ভালোবাসার জন্য একটি যৌক্তিক কারণ আবশ্যক। কিন্তু কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটে। আমি নিজে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ না করলে তা উল্লেখ করতাম না। এরপর তিনি আবুস সারা আম্মার বিন যিয়াদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একদিন ইবনু হাযম গেলেন আবুস সারা আম্মার বিন যিয়াদের সাথে দেখা করতে। তিনি দেখলেন আবুস সারা খুব চিন্তিত ও বিষণ্ণ। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কিছুদিন আগে এক মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছি। ঘুম থেকে উঠার পর দেখি তার ভালোবাসা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ আমি তাকে চিনিও না। ইবনু হাযম বললেন, আপনি নিজেকে এমন বিষয়ে জড়িয়ে ফেলছেন যার কোনো বাস্তবতাই নেই।[২৫৮]

স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসা যাক। স্বপ্ন তো নানারকমের হয়। একটা হলো ঘুমের স্বপ্ন। আরেকটা হলো জেগে থেকে দেখা স্বপ্ন। বিয়ে নিয়েও মানুষের মনে থাকে নানা স্বপ্ন। বউ কেমন হবে না হবে, এসব আর কী। বিয়ে সংক্রান্ত সব স্বপ্নের মূলকথা কিন্তু একটাই, মনের মত বউ চাই। মনের মত বউ পেয়েছিলেন তাবেয়ী শুরাইহ বিন হারেস বিন কাইস আল কিন্দি। বিয়ে করেছিলেন বনু তামিমের মেয়ে যয়নবকে। বিশ বছর সংসার করে তিনি বলেছেন, যয়নবের সাথে সংসার করে প্রতিদিন আমি আগেরদিনের চেয়ে বেশি আনন্দিত ছিলাম। বিশ বছরে কখনো

---

[২৫৮] আন্দালুসি, আবু মুহাম্মদ আলি বিন আহমাদ বিন সাইদ বিন হাযম (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী), তওকুল হামামাহ, পৃ-১৯, (মিতবাআহ হিজাজি, ১৩৬৯ হিজরী)

আমি তার উপর রাগ করিনি (অর্থাৎ সে এমন কোনো কাজ করেনি যাতে আমি ক্রোধান্বিত হব)। একবার তার উপর রাগ করেছিলাম, কিন্তু সেদিনও তার কোনো দোষ ছিল না। এরপর শুরাইহ কবিতা আবৃত্তি করেছেন, আমি দেখি লোকেরা তাদের স্ত্রীকে প্রহার করে। আমি যদি যয়নবের গায়ে হাত তুলি তাহলে আমার ডান হাত অবশ হয়ে যাক।[২৫৯]

শুরাইহ’র কথা শুনে কারা কারা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, দাঁড়িয়ে যান, দু’হাত তুলে দেখান।

বিয়ে আসলে মজার জিনিস। ঠিক কতটা মজার সেটা তো বিয়ে না করে বোঝানোর উপায় নেই। বাকি বিয়ে করেছেন এমন একজনের কথা শোনা যাক। আহমদ বিন তৈয়ব সারাখসি নামে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দুনিয়ার মজা কিসে? তিনি সরাসরি বলে বসেছেন,

– – – – – – – —   — – – – – – – – – – — – – – – – —

উফ কী ভয়ংকর কথাবার্তা। মোবাইল পর্যন্ত গরম হয়ে গেছে। এই কথা শুনে এক কবি আবার কবিতাও বানিয়ে ফেলেছে।[২৬০]

– – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – –

যাক, আমরা নীরস মানুষ। এইসব কবিতার সাথে আমাদের কোনো লেনাদেনা নেই। আমরা বরং আগের আলোচনাতেই ফিরে যাই। মনের মত বউ। মনের মত বউ পাবেন কিনা, আর পেলে আপনি তার মনের মত স্বামী হতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে বিজ্ঞজনরা নীরব। এ প্রশ্ন উঠলেই তারা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসেন। ‘আরো কত দরকারি কাজ আছে সে সব বাদ দিয়ে এই আলোচনা কেন?’ বলে তারা সবকিছু উড়িয়ে দিতে চান। তাদের নীরবতা আমাদের আতংকিত করে , কিন্তু একইসাথে আমরা সবাইই দিল্লির লাড্ডু খেয়ে পস্তাতে আগ্রহী, না খেয়ে সান্ত্বনা নিতে আমাদের কোনো আগ্রহই নেই।

মনের মত বউ পেয়ে তাকে রানী করবেন বলে যারা ভাবছেন তারা হয়তো নুরজাহানের কথা ভুলে গেছেন। ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের এক কর্মকর্তার মেয়ে।

---

[২৫৯] ইবনু আসাকির, আবুল কাসেম আলি বিন হাসান ইবনু হিবাতিল্লাহ বিন আবদিল্লাহ শাফেয়ী (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী), তারিখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৩/৫৩, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হিজরী)

[২৬০] কাযভিনি, যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (মৃত্যু ৬৮২ হিজরী), আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, পৃ-৩৯০, (বৈরুত, দার সাদের)

যৌবনের শুরুতে কাবুলে শাহজাদা জাহাংগিরের সাথে দেখা। এরপর তো ইরাবতি আর যমুনায় অনেক জল গড়ালো। নুরজাহানের বিয়ে হলো। স্বামীর সাথে বাংলায় এলেন। স্বামী নিহত হলেন, এতে জাহাংগিরের হাত থাকুক বা না থাকুক, ফলাফল হিসেবে হিসেবে নুরজাহান উপস্থিত হলেন মুঘল হেরেমে। বিয়ে হলো জাহাংগিরের সাথে। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের কতৃত্ব বুঝে নিলেন নুরজাহান। দেখা গেল সম্রাটের আড়ালে থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন তিনিই। যুবরাজ খুররম বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তাকে দমনের জন্য সম্রাটের সাথে থাকলেন নুরজাহান। খুররমের সাথেও ছিলেন আরেক নারী। যিনি সারাজীবন স্বামীর সাথে প্রতিটি সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি, ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে, খুররম ততদিনে সম্রাট শাহাজাহান, স্বামীর সাথে তিনি চলে গেলেন বোরহানপুর। লড়াই হচ্ছিল সেখানে আর তিনি ছিলেন গর্ভবতী। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ, যুদ্ধের অনিশ্চয়তা, শারিরিক দূর্বলতা সবকিছু ভুলে গিয়ে জেদ করেই তিনি স্বামীর সাথে ছিলেন এই সফরে। এই সফরেই তিনি মারা যান, চৌদ্দতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। তিনি মমতাজ মহল। বাল্যকালে মিনাবাজারে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন শাহজাহান।[২৬১]

মেলা কথা হচ্ছে। সব কথা একদিনে বলার দরকার কী? বাকি কথা আরেকদিন।

[২৬১] দেহলভী, শামসুল উলামা মৌলভী মুহাম্মদ যাকাউল্লাহ, তারীখে হিন্দুস্তান, ৭ম খন্ড, (দিল্লি, শামসুল মাতাবি, ১৮৯৭)

আব্বাসাকে নিয়ে বিভ্রান্তি ও জাফর হত্যার রহস্যের খোজে

(আব্বাসা। খলীফা হারুনুর রশিদের বোন। তাকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। বলা হয় তার সাথে উযির জাফর বারমাকির প্রনয় ছিল। জাফরের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। শর্ত ছিল তারা যৌন সম্পর্ক করতে পারবে না।

কিন্তু তারা যৌন সম্পর্ক করে এবং তাদের একটি সন্তান হয়। ফলে খলীফা ক্রুদ্ধ হয়ে জাফরকে হত্যা করেন। জাফরকে হত্যা করা হয়েছে আব্বাসার কারনেই। এই গল্পের সত্যমিথ্যা কতটুকু ? আসলেই কি আব্বাসার সাথে জাফরের বিয়ে হয়েছে ? জাফরকে হত্যার প্রকৃত কারনই বা কী ? কী বলছে ইতিহাস গ্রন্থগুলো? এসব প্রশ্নের জবাব নিয়েই এই লেখা)

বারামেকা পরিবার

বারামেকা পরিবার। আব্বাসী সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনায় যাদের কথা বলতেই হয়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৩৬ হিজরী-১৮৭ হিজরী) এই পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত সুনাম ও খ্যাতির সাথে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। বলতে গেলে সাম্রাজ্য পরিচালনার চাবিকাঠি ছিল তাদের হাতেই। তাদের হাতেই বাগদাদ হয়ে উঠে সুশোভিত। বারামেকাদের স্বর্নযুগ ধরা যায় হারুনুর রশিদের শাসনামল। আবার তাদের পতনও হয় হারুনের হাতেই। বারামেকাদের আদী বাসস্থান ছিল বলখে। সেখানে এক বিশাল অগ্নিকুন্ড ছিল। স্থানীয়রা এই অগ্নিকুন্ডের উপাসনা করতো । ৩১ হিজরীতে (৬৫১ খ্রিস্টাব্দ) মুসলমানদের হাতে বলখ বিজয়ের পর অগ্নিকুন্ড নিভিয়ে ফেলা হয়। কিছুকাল পরে আবার এই অগ্নিকুন্ড জ্বালানো হয়। ৮৬ হিজরীতে (৭০৫খ্রিস্টাব্দ) কুতাইবা বিন মুসলিম আবারো বলখ দখল করেন এবং একে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময় অগ্নিপূজকদের একটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করে দামেশকে চলে যায়। ১৩৩ হিজরীতে যখন দারুল খিলাফাহ দামেশক থেকে বাগদাদে সরিয়ে নেয়া হয় তখন তারাও বাগদাদ গমন করে।। এ সময় থেকে রাজদরবারে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। অগ্নিপূজক এই সম্প্রদায়ের নাম ছিল বারমাক। বারমাকের বহুবচন বারামেকা। খালেদ বারমাকি, ইয়াহইয়া বারমাকি, জাফর বারমাকি, ফজল

বারমাকি এই পরিবারের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিত্ব। বারমাকিরা আব্বাসি সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের অবদান রেখেছে। বিশেষ করে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। ইয়াহইয়া বারমাকি ভারতবর্ষে দূত প্রেরন করে এখানকার বেশকজন পন্ডীতকে বাগদাদ নিয়ে যান। তিনি অনুবাদক নিয়োগ করে ভারতবর্ষে রচিত চিকিতসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বেশকিছু বই অনুবাদ করান।[২৬২] ইয়াহইয়া বারমাকি বাগদাদে ইলমী বিতর্কের আয়োজন করতেন। পরে খলীফা মামুনের আমলে এর আরো বিস্তৃতি লাভ করে। প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি সাহিত্য ও কাব্যরচনায় বারামেকাদের পারদর্শীতা ছিল। ফজল বারমাকি বাগদাদে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৩]
প্রশাসনিক পদোন্নতি ও খলিফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারনে বারামেকারা বিপুল অর্থবৈভব ও প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক হয়। বাগদাদের আবাদী জমির বেশিরভাগ তাদের দখলে চলে যায়। এসময় তারাই পর্দার আড়াল থেকে হয়ে উঠে খেলাফতের নিয়ন্ত্রক। প্রকাশ পেতে থাকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা। গুরুত্বপুর্ণ পদগুলো তাদের দখলে চলে আসে। ইবনে খালদুনের মতে , তারা কোষাগারের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে। অনেকসময় খলিফা হারুনুর রশিদ প্রয়োজনে পড়ে কোষাধ্যক্ষের কাছে অর্থ চেয়েও পেতেন না।[২৬৪]

নানাকারনে বারামেকাদের অনেক শত্রু তৈরী হয়। এদের একজন খলীফা হারুনুর রশিদের প্রাসাদের প্রধান পাহারাদার (হাজেব) ফজল ইবনে রবী। ফজল তার পদমর্যাদাবলে খলীফার কাছে বারামেকাদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন। তার মনকে বিষিয়ে তোলেন। খলিফাকে বলা হয় বারামেকারা বনু আব্বাসের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছে। ফজল ইবনে রবির অভিযোগ ও ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কারনে খলিফা বারামেকাদের উপর ক্রুদ্ধ হন। ১৮৭ হিজরীর (৮০৩ খ্রিস্টাব্দ) একরাতে খলীফা আদেশ দিলেন উযির জাফরকে হত্যা এবং জাফরের পিতা ইয়াহইয়া ও ভাই ফজলকে গ্রেফতার করতে। একইসাথে বারামেকাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেয়া হলো। খলিফার অনুচর মাসরুরের মাধ্যমে জাফরের হত্যাকান্ড সম্পন্ন হলো। বারামেকাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। ইয়াহইয়া বারমাকি ও অন্যদের রাক্কা শহরে বন্দী করা হয়। প্রথম এক

[২৬২] আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত, (৬১-৬৫ পৃষ্ঠা) — সাইয়েদ সুলাইমান নদভী। মশাল বুকস, লাহোর।
[২৬৩] আল বারামেকা , (১২৮,১২৯ পৃষ্ঠা) — মুনশী আব্দুর রাজ্জাক কানপুরী। নামী প্রেস, কানপুর।
[২৬৪] আল মুকাদ্দিমা , (১ম খন্ড,১০০ পৃষ্ঠা) — আল্লামা ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

বছর তাদেরকে কোনো কষ্ট দেয়া হয় নি। তাদের সুখ স্বাচ্ছ্যন্দের দিকেও খেয়াল রাখা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক ইবনে সালেহ ও তার পুত্র খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে গ্রেফতার হন। অভিযোগ উঠে বারামেকারা এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিল। এবার খলিফা বন্দী বারামেকাদের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং সকল সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেন। ১৯০ হিজরীতে বৃদ্ধ ইয়াহইয়া বারমাকি কারাগারে মৃত্যুবরন করেন। মামুন ক্ষমতায় এলে বারামেকাদের মুক্তি দেন এবং তাদের সম্পদও ফিরিয়ে দেন।[২৬৫] কিন্তু বারামেকারা আর তাদের হারানো জৌলুস ফিরে পায় নি।

সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর মতে, খলীফা হারুনুর রশিদ যদি বারামেকাদের উপর খড়গহস্ত না হতেন , তাহলে হয়তো আব্বাসী সাম্রাজ্যের ইতিহাসই বদলে যেত।[২৬৬]

জাফর বারমাকি

ইয়াহইয়া বারমাকির ছেলে জাফর বারমাকির জন্ম ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ)। খলিফা আবু জাফর মানসুরের শাসনকালে। বাল্যকালেই জাফরের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। জাফর ফিকহ পড়েন কাজি আবু ইউসুফের কাছে। আবু ইউসুফ ছিলেন নানা শাস্ত্রে দক্ষ। শিক্ষাজীবন শেষে জাফর সাহিত্য, ফিকহ, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ হয়ে উঠেন। মুহাম্মদ বিন রাশেদ ইসহাক মসুলির বর্ননামতে, জাফর বাগদাদের আলেমদের অন্যতম ছিলেন। প্রশাসনিক কাজে জাফর কখন নিযুক্ত হন তার কোনো বিশুদ্ধ বর্ননা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনাবলি থেকে এটা বুঝা যায়, হারুনুর রশিদ খলিফা হওয়ার এক বছর পর জাফরকে উযির নিযুক্ত করেন। ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১ খ্রিস্টাব্দ) জাফরকে মিসরের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ) তার পরিবর্তে ইসহাক বিন সুলাইমান কে পাঠানো হয়। ১৮০ হিজরীতে জাফরকে পাঠানো হয় শামের বিদ্রোহ দমন করতে। কিছুকাল তাকে খোরাসান ও সিজিস্তানে পাঠানো হয়। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। খলিফার সাথে তার অত্যন্ত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। জাফরের পিতা ইয়াহইয়া ছিলেন হারুনের শিক্ষক। খলীফা নিজের যে কোনো কাজে জাফরকে সাথে রাখতেন। নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন জাফরের জন্যও

[২৬৫] হিস্ট্রি অব সারাসিনস, (১৭৬,১৭৭ পৃষ্ঠা)– সৈয়দ আমীর আলী। বাংলা সংস্করণ, বাংলা একাডেমী।
[২৬৬] আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত, ৬৫ পৃষ্ঠা — সাইয়েদ সুলাইমান নদভী। মশাল বুকস, লাহোর।

তা পছন্দ করতেন। প্রায়ই তাকে ভাই বলে ডাকতেন। উযির হিসেবে জাফর ছিলেন দুরদর্শী, বিচক্ষণ ও কৌশলী।[২৬৭]

জাফর হত্যার স্বরুপ সন্ধান

জাফরকে হত্যা করা হয় ১৮৭ হিজরীতে। পুরো ব্যপারটিই ছিল আকস্মিক। এমনকি হত্যার দিনে সারাদিন খলিফা জাফরকে নিজের সাথে রেখেছেন। শেষ বিকেলে খলীফা বললেন, 'জাফর,আমি তোমাকে এতটাই ভালোবাসি, আজ তোমার থেকে পৃথক হতে ইচ্ছে করছে না। যদি আজ স্ত্রীর কাছে না যেতাম, তাহলে সারারাত তোমার সাথে গল্প করতাম' ।সে রাতে খলীফা মাসরুরকে নির্দেশ দিলেন, জাফর বারমাকিকে হত্যা করো। ইয়াহইয়া বারমাকি ও ফজল বারমাকিকে গ্রেফতার করো। একইসাথে বারমাকিদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করো।[২৬৮]
খলীফার আদেশমতে সেরাতেই জাফরকে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিকরা এ হত্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বক্ষমান আলোচনায় পুরো ঘটনার বিবরণ দেয়ার সুযোগ নেই। আমরা আপাতত এ হত্যাকান্ডের কারন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ননা তুলে ধরবো।

ইবনে খালদুন লিখেছেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বারামেকাদের হাতে চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই খলিফা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। এছাড়া বারামেকাদের বিরোধী পক্ষ তাদের ব্যাপারে খলিফার কান ভারী করতে থাকে। ফলে জাফরের ছোট ছোট দোষও খলিফার চোখে বড় হয়ে দেখা দেয়। একারনে খলিফা জাফর ও তার পরিবারের উপর রুষ্ট হন[২৬৯] অন্যত্র তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে বারামেকাদের পতনের যথার্থ কারন তাদের অযথা হস্তক্ষেপের মধ্যে নিহিত ছিল।[২৭০]
ইবনে কাসীর এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি বর্ননা এনেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, খলিফা জাফরকে বলেছিলেন, ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানকে নিজের ঘরে বন্দী রাখতে। জাফর তাকে মুক্ত করে দেয়। খলীফা প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করেন নি। পরে জাফর স্বীকার করলে খলীফা ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি কসম খেয়ে বলেন, জাফরকে আমি অবশ্যই হত্যা করবো। খলীফা জাফরের উপর আরো কয়েকটি কারনে ক্রুদ্ধ হন। তিনি যে এলাকায় যেতেন দেখতেন সেখানের সব

---

[২৬৭] আল বারামেকা, (১৪৮-১৫৫ পৃষ্ঠা)– মুনশী আব্দুর রাজ্জাক কানপুরী। নামী প্রেস, কানপুর।
[২৬৮] কিতাবুল উযারা, (১৫০, ১৫১ পৃষ্ঠা)– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জাহশায়ারি। দারুল ফিকরিল হাদিস, বৈরুত।
[২৬৯] তারীখে ইবনে খালদুন , (৩য় খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা) — আল্লামা ইবনে খালদুন। দারুল ফিকর।
[২৭০] আল মুকাদ্দিমা, (১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)– ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

ভালো জমি জাফরের দখলে। এছাড়া জাফর প্রচুর অর্থব্যায়ে একটি ঘর নির্মাণ করে। এতেও খলিফা রাগান্বিত হন।[২৭১]

ইবনে আসীর জাফরের নির্মিত বিলাসবহুল গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরেকটি বর্ননা এনেছেন, তা হলো, একদিন ইয়াহইয়া বারমাকি খলিফার বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করে। খলিফা তখন সামনে উপবিষ্ট শাহী চিকিতসককে বলেন, তোমাদের এলাকায় কি লোকজন অনুমতি ছাড়া ঘরে চলে আসে ? এ কথা শুনে ইয়াহইয়া লজ্জিত হন। মূলত এ সময় থেকেই খলিফা বারামেকাদের উপর ক্ষিপ্ত হতে শুরু করেন। ইবনে আসীর এ হত্যাকান্ডের কারন হিসেবে তাবারীর বর্ননাটিও উল্লেখ করেছেন, যা থেকে আব্বসাকে নিয়ে বিভ্রান্তির সূচনা।[২৭২]

হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাভী জাফরের ঘর নির্মাণের বর্ননা বেশ গুরত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বারামেকাদের উপর সুলতানের ক্ষিপ্ত হওয়ার আরেকটি কারন বর্ননা করেছেন। ইয়াহইয়া বারমাকি দরবারে প্রবেশ করলে গিলমানরা তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতো। বিষয়টি খলিফা অপছন্দ করেন। তিনি মাসরুরকে আদেশ দেন, গিলমানদের সম্মান জানাতে নিষেধ করতে। হাফেজ জাহাভীও অন্যান্য বর্ননার সাথে তাবারীর বর্ননাটি এনেছেন।[২৭৩]

ইবনে খাল্লিকান উপরোক্ত কারনসমূহ উল্লেখের পাশাপাশি তাবারীর ভিত্তিহীন বর্ননাটিও এনেছেন।[২৭৪]

ইবনুল জাওযি ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি আবু বকর সুলির একটি বর্ননা এনেছেন। সুলি বলেন খলিফার বোন আলিয়া তাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কেন জাফরকে হত্যা করেছেন। খলিফা জবাব দিলেন, যদি আমি টের পাই আমার জামা এই হত্যার কারন জানে তাহলে আমি জামাকেও পুড়িয়ে ফেলবো। ইবনুল জাওযি বিস্ময়ের সাথে তাবারির বর্ননাটিও উল্লেখ করেছেন।[২৭৫]

---

[২৭১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (১০ম খন্ড,১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা)— হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির। মাকতাবাতুল মাআরিফ। বৈরুত।

[২৭২] আল কামেল ফিত তারিখ (৫ম খন্ড, ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠা)– ইবনুল আসির জাযারি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

[২৭৩] তারীখুল ইসলাম (১২শ খন্ড, ২২-২৭ পৃষ্ঠা)– হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাভী। দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।

[২৭৪] ওফায়াতুল আইয়ান (১ম খন্ড, ৩২৯,৩৩০ পৃষ্ঠা) –ইবনে খাল্লিকান। দারু সাদের, বৈরুত।

[২৭৫] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম (৯ম খন্ড, ১২৬-১৩৩)– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

মুহম্মদ রেজা-ই-করীম লিখেছেন, সম্ভবত আব্বাসীয় দরবারে বারমাকিদের ইরানি প্রভাব আরব সভাসদবর্গের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাহারা খলিফাকে কুমন্ত্রণা দিয়াছিল ।[২৭৬]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইবনে খালদুনের বক্তব্যই শক্তিশালী মনে হয়। বারামেকাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অন্যায় হস্তক্ষেপ খলিফাকে বিষিয়ে তোলে।
তাবারীর বর্ননায় কী আছে?
জাফরের হত্যাকান্ডের সাথে আব্বাসাকে জড়িয়ে যে গল্প চালু হয়েছে তার মূল উৎস ইবনে জারির তাবারির একটি বর্ননা। যারাই জাফরের হত্যাকান্ডের সাথে আব্বাসাকে জড়িয়েছেন সবাই এই বর্ননা থেকেই রসদ নিয়েছেন। পরে গল্প উপন্যাসের কল্যানে এই গল্প ডালপালা মেলেছে। চালু হয়েছে নানা কিসিমের মুখরোচক গল্প। দেখা যাক, তাবারীর বর্ননায় কী আছে?
তারীখে তাবারীতে বারামেকাদের পতনের কারন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাবারি বর্ননা করেন,
আমাকে যুহাইর বর্ননা করেছেন, তাকে তার চাচা যহির বিন হারব বলেছেন, বারামেকাদের পতনের জন্য জাফর ও আব্বাসার বিবাহ দায়ি। খলিফা হারুনুর রশিদ , জাফর ও আব্বাসা দুজনকেই খুব ভালোবাসতেন। তাদেরকে দেখা ছাড়া থাকতে পারতেন না।

খলিফা চাইতেন মদপানের মজলিসে দুজনই উপস্থিত থাকুক। এজন্য খলিফা জাফরকে বললেন, তুমি আব্বাসাকে বিবাহ করো। তাহলে আর পর্দার সমস্যা হবে না। তবে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করতে পারবে না। এই শর্তে খলিফা জাফরের সাথে আব্বাসার বিবাহ দেন। পরে মদ্যপ অবস্থায় জাফর আব্বাসার সাথে যৌন সম্পর্ক করে এবং তাদের একটি সন্তান হয়। এ সংবাদ খলিফা থেকে গোপন করে শিশুটিকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আব্বাসার সাথে মনোমালিন্যের জের ধরে জনৈক দাসি একথা খলিফাকে জানিয়ে দেয়। খলিফা সেবছর হজ্বের সফরে শিশুটির ব্যাপারে নিশ্চিত হন। তিনি শিশুটিকে হত্যা করেন এবং জাফরকেও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন[২৭৭]

তাবারির বর্ননা এটুকুই। আব্বাসাকে নিয়ে বিভ্রান্তির শুরুও এখান থেকেই। অথচ তাবারী স্বীয় অভ্যাসমতে অন্যান্য বর্ননার সাথে এটিকেও এনেছেন এবং

---

[২৭৬] আরব জাতীর ইতিহাস (২২৭ পৃষ্ঠা)– মুহম্মদ রেজা-ই-করীম। বাংলা একাডেমী।
[২৭৭] তারীখে তাবারী (৮ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)– আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী। দারুল মাআরিফ, কায়রো।

কোনোটিকেই তিনি তারজিহ বা প্রাধান্য দেন নি। তবে তাবারির পরে অন্যান্যরা এ গল্পকে আরো বড় করেছেন। রঙ চড়িয়েছেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক মাসউদি মারুজুজ জাহাব গ্রন্থে এক দীর্ঘ গল্প এনেছেন। সেসব দীর্ঘ গল্পের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাবারির বর্ননা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

প্রথমদিকের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তাবারী উল্লেখযোগ্য। তার রচিত ইতিহাসগ্রন্থটিও আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তবে তাবারীর সব বর্ননাই নির্ভুল কিংবা গ্রহনযোগ্য বিষয়টা এমন নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি লোকমুখে শ্রুত ও প্রচলিত অনেক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যার কোনো ভিত্তি নেই। এসব বর্ননা তিনি উল্লেখ করেছেন অন্যান্য বর্ননার পাশাপাশি, এবং এগুলোর কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া ব্যতিতই। শুধু তাবারী একা নন, ঐতিহাসিকদের অনেকেই এমনকিছু ভিত্তিহীন বর্ননা এনেছেন , যার দ্বারা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক ভিত্তিহীন গল্প। কাজি ইয়াহইয়া ইবনে আকসামের মদপান, মামুনের প্রেমের গল্প, এসব এমনই ভিত্তিহীন গল্পের অংশ। ইবনে খালদুন এ ব্যাপারে বলেন, ঐতিহাসিকদের অনেকেই কল্পিত বর্ননা ও মিথ্যা কাহিনীর সংযোজন করেছেন। পরে অনেকেই এগুলো অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং এই অতিরঞ্জিত বিবরণই আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। এখানে অনুসন্ধানের চেষ্টা নেই। বিচার বিশ্লেষন করে ঘটনাবলীকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টা নেই।[২৭৮]

তাবারীর বর্ননার দূর্বলতা

১।

তাবারীর বর্ননায় যুহাইর ও তার চাচা যাহের আছেন। এই দুজন মুতাজিলী ছিল। তাদের কেউই জাফরের হত্যাকান্ডের সময় উপস্থিত ছিল না। তাবারী নিজেই জাফরের হত্যাকান্ডে জড়িতদের নামের তালিকা দিয়েছেন সেখানে এই দুজনের নাম নেই। এছাড়া অন্য ঐতিহাসিকরাও এ দুজনের নাম দেন নি। সর্বশেষ বর্ননাকারী যাহের নিজেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না।

২।

হারুনুর রশিদের নামে মদপানের যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা রীতিমত বিস্ময়কর ও ভিত্তিহীন। ইবনে খালদুন আফসোস করে লিখেছেন, ঐতিহাসিকগন সম্রাট হারুনের সুরাসক্তি ও অন্তরংগদের সাথে সুরাপানের আসর বসানোর যে অবমাননার কাহিনি বর্ননা করেছেন, আল্লাহ ক্ষমা করুন, তার সম্পর্কে অনুরুপ দুর্মতির কোনো জ্ঞানই আমাদের নেই। খেলাফতের উত্তরসূরী, ধর্ম ও

---

[২৭৮] আল মুকাদ্দিমা (১ম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) –ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

ন্যায়পরায়নতার প্রতিভূ সম্রাট হারুনের পক্ষে এটা কীভাবেই বা সম্ভব । তিনি সর্বদা জ্ঞানীগুনি ও আধ্যাত্মিক মনিষীদের সাহচর্যে থাকতেন। ফুজাইল ইবনে আয়াজ, ইবনে সামাক, উমরির ন্যায় গুনিদের সাথে আলচনা করতেন। সুফিয়ান সাউরির ন্যায় মনিষীর সাথে তার পত্রালাপ চলতো।[২৭৯] মদের ব্যাপারে খলিফার অনাসক্তি বুঝতে এটাই যথেষ্ট যে, খলীফা মদপানের কারনে কবি আবু নাওয়াসকে গ্রেফতার করেন এবং মদপান ত্যাগ করার আগে তাকে মুক্তি দেয়া হয় নি। অবশ্য খলিফা আঙ্গুরের রস পান করতেন। কিন্তু একে মদ বলা ভুল। খলিফা মদের আসর বসাতেন এর কোনো বিশ্বস্ত বর্ননা পাওয়া যায় না। যেখানে মদের আসরই প্রমানিত নয় সেখানে শুধু এই আসরের জন্যই জাফর ও আব্বাসার বিবাহের গল্প কীভাবে সত্য হতে পারে।

৩।

বারামেকাদের পতনের পর আবু নাওয়াস ও অন্যান্য কবিরা যেসকল কবিতা রচনা করেছেন, তাতে এই বিবাহের কোনো আভাসও নেই। তাবারী ছাড়া আর কারো কাছেই যেন এ বিবাহের সংবাদ পৌছে নি।

৪।

হারুনুর রশীদ একজন আব্বাসী। তিনি কী করে তার বোনকে অনারব মুক্ত ক্রীতদাসের সাথে বিবাহ দিবেন? ইবনে খালদুন তাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার সাথে আব্বাসার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কী করে সম্ভব হতে পারে? একজনের পূর্বপুরুষ রাসুলের (সা) পিতৃব্য ও কোরায়শ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আর অন্যজনের পিতৃব্য অনারব পারস্যবাসী। আব্বাসিয়রাই বারমাকিদের ক্রীতদাসের কলংক থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেন। চিন্তাশীল পাঠক যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন তাহলে তার বিবেক কিছুতেই এই কথা সমর্থন করবে না যে, আব্বাসা নিজ বংশের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত একজনের সাথে এ প্রকার সম্পর্কে রাজী হবেন।[২৮০]

৫।

আব্বাসার বিয়ে সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহনযোগ্য বক্তব্য দিয়েছেন আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি। তার জন্ম ২১৩ হিজরীতে। অর্থাৎ, জাফরের হত্যাকান্ডের ২৬ বছর পরে। জীবনের এক দীর্ঘ সময় তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। সেসময় বাগদাদে বারমাকিদের অনেকেই বেচে

---

[২৭৯] আল মুকাদ্দিমা (১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) –ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

[২৮০] আল মুকাদ্দিমা (১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা) –ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

ছিল যারা জাফর হত্যাকান্ডের পূর্বাপর জানতো। যদি বারমাকিরা জাফর হত্যার জন্য আব্বাসার সাথে জাফরের বিবাহের গল্প বলতো তাহলে আবু আবদুল্লাহ অবশ্যই সে তথ্য উল্লেখ করতেন। কিন্তু আব্বাসা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, আব্বাসার প্রথম বিবাহ হয় মুহাম্মদ বিন সোলায়মান বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে। মুহাম্মদ মারা গেলে পরে ইবরাহীম বিন সালেহ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়।[২৮১]
আব্বাসার জন্ম হয় ১৫৪ হিজরীতে, কুফায়। ১৭২ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন সোলায়মানের সাথে তার বিয়ে হয়। মুহাম্মদ বিন সোলায়মান ছিলেন বসরার গভর্ণর। ১৭৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে আব্বাসার বিয়ে হয় ইবরাহীম বিন সালেহর সাথে। আবু আব্দুল্লাহ দিনাওয়ারি ছাড়াও এই বিয়ের উল্লেখ করেছেন সালেহ হিন্দী। তিনি হারুনুর রশীদের রাজ চিকিতসক ছিলেন। একবার ইবরাহিম বিন সালেহ প্রচন্ড অসুস্থ হলে তিনি চিকিতসা করেন। ইবরাহিম সুস্থ হলে আব্বাসার সাথে তার বিয়ে হয়। সময়কাল ১৭৬ হিজরী।[২৮২] ইবরাহীমকে মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ও আব্বাসা মিসরেই ইন্তেকাল করেন।[২৮৩]

৬।

খলিফা আব্বাসাকে সারাক্ষন নিজের কাছে রাখতে চাইতেন এই গল্পও নাকচ হয়ে যায়। কারন আব্বাসা প্রথম বিবাহের পর বসরা এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর মিসরে চলে যান।
(প্রখ্যাত উর্দু উপন্যাসিক সাদিক হোসাইন সিদ্দিকী তার রচিত ‘শাহজাদী আব্বাসা’ গ্রন্থে বেশ জোরের সাথে বলেছেন, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর আব্বাসা আর বিবাহ করেন নি। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো আব্বাসার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল)

---

[২৮১] আল মাআরিফ (৩৯৪ পৃষ্ঠা)– আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দিনাওয়ারি। উর্দু সংস্করণ। কিরতাস পাবলিকেশন্স, করাচী।
[২৮২] উয়ুনুল আনবা ফি তবাকাতিল আতিব্বা (৩২৪ পৃষ্ঠা)– ইবএন আবি উসাইবা। মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত।
[২৮৩] আল বারামেকা , (২৭৭ পৃষ্ঠা) — মুনশী আব্দুর রাজ্জাক কানপুরী।নামী প্রেস, কানপুর।

শয়তান

মূল- খান আসিফ
অনুবাদ- ইমরান রাইহান

১

শহরের বাইরে প্রশস্ত মাঠে হাজারো মানুষের ভীড়। একটু পর এখানে একজন আসার কথা। সে নিজেকে খোদা দাবী করে। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে একটি সিংহাসন রাখা। সিংহাসনের চারপাশে রেশমি কাপড়ের ঝালর।

অপেক্ষার প্রহর ধীরে চলে। জনতার মাঝে চাপা কৌতুহল ও উতকন্ঠা। অস্বস্তিবোধ করে কেউ কেউ। অনেক অনেক পরে, উত্তর দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসে। জনতা ফিরে তাকায় সেদিকে। চারটে সাদা আরবী ঘোড়ায় টেনে আনা গাড়ি দৃশ্যপটে উদয় হয়। ঘোড়াগুলো দ্রুত টেনে আনে গাড়িকে, ধুলো উড়তে থাকে, তার মাঝেই দেখা যায় গাড়িতে বসে আছে এক বেটে লোক। লোকটি সোনালী মুখোশ পরে আছে। তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তার পেছনে দাঁড়িয়ে চার প্রহরী। সবার কোমরে তরবারী। গাড়ির ডানে বামে আরো কয়েকজন সিপাহী। জনতা সরে জায়গা করে দেয়। ভীড়ের মাঝ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে যায় সিংহাসনের দিকে। জনতা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। সিংহাসনের কাছে এসে গাড়ি থেমে যায়। বেটে লোকটি গাড়ি থেকে নেমে সিড়ি বেয়ে সিংহাসনে উঠে। তার পিছু পিছু সিপাহিরাও উপরে উঠে। তারা উঠেই বেটে লোকটির সামনে সিজদায় চলে যায়। বেটে লোকটি একবার সিপাহিদের দিকে তাকায়, তারপর নিরাসক্ত ভংগিতে ডান হাত উপরে তোলে যেন সে তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। সিপাহীরা সেজদা থেকে মাথা তোলে, ধীরে ধীরে সরে আসে তারপর তারা বেটে লোকটির পেছনে চলে যায়। চার প্রহরী বেটে লোকটির পেছনে চলে যায়। বেটে লোকটির সাথে আসা সিপাহিরা এবার সেজদা করে। বেটে লোকটি আগের মতো ডান হাত উঁচু করে গম্ভীর কন্ঠে বলে, তোমাদের সেজদা কবুল হয়েছে। সিপাহিরা ধীরে ধীরে মাথা তোলে।

‘যারা আমার ইবাদত করে তারা নিরাপদ থাকুক’ মুখোশধারী বেটে লোকটি বলে।

সিপাহিরা জোরে স্লোগান দিয়ে উঠে। শ্লোগানের শব্দ পুরো মাঠে ছড়িয়ে যায়।

‘আপনি আমাদের খোদা, আমরা আপনার বান্দা’ সিপাহিরা বলে। উপস্থিত জনতা হতবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। ‘আমরা তোমাকে খোদা মানি না। তুমি খোদা হলে তার প্রমাণ দাও’ সামনের দিক থেকে একজন বলে উঠে।
‘অপেক্ষা করো। সূর্য অস্ত গেলেই আমার খোদায়ীর প্রমাণ দেখাবো। তোমরা আমার শক্তি টের পাবে’ বেটে লোকটি বলে।
জনতা অপেক্ষা করতে থাকে। সবার মধ্যে চাপা অস্বস্তি খেলা করছে। ধীরে ধীরে সূর্যটা পশ্চিমে হারিয়ে যায়। রোদের তেজ কমে আসে, হালকা লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য অস্ত যায়। ধীরে ধীরে চারপাশে আধার ঘনায়। আরো কিছু সময় পার হয়। আকাশে চাঁদ উঠে। চতুর্দশীর চাঁদ।
‘এটা তার সৃষ্টি যিনি এই পৃথিবীর শুরু থেকেই খোদা এবং শেষ দিন পর্যন্তই থাকবেন। তিনি আমাকে তার অবতার করে পাঠিয়েছেন। আমাকেও তিনি অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন’ বেটে লোকটির কণ্ঠ গমগম করে উঠে।
‘তাহলে তোমার শক্তি দেখাও’ কয়েকজন বলে উঠে। অপেক্ষা করতে করতে সবাই বিরক্ত হয়ে গেছে।
‘পাহাড়ের দিকে তাকাও’ বেটে লোকটি শান্তকণ্ঠে বলে। বেটে লোকটির মঞ্চের পেছন দিকেই ছোট একটি পাহাড়। সাদা জোসনায় ভেসে যাচ্ছে পাহাড়। স্থির কাঠামোকে মনে হচ্ছে ভৌতিক অবয়ব। সবাই পাহাড়ের দিকে তাকায়। প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। জনতা বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাবে তখনই পাহাড়ের আড়াল থেকে একটি চাঁদ উদিত হয়। চাঁদটি ধীরে ধীরে পাহাড়ের কাছ থেকে সরে আসে। এই চাদকেও চতুর্দশীর চাদের মতো দেখাচ্ছে। চাঁদটি মাঠের উপর চলে আসে। চাঁদ দুটি একইরকম উজ্জ্বল।
‘এই দেখো আমার শক্তি। এই চাঁদ আমার সৃষ্টি। এটাই প্রমান আমি খোদা’ বেটে লোকটি বলে উঠে। জনতা চুপ করে থাকে। তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা একবার চাদের দিকে তাকায়, আবার মুখোশধারীর দিকে তাকায়, তাকে মনে হচ্ছে রহস্যমানব, জনতা তার চেহারা দেখতে কৌতুহলী হয়।
‘তোমরা নিজের চোখে আমার ক্ষমতা দেখলে। তোমরা যদি আমাকে খোদা মেনে নাও তাহলে আমার নিরাপত্তার চাদর তোমাদের ঘিরে রাখবে। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে তোমাদের উপর একের পর এক বিপদাপদ আসতেই থাকবে’ একথা বলে মুখোশধারী উঠে দাঁড়ায়। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই সে গাড়িতে চড়ে বসে। ঘোড়ার ছুটন্ত পদশব্দের সাথে তার গাড়িও চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়।

জনতা কিছুক্ষণ নির্বাক বসে থাকে। এখনো তারা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি।
'সে অবশ্যই খোদার অবতার। না হলে সে কীভাবে চাঁদ সৃষ্টি করলো?' কেউ কেউ বলে উঠে।
'সে জাদুকর। জাদু দেখাচ্ছে। তার কথায় বিশ্বাস করো না' অন্যরা প্রতিবাদ জানায়। সেরাতে শহরবাসী ঘরে ফেরে দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে।

পরবর্তী কদিন দেখা গেল প্রতিরাতে এই নতুন চাঁদটি উদয় হয়। ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থেমে যায়। অনেকেই মুখোশধারীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে। কয়েকজন সাহসী মানুষ রাতের বেলা সেই মাঠে থেকে নতুন চাদটি পর্যবেক্ষন করে। তারা লক্ষ্য করে আসল চাদের সাথে মুখোশধারীর চাদের পার্থক্য হলো এই চাদটি পাহাড়ের ওপাশ থেকে উদিত হয়। আকাশের একটা নির্দিষ্ট অংশে এসে স্থির হয়ে যায়। রাতের শেষভাগে আবার ধীরে ধীরে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায়।
'এ কেমন চাঁদ? এই চাদের আকার সবসময় একই থাকে। বাড়ে কিংবা কমে না কেনো? আর কেনই বা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে এই চাঁদ থেমে যায়? এই চাঁদ কেনো পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় না?' লোকেরা মুখোশধারীকে এমন নানা প্রশ্ন করে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সে শান্তস্বরে জবাব দেয়,
'দেখো আসমানে যে খোদা আছেন আমি সে নই। আমি তার সহকারী। আমাকে এটুকু ক্ষমতাই দেয়া হয়েছে। যদি আমার ক্ষমতার উপর তোমাদের আস্থা না থাকে তাহলে যাও, আমার মতো এমন কাউকে খুজে নাও। দেখি পাও কিনা' তার কথা শুনে কেউ কেউ তাকে খোদার আসনে বসায়। কেউ কেউ ভাবে সে জাদুর খেল দেখাচ্ছে।
'এটা যদি জাদু হয় তাহলে আরেকজন জাদুকর খুজে বের করো। এমন কাউকেই তোমরা পাবে না' মুখোশধারী রাগতস্বরে বলে। কেউ এর চেয়ে বেশি প্রশ্ন করলে মুখোশধারীর প্রহরীরা তাদের উপর হামলে পড়ে।
'খোদার সাথে বেয়াদবি? তার অপমান করছো? অবশ্যই তোমাদেরকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে' একথা বলে তারা মারধর করে। দুয়েকজন তো আঘাতের চোটে মারাই যায়। ধীরে ধীরে মুখোশধারীর বিরোধিরা জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে চুপ হয়ে যায়। তার ভক্তরা অবশ্য তাকে খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। কেউ কেউ উদ্যোগী হয় নতুন চাদের রহস্য ভেদ করতে। পাহাড়ের পেছন দিকটায় গেলে এই নতুন চাদের রহস্য জানা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যাওয়া সহজ নয়। জায়গাটা

দুর্গম এবং সেখানে মুখোশধারীর সিপাহিরা পাহারা দেয়। অচেনা কেউ সেদিকে গেলেই তাকে ধরে ফেলে। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখানো হয়। যে কয়েকজন সেদিকে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে চুপ হয়ে যায়। আর সেদিকে যাওয়ার নাম নেয় না।
এই মুখোশধারী হলো হেকিম মুকান্না খোরাসানী। ভেলকি দেখিয়ে সে দূর্বল ঈমানের লোকদের ঈমান কিনতে চায়।

হেকিম মুকান্না খোরাসানির জন্ম মার্ভের কাছাকাছি একটি শহরে। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন তার বংশীয় নাম হিশাম। আবার কেউ কেউ বলেছেন তার নাম আতা। তার বাবা ও দাদা ছিলেন ধোপা। আর্থিক ও সামাজিকভাবে অবহেলিত। এমনই এক পরিবারে আতার জন্ম। বাল্যকালেই তার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শারিরিকভাবে সে ছিল খর্বাকৃতি। ছয় সাত বছর বয়স থেকে আতা টের পায় সমবয়সীদের চোখে সে অবহেলিত। সে তাদের সাথে খেলতে চায়, কিন্তু কেউ তাকে খেলায় নেয় না। এমনকি সে তাদের কাছে গেলেও তারা সহ্য করে না। 'কানা আসছে। তাকে সরিয়ে দাও। সে আমাদের জন্য কুলক্ষণ ডেকে আনবে' এই কথা বলে বালকরা তাকে মারধোর করে সরিয়ে দেয়। সমবয়সীদের অবহেলা আতাকে ব্যথিত করে। ধীরে ধীরে সে সবাইকে এড়িয়ে চলতে থাকে। বাড়ির পেছন দিকে নির্জন জায়গা হয়ে উঠে তার আশ্রয়। সে একাকী বসে ভাবতে থাকে সমবয়সীদের অবহেলার কথা।
'সময় আসুক। তোমরা ঠিকই টের পাবে আমি কে ? আজ তোমরা আমাকে লাঞ্চিত করছো। একদিন আমি তোমাদের লাঞ্চিত করবো' ক্রোধে মুষ্ঠি বন্ধ করতে করতে বিড়বিড় করে আতা। বাল্যকাল থেকেই আতার মনে এই কষ্টকর স্মৃতি গেথে যায়। জন্মগতভাবে আতা ছিল প্রচন্ড মেধাবী। ছোটবেলাতেই সে পিতাকে এমনসব প্রশ্ন করতো যা তার বয়সি ছেলের সাথে মানায় না। মূর্খ ধোপা ছেলের এসব প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে ধমকাতো।
'এসব আজগুবি প্রশ্ন তোমার মাথায় কোথেকে আসে? এসব বেহুদা চিন্তা বাদ দিয়ে ঘাটে যাও। কাপড় ধোও। আমাদের পেশায় কিছুটা উন্নতি করতে পারবে' পিতা বলে।
'ধোপার পেশা খুবই নিচু পেশা। এই পেশার কারনে কেউ আমাদের সম্মান করে না' আতা পিতার মুখের উপর বলে দিতো।
'ধোপার ছেলে ধোপা হয়, অন্যকিছু হতে পারে না'

‘আমি ধোপার ছেলে হবো না, আমি বাদশাহর চেয়েও বড় কিছু হবো’ আতা প্রতিবার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতো। পিতা কখনো কখনো একে শিশুসুলভ চিন্তা ভেবে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু আতার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার এই বিশ্বাস পোক্ত হয়। কয়েকবার পিতা তাকে মারধোরও করেন, ‘তুই নিজের চেহারা দেখেছিস? বাদশাহদের চেহারা এমন হয়’? পিতার মারধোর ও তিরস্কারের জবাবে আতার মুখে একটি বাক্যই উচ্চারিত হতো, ‘আমি বাদশাহদের চেয়েও বড় হবো’। পিতা তাকে ঘাটে নিয়ে যেতেন তবে আতা সুযোগ পেলেই পালিয়ে যেত। সে বিভিন্ন মক্তব ও দরসগাহে ঘুরে বেড়াতো। শিক্ষকদের বলতো আমি জ্ঞান অর্জন করতে চাই কিন্তু পিতা আমাকে পড়তে দেয় না। আপনারা আমাকে সুযোগ দিন। এভাবে সে বিভিন্ন মক্তবে পরতে বসে। শীঘ্রই শিক্ষকরা তার বিস্ময়কর মেধার পরিচয় পান। সমবয়সীদের তুলনায় তার মেধা ও স্মরনশক্তি অনেক বেশি। সে একবার কিছু শুনলে আর ভুলে না। উস্তাদরাও যত্নের সাথে তাকে পড়াতে থাকেন। আতার পিতা কয়েকবার শিক্ষকদের কাছে অভিযোগ করেন, আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে। সে আমাদের বংশীয় পেশা ছেড়ে আপনাদের মত হতে চায়, তাকে একটু বুঝান।
‘আপনি ভুল বুঝছেন। সে পাগল হয়নি। তার মেধা খুবই প্রখর। সে পড়ালেখা করে অনেক বড় বিদ্বান হবে। সেদিন আপনাদের আর অভাব থাকবে না। সবাই আপনাদের সম্মান করবে। তাকে লেখাপড়া করতে দিন’ একথা বলে শিক্ষকরা আতার পিতাকে বিদায় করেন। পিতা হতাশ হয়ে তাকে তার মতো চলতে দেন।

আতা বেশিরভাগ সময় দরসগাহে অবস্থান করে। রাতের বেলা কুপি জ্বেলে দুষ্প্রাপ্য বইপত্র পড়তে থাকে। কোনো বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট মনে হলে বারবার পড়ে, উস্তাদদের সাথে আলোচনা করে, বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার আগে সে ক্ষান্ত হয় না। উস্তাদরা জানে আতা মেধাবি ছাত্র, জ্ঞান অন্বেষনে তার প্রবল পিপাসা। কেউ টের পায় না আতার মনের গোপন কুঠুরিতে ঠিক কী লুকিয়ে আছে। পচিশ বছর বয়সে আতার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হয়। ততদিনে সে চিকিতসা ও দর্শনে দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে। দূর দুরান্তে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সে একটি ওষুধ আবিস্কার করে যা খেলে বৃদ্ধরাও শরীরে যুবকদের মতো শক্তি অনুভব করে। এই ওষুধের কথা জানতে পেরে দূরদুরান্ত থেকে লোকজন এসে এই ওষুধ কিনতে থাকে। ধনী ও আমীরদের চাকররা এসে আতার গৃহে ধর্না দেয়। অল্পকদিনেই আতার পরিবার ধনী হয়ে যায়। আতার পিতা তাদের বংশীয় পেশা ছেড়ে দিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে থাকে।

২

খোরাসান ও আশপাশের শহরে আতার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন তার কাছে আসতে থাকে। সবাই আতার কাছে আসতো ঠিকই কিন্তু কিন্তু মনে মনে তাকে ঘৃণা করতো। তার খর্বাকৃতি দেহ, এক চোখ নষ্ট ও কুচকুচে কালো ত্বক কোনো এক অজানা কারনে তার সাথে অন্যদের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিতো। লোকজন তাকে আড়ালে আবডালে কানা হেকিম বলতো। আতার কানে এ কথা পৌছলে সে খুব কষ্ট পায়। সে ভাবতে থাকে কীভাবে মানুষের অবহেলা ও বিদ্রুপ থেকে বাচা যায়। আতা চেহারা সুন্দর করার উপায় নিয়ে ভাবতে থাকে। সে কিছু ওষুধ তৈরী করে কিন্তু কোনোটাই কার্যকর হয় না। শেষ উপায় হিসেবে সে একটি বুদ্ধি বের করে। সাত আট দিনের জন্য সে ঘরে আশ্রয় নেয়। এসময় সে কারো সাথেই দেখা করেনি।

'হেকিম সাহেব আধ্যাত্মিক সাধনায় আছেন। কাউকে দেখা দিবেন না' আতার কর্মচারীরা এই বলে দর্শনার্থীদের বিদায় দেয়।

আটদিন পর আতা ঘর থেকে বের হয়। তার চেহারায় সোনালী মুখোশ। মুখোশের গায়ে সুক্ষ্ম কারুকাজ। আতার কদাকার চেহারা হারিয়ে গেছে মুখোশের আড়ালে। পরের কটা দিন লোকেরা আবিস্কার করলো অন্য আতাকে। আতার চেহারার কদার্যতা আর ভাবায় না কাউকে। তার চেহারায় সোনালী মুখোশ। চোখ ও নাকের জায়গায় ছোট্ট ছিদ্র। আরবীতে মুখোশ পরিহিতদের বলা হয় মুকান্না। ধীরে ধীরে আতাকে সবাই মুকান্না নামে ডাকতে থাকে। এই নামের আড়ালে চাপা পড়ে যায় আতা ও হিশাম নামদ্বয়। পরবর্তী বছরগুলোতে মানুষ তাকে চেনে হেকিম মুকান্না আল খোরাসানি নামে, যে নামের সাথে একইসাথে মিশে আছে ঘৃণা ও বিস্ময়।

মুকান্নার মনে আছে তার বাল্যকালের কথা। সমবয়সীদের অবহেলা, পথিকের চোখে ঘৃণা, সবই মনে আছে। পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। এখন তার অনেক ভক্তও জুটে গেছে। কিন্তু মুকান্না এতেই সন্তুষ্ট নয়। সে আরো বেশি কিছু চায়। বাল্যকালে সে পিতাকে বলতো, আমি বাদশাহর চেয়েও বড় হবো। সেকথা এখনো সে ভুলেনি। তাকে অনেক বড় হতে হবে, বাদশাহর চেয়েও বড়। মুকান্না পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিল। হিন্দুদের অনেকে এই মতবাদে বিশ্বাস করে। এই মতবাদ অনুসারে আত্মা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। কেউ একবার মারা গেলে আবার সে নতুনভাবে জন্মলাভ করে। আগের জন্মে পূন্য করলে পরের জন্মে সে সুন্দর মানুষের মতো জন্মগ্রহন করবে। আর আগের জন্মে পাপ করলে সে পশুপাখি হয়ে জন্মগ্রহন করবে। মুকান্না এই মতবাদকে তার কাজে লাগায়। সে

তার সহচরদের বলে, আমি তোমাদের একটি বিশেষ খবর শুনাবো। আমার কথামতো চললে তোমরা সুখে থাকবে। শহরবাসীকে আমার ঘরে আসতে বলো। এক বিশেষ দিনে মুকান্নার গৃহের সামনে অনেকেই ভীড় করে। দিনটি ছিল আলোকজ্জ্বল। মুকান্নার মুখোশে রোদ ঝলমল করছে।

'আমি তোমার একটি বিশেষ সংবাদ দিতে চাই। আমার কথা তোমাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে। বিশ্বাস রাখো আমার উপর, আমি মিথ্যা বলছি না। আমি পৃথিবীতে স্রষ্টার অবতার। তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে নিজের অবতার পাঠিয়েছেন। আমিও এমনই একজন' মুকান্না ধীর কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

'তোমার এই কথার প্রমাণ কী?' একজন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে।

'খোদা প্রথমে আদম (আ) কে তার অবতার বানান। এজন্যই ফেরেশতাদের বলেছিলেন তাকে সেজদা করতে। ইবলিস তাকে সেজদা না করায় বিতাড়িত হয়। কারন আদম (আ) ছিলেন স্রস্টার অবতার। এভাবে অন্যান্য নবীরাও ছিলেন অবতার। তোমাদের এই সময়ে আমি খোদার অবতার। অর্থাৎ জমিনের খোদা। এখন আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমাকে মেনে চললে সুখের সন্ধান পাবে' মুকান্নার কথায় অশিক্ষিত অনেকের বিশ্বাস টলে যায়। কেউ কেউ তাকে অলৌকিক কিছু দেখাতে বলে। মুকান্না দর্শন ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি জাদুবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিল। সে আমু দরিয়ার তীরে একটি কূপে একটি কৃত্রিম চাঁদ তৈরী করে লুকিয়ে রাখে। রাত হলে এই চাঁদ ধীরে ধীরে উপরে উঠতো। নির্দিষ্ট এক স্থানে এসে এই চাঁদ থেমে যেত। চাদটি ছিল চতুর্দশীর চাদের মতই উজ্জ্বল। রাতের শেষ প্রহরে এই চাঁদ আবার নেমে যেত। মুকান্নার তৈরী এই কৃত্রিম চাঁদ দেখে তার প্রচুর অনুসারী জুটে যায়। তারা তাকে খোদা বলে মেনে নেয়। খোরাসানের বাসিন্দারা ছিল মূর্তি পূজক। ইসলামের আগমনে তারা ইসলামগ্রহন করলেও অনেকে তাদের পুরনো ধর্মের বিশ্বাস থেকে বের হতে পারেনি। বিশেষত তাওহিদ সম্পর্কে তাদের পরিস্কার জানাশোনা না থাকায় তারা সহজেই মুকান্নার কথায় প্রভাবিত হয়। মুকান্নার পূর্বে আবু মুসলিম খোরাসানিও অনেককে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল, পরে যাকে হত্যা করা হয়। খোরাসানের মুসলিমদের ধর্মীয় জ্ঞান কম ছিল। মুকান্না এই সুযোগ গ্রহন করে।

মুকান্না তার অনুসারীদের বলতো তাকে সেজদা করতে। সে বলতো, আমি শতাব্দীকাল ধরে অবতার থাকবো। তোমরা আমাকে সেজদা করো। আমার কথা মেনে চলো।

ধীরে ধীরে তার অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই তার অনুসারীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে পৌছে যায়।

হেকিম মুকান্না তার অনুসারীদের বলতো, আমি এসেছি তোমাদের সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশের মুখ দেখাতে। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করো। যা পান করতে মন চায় পান করো।

মুকান্না তার এই দর্শন অনুসারে শুয়োর এবং মদ বৈধ করে। সে সকল প্রকার আত্মীয়তার বন্ধন অস্বীকার করে। তার মতে যে কোনো নারী যে কারো জন্য বৈধ। এর ফলে দরিদ্র ঘরের সুন্দরী মেয়েদের জীবন হয়ে উঠে বিপন্ন। ধনী ও প্রভাবশালীরা এসব মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত। কেউ মুকান্নার কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলে সে বলতো, আমার অনুসারীদের জন্য আমি সবকিছু বৈধ করেছি। যারা আমাকে খোদা মেনে নিবে তাদের জন্য সবকিছু বৈধ।

মুকান্নার অনুসারীরা দিনের একটা সময় ঘরের কোনো বসে মুকান্নার চেহারা কল্পনা করতো। এটাই ছিল তাদের কথিত ইবাদত। মুকান্নার এই ধর্মমত ছিল সবচেয়ে সহজ ধর্ম। যা ইচ্ছা করা যায়। তাই দ্রুত তার অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার অনুসারীরা কখনো কখনো আবেগের আতিশয্যে বলে বসতো, প্রভু , আমাদের কে আপনার চেহারা দেখান। আমাদের অন্তর প্রশান্ত হোক। ‘বেকুবের মতো কথা বলো না। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার চেহারা দেখতে পারে না। আমার চেহারা দেখলে তোমরা সহ্য করতে পারবে না’ মুকান্না ক্রোধের সাথে জবাব দিত। একথা শুনে কেউ আর কিছু বলার সাহস পেতো না।

মুকান্নার সশস্ত্র প্রহরীরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। কোথাও কেউ মুকান্নার বিরুদ্ধাচারন করলেই তাকে হত্যা করতো। মুকান্নার অনুসারীরা কিছু মসজিদ নির্মান করে, যদিও তারা নামাজ পড়ত না। মুকান্না আগেই বলেছে যারা তাকে মেনে নিবে তাদের জন্য নামাজ রোজা মাফ। মুকান্না নিজে শুয়রের মাংস খেতো, মদপান করতো। তার হেরেমে ছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে তুলে আনা সুন্দরী মেয়েরা। মুকান্নার সহচররা কোথাও কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলেই তাকে নিয়ে আসতো। মুকান্না তাদেরকে নিজের হেরেমে রেখে দিতো। মুকান্নার অনেক সন্তান হয় সে যাদের নামও জানতো না। মুকান্নার হেরেমে এক মুসলিম মেয়ে ছিল যার নাম সালমা। তাকে মুকান্নার লোক অপহরন করে এনেছিল দুরের এক গ্রাম থেকে। সালমার কিছুই করার ছিল না। রাত গভীর হলে সালমা নামাজে দাড়াতো। দুহাত তুলে দোয়া করতো, হে আল্লাহ, আমাকে এই শয়তানের হাত থেকে মুক্তি দিন। তার উপর আপনার আজাব পাঠান। তাকে ধবংস করে দিন।

৩

মুকান্নার অনুসারী বাড়তে থাকে। সে বিভিন্ন এলাকা দখল করে। চলতে থাকে তার অত্যাচার ও লুটতরাজ। এ সময় মুকান্না দাসিক নামে একটি কেল্লা নির্মান করে। কিছুদিন পরে তার মনে হয় এই কেল্লা নিরাপদ নয়। এ চিন্তা থেকে সে সিয়াম পর্বতে আরেকটি কেল্লা নির্মান করে। এই কেল্লা ছিল খুবই মজবুত। কেল্লার চারপাশে প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়। শত্রুপক্ষ আক্রমন করলে এই পরিখা অতিক্রম করা তাদের জন্য কঠিন হবে। কেল্লায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যশস্য জমা করা হয় যেন দীর্ঘমেয়াদী অবরোধেও তাদের কোনো সমস্যা না হয়। ‘এখন আর আমার বিশ্বাসীদের উপর বিপদের ভয় নেই। আজ থেকে তোমরা নিরাপদ। এই কেল্লা দখল করার শক্তি কারো নেই’ মুকান্না তার অনুসারীদের বলে। কেল্লা নির্মানের পর খোরাসানের আশপাশের এলাকার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। মুকান্নার সিপাহিরা প্রচুর মুসলমানকে হত্যা করে। যুবতী মেয়েদের বন্দী করে। মুকান্না শীঘ্রই নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষনা দেয়।

সময়টা ছিল উত্তাল। আব্বাসী সালতানাত তখনো নিজেদের পা মজবুত করতে পারেনি। আবু মুসলিম খোরাসানির সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই বোখারায় অনেকে বিদ্রোহ করে। এর মধ্যে ছিল মাবিজা নামে একটি গোত্র। মুকান্নার সাথে এই গোত্রের সরদার যোগাযোগ করে। মুকান্নাকে সে খোদা না মানলেও রাজনৈতিক কারনে তার সাথে সন্ধি করে। এছাড়া কয়েকটি তুর্কি গোত্রও মুকান্নার সাথে হাত মেলায়। মুকান্না হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য। তার জুলুম নির্যাতন বেড়ে যায় কয়েকগুন।

নির্যাতিত মুসলমানদের একটি দল বাগদাদ পৌছায়। ক্ষমতায় তখন আব্বাসী খলিফা মানসুরের পুত্র মাহদি। নির্যাতিত এই মুসলমানরা খলিফা মাহদিকে খোরাসানের অবস্থা জানায়। এই প্রথম খলিফা মাহদি খোরাসানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। এর আগে মুকান্না সম্পর্কে তার কোনো ধারনাই ছিল না। খলিফা জানতে পারলেন মুকান্না খোরাসানে একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছে। একইসাথে সে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। খলিফা ক্ষিপ্ত হন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন এখনই মুকান্নাকে থামাতে হবে। খলিফা মুকান্নার বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরন করেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আবু নোমান জুনাইদ ও লাইস বিন নসর। মুকান্নার একটি অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে খলিফার বাহিনীর লড়াই

হয়। এই লড়াইয়ে খলিফার বাহিনী পরাজিত হয়। যুদ্ধে লাইস বিন নসরের ভাই মুহাম্মদ বিন নসর শহীদ হন।
খলিফা দাতে দাত চেপে এই সংবাদ হজম করেন। তিনি আরেক বিখ্যাত সেনাপতি জিবরিল বিন ইয়াহইয়া কে ডেকে পাঠান।
'কাল পর্যন্ত তোমরা কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে। ইসলাম তোমাদেরকে এই আধার থেকে টেনে আলোর প্রাসাদে নিয়ে এসেছে। আমি জানি এখনো তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে যায়নি। খোরাসানের মাটিতে মুসলিম বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। যুবক ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হচ্ছে। নিজেকে খোদার আসনে বসিয়েছে এক দুষ্ট বামন। তুমি সেখানে যাও। চিরতরে তার রাজত্বের স্বপ্ন মুছে দাও' খলিফা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন।

জিবরিল বিন ইয়াহইয়া রওনা হলেন খোরাসানের পথে। চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মুকান্নার অনুসারিরা বোখারায় একটি কেল্লায় অবস্থান করছিল। জিবরিল বিন ইয়াহইয়া এই কেল্লায় হামলা চালান। চার মাস লড়াইয়ের পর মুকান্নার বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে মুকান্নার এক হাজার সৈন্য নিহত হয়। নিজ বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনে মুকান্না থমকে যায়।
'যারা আসছে সবাই প্রবেশের পর কেল্লার ফটক আটকে দাও। এখানে আমরা নিরাপদ' বলে সে।
জিবরিল বিন ইয়াহইয়া পরাজিত বাহিনীকে ধাওয়া করে সিয়াম পর্বতের কেল্লায় পৌছান। এখানে পৌছে তিনি থমকে যান। পরিখা পার না হয়ে কেল্লায় আক্রমন করা যাচ্ছে না, আবার পরিখাও পার হওয়া যাচ্ছে না। জিবরিল বিন ইয়াহইয়া কেল্লা অবরোধ করলেন।

খলিফা খোরাসানের অভিযান নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন সেনাপতি জিবরিল বিন ইয়াহইয়ার সাথে। কেল্লা অবরোধের সংবাদ শুনে তিনি আরেক সেনাপতি আবু আউনকে পাঠালেন কিন্তু তিনি এসেও কেল্লায় আক্রমনের কোন উপায় বের করতে পারলেন না। খলিফা বাধ্য হয়ে আরেক সেনাপতি মুয়াজ বিন মুসলিম কে সত্তর হাজার সৈন্যসহ পাঠালেন। মুয়াজ বিন মুসলিম তার বাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে খোরাসান পৌছলেন। এই বাহিনী পাঠিয়েও খলিফা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। তিনি উকবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উকবা বিন মুসলিম দ্রুত এসে মুয়াজ বিন মুসলিমের বাহিনীর সাথে মিলিত হন। এই দুই বাহিনী একত্রে তাওয়ালিস অঞ্চলের

একটি কেল্লায় আক্রমন করে, যা মুকান্নার বাহিনীর দখলে ছিল। এই যুদ্ধে মুকান্নার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মুকান্না পরাজয়ের সংবাদ শুনে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়। সে বুঝতে পারে খোলা ময়দানে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না। সে তার বাহিনীকে কেল্লাতেই অবস্থানের নির্দেশ দেয়।
মুয়াজ বিন মুসলিম এসে অবরোধের নিয়ন্ত্রন নেন। তার সহকারী ছিলেন সাইদ বিন আমর। দূর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েকদিনের মধ্যে মুয়াজ বিন মুসলিমের সাথে সাইদ বিন আমরের কথা কাটাকাটি থেকে তীব্র ঝগড়া হয়। এমনকি সাইদ বিন আমর খলিফার কাছে পত্র লিখে বলেন, যদি আমাকে একা এই অভিযানের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে আমি শীঘ্রই মুকান্নার কেল্লাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবো। খলিফা সাইদের কথা মেনে নেন। মুয়াজ বিন মুসলিমকে বাগদাদে তলব করা হয়। মুয়াজ বিন মুসলিম বাগদাদ ফিরে যান কিন্তু তার ছেলেকে সাইদ বিন আমরের বাহিনিতেই রেখে যান।
সাইদ বিন আমর পরিখা অতিক্রমের অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু প্রতিবারই ব্যার্থ হন। মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছিল খোলা ময়দানে। প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করতে হচ্ছিল। এছাড়া মুকান্নার বাহিনী আচমকা তীর নিক্ষেপ করে অনেক মুসলমানকে হত্যা করছিল । এতকিছুর পরেও মুসলমান বাহিনী মনোবল হারায়নি। সাইদ বিন আমর নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। যেকোন মূল্যে মুকান্না কে পরাজিত করবেনই। সাইদ বিন আমর কাঠ ও লোহার কিছু সিড়ি নির্মান করে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হয়নি উলটো অনেকে প্রাণ হারায়। সাইদ বিন আমর খলিফাকে বিস্তারিত জানিয়ে পত্র লেখেন।

সেসময় ভারতবর্ষের সিন্ধ অঞ্চল ছিল আব্বাসী সালতানাতের শাসনাধীন। খলিফা মাহদি কজন কর্মচারী পাঠিয়ে সেখান থেকে প্রচুর চামড়া সংগ্রহ করেন। গরু ও ছাগলের চামড়া সাইদ বিন আমরের কাছে পাঠানো হয়। সাইদ বিন আমর এসব চামড়ায় বালু ভরে চামড়া সেলাই করে দেন। তারপর বালুভর্তি বস্তসদৃশ চামড়াগুলো পরিখাতে ফেলা হয়। পরিখার একদিক ভরে যায়। কেল্লায় হামলা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাইদ বিন আমর এবার প্রচন্ড শক্তিতে আক্রমন করেন। কেল্লার পতন আসন্ন বুঝতে পেরে মুকান্নার সেনারা গোপনে সাইদের সাথে যোগাযোগ করে। তারা জানায় তারা তওবা করে মুকান্নার পক্ষত্যাগ করবে বিনিময়ে তাদেরকে জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। সাইদ এ শর্ত মেনে নেন। মুকান্নার ত্রিশ হাজার সৈন্য সাইদ বিন আমরের কাছে আত্মসমর্পন করে। মুকান্না নানাভাবে তাদের থামাতো চেয়েও সফল হয়নি।

‘তুমি যদি খোদা হতে তাহলে এখানে বসে থাকতে না। আরো আগেই মুসলিম বাহিনীকে বিপদে ফেলে ধবংস করে দিতে’ এই বলে মুকান্নার সৈন্যরা কেল্লা থেকে বের হয়ে যায়।
কেল্লায় শুধু মুকান্নার দু হাজার সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। এরা ছিল তার প্রতি নিবেদিতপ্রান। কোনোভাবেই তারা পক্ষত্যাগ করবে না। মুকান্না বুঝতে পারে কেল্লার পতন আসন্ন। যেকোনো সময় বাগদাদের সৈন্যরা কেল্লায় প্রবেশ করবে। তাকেও আবু মুসলিম খোরাসানির মতো হত্যা করা হবে। মুকান্না তার অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে কেল্লার প্রাংগনে জড়ো করে। সে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে, ‘এখন তোমাদের সামনে দুটো পথ খোলা। তোমরা আত্মসমর্পন করে মুসলমানদের গোলাম হয়ে যাও । অথবা আমার সাথে আসমানে চলো। সেখানে তোমরা সুখে থাকবে।
‘আমরা আপনার সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছু চাই না’ মুকান্নার অনুচররা সমস্বরে বলে উঠে ।
এরপর মুকান্না মাঠে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দেয়। আগুন জ্বলে উঠলে কেল্লার মূল্যবান সব জিনিসপত্র আগুনে ফেলা হয়। ভারবাহী পশুগুলোকেও আগুনে ফেলা হয়।
‘আমি যাচ্ছি , তোমরা আমার সাথে আসো’ একথা বলে মুকান্না আগুনে ঝাপ দেয়। তার অনুচর ও হেরেমের মহিলারা তাকে অনুসরণ করে। কারো কারো মতে মুকান্না সবাইকে মদপান করিয়ে মাতাল করেছিল। তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মুকান্না কে অনুসরণ করে আগুনে ঝাপ দেয়।
মুকান্নার হেরেমের এক মেয়ে এই সময় লুকিয়ে ছিল। মুকান্না ও তার সাথীরা মারা গেলে সে কেল্লার প্রাচীরে চড়ে মুসলিম বাহিনীকে কেল্লায় প্রবেশের আহবান জানায়।
‘আপনারা ভেতরে আসুন। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই’
মুসলিম বাহিনী কেল্লায় প্রবেশ করে। সেখানে তখন মেয়েটি ছাড়া আর কেউ ছিলো না।
এই মেয়েই ছিল সালমা, যে রাত জেগে জেগে আল্লাহর কাছে দোয়া করতো।

৪

মুকান্নার এই ফেতনা প্রায় ১৩ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৬৩ হিজরীতে মুকান্নার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ফেতনার সমাপ্তি ঘটে।

অনুবাদকের কথা

খান আসিফ তার লেখায় কোনো ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেননি। চলুন এবার মুকান্নার ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত দেখে আসা যাক । প্রথমদিকের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায় সবাই হেকিম মুকান্না আল খোরাসানির কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ ১৬৩ হিজরীর ঘটনাবলীতে মুকান্নার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, মুকান্নার তৈরী এই নকল চাঁদ দুই মাসের দূরত্ব থেকেও দেখা যেত। ইবনে কাসির লিখেছেন, মুকান্না তার স্ত্রীদের বিষপান করিয়ে হত্যা করে। নিজেও বিষপান করে আত্মহত্যা করে। মুসলিম সৈন্যরা কেল্লায় প্রবেশ করে তার লাশ পায়। তারা তার মাথা কেটে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেয়। খলিফা তখন হালাব শহরে অবস্থান করছিলেন।[২৮৪]

ইবনে জারীর তাবারি লিখেছেন, মুকান্নার মাথা কেটে খলিফার কাছে প্রেরণ করা হয়।[২৮৫]

ইবনে খালদুন মুকান্নার সাথে লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখছেন, মুকান্না সোনার তৈরী একটি মুখোশ পরে থাকতো। এছাড়া তিনি মুকান্নার নকল চাঁদের কথাও উল্লেখ করেছেন।[২৮৬]

ইবনে আসীর লিখেছেন, মুকান্না ও তার অনুসারীদের বিশ্বাস ছিল আবু মুসলিম খোরাসানী আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (নাউজুবিল্লাহ)। মুকান্নার অনুসারীরা যুদ্ধের সময় বলতো হে হিশাম, আমাদের সাহায্য করো। মুকান্নার হত্যা সম্পর্কে ইবনে আসীর দুইটি বর্ননা উল্লেখ করেছেন।

১. মুকান্না বিষপানে আত্মহত্যা করে। পরে তার মাথা কেটে খলিফার কাছে প্রেরণ করা হয়।

২. মুকান্না আগুনে পুড়ে মারা যায়।[২৮৭]

---

[284] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০ম খন্ড, ১৪৫,১৪৬ পৃষ্ঠা– হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির। মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত।

[285] তারীখে তাবারী, ৯ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা– ইবনে জারির তাবারি। দারুল মাআরিফ, মিসর।

[286] তারীখে ইবনে খালদুন, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা– আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন। দারুল ফিকর।

[287] আল কামেল ফিত তারিখ, ৫ম খন্ড, ২৩৮, ২৩২ পৃষ্ঠা– ইবনুল আসীর। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

ইবনুল জাওযি লিখেছেন, মুকান্না তার হেরেমের মহিলাদের বিষপানে হত্যা করে, পরে নিজেও বিষপান করে আত্মহত্যা করে।[২৮৮]
খান আসিফের লেখায় যেমনটা দেখা যাচ্ছে, তিনি মুকান্নার খোদায়ী দাবির জন্য অনেকটাই বাল্যকালের অবহেলা ও বিদ্রুপকে দায়ী করছেন। নির্মোহ বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সরলীকরণ বলেই মনে হয়। মুকান্নার জীবনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম থেকেই সে আবু মুসলিম খোরাসানি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সে মনে করতো আবু মুসলিম খোরাসানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। এছাড়া ড. মুহাম্মদ বিন নাসের বিন আহমদ লিখেছেন, মুকান্না জীবনের প্রথম দিকেই রযযামিয়াদের (শিয়াদের একটি শাখা) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়।[২৮৯] এইসব বর্ননা দ্বারা বুঝা যায়, মুকান্না বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একইসাথে বাল্যকালের অবহেলাও তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

এবার আসা যাক মুকান্নার চাঁদ প্রসংগে। ঐতিহাসিকদের যারাই চাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা এই চাঁদের রহস্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। এই চাঁদ সম্পর্কে একটি বর্ননা পাওয়া যায় বুলদানুল খিলাফাতিশ শরকিয়্যাহ গ্রন্থে। সেখানে আছে, মুকান্না একটি কুপে পারদভর্তি থালা রেখে দেয়। সেখান থেকেই চাঁদ উঠতো[২৯০]। এই বর্ননা থেকে ড. মুহাম্মদ বিন নাসের বিন আহমদ অনুমান করছেন সম্ভবত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে শূন্যে চাঁদের আকৃতি তৈরী করতো।
বিষয়টি পরিস্কার করতে চুয়েটের অধ্যাপক ড. আব্দুর রাকিব ভূইয়ার দারস্থ হই। তিনি বলেন, মূল বিষয় হলো মানুষের দৃষ্টির কোন । যেহেতু মানুষের দৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা আছে এবং নানা কোনে নানাভাবে খেল দেখানো যায় । তাই অনেকক্ষেত্রে সামনে না থাকা জিনিস আপাতভাবে সামনে এনে মানুষকে তাক লাগানো যায় । আলোর কোন সৃষ্টি করে অথবা মানুষের দৃষ্টিসীমার কোন(এংগেল) ব্যবহার করে এই কাজ করা যায়। এই কৌশল খাটিয়েই ডেভিড কপারফিল্ড কিছু সময়ের জন্য স্টাচু অফ লিবার্টিকে মানুষের দৃষ্টিসীমার আড়ালে নিয়ে যান।

---

[২৮৮] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ৮ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
[২৮৯] জামেয়া ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ সাময়িকী, শাওয়াল, ১৪২০ হিজরী। হারাকাতুল মুকান্না আল খোরাসানি — ড. মুহাম্মদ বিন নাসের বিন আহমদ। ২৭৯ পৃষ্ঠা।
[২৯০] বুলদানুল খিলাফাতিশ শরকিয়্যাহ, ৫১৩, ১৪ পৃষ্ঠা– মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

গল্পাকার ইতিহাস

বিক্রিত আলেমদের গল্প

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ

মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। আকবর ছিলেন নিরক্ষর। তবে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনে তার ছিল সীমাহীন তৃষ্ণা। ঐতিহাসিক আব্দুল কাদের বাদায়ুনির বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রথম জীবনে আকবর বেশ ধার্মিক ছিলেন। পীর বুজুর্গদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। প্রতি জুমার রাতে আলেমদের মজলিস বসাতেন। কাজি জালাল ও অন্যান্য আলেমদের তিনি তাফসির করার আদেশ দেন। একবার আজমির যাওয়ার পথে সেকালের বিখ্যাত বুজুর্গ শায়খ নিজাম নারনুলির সাথেও দেখা করেন। দোয়া নেন। শায়খ মোহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারিকে তিনি এক কোটি মুদ্রা মূল্যের জায়গীর উপহার দেন।

তবে শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন, আকবরের এই ধর্মবোধ ছিল ভাসাভাসা আবেগের উপর, যার কোনো মজবুত ভিত্তি ছিল না। কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কেও তার কোনো অধ্যয়ন ছিল না। তার এই ধর্মবোধের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে মাজারে হাজিরা দেয়া, সেখানকার মূর্খ খাদেমদের শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও খানকাহ ঝাড়ু দেয়া।

আকবরের দূর্ভাগ্য তার পাশে এমনকিছু আলেম জড়ো হয়েছিলেন যারা ছিলেন প্রচন্ড দুনিয়ালোভী। উদাহরণস্বরূপ মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপুরীর কথা বলা যায়। এই আলেম যাকাত দেয়া থেকে বাচার জন্য নানা ছলচাতুরী করতেন। এমনকি তিনি ফতোয়া দেন হজ্বের ফরজিয়ত আর অবশিষ্ট নেই। আকবরের জুমা রাতের মজলিসে অনেক মাসালা নিয়ে আলোচনা হতো। এই মজলিসগুলোতে আলেমরা প্রায়ই পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাতে লিপ্ত হতো এমনকি একে অপরকে কাফের ফতুয়াও দিতেন। একই সময়ে আকবর ধর্মীয় সভা আহবান করেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার মজলিস বসান। আলেমরা এসব মজলিসে বসতেন কিন্তু তারা থাকতেন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তারা কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে পারতেন না, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যার সমাধান দিতেও তারা ছিলেন

অক্ষম। ফলে আকবরের মনে এক ধরনের বিরাগ জন্ম নেয়। তিনি সকল ধর্মের মিশেলে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের কথা ভাবেন। এই চিন্তায় সহযোগী হিসেবে পেয়ে যান ভারতবর্ষের বিস্ময়কর তিন প্রতিভা মোল্লা মোবারক নাগোরী, ফইজি ও আবুল ফজলকে। তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থে সম্রাটকে নতুন ধর্ম প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। আকবর দ্বীনে এলাহী নামে নতুন একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। আকবর অগ্নিপূজা ও সূর্য পূজা শুরু করেন। যাকাত নিষিদ্ধ করা হয়, মদ পানে উদ্বুদ্ধ করা হয় এমনকি মুফতি মীর আদলও মদপান করেন। ধর্মীয় রোকনগুলোকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা হয়। নামাজ নিষিদ্ধ করা হয়। আকবরের এই ধর্ম মতে কয়েকটি ধর্মের অনুসারীরা যোগ দেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস একটি বিপদজনক বাঁকে এসে পৌছায়। সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর ভাষায়, এ ছিল পৈতাধারীর হাতে তাসবিহ ও তাসবিহধারীর গলায় পৈতা লটকে দেয়া।

দরবারী আলেমরা আকবরের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। যেসকল আলেমরা আকবরের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান, তাদেরকে হয় নির্বাসনে পাঠানো হয় কিংবা হত্যা করা হয়।

সেই ক্রান্তিলগ্নেও অনেক আলেম সত্য প্রকাশের দু:সাহস বুকে লালন করতেন।

—

শাহবায খান কাম্বুহ এমনই একজন আলেম। তিনি ছিলেন আকবরের সভাসদ। আকবর তাকে মীর বখশ উপাধী দেন। শাহবায খান কখনো মদ পান করেননি, দাড়িও মুন্ডন করেননি। আকবরের প্রচলিত ধর্মমতের তিনি ছিলেন প্রকাশ্য বিরোধী।

একদিন বিকেলের ঘটনা। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে একটি পুকুরের পাড়ে পায়চারি করছিলেন। শাহবায খান সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট তার হাত ধরে হাটতে থাকেন। নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। উপস্থিতরা ভাবতে থাকে শাহবায খান আজ কোনোভাবেই সম্রাটের হাত থেকে ছাড়া পাবে না। তার মাগরিবের নামাজ কাযা হবেই। শাহবায খান সম্রাটকে বলেন, আমি নামাজ পড়বো।

‘আমাকে একা রেখে যেও না। পরে কাজা করে নিও’ সম্রাট বলেন।

শাহবায খান জোর করে সম্রাটের হাত থেকে হাত সরিয়ে নেন। চাদর বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যান। নামাজ শেষে নিয়মিত আমল অজিফা শুরু করেন। সম্রাটের প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। সম্রাট প্রচন্ড রাগে কাঁপছিলেন। উপস্থিত দুই আমির আবুল ফাতাহ ও হাকিম আলি গিলানী অনেক কষ্টে সম্রাটকে ঠান্ডা করেন।

—

শায়খ আব্দুল কাদের উচাঈ সে যুগের আরেকজন সাহসী আলেম। একবার সম্রাট তাকে আফিম সাধেন। আব্দুল কাদের অস্বীকৃতি জানালে সম্রাট রেগে যান।
একবার তিনি ইবাদতখানায় নফল পড়ছিলেন। আকবর বললেন, আপনার উচিত ঘরে গিয়ে নামাজ পড়া।
'এই এবাদতখানা আপনার রাজত্ব নয়' শান্তকণ্ঠে বললেন আব্দুল কাদের উচাঈ।
'আমার রাজত্ব পছন্দ না হলে এখান থেকে চলে যান' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন আকবর।
এই ঘটনার পর আব্দুল কাদের উচাঈকে নির্বাসিত করা হয়।

(আকবরের জীবনের প্রথমদিকের ঘটনাবলী জানতে দেখুন, মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ– মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ুনি।
তারীখে দাওয়াত ও আযিমত, ৪র্থ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা– সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী।
নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫৩৯ ও ৫৬৮ পৃষ্ঠা- শায়খ আব্দুল হাই হাসানি নদভী। দার ইবনে হাযম বৈরুত)

ইবনে তাইমিয়ার সাহসিকতা

৬৯৯ হিজরী।

তাতার সম্রাট মাহমুদ গাযান ৬০ হাজার সৈন্যসহ ফুরাত নদী অতিক্রম করে এগিয়ে গেল সিরিয়ার দিকে। আরো একবার অস্ত্রের ঝনঝনানি ও আহতদের আর্তচিৎকার শোনার প্রহর গুনছিল মুসলিম বিশ্ব। দামেশকে শুরু হয় বুখারির খতম। মসজিদে , মকতবে চলতে থাকে দোয়া।

ইতিমধ্যে মাহমুদ গাযানের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়েছে সুলতান নাসির মাহমুদ বিন কালাউনের বাহিনীর। পরাজিত হয়েছে সুলতানের বাহিনী। নিহত হয়েছে আমীর ও সাধারণদের অনেকে। সুলতান নিজে কোনোমতে পালিয়ে বেচেছেন।

সে সময় একজন আলেম বললেন, আমি মাহমুদ গাযানের সাথে দেখা করবো। দামেশকের শীর্ষ আলেমদের নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন মাহমুদ গাযানের দরবারে। ‘এরা কারা?’ জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ গাযান।

‘ইনারা দামেশকের শ্রেষ্ঠ আলেম’ গাযানের দরবারের একজন বললো। মাহমুদ গাযান আলেমদেরকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। আলেমদের সামনের সারীতে আছেন মধ্যবয়সী একজন। তার চেহারার দিকে তাকাতেই মাহমুদ গাযানের অন্তর ভীত হয়ে উঠলো। সে আদেশ দিল সবাইকে সসম্মানে বসানো হোক।

মধ্যবয়সী শায়খ কথা শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোচনা করেন। কথা বলার সময় তার কণ্ঠ চড়তে থাকে। এমনকি তিনি মাহমুদ গাযানের হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসেন। শায়খ বলতে থাকেন, ‘তুমি নিজেকে মুসলমান দাবী করছো। তোমার সাথে আলেম, কাজি ও ইমামদের বিশাল জামাতও আছে,

আর তুমি মুসলিমদের সাথে লড়াই করছো। তোমার বাবা ও দাদা কাফের ছিল। আর তুমি মুসলিম হয়েও প্রতিজ্ঞা করে তা ভংগ করছো’।

শায়খের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠে। মাহমুদ গাযান হতভম্ব। শায়খের ব্যক্তিত্বের সামনে সে কিছুই বলতে পারছিল না।

মাহমুদ গাযান সবাইকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। শায়খ হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। তিনি পরিস্কার কণ্ঠে বলেন, আমি এই খাবার গ্রহণ করবো না। এগুলো তোমরা মানুষদের থেকে কেড়ে এনেছো। এই ফল এনেছো মানুষের গাছ কেটে।

মাহমুদ গাযান বললো, আমার জন্য দোয়া করুন।

শায়খ বললেন, যদি তুমি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার জন্য এই যুদ্ধ করে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুক। আর যদি দুনিয়া অর্জনের জন্য এই লড়াই করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধবংস করে দিক।

দৃঢ়পদে বের হয়ে এলেন শায়খ। এই শায়খের নাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা। তিনি বলতেন, যার অন্তর রোগাক্রান্ত সে-ই কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে।

সূত্র

(গাযানের সাথে ইবনু তাইমিয়্যার সাক্ষাতের ঘটনা ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন তারিখুল ইসলাম গ্রন্থে। ৫২ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা। ইবনু কাসীর আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহতে উল্লেখ করেছেন। ১৭শ খন্ড, ৭১৭ পৃষ্ঠা। এছাড়া ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে উমর বিন আলী বাজ্জার রচিত আল আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ গ্রন্থের ৬৩-৬৬পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে)

প্রশান্ত আত্মা ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

রাগে ফুঁসছেন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ না খয়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ ও গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে, কিন্তু এ খনো তাঁর সন্ধান মেলেনি। ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ নাখয়ি একজন তাবেয়ি। যুগে র শ্রেষ্ঠ ফকিহদের একজন। তাঁর অপরাধ, তিনি হাজ্জাজের ঘোর বিরোধী। তিনি মনে করেন হাজ্জাজকে লানত করা বৈধ। একবার তাঁর দরসে প্রশ্ন করা হয়েছি, কেউ যদি হাজ্জাজকে লানত দেয় তাকে আপনি কী বলবেন? তিনি জবাবে আয়া ত তেলাওয়াত করেছিলেন

––––––––––––––––––

অর্থাৎশুনে রাখো, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। *(সূরা হুদ ১ ১:১৮)*

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আশআস যখন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন ইবরাহিম নাখয়ি তাকে সমর্থন দেন। হাজ্জাজ প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হন। পুলিশ কে নির্দেশ দেন, ইবরাহিম নাখয়িকে গ্রেপ্তার করতে।
ইবরাহিম গা–
ঢাকা দেন। পুলিশ ও গোয়েন্দারা ইরাকের প্রতিটি শহরে খুঁজতে থাকে তাঁকে।
মধ্যরাত। কুফার বাসিন্দারা ঘুমে বিভোর। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কুফার বিখ্যাত আবেদ ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ তাইমি ঘর থেকে বের হলেন। সরু গলি ধ রে হাঁটছেন। হালকা চাঁদের আলো। পথ দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। সারারাত ঠাণ্

ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। ইবরাহিম তাইমি জামে মসজিদে পৌঁছে ওজু করলেন। না মাজে দাঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে তেলাওত শুরু করলেন। মসজিদের একপাশে প্রদীপ জ্বলছে। মসজিদের দেয়ালে ইবরাহিম তাইমির প্রলম্বিত ছায়া মৃদু কাঁপছে।
প্রতিরাতের মতো হাজ্জাজের পুলিশ বাহিনী ঘুরছে কুফার অলিগলিতে। জামে ম সজিদের সমুখ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেল ভেতরে কেউ একজন নামাজ পড় ছে। পুলিশ বাহিনীর লোকেরা মসজিদে প্রবেশ করল।
ইবরাহিম তাইমির নামাজ শেষ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,
‘আপনার নাম কী?’
‘ইবরাহিম’
‘আপনিই কি ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ?’
‘জি, আমিই।’ শান্তকণ্ঠে বললেন ইবরাহিম তাইমি।
‘আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কী ভেবেছিলেন? আমাদের হাত ফাঁকি দিয়ে পা লাবেন? আমরা তো পাতাল থেকেও অপরাধীকে ধরে নিয়ে আসি।’ পুলিশ অফি সার উল্লসিত কণ্ঠে বলল। ইবরাহিম তাইমি বুঝতে পারলেন পুলিশ এসেছে ইবরা হিম নাখয়িকে গ্রেপ্তার করতে। তবু তিনি নিজের আসল পরিচয় দিলেন না। চুপ থাকলেন। তিনি ভাবলেন নিজের গ্রেপ্তারির বিনিময়ে যদি ইবরাহিম নাখয়িকে র ক্ষা করা যায়, তবে তা–ই তাঁর জন্য উত্তম।

ইবরাহিম তাইমিকে গ্রেপ্তার করে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হলো। হাজ্জা জ কোনো প্রশ্ন না করে আদেশ দিলেন ইবরাহিম তাইমিকে দিমাসের কারাগারে বন্দী করতে।
সেকালে দিমাসের কারাগার ছিল ভয়ংকর কারাগার। শুধুমাত্র ভয়ংকর অপরাধীদ েরকেই এখানে বন্দী করা হতো। এক প্রশস্ত ময়দানের চারপাশে প্রাচীর তুলে দেয়া, এর ভেতরে বন্দীরা থাকত। ভেতরে কোনো ঘর নেই। খোলা মাঠেই থাক তে হতো। রোদ বৃষ্টি ঝড় থেকে বাঁচার উপায় নেই। কিছুদিন পর ইবরাহিম তাইমি র আম্মা এলেন ছেলেকে দেখতে। ছেলেকে দেখে তিনি নিজেই চিনতে পারলেন না। ইবরাহিম তাইমির শরীরে শুধু হাড়টুকু অবশিষ্ট আছে। মা প্রশ্ন করলেন,

‘বেটা, তুমি তো জানতে পুলিশ তোমাকে খুঁজছে না, তারা খুঁজছে ইবরাহিম নাখ য়িকে। তবু কেন তুমি তাদেরকে নিজের আসল পরিচয় জানালে না?’ ইবরাহিম তাইমি জবাব দিলেন,

‘মা, ইবরাহিম নাখয়ি অনেক বড় আলেম। এই উম্মাহর জন্য তিনি রহমতস্বরূপ। আমি চেয়েছি তিনি নিরাপদ থাকুন। আমি ইবরাহিম তাইমির চেয়ে তাঁর নিরাপত্ত া উম্মাহর জন্য অধিক প্রয়োজন। তাই আমি নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছি।

ইবরাহিম তাইমি কারাগারেই ইন্তেকাল করলেন। তাঁর ইন্তেকালের রাতে হাজ্জা জ স্বপ্নে দেখলেন কেউ একজন বলছে,

‘আজ একজন জান্নাতি মানুষ মারা গেছে।’ সকালে হাজ্জাজ খবর নিয়ে ইবরাহিম তাইমির মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। পাষণ্ড হাজ্জাজ আদেশ দিলেন, তাঁর লাশের উপর ঘোড়া চালিয়ে দিতে। ‘রাতের স্বপ্নটা ওয়াসওয়াসা ছিল’ এই ভেবে হাজ্জাজ নিজ েকে সান্ত্বনা দিলেন। ইবরাহিমের লাশের সাথে বেয়াদবি করা হলো। ইবরাহিম ের রুহ হয়তো তখন মুচকি হাসছিল। অপেক্ষায় ছিল রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অভ্যর্থনার—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজ ন হয়ে। (ফাজর ২৭–২৮)

সূত্র :

সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫ম খণ্ড, ৬০–
৬২ পৃষ্ঠা। হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত

যিরইয়াব

এক ঘুনেপোকার নাম। এই ঘুনেপোকা কুড়েকুড়ে খেয়েছে আন্দালুসকে। যিরইয়াবের জন্ম বাগদাদে, ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সে ছিল বিখ্যাত সংগীতশিল্পি। তার বেড়ে উঠা
শাহী পরিবেশে। বাগদাদের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ইবরাহিম মোসুলির কাছে তার সংগীতের দীক্ষা। রাজদরবারে ছিল তার অবাধ যাতায়াত। গান গেয়ে আনন্দ বিলানোই ছিল তার কাজ।[২৯১]
ধীরে ধীরে যিরইয়াবের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। হিংসায় পুড়তে থাকেন ইবরাহিম মোসুলি। যিরইয়াবের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়। যিরইয়াব বাধ্য হয় বাগদাদ থেকে পালাতে। ৮২২ খ্রিস্টাব্দে সে আন্দালুসে পৌছায়। শাসনক্ষমতায় তখন দ্বিতীয় আব্দুর রহমান। আন্দালুসে পৌছে অভিজাত শ্রেনীর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে তাদেরকে গান শোনায়। এর আগে আন্দালুসে সংগীতচর্চার ধারা গড়ে উঠেনি। যিরইয়াব রচনা করে আন্দালুসী গীতি। ধীরে ধীরে পুরো আন্দালুসে সে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। আন্দালুসবাসীর চালচলন রুচিও সে প্রভাবিত করে। সে তাদেরকে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধা
নের ফ্যাশন শেখায়, কাটাচামচের ব্যবহার শেখায়[২৯২]। আন্দালুসবাসীদের এক বিরাট অংশ গান বাজনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমীরদের ঘরে বসতে থাকে গানের আসর। ইলমচর্চার প্রতি জনগনের আগ্রহ কমে যায়। নৈতিক অবক্ষয় নেমে আসে আন্দালুসে।
যিরইয়াব মারা গেছে ১২০০ বছর আগে। এখনো উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে তার জীবনি আলোচনা করা হয়। আন্দালুসী গীতি চর্চা করা হয়। তিউনিসিয়া,

---

[২৯১] নাফহুত তীব– মাক্কারি, ১/১২৩
[২৯২] নাফহুত তীব–মাক্কারি, ১/১৩০

মরক্কো কিংবা আলজেরিয়ার অনেক মুসলমানই যিরইয়াব সম্পর্কে জানে। তার সংগীতের চর্চা করে। অথচ তারা চেনে না আব্দুর রহমান আদ দাখেলকে, জানে না মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাহর কথা। উম্মাহ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ইতিহাস তাদের অজানা। কিন্তু যিরইয়াবের জীবন তাদের কাছে পরিচিত।

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। যিরইয়াব আজ নেই। নতুন যুগের যিরইয়াবরা আছে। তারা আমাদের চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত করছে। আমাদেরকে নিত্যনতুন ফ্যাশন শিক্ষা দিচ্ছে। আমরা সরে পড়ছি সালফে সালেহীনের পথ থেকে। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। ইতিহাসের এইসব ঘটনা বলার উদ্দেশ্যই হলো ইতিহাসের আয়নায় অতীত দেখে নিজেদের বর্তমানের কর্মপন্থা ঠিক করা। *(ঈষৎ পরিমার্জিত)*

ইতিহাস পাঠ

জীবনী সাহিত্য : ইসলামি ইতিহাসে যেভাবে চর্চিত হয়েছে

পূর্বপুরুষ ও বরেণ্যদের জীবনী সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে চালু ছিল। পূর্বপুরুষের স্মরণে তারা মূর্তি নির্মাণ করতো, পাথরে খোদাই করে একে দিত তাদের বীরত্বগাঁথার চিত্র। মুসলমানদের পূর্বে রোমানরাও এভাবেই তাদের বীরপুরুষদের জীবনি ও স্মৃতি সংরক্ষণ করতো।

মুসলমানরা শুরু থেকেই জীবনী সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী থেকেছে। সাহাবায়ে কেরাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি তথ্যই সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করেছেন এবং তাদের ছাত্র তাবেয়ীদেরকে জানিয়েছেন। তখনও ব্যাপকভাবে লেখালেখির সূচনা হয়নি, ফলে এসব তথ্য সংরক্ষণের জন্য তারা নিজেদের স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করতেন। আরবরা বরাবরই ছিলেন ঈর্ষনীয় স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত, ফলে এ নিয়ে তাদের কখনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সংরক্ষণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম যে ধারার সূচনা করেন পরবর্তী দিনগুলিতে তা আরো বেগবান করেন তাবেয়ীরা। তারা ছিলেন সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের ছাত্র। তারা সাহাবায়ে কেরামকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাদের আচার-আচরণ ও কর্মপন্থা। তারপর সেসব তারা জানিয়েছেন তাদের ছাত্রদের, ইসলামের ইতিহাসে যারা পরিচিত তাবে তাবেয়ী নামে। ততদিনে ইলমের জন্য সফর করার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল, পরবর্তী দিনগুলিতে শাস্ত্রবিদরা একে নাম দিয়েছিলেন রিহলাহ, এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়েও তারা রচনা করেছিলেন অনেক বইপত্র। রিহলাহর কল্যাণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সফর করছিলেন জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী আলেম ও ছাত্ররা, প্রতিটি অঞ্চলে তারা অর্জন করছিলেন নতুন নতুন জ্ঞান। এসময় অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে জীবনী শাস্ত্রেও তারা গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন। খাইরুল কুরুনের যুগে বিভিন্ন দরসগাহের পাঠ্যসূচি থেকে দেখা যায়, সেখানে সিয়ার ও মাগাজির ঘটনাবলী বর্ননা করা হত।

এভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংরক্ষিত হতে থাকে।

মুসলিম উম্মাহর কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মুসলিমরা প্রথমেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সংকলনের কাজ শুরু করে। তবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে নবিজির কোনো সীরাত রচনার প্রমাণ নেই। গবেষকদের মতে , ইবনু ইসহাকই (মৃ-১৫১ হিজরি) প্রথম 'আস সিরাতুন নববিয়্যাহ' নামে নবিজির জীবনী লেখেন। একই সময় 'আল মাগাযি' নামে আরেকটি সীরাতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন মুসা ইবনু উকবা। তিনি ছিলেন অল্পবয়সী তাবেয়ীদের অন্যতম। তার সীরাতগ্রন্থটি বেশ প্রশংসিত হয়েছিল, বিশেষ করে মাজহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের একজন, ইমাম মালেক (মৃ-১৭৯ হিজরি) এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় জীবনীশাস্ত্র সংকলনের কাজ। এ সময় লাইস বিন সাদ (মৃ-১৭৫ হিজরি) সংকলন করেন 'আত তারিখ' নামে একটি গ্রন্থ। একইনামে আরেকটি গ্রন্থ সংকলন করেন, ইমাম আবু হানিফার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ-১৮১ হিজরি) রহিমাহুল্লাহ। ইমাম যাহাবী জানিয়েছেন, ওয়ালিদ বিন মুসলিমও (মৃ-১৯৫ হিজরি) জীবনিশাস্ত্র নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এভাবে জীবনীশাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থ রচনার ধারা শুরু হয়, এবং ক্রমেই তা বেগবান হতে থাকে।

যে ধারায় লিখিত হয়েছে জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো

জীবনীগ্রন্থ প্রনয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকরা প্রায়ই কয়েকটি ধারা অনুসরণ করতেন। কখনো তারা শুধু বিশেষ একটি শ্রেণীর জীবনি আনতেন। যেমন, কেউ কেউ শুধু সাহাবায়ে কেরামের জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ধারার উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হলো, আল ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ এবং উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা। প্রথমটি রচনা করেছিলেন ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ-৮৫২ হিজরি), সহিহ বুখারির সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থটির লেখক তিনি। পরেরটি রচনা করেছিলেন ইবনুল আসির জাযারি (মৃ-৬৩০ হিজরি) , ইতিহাস শাস্ত্রে আল কামিল ফিত তারিখ গ্রন্থটি লিখে মুসলিম বিশ্বে তিনি পরিচিত। তাশ কুবরাযাদাহ (মৃ-৯৬৮ হিজরি) লিখেছেন, 'আশ শাকাইকুন নুমানিয়্যা ফি উলামাইদ দাওলাতিল উসমানিয়্যা' নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি উসমানি সালতানাতে বসবাসকারী আলেমদের জীবনি এনেছেন।

জীবনীকাররা কখনো শুধু নির্দিষ্ট পেশার মানুষদের জীবনী সংকলন করতেন। চতুর্দশ শতাব্দির আরব ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন ফজলুল্লাহ উমরি (মৃ- ৭৪৯ হিজরি) রচিত 'মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার' নামক সুবিশাল গ্রন্থটি এই ধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই গ্রন্থের একেকটি খন্ডে তিনি একেক পেশার মানুষের জীবনী উল্লেখ করেছেন। ২৭ খন্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে তিনি একাধারে মামলুক সুলতান, উজির, সেনাপতি, কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস, ফকিহ, ব্যাকরণবিদ, গায়কসহ নানা পেশার মানুষের জীবনী আলোচনা করেছেন। এ ধারার আরেকটি উদাহরণ জালালুদ্দিন সুয়ুতি (মৃ-৯১১ হিজরি) রচিত 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি শুধু খলিফাদের জীবনী এনেছেন। ইবনু আবি উসাইবিয়াহ (মৃ-৬৬৮ হিজরি) রচনা করেছিলেন চিকিৎসকদের জীবনী। সেই গ্রন্থের নাম 'উয়ুনুল আনবা ফি তবাকাতিল আতিব্বা'। ইমাম যাহাবী (মৃ-৭৪৮ হিজরি) তার লিখিত 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'তে নানা শ্রেনী ও পেশার মানুষদের জীবনী এনেছেন।

কেউ কেউ মৃত্যুর সাল হিসেবে জীবনী রচনা করেছেন। এমনই একজন ইবনুল ইমাদ হাম্বলি (মৃ-১০৮৯ হিজরি)। তিনি রচনা করেছেন শাজারাতু যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব নামে ১০ খন্ডের একটি জীবনী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম হিজরি থেকে ১০০০ হিজরি পর্যন্ত সময়ে যারা যারা মারা গেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনি আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু কাসির (মৃ-৭৭৪ হিজরি) তার লিখিত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে প্রত্যেক বছরের আলোচনা শেষে সে বছর যারা মারা গিয়েছেন তাদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। ফলে তার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থটি হয়ে উঠেছে জীবনী জানার জন্য আকর গ্রন্থ। ইমাম যাহাবী (মৃ-৭৪৮ হিজরি) তার লিখিত 'তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম' গ্রন্থে মৃত্যুসাল হিসেবে জীবনী এনেছেন।

কিছু গ্রন্থ রচনা হয়েছিল নামের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। এসব গ্রন্থে আরবী বর্ননামালার ধারাবাহিকতা অনুসারে জীবনী বিন্যাস করা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান (মৃ- ৬৮২ হিজরি) রচিত 'ওয়াফায়াতুল আইয়ান' গ্রন্থটি এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। ইবনে আসাকির (মৃ-৫৭১ হিজরি) তার রচিত 'তারিখু দিমাশক' গ্রন্থে নামের ধারাবাহিকতা অনুসারে জীবনী এনেছেন। খতিব বাগদাদি (মৃ-৪৬৩ হিজরি) লিখিত 'তারিখু মাদিনাতিস সালাম' বা তারিখে বাগদাদ গ্রন্থেও এই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

কখনো শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ব্যক্তিদের জীবনীও সংকলন করা হয়েছে। আবুল হাসান নাবাহি আন্দালুসি (মৃ-৬৯২ হিজরি) তার লিখিত 'তারিখু কুজাতিল

আন্দালুস’ গ্রন্থে আন্দালুসের কাজিদের জীবনী এনেছেন। কাজি আতহার মোবারকপুরী (মৃ-১৪১৭ হিজরি) রচিত ‘রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ’ গ্রন্থে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনী এসেছে। আবদুল হাই হাসানি নদভী (মৃ-১৩৪১ হিজরি) লিখিত ‘নুজহাতুল খাওয়াতির’ গ্রন্থে ভারতবর্ষের শাসক, আলেম, মন্ত্রী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদী নানা শ্রেনীপেশার মানুষের জীবনী এসেছে।

জীবনীর উপর দেয়া হত স্বতন্ত্র দরস

জীবনীশাস্ত্র নিয়ে বইপত্র রচনার পাশাপাশি জীবনী নিয়ে স্বতন্ত্র দরস দেয়ার ব্যবস্থাও চালু ছিল। এ ধরণের দরস দু ধরণের হত। কখনো শিক্ষক পূর্বসূরী কারো জীবনী নিয়ে আলোচনা করতেন। আবার কখনো শিক্ষক কারো জীবনী লিখে সেই লিখিত বইয়ের উপর দরস দিতেন। আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল হারিসি (মৃ-৩৪০ হিজরি) একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ইমাম আবু হানিফার জীবনী নিয়ে। তিনি তার ছাত্রদের সামনে সেই বইটির পাঠদান করতেন। বইটির নাম ‘কাশফুল আসারিশ শারিফা ফি মানাকিবি আবি হানিফা’।

মুসলমানদের জীবনী-সাহিত্য যে কারণে অনন্য

জীবনী-সাহিত্যে মুসলমানদের আগ্রহের প্রধান কারণটি ছিল ধর্মীয়। নবিজির ইন্তেকালের পর যতই সময় গড়াচ্ছিল, ততই নবিজির হাদিসগুলোর বর্ননাকারীর সংখ্যা দীর্ঘ হচ্ছিল। এ সময় আবশ্যক ছিল হাদিসের বর্ননাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত ও নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করা, কারণ নবিজি তার নামে মিথ্যা হাদিস বর্ননার ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছিলেন। কোরআনুল কারিমেও ফাসেকদের কাছ থেকে যাচাই-বাছাই ছাড়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য বর্ননাকারীদের জীবনী জানার বিকল্প ছিল না। ইবনু সিরিন, স্বপ্নের ব্যখ্যা দিয়ে ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি বলেছিলেন, এই ইলম দ্বীনের অংশ। সুতরাং তোমরা কার কাছ থেকে ইলম অর্জন করছো তা খেয়াল করো। নবিজির হাদিসগুলোকে বিশুদ্ধরুপে সংগ্রহ করার জন্যেই মুসলমানরা সমৃদ্ধ জীবনী-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। মুসলমানদের জন্য এটা গৌরবের বিষয় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসগুলোকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করার জন্য তারা ‘ইলমুর রিজাল’ নামে এক সুবিশাল শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করে। তারা সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। ইমাম ওয়াকেদি (মৃ-২০৭ হিজরি) খলিফা মামুনের সময় বাগদাদের একটি অঞ্চলের বিচারক নিযুক্ত

হয়েছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন এভাবে, 'আমি কোনো সাহাবীর পুত্র, শহীদ পুত্র বা তাদের চাকরকে পেলেই জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কোথায় শহিদ হয়েছেন এবং কোথায় তার কবর। তার সম্পর্কে সামান্য তথ্য পেলেও আমি তার সুত্র ধরে সেখানে উপস্থিত হয়েছি, ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছি। তথ্য সংগ্রহ করেছি। এভাবে ইমাম ওয়াকেদি জীবনি সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ইমাম ওয়াকেদি একা নন, এই ধারায় তার সঙ্গী হয়েছিলেন অন্যরাও। তারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা সফর করছিলেন, লিখিত বইপত্র সন্ধান করছিলেন, সেগুলো পর্যালোচনা করছিলেন এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করছিলেন।

মুসলমানরা জীবনী-চর্চার সময় খুবই সতর্ক থেকেছেন, তারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মানবিক গুনাবলী ও সমস্যাগুলিও নিপুনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা সেসব উল্লেখ করে দিয়েছেন জীবনীগ্রন্থ সমূহে। ফলে জীবনী শাস্ত্রের পাতা উল্টালে সহজেই জানা যাচ্ছে কার স্মৃতিশক্তি দূর্বল ছিল, কে মিথ্যুক ছিলেন, কে জাল হাদিস বর্ননা করতেন, কে প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। জীবনীচর্চার সময় তারা প্রায়ই নির্মোহ বিশ্লেষণ করতেন, এমনকি আপনজনের ক্ষেত্রেও তারা কোনো আবেগ ছাড়াই সঠিক অবস্থাটি জানিয়ে দিতেন। ফলে তারা যে জীবনি-সাহিত্য চর্চা করেছেন, তা কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ব্যতিত প্রকৃত চিত্রটিই আমাদের সামনে উপস্থিত করে।

ইতিহাসের গলিঘুঁজি

ইতিহাস কী ও কেন? প্রশ্নটা মাথার ভেতর ঘুরঘুর করছিল অনেকদিন থেকেই। ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ, রাজাগজাদের কেচ্ছাকাহিনী। কিন্তু ইতিহাস বলতে আসলে কী বোঝায়? ঐতিহাসিকরা ইতিহাস বলতে কী বোঝেন? বিষয়টা ভাবাচ্ছিল। ইতিহাসের সংজ্ঞা জানতে দারস্থ হই ইবনে খালদুনের[২৯৩]।

ভেবেছিলাম ইবনে খালদুন ভারিক্কি চালে ভাবগম্ভীর কোনো সংজ্ঞা দিবেন। নাহ, তিনি দেখি সাদাসিধে ভাবেই লিখেছেন, ইতিহাস মূলত অতীতকালের ঘটনাবলী ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ।[২৯৪]

ইবনে খালদুনের সংজ্ঞা পাওয়ার পর আর কোনো সংজ্ঞা না দেখলেও চলে। তবু মনে একটু খুঁতখুঁত তো থেকেই যায়। শরনাপন্ন হলাম ড. হুসাইন মুনিসের। তিনিও বেশ সহজভাবেই লিখেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনাবলীর পাঠ মাত্র।[২৯৫]

মোটামুটি আগের কথাটাই এসেছে। এবার একটু ভেতরে যাওয়া যাক। দেখি আর কেউ কিছু বলেছেন কিনা। ইতিহাস নিয়ে আলাপ করতে গেলে আল্লামা সাখাবীকে[২৯৬] সামনে রাখতেই হয়। তিনি একটু বিশদাকারেই লিখেছেন, ইতিহাস আলোচনা করে রাজ্যসমূহ নিয়ে, খলিফা ও উযিরদের নিয়ে, যুদ্ধ ও রাজ্যবিজয় নিয়ে। এর বাইরে ইতিহাস আলোচনা করে নবীদের ঘটনাবলী নিয়ে, এবং অতীতের জাতীসমূহের ঘটনাবলী নিয়ে। ইতিহাসের আলোচনায় উঠে আসে

---

[২৯৩] পুরো নাম আবু জায়েদ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন খালদুন আল হাদরামি। জন্ম মে ২৭, ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দ /৭৩২ হিজরি। মৃত্যু ১৯ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ/৮০৮ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন আরব মুসলিম পন্ডিত। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসের জনকদের মধ্যে তাকে অন্যতম বিবেচনা করা হয়। কিতাবুল ইবার তার লিখিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ।

[২৯৪] আল মুকাদ্দিমা, ১ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা– আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন। দার ইয়ারুব।

[২৯৫] আত তারিখ ওয়াল মুআররিখুন, ২৩ পৃষ্ঠা–ড হুসাইন মুনিস। দারুর রাশাদ।

[২৯৬] পুরো নাম শামসুদ্দিন আবুল খাইর মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান বিন মুহাম্মদ আস সাখাবী। জন্ম মিসরে , ৮৩১ হিজরীতে (১৪২৭ খ্রিস্টাব্দ)। মৃত্যু ৯০২ হিজরীতে, ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানির ছাত্র। হাদিসশাস্ত্রে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। ইতিহাস বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, আদদাউ আল্লামি ফি আইয়ানিল করনিত তাসি।

মসজিদ, মাদরাসা, সড়ক ও পুল নির্মানের বিবরন, বাদ পড়ে না দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের বিবরনও।[২৯৭]

ইতিহাসের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে সংজ্ঞা দিয়েছেন সাইয়েদ কুতুব[২৯৮]। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস নিছক ঘটনাবলীর বিবরণের নাম নয়। বরং ইতিহাস হলো, এসব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নাম। বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মধ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ যোগসূত্র আবিষ্কার করার নামই ইতিহাস।[২৯৯]

সাইয়েদ কুতুবের এই সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ আছে। তবে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া নিছক ঘটনাবলীর বিবরণ পাঠ কখনো ইতিহাসের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারে না। ইতিহাসের নানা ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসুত্র আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলে ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন অনুমান করা হয়ে উঠে কষ্টসাধ্য। ইতিহাসের ঘটনাবলী পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে কীভাবে ঘটনাপ্রবাহের পটপরিবর্তনের ধারনা পাওয়া যায় এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

ইতিহাসের সাথে প্রাথমিক পরিচয়ের পর ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা জানা দরকার। ইতিহাস কি নিছক কিছু ঘটনাবলীর সমষ্টি, যা কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যেই পাঠ করা হবে। নাকি এর অন্য কোনো উদ্দেশ্যও আছে। ঐতিহাসিক ইবনুল আসির[৩০০] এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, আমি দেখেছি অনেকেই মনে করে ইতিহাস মানে কিছু গল্প ও ঘটনার সমষ্টি। কিন্তু আল্লাহ যাকে সুস্থ অন্তর ও মস্তিষ্ক দান করেছেন এবং সিরাতে মুস্তাকিমের সন্ধান দিয়েছেন , তিনি জানেন এর পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারিতা অনেক।[৩০১]

ইবনুল জাওযির[৩০২] কলমে উঠে এসেছে ইতিহাসপাঠের গুরুত্ব। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস পাঠে দুধরনের উপকারিতা আছে। প্রথমত, যখন আপনি বিচক্ষণদের

---

[২৯৭] আল ইলান বিত তাওবিখ, ১৮ পৃষ্ঠা– আল্লামা সাখাবী। মুআসসাতুর রিসালাহ।

[২৯৮] সাইয়েদ কুতুবের জন্ম ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, মিসরে। তাফসির ফি যিলালিল কুরআন তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাকে ফাসি দেয়া হয়।

[২৯৯] ফিত তারিখি ফিকরাতুন ওয়া মিনহাজুন, ৩৭ পৃষ্ঠা– সাইয়েদ কুতুব।

[৩০০] মূল নাম ইযযুদ্দিন আবুল হাসান আল জাযারি। জন্ম ইরাকের মোসুলে, ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে। আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আল কামিল ফিত তারিখ, আত তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ তার উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ। ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

[৩০১] আল কামিল ফিত তারিখ, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা– ইবনুল আসির। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[৩০২] জন্ম বাগদাদে, ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে। হাদিস, তাফসির, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদী শাস্ত্রে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। ওয়ায়েজ হিসেবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জীবন চরিত অধ্যয়ন করবেন তখন আপনিও সুন্দর চিন্তা ও বিচক্ষনতার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত হবেন। আবার সীমালঙ্ঘনকারীদের জীবন চরিত ও তাদের শেষ পরিনতি পাঠ করে উদ্ধতরাও সংযত হয়ে উঠে। একইসাথে বুদ্ধির তরবারী হয়ে উঠে ধারালো। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নানা আশ্চর্য বিষয় ও যুগের পটপরিবর্তন জানা যায়, জানা যায় ভাগ্যের উত্থান পতন, যা পাঠ করে মন হয়ে উঠে প্রশান্ত।

আবু আমর বিন আলা একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি মরতে চান? বৃদ্ধ বললেন, না। আবু আমর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য দুনিয়ার কোন স্বাদ আর অবশিষ্ট আছে? বৃদ্ধ বললেন, আমি আশ্চর্য সব বিষয়ে শুনতে পছন্দ করি।[৩০৩]

ঐতিহাসিক মাসউদি[৩০৪] তো সরাসরি বলেই বসেছেন, ইতিহাস এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা জ্ঞানী ও মূর্খ দুদলই উপকৃত হতে পারে। এর দ্বারা বুদ্ধিমান ও নির্বোধ দুদলই তৃপ্ত হয়।[৩০৫]

আল্লামা সাখাবী বলেন, ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারন তিনি সৎ কর্মশীলদের এর বিনিময় দান করেন। নিয়তের মাধ্যমে আমলের ফলাফল নির্ধারিত হয়।[৩০৬]

ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবী লিখেছেন, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো তারা ইতিহাস পাঠ করবে। বিশেষ করে তারা সীরাতে নববী ও খোলাফায়ে রাশেদিনদের ইতিহাস পাঠ করবে। মুসলমানদের জিহাদসমূহের বিবরণ পাঠ করবে। পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদদের জীবনি পাঠ করবে। এরপর সেই ইতিহাস আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে এ যুগের মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। এভাবেই উম্মাহ আবারও ফিরে পাবে সঞ্জিবনী শক্তি, যুহদ ফিদ দুনিয়া ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর দৃঢ় প্রত্যয়।[৩০৭]

---

[৩০৩] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[৩০৪] ঐতিহাসিক মাসউদির জন্ম ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে, বাগদাদে। একজন ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ। মুরুজুয যাহাব তার বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে তিনি প্রচুর বানোয়াট ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালদুন আল মুকাদ্দিমায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মাসউদি ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন।

[৩০৫] মুরুজুয যাহাব, ১ম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা– মাসউদি। আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত।

[৩০৬] আল ইলান বিত তাওবিখ, ৮১ পৃষ্ঠা– আল্লামা সাখাবী।

[৩০৭] সফাহাতুন মুশরিকাতুম মিনাত তারিখিল ইসলামি, ১ম খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা– ড আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবী। দার ইবনুল জাওযি, কায়রো।

পরবর্তী পর্বে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে প্রায়োগিক আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইতিহাস পাঠের পূর্বে আকিদাহর জ্ঞান রাখা আবশ্যক। আকিদাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান না থাকলে একজন মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে তফাত করতে পারবেন না। তিনি যুদ্ধ ও জিহাদকে আলাদা করতে পারবেন না। খিলাফাহ ও সাম্রাজ্যকেও তার মনে হবে একই জিনিস। তার মনে হবে সম্রাট আকবর একজন উদারমনা মহান সম্রাট, যিনি কিনা সব ধর্মকেই একসাথে মিলেমিশে থাকার সুযোগ দিচ্ছেন। আকিদাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান না থাকলে উসমানি সুলতান প্রথম আব্দুল মাজিদকে মনে হবে যুগ সচেতন একজন সুলতান, যিনি কিনা উসমানি সাম্রাজ্যে ফ্রান্সের সংকলিত দন্ডবিধি প্রচলন করেন। ব্যাভিচার ও চুরির শরয়ী দন্ডবিধিকে বাতিল করে দেন।[৩০৮]

মূলত আকিদাহ একজন মুসলিমের জন্য সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিছক ইতিহাস পাঠের সাথে সম্পৃক্ত, বিষয়টি মোটেও এমন নয়। এখানে যেহেতু আমরা ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি তাই এখানে ইতিহাসের সাথে আকিদাহর সম্পর্কের কথা আসলো। নইলে আকিদা একজন মুসলিমের জন্য সবসময়ই প্রথম আবশ্যক।

---

[৩০৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন ড. ওমর সুলাইমান আশকার রচিত আশ শরিয়াতুল ইলাহিয়্যাহ লাল কাওয়ানিনুল জাহিলিয়্যাহ।

ওয়াজ মাহফিল ও ইতিহাসের পুনর্পাঠ

বাসায় ফেরার পথে শুনলাম পাশে কোথাও ওয়াজ হচ্ছে। একবার ভাবলাম যাবো, পরে আবার মত বদলাই। কদিন ধরে জ্বরে ভুগছি। শরীর বেশ দূর্বল। এই ভেবে আর গেলাম না। এক সময় প্রচুর ওয়াজ শুনেছি। অন্তত এদেশের প্রসিদ্ধ বক্তাদের কারো ওয়াজ শোনা বাকি নেই। সবচেয়ে ভালো লাগতো শীতকালে, গ্রামাঞ্চলে ওয়াজ শুনতে। মামাতো ভাইদের সাথে দলবেধে তিন চার মাইল দূরে চলে যেতাম ওয়াজ শুনতে। শেষ বিকেলে নামতো হালকা কুয়াশা। ফসলের মাঠে পেরিয়ে দুরের গ্রামগুলো ঝাপসা হয়ে যেত। খালের পানিতে মৃদু আলোড়ন। আমরা মাটির রাস্তা ধরে হাটতে হাটতে নানা গল্প করতাম। মাহফিলে প্যান্ডেলের নিচে থাকতো খড়। বাদাম বুট নিয়ে বসে যেতাম। বাদাম বুট খেতে খেতে ওয়াজ শুনতাম। নখ দিয়ে খড় কুটিকুটি করতাম। রাত বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশা বাড়তো, আমরা মাফলার আর শাল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতাম, ওদিকে বক্তার কণ্ঠও হয়ে উঠতো করুণ। বেশ লাগতো। মাহফিল শেষ হতো মধ্যরাতে। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে হেটে আসতাম আমরা।

সেই দিনগুলি আর নেই। বন্ধুরা সবাই এখন বেশ ব্যস্ত। ওয়াজ মাহফিলের প্রতিও আকর্ষণ কমে এসেছে নানা কারণে। ওয়াজ মাহফিল নিয়ে লোকজনও এখন বেশ দ্বিধাবিভক্ত। কিছু কিছু ওয়ায়েজের স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত হয়ে অনেকে ওয়াজ মাহফিলের গুরুত্বকেই অস্বীকার করে বসছেন। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত শিথিলতা দেখিয়ে একটি বিশেষ শ্রেনিকে বেপরোয়া হয়ে উঠার সুযোগ করে দিচ্ছেন। বিশেষ করে সুযোগসন্ধানী ইউটিউবারদের উদ্ভট সব ক্যাপশন আর কিছু অর্থলোভী জোকার বক্তাদের কারনে এখন ওয়াজ মাহফিল শুনলেই মনে হয় উদ্ভট কিছু মানুষের বিচ্ছিরি কান্ডকীর্তি।

ওয়াজ শব্দের শাব্দিক অর্থ উপদেশ, নসিহত। মূলত ওয়াজ হলো, মানুষের মধ্যে দ্বীনি ইলম প্রচার ও মানুষকে ঈমান আমলের প্রতি মনোযোগী করার একটি পদ্ধতি। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারন উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে। (সুরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

ওয়াজ মাহফিল এই আয়াতের নির্দেশের উপর আমল করার শক্তিশালী মাধ্যম। তবে ওয়ায়েজদেরও কিছু যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। তাদের কোরআন, হাদিস ও ফিকহের উপর তাদের পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। ইখলাসের সাথে সঠিক কথা বলার সঠিক পদ্ধতী রপ্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। ইখলাসের সাথে উম্মাহর কল্যানের জন্য যেকথা বলা হয় তা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে।
তাবেয়ী উবাইদ বিন উমাইরের কথাই বলা যায়। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। ৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ওয়াজের মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বসতেন। উবাইদ বিন উমাইরের আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি কান্নাও করতেন।[৩০৯]

ইবনে যুবাইর আন্দালুসি ৫৮১ হিজরীতে জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদের এক ওয়াজের মজলিসে বসেছিলেন। তিনি তার ভ্রমনকাহিনীতে সেই মজলিসের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, আমরা প্রথমে জামিয়া নিজামিয়ার উস্তাদ শায়খ রাযিউদ্দিন কাযভিনির ওয়াজে বসি। দিনটি ছিল ৫ই সফর। শায়খ হাদিস ও তাফসির থেকে ওয়াজ করছিলেন। তার কথা শুনে শ্রোতারা কান্না করছিল। পুরো মজলিসে ছিল কান্নার রোল। লোকজন পাপাচার থেকে তওবা করছিল। কেউ কেউ লিখিত প্রশ্ন করছিল। শায়খ এসকল প্রশ্নের জবাব দেন।[৩১০]
শায়খ আবুল কাসেম কুশাইরি যখন নিশাপুরের মুতাররায মসজিদে ওয়াজ করতেন তখন শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনতো। তার ওয়াজ সম্পর্কে একজনের বক্তব্য ছিল, যদি শয়তানও তার মজলিসে বসে, তাহলে হয়তো সেও তওবা করে ফেলবে।[৩১১]
ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ যখন বাগদাদে ওয়াজ করতেন তখন শ্রোতাদের কেউ কেউ বেহুশ হয়ে যেত। অনেকেই কান্না করতো। অন্তত বিশ হাজার ইহুদি-খ্রিস্টান তার হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল। তওবা করেছিল প্রায় এক লক্ষ লোক।[৩১২]

---

[৩০৯] লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাতি ওয়া উলুমিল হাদিস, পৃষ্ঠা ১০৮– শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ।

[৩১০] রিহলাহ, ১৯৬ পৃষ্ঠা– ইবনে যুবাইর আন্দালুসী।

[৩১১] আল হায়াতুল ইলমিয়্যা ফি নিসাবুর, ২৩৪ পৃষ্ঠা– মুহাম্মদ ফাজালু।

[৩১২] তারিখে দাওয়াত ও আযিমত, ১ম খন্ড, — আবুল হাসান আলী নদভী।

হাসান বসরির ওয়াজের মজলিসের কথাও ইতিহাসে বিখ্যাত। ওয়াজের মজলিস থেকেই তিনি জনগনের সংশোধনের কথা আলোচনা করেছেন। আবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত জালিম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ থেকেও বিরত থাকেননি।[৩১৩]

সমকালিন জনজীবনে এসব ওয়াজ মাহফিলের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইবনুল জাওযির ওয়াজে কখনো কখনো এক লক্ষ মানুষও হতো। ইমাম গাজালি যখন জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদে ওয়াজ করতেন তখন প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ একত্রিত হত।[৩১৪] সে সময় আলেমরা মুসলিম বিশ্বের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত সফর করতেন। নতুন কোনো শহরে গেলে সেখানে হাদিসের দরসে বসতেন, অথবা হাদিসের দরস দিতেন। কখনো কখনো তাদের ওয়াজের মজলিস অনুষ্ঠিত হত। ঈসা বিন আবদুল্লাহ গযনভী ৪৯৫ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বেশকিছু মজলিসে ওয়াজ করেছিলেন।[৩১৫]

ভারতবর্ষে সুলতানি আমল থেকেই ওয়াজের প্রচলন ছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে নাসিরুদ্দিন নামে একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। সুলতান তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান তার বসার জন্য একটি মিম্বর নির্মান করে দেন। সুলতান নিজেও তার ওয়াজে বসতেন। ওয়াজ শেষে তার সাথে কোলাকুলি করতেন। হিজরী নবম শতাব্দীতে মাওলানা শোয়াইব দিল্লীতে ওয়াজ করতেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী তার প্রশংসা করেছেন। মাওলানা আলাউদ্দিন আউধি দিল্লীতে ওয়াজ করতেন। ওয়াজে তারা কবিতাও আবৃত্তি করতেন। যেমন শায়খ তকিউদ্দিন তার ওয়াজে চান্দায়ন নামে একটি গ্রন্থ থেকে হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৩১৬]

তবে শুরু থেকেই ওয়ায়েজদের একাংশের প্রবনতা ছিল আজগুবি গল্প-কাহিনী বলে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষন করা। এভাবেই অনেক জাল হাদিস ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর সূচনা হয়। এই ধরনের গল্পকারদের বলা হতো কাসসাস। জালালুদ্দিন সুয়ুতি এই ধরনের গল্পকারদের সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে লিখেছেন, 'তাহজিরুল খাওয়াছ মিন আকাজিবিল কাসসাস' নামক গ্রন্থ।

---

[৩১৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী

[৩১৪] জামেয়া নিজামিয়া বাগদাদ ইলমি ওয়া ফিকরি কিরদার, ২৩৪ পৃষ্ঠা –ড সুহাইল শফিক

[৩১৫] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ৯ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি।

[৩১৬] হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালিম ও তরবিয়ত, ১ম খন্ড, ২৬৬-২৭০ পৃষ্ঠা– মানাজির আহসান গিলানী। সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানি নদভী তার রচিত নুজহাতুল খাওয়াতির নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের অনেক ওয়ায়েজের জীবনি আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এইসব গল্পকারদের বানোয়াট হাদিসগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন 'আহাদিসুল কাসসাস' নামক গ্রন্থে।

ইবনুল জাওযি এ ধরনের ওয়ায়েজদের সম্পর্কে লিখেছেন, ওয়ায়েজদের অনেকের কথাই অন্তসারশূন্য। তাদের ওয়াজের বিরাট অংশ হজরত মুসা (আ) ও তুর পাহাড়ের কাহিনী এবং ইউসুফ (আ) ও জুলায়খার কাহিনী দিয়ে ভরপুর। এসব ওয়াজ নসিহতে ইসলামের ফরজ বিধান নিয়ে আলোচনা নেই, কী করে গোনাহ থেকে বাচা যায় তা নিয়েও আলোচনা নেই, তাহলে এসব ওয়াজ দ্বারা কী করে একজন সুদখোর ও ব্যাভিচারী তওবা করতে আগ্রহী হবে? ওয়ায়েজরা শরিয়তকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে, ফলে তাদের আয় বেড়েছে.........।[৩১৭]

এক সময় এই অঞ্চলে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরির ওয়াজের মাধ্যমে হাজারো মানুষের জীবন বদলে গিয়েছিল।[৩১৮] পরবর্তীতে এই ধারায় মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ (র), মাওলানা সিদ্দিক আহমদ চাটগামি (র), মাওলানা আবদুল গাফফার ঢাকুবী (র), মাওলানা আবদুর রহমান জামি (র), মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাইদি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। কিন্তু কিন্তু ধীরে ধীরে ওয়াজ মাহফিলগুলো হয়ে উঠেছে অন্তসারশূন্য। বেশিরভাগ শ্রোতার আকর্ষণ কিচ্ছা-কাহিনী ও সুরের মূর্ছনার দিকে। বাজারদর বাড়াতে এক শ্রেনীর বক্তাও শ্রোতাদের চাহিদা পূরনে বদ্ধপরিকর। ওয়াজের চেয়ে আওয়াজ করাটাই হয়ে উঠছে মূখ্য উদ্দেশ্য। যোগ্য আলোচকদের চেয়ে অযোগ্যদের জনপ্রিয়তাই বেশি।

তবে চাইলেই পরিস্থিতি বদলানো যায়। আলোচকদের অনেকেই এখন দলিল ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনার দিকে ঝুকছেন। পথটি কঠিন , তবে শ্রোতাদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে পুরো ময়দানের চেহারাই বদলে যাবে। বিশেষ করে আয়োজকদের কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। জনতার চাহিদার দিকে না তাকিয়ে যার আলোচনায় জনগনের ঈমান আমলের ফায়দা হবে তাকেই আমন্ত্রণ করা উচিত। নিজ মতের বিরুদ্ধে কাউকে পেলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গর্জে উঠে ময়দানে ঝড় তোলা বক্তাদেরকে পরিত্যাগ করা উচিত। শহরাঞ্চলে মাঠের বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত মাইক লাগিয়ে জনগনের ভোগান্তি বাড়ানো হয়, আয়োজকরা চাইলেই এটি পরিহার করতে পারেন।

---

[৩১৭] তালবিসু ইবলিস, ১২১ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি।

[৩১৮] তার জীবনি জানতে দেখুন, রিজালুন সানাউত তারিখ — মিজান হারুন। প্রকাশক দারুল বায়ান, ঢাকা।

ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চা

মূল : শায়খ আবদুল হাই হাসানি নদভী
রুপান্তর : ইমরান রাইহান

(প্রথম পর্ব)

ভারতবর্ষে বরাবরই ইতিহাসচর্চায় আগ্রহ- উদ্দীপনা ছিল। এখানকার লেখকরা তাই রাজন্যবর্গের শাসনকাল ও তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস সংরক্ষনে কলম ধরেছেন। তারা আলেম, সুফী, কবি, চিকিৎসকদের জীবনি নিয়েও বইপত্র লিখেছেন, যদিও জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ উল্লেখের ক্ষেত্রে তারা বরাবরই উদাসীন ছিলেন। তারা লিখেছেন বেশী ফার্সিতে, হিন্দিতেও কম লিখেন নি, এমনকি লিখেছেন আরবীতেও। এ সকল বইপত্রের এক বিরাট অংশই লেখা হয়েছে শাসকদের জীবনি ও শাসনকাল নিয়ে। চলুন এ ধারার কিছু গ্রন্থের নাম জেনে আসা যাক :

১. তারীখে সিন্ধ। একে তারীখে কাসেমীও বলা হয়। লেখক আলী বিন হামীদ কুফী সিন্ধী।

২. তাজুল মাআছির। লেখক সদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন হাসান নিজামী নিশাপুরী। এই গ্রন্থে ৫৮৭ হিজরী থেকে ৬১৪ হিজরী (কিছু কিছু কপিতে ৬২৬ হিজরী) পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসকদের আলোচনা করা হয়েছে।

৩. তবাকাতে নাসিরী। লেখক কাজী মিনহাজুদ্দীন জুরজানি। রচনাকাল ৬৫৮ হিজরী।

৪. তারীখে ফিরোজশাহী। লেখক কাজী জিয়াউদ্দীন বারনী। রচনাকাল ৭৫৮ হিজরী।

৫. ফুতুহাতে ফিরোজশাহী। লেখক সিরাজ আফীফ।

৬. তারীখে কাবীর। লেখক শায়খ কাবীর উদ্দিন ইরাকী। এই বইটি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়কাল নিয়ে লেখা।

৭. শাহনামা । লেখক বদরুদ্দীন শাশী। তিন হাজার পংক্তির এই বইটি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়কাল নিয়ে লেখা।

৮. মসনবী কুরআনুস সা'দাইন। লেখক আমির খসরু বিন সাইফুদ্দীন দেহলভী। এটি সুলতান মুইযযুদ্দীন কায়কোবাদ ও তার পিতা বোগরা খানের সাক্ষাতকারের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা।

৯. তাজুল ফুতুহাত। সুলতান জালালুদ্দীন খিলজির যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস নিয়ে লেখা। খাজাইনুল ফুতুহ। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির যুদ্ধের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। তুঘলকনামা। সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সময়কাল নিয়ে লেখা। তিনটি বইই আমীর খসরু দেহলভীর লেখা।

১০. তুঘলক নামা । লেখক মুহাম্মদ সদর আলা। বইটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও ছোট কিন্তু সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় লেখা। হাজী খলিফা কাশফুজ জুনুনে এই বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

১১. তারীখে মোবারকশাহী। লেখক ইয়াহইয়া বিন আহমদ দেহলভী। সুলতান মোবারক শাহের শাসনকাল নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি।

১২. ওয়াকেয়াতে মুশতাকী। লেখক যউকুল্লাহ বিন সাদুল্লাহ বুখারী দেহলভী। সুলতান বাহলুল লোদীর সময়কাল থেকে শাহ আদিল সুরীর শাসনামল পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস নিয়ে লেখা।

গুজরাটের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো :

১. মুজাফফর শাহী। প্রথম মোজাফফর শাহের শাসনামলে গুজরাটের পরিস্থিতি নিয়ে লেখা।

২. আহমদ শাহী। আহমদ শাহ গুজরাটির শাসনকাল নিয়ে লেখা।

৩. মাহমুদ শাহী। একে মাআছিরে মাহমুদিয়াও বলা হয়। সুলতান মাহমুদ শাহের শাসনামলের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। লেখক শামসুদ্দীন মাহমুদ সিরাজী।

৪. তবাকাতে মাহমুদ শাহী। লেখক আব্দুল করিম বিন আতাউল্লাহ সিরাজী। বইটি গুজরাটের সুলতান মাহমুদ শাহের শাসনামলে লেখা হয়। লেখক এ বইতে আদম (আ) এর সময়কাল থেকে ৯১৫ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।

৫. বাহাদুরশাহী। গুজরাটের সুলতানদের ইতিহাস। লেখক হিসাম খান। বাহাদুর শাহ বিন মুজাফফরের শাসনামলে লেখা।

৬. মিরআতে সিকান্দারী। গুজরাটের সুলতানদের ইতিহাস। লেখক ইস্কান্দর বিন মুহাম্মদ গুজরাটি। রচনাকাল ১০২০ হিজরী।

৭. মিরআতে আহমদী। লেখক মির্জা আলী মুহাম্মদ গুজরাটি।

৮. তারীখে সগীর। লেখক আবু তোরাব বিন কামালউদ্দিন হুসাইনি গুজরাটি।

৯. তারীখে গুজরাট। লেখক আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর। বইটি লন্ডন থেকে ছেপেছে।

১০. তুহফাতুস সাদাত। লেখক আরাম কাশ্মিরী। বইটি সাইয়েদ মোবারক হুসাইনি বোখারী গুজরাটির জন্য লেখা হয়।

১১. ইয়াদে আইয়াম। উর্দু ভাষায় রচিত ছোট একটি গ্রন্থ। লেখক খাকসার।

দাকানের শাসকদের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো :

১. বাহামননামা। লেখক আদরি ইসফারাইনি।

২.সিরাজুত তাওয়ারিখ। লেখক মোল্লা মুহাম্মদ বায়দারী।

৩. তুহতাফুস সালাতিন। লেখক মোল্লা দাউদ বায়দারী।

৪. মাহবুবুল ওয়াতন। লেখক মৌলভী আব্দুল জাব্বার আসেফী হায়দারাবাদী।

৫. আল মাহমুদিয়া। উযির ইমাদুদ্দীন মাহমুদ গিলানীর জন্য আব্দুল করিম হামাদানী বইটি লেখেন।

৬. মাআছিরে বোরহানী। লেখক আলী বিন আব্দুল আজীজ বিন আজিজুল্লাহ। ১০০৯ হিজরীতে বোরহান নিজাম শাহ প্রথমের শাসনকালে বইটি লেখা হয়।

৭. তারীখে শিহাবী। লেখক শিহাবুদ্দীন আহমদ নগরী।

মালোয়ার শাসকবর্গের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো :

১. মাহমুদশাহী। প্রথম মাহমুদ শাহের শাসনামলে হাকিম শিহাবুদ্দীন জৌনপুরী বইটি লেখেন। মাহমুদশাহী নামে আরেকটি বই আছে যা দ্বিতীয় মাহমুদশাহের শাসনামলে লেখা হয়।

২. তারীখে আসাদী। বিজাপুরের ইতিহাস নিয়ে নবাব আসাদ খান লারী লিখেছেন।

৩. তাযকিরাতুল মুলুক। রফিউদ্দীন সিরাজী ১০১৮ হিজরীতে বিজাপুরের শাসকদের ইতিহাস নিয়ে বইটি লেখেন।

৪. নাওয়াস নামা। এই বইয়ের অপরনাম গুলজারে ইব্রাহিমী। মুহাম্মদ কাসেম বিন গোলাম অস্ত্রাবাদী বিজাপুরী ১০১৮ সালে ইবরাহীম আদিল শাহের শাসনামলে বইটি লেখেন। স্বীয় বিষয়ে এটি একটি অসাধারণ বই। ইসলামের সূচনা

যুগ থেকে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসকদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে বইটিতে। সাধারণত বইটি তারীখে ফেরেশতা নামেই অধিক পরিচিত ।

৫. মুহাম্মদনামা। জহুর বিন জহুরী কায়েনীর লেখা এ বইতে মাহমুদ আদীল শাহ পর্যন্ত বিজাপুরের শাসকদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

৬. ইনশা আদিল শাহী। লেখক নুর বিন আলী মুহাম্মদ বিজাপুরী।

৭. শাহনামা। উর্দুতে লিখিত এই গ্রন্থের লেখক আবুল হাসান বিন কাজী আব্দুল আজীজ বিজাপুরী।

৮. বাসাতিনুস সালাতিন। মির্জা ইব্রাহিম যুবায়রির লেখা।

৯. তারীখে বিজাপুর। লেখক শিহাবুদ্দীন আহমদ নগরী।

গোয়ালকুন্ডার শাসকদের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো :

১. কুতুবশাহী। লেখক খোরশাহ ফারসী। বইয়ের শেষদিকে বাহামনি এবং কুতুবশাহী শাসকদের আলচনা আছে।

২. তারীখে নেজামি। লেখক সাইয়েদ নিজামুদ্দীন।

৩. হাদীকাতুল আলম। লিখেছেন উযীর আবুল কাসেম রাজী তুসতরী।

৪. তারীখে কাদেরী। মুনশী কাদের খান বায়দারীর লেখা।

(দ্বিতীয় পর্ব)

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো :

১. ওয়াকেয়াতে বাবরী। এটি তুজুকে বাবরী নামেও প্রসিদ্ধ। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তুর্কি ভাষায় এটি লেখেন।

তুজুকে বাবরীর উর্দু অনুবাদ

২. ওয়াকেয়াতে হুমায়ুনি। জওহর আফতাবচির লেখা। এটি তাজকিরাতুল ওয়াকেয়াত নামেও পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুনের আলোচনা।

৩. হুমায়ুন নামা। হুমায়ুনের সৎ বোন গুলবদন বেগমের লেখা। সম্রাট হুমায়ুনের আলোচনা।

৪. তবাকাতে আকবরী। লেখক মির্জা নিজামুদ্দীন বিন মোহাম্মদ মুকিম আকবরাবাদী।

৫. আবুল ফজলের আইনে আকবরী ও আকবরনামা।

৬. মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ। মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ুনী।

মুনতাখাবুত তাওয়ারিখের উর্দু সংস্করণ

৭. হাফতে গুলশন। লেখক মির্জা মোহাম্মদ হাদী। পুরো বইটি সাত অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষ অধ্যায়ে মাশায়েখদের জীবনি আছে।

৮. আখবারুল মুলুক। লেখক আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী।

৯. তুজুকে জাহাংগীরী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের লেখা আত্মজীবনি।

১০. ইকবালনামা। লেখক মুতামিদ খান মুহাম্মদ শরীফ বিন দোস্ত মুহাম্মদ ইরানী।

১১. মাআছিরে জাহাঙ্গীরি। মির্জা কামগারের লেখা।

১২. বাদশাহনামা। লেখক আব্দুল হামিদ লাহোরী। বইটি সম্রাট শাহজাহানের শাসনামল নিয়ে চারখন্ডে লেখা।

১২. বাদশাহনামা। লেখক ওয়ারিস আকবরাবাদী।

১৩. বাদশাহনামা। মির্জা মুহাম্মদ আমিন কাজভিনীর লেখা ।

১৪. শাহজাহাননামা । মির্জা আলাউদ্দীন আলাউল মুলুকের লেখা।

১৫. শাহজাহাননামা। মির্জা মুহাম্মদ তাহের ।

১৬. শাহনামা। মির্জা আবু তালেব কালিম হামদানীর লেখা। ফার্সী কাব্যাকারে লেখা হয়েছে বইটি।

১৭. আমালে সালেহ। মুহাম্মদ সালেহ আকবরাবাদীর বই।

১৮. যুবদাতুত তাওয়ারিখ। মুফতী নুরুল হক বিন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী।

১৯. তারীখে খানদানে তৈমুরী। বইটি ফার্সী ভাষায় লেখা। তৈমুর লঙ্গয়ের সময়কাল থেকে আকবরের শাসনামলের ২২ বছর পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে বইটিতে।

২০. আলমগীরনামা। লেখক মীর্জা মুহাম্মদ কাজেম কাযভিনী। আলমগীরের শাসনামলের প্রথম দশ বছরের আলোচনা আছে বইটিতে।

২১. মাআছিরে আলমগিরী। লেখক মুহাম্মদ সাকি মুসতাইদ খান। ১১২২ হিজরীতে উযীর এনায়েতুল্লাহ কাশ্মীরীর আদেশে তিনি বইটি লেখেন।

আলমগিরের শাসনামলের প্রথম দশ বছর বাদে বাকী সময়কালের আলোচনা আছে এতে। একে মির্জা কাজেমের আলমগীরনামার তাকমিলা বলা যায়।

২২. যফরনামা আলমগীর। লেখক মীর সাহেব কাবেল।

২৩. আছুবে হিন্দুস্তান। ফার্সি ভাষায় কাব্যাকারে লিখিত বইটিতে শাহজাহানের ছেলেদের সিংহাসন নিয়ে লড়াই ও আলমগীরের সামরিক অভিযানগুলোর আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বেহেশতী সিরাজী।

২৪. ফুতুহাতে আলমগীর। লেখক মোহাম্মদ মাসুম।

২৫. আওরংনামা। লেখক মীর মোহাম্মদ আসকারী।

২৬. মিরআতুল আলম। লেখক বখতাউর খান।

২৭. মিরআতে জাহানামা। মুহাম্মদ বাকা সাহারানপুরী।

২৮. ফাতহুশ শাম। লেখক শিহাবুদ্দীন তালেশ।

২৯. ওয়াকায়ে। নেয়ামত খান আলী সিরাজীর লেখা।

৩০. দস্তুরুস সিয়াক। আলমগীরের আমলে সুলতানের আমদানী বিষয়ক হিসাব মিলবে বইটিতে। জংনামা, শাহ আলমনামা। তিনতি বইই নেয়ামত খান আলীর লেখা।

৩১.মুনতাখাবুল লুবাব। তিন খন্ডের এ বইটি লিখেছেন খফী খান।

৩২. ফুরখে শাহিয়া। ইখলাস খান কালানুরী।

৩৩. মুহাম্মদ শাহিয়া। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের আমলে বইটি লিখেছেন গোলাম হুসাইন বিন হেদায়াত আলী।

৩৪. তাজকিরায়ে সালাতিন। লেখক মুহাম্মদ হাদী কামুর খান। এই বইতে চেংগিস খানের সময়কাল থেকে দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ শাহের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

৩৫. মিরআতে আফতাবনামা। সাইয়েদ আব্দুর রহমান দেহলভী ১২৩৪ হিজরীতে বইটি রচনা করেন।

৩৬. মিরআতুস সানা। মির মুহাম্মদ আলী বিন মুহাম্মদ সাদেক বুরহানপুরী ১১৭০ হিজরীতে জুযল শাহের আদেশে বইটি রচনা করেন।

৩৭. সিয়ারুল মুতাআক্ষেরিন। দুই খন্ডের বইটির লেখক সাইয়েদ গোলাম হুসাইন।

সিয়ারের ইংরেজী অনুবাদ

৩৮. মুলাখখাসুত তাওয়ারিখ। বইটি ফার্সী ভাষায় লেখা। ৭৭২ হিজরী থেকে ১১৯৫ হিজরী সময়কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে বইটিতে। লেখক সাইয়েদ ফরজন্দ আলী।

৩৯. যুবদাতুত তাকওয়ারিখ। আব্দুর রহিম বিন আব্দুল করীম সফিপুরী।

৪০. তারীখুল হিন্দ। আব্দুর রহীম বিন মুসাহেব আলী।

৪১. মাজমাউস সালাতিন। লেখক তাওয়াব জাওয়ারা।

৪২. দরবারে আকবরী। শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ দেহলভী।

৪৩. তাযকিরাতুল মুলুক। ফার্সিতে বইটি লিখেছেন রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী।

৪৪. কিতাব দর আখবারে মুলুক। আব্দুল কাদের বিন মুহাম্মদ আকরাম রামপুরী এই বইতে ভারতবর্ষে হিন্দু শাসনামল থেকে মুসলিম শাসনের শেষভাগ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন।

৪৫. হাদিকাতুল আকালিম। আলা ইয়ার খান বালাগ্রামীর বই।

৪৬. তারীখে হিন্দুস্তান। মৌলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী। উর্দু ভাষায় ১৪ খন্ডে সমাপ্ত বইটি। ভারতবর্ষে মুসলিমদের আগমন থেকে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা আছে বইটিতে। *(এটি একটি অসাধারণ বই। বলা যেতে পারে ফার্সিতে রচিত সকল ইতিহাস গ্রন্থের নির্যাস চলে এসেছে এ বইতে — ই. রা)*

৪৭. তারীখে হিন্দ। মৌলভী মাসিহুদ্দীনের লেখা।

৪৮. তারীখে কাশ্মীর। কাব্যাকারে এ বইটি সাদাত শায়েরী ১০৯৪ হিজরীতে রচনা করেন।

৪৯. তুর্কে তাজানে হিন্দ। মির্জা আনসারুল্লাহ খান ইসফাহানীর লেখাএ বইটি ফার্সী ভাষায় চার খন্ডে সমাপ্ত।

৫০. তারীখে মুখাদ্দারাতে তৈমুরিয়া। দুই খন্ডের বইটির লেখক আব্দুল হালীম শরর লখনভী (যিবি বিখ্যাত ইসাবেলা বইটির লেখক)।

৫১. বাহারীস্থান-ই-গায়বী। মির্জা নাথানের লিখিত এ বইতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা, আসাম ও কুচবিহারের সেনা অভিযানের আলোচনা আছে।

৫২. বজমে তৈমুরিয়া। সাইয়েদ সবাহুদ্দিন আব্দুর রহমানের লিখিত বইটি দারুল মুসান্নেফিন আজমগড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাস নিয়ে রচিত বইগুলো :

১. রিয়াযুস সালাতিন। গোলাম হোসেন সেলিম ১২৩৩ হিজরীতে বাংলার ইতিহাস নিয়ে বইটি লেখেন।

২. খুলাসাতুত তাওয়ারিখ। সাইয়েদ এলাহী বখশ হুসাইনির লেখা।

৩. খুলাসাতুত তাওয়ারিখ। মৌলভী আব্দুর রউফ ওয়াহিদীর লেখা।

৪. তারীখে মোজাফফরী। ১১৩১ থেকে ১১৮৭ হিজরী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস নিয়ে লেখা।

৫. রাহাতুল আরওয়াহ। ইসলামের শুরু যুগ থেকে ১২০৭ হিজরী পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে মুহাম্মদ রাহাত এ গ্রন্থ লেখেন।

৬. তারীখে জাহাঙ্গীরনগর। সাইয়েদ আলী খানের লেখা।

৭. আজকারুস সালাতিন। ফকির মোহাম্মদ রাজাপুরীর লেখা।

৮. আহাদিসুল খাওয়ানিন। চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে মৌলভী হামিদুদ্দীন চাটগামী বইটি লিখেছেন।

\

চিশত থেকে পান্ডুয়া

১

দিল্লীর পথে হাটছিলেন পথিক। মাইলের পর মাইল নির্জন ধু ধু প্রান্তর। মাথার উপর আগুন ঝরাচ্ছে সূর্য। বইছে লু হাওয়া। দুপুরে গিয়াসপুর পৌছলেন পথিক। কবছর আগেও এখানে তেমন জনসমাগম ছিল না। কিন্তু কিছুদিন আগে এক দরবেশ এখানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর থেকে বাড়ছে জনতার আনাগোনা। এই দরবেশের সাথে দেখা করতে সবাই ব্যাকুল। এমনকি শোনা যায় দিল্লীর সুলতান জালালুদ্দিন খিলজিও দরবেশের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছেন কিন্তু দরবেশ অনুমতি দেন নি।খানকাহ প্রতিষ্ঠার পর এদিকে এবারই প্রথম আসা। পথিক ভাবলেন ঢু মেরে আসা যাক।

খানকাহর সামনে প্রচন্ড ভীড়। যোহরের নামাজ শেষ হয়েছে একটু আগে। এখন দস্তরখান বিছানো হচ্ছে। প্রতিদিন তিনবেলা খাবারের দস্তরখান বিছানো হয় এখানে। অন্যদের সাথে পথিকও বসে পড়লেন। বিভিন্ন প্রকারের খাবার দেখে পথিক হতবাক। দিল্লীর শাহী দস্তরখানেও এত খাবার নেই হয়তো। এই দরবেশের দস্তরখানে ধনী গরীব সবাইই মেহমান। চারপাশে প্রচুর হট্টগোল হচ্ছে। সদ্য রান্না করা খাবার থেকে ধোয়া উড়ছে।

আচমকা কোলাহল থেমে গেল। নড়ে উঠলো পর্দা। ভেতরের হুজরা থেকে বের হলেন এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। একপাশে বিছিয়ে রাখা জায়নামাজে বসলেন। সবার চোখ এখন তার দিকে। বৃদ্ধ মুচকি হেসে পাশের জনকে খাবার শুরু করার আদেশ দিলেন। নিজে একটা রুটি আর সামান্য করলা ভাজি নিয়ে আহার শুরু করলেন।

'কে তিনি?' জিজ্ঞেস করলো পথিক।

'খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া' জবাব দিলো পাশেরজন।

২

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। মুসলিম বিশ্বে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। গোবি মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসা তাতারী ঝড়ে বিপর্যস্ত পুরো মুসলিম বিশ্ব। পতন ঘটেছে বোখারা , সমরকন্দ, রায়, হামাদান,খাওয়ারেজম, কাযভিন ও মার্ভের মতো সমৃদ্ধ নগরীগুলোর। বাগদাদে ঘটেছে নির্মম গনহত্যা। সেদিনের এ বিপর্যয় থেকে

ভারতবর্ষ ছিল নিরাপদ। মধ্য এশিয়া থেকে হিজরত করে আসা উলামায়ে কেরাম ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের জন্য সেদিনের দিল্লী ছিল নিরাপদ আশ্রয়।
দিল্লী তখন সমৃদ্ধ এক শহর। তার যৌবন-সূর্য তখন মধ্যাকাশে। একই সময়ে চিশতিয়া সিলসিলাও পার করছে তার সোনালী যুগ। ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসন দখল করে রেখেছেন সুলতানুল আউলিয়া খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।
দিল্লীর পাশেই , গিয়াসপুরে তার খানকাহ , হয়ে উঠেছে ভারতবাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া পান্ডুয়া, লখনৌতি, দৌলতাবাদ, গুলবার্গ, বুরহানপুর, যয়েনাবাদ,মান্ডো, আহমেদাবাদ,সফিপুর, মানিকপুর ও সলোনেও গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল চিশতিয়া খানকাহ। পিপাসার্ত হৃদয় নিয়ে আসছে মানুষ। পাচ্ছে পথের সন্ধান।
#
সেদিনের ভারতে চিশতিয়া সিলসিলা একাই ছিল না। একই সময়ে আরো কয়েকটি সিলসিলাও কাজ করেছে। তবে সবার আগে আগমন চিশতিয়া সিলসিলার। সবচেয়ে বেশী প্রচার প্রসারও তারই।
সোহরাওয়ার্দি সিলসিলার কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষে এ সিলসিলার কাজ শুরু করেন শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানি। কিন্তু এ সিলসিলার খানকাহ মুলতান ও সিন্ধ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। একই সময়ে বিহারে শুরু হয় ফেরদৌসিয়া সিলসিলার কাজ। এ সিলসিলার শুরু শায়খ বদরুদ্দিন সমরকন্দীর হাতে হলেও একে নবজীবন দান করেন শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মনিরী। এই সিলসিলাও বিহারের বাইরে প্রচার প্রসার পায় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাদেরিয়া ও শাত্তারিয়া সিলসিলা প্রকাশ পায়। কাদেরিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা শাহ নেয়ামত উল্লাহ কাদেরি। শাত্তারিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা শাহ আবদুল্লাহ শাত্তারী। সম্রাট জাহাংগীরের আমলে এই সিলসিলা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আকবরের শাসনামলে খাজা বাকী বিল্লাহ ভারতবর্ষে নকশবন্দি সিলসিলার কাজ শুরে করেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানীর হাতে এ সিলসিলার ব্যাপক সংস্কার ও প্রসার ঘটে। এরপর থেকে এই সিলসিলাকে মুজাদ্দেদিয়া নকশবন্দিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

চিশত খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে কয়েকজন বুযুর্গ আধ্যাত্মিক সংশোধনের কাজ শুরু করেন। তাদের দিকে সম্পর্ক করেই এই সিলসিলাকে চিশতিয়া সিলসিলা নামকরণ করা হয়।'শাজারাতুল আনোয়ার' থেকে চিশত নামে দুটি শহরের সন্ধান মেলে। একটি খোরাসানে। হেরাতের কাছাকাছি। অন্যটি

ভারতবর্ষে । আউচ এবং মুলতানের মাঝামাঝি। এই সিলসিলার নামকরণ হয়েছে খোরাসানের চিশত অনুসারে।
সম্ভবত শায়খ আবু ইসহাক শামীই (মৃত্যু ৩২৯ হিজরী/৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম বুযুর্গ যার নামের শেষে চিশতী ব্যবহার করা হয়।
ভারতবর্ষে এ সিলসিলা নিয়ে কয়েকজন বুযুর্গ আগমন করলেও এ সিলসিলার সত্যিকার প্রচার প্রসার শুরু হয় খাজা মইনুদ্দীন চিশতীর সময়ে।

সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরির ভারত আক্রমনের মধ্যবর্তী সময়ে (৫৭৯ হিজরী-৬০২ হিজরী) খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরে অবস্থান নেন এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। আজমীরের শাসনকর্তা তখন পৃথ্বিরাজ, যার সাহসিকতার খ্যাতি ছড়িয়েছিল বহুদূর। সে যুগে আজমীরই ছিল সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্র।
'সিয়ারুল আউলিয়া' থেকে জানা যায় একবার পৃথ্বিরাজ একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়। খাজা সাহেব এর প্রতিকার চেয়ে পৃথ্বিরাজকে পত্র লেখেন। পৃথ্বিরাজ পত্রের জবাব দেয় অবমাননাকর ভাষায়। খাজা সাহেব তখন বলেন, আমি পৃথ্বিরাজকে বন্দী করে মোহাম্মদ ঘোরির হাতে তুলে দিলাম। এর কিছুদিন পরেই মোহাম্মদ ঘোরি হামলা করেন এবং পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন।
খাজা সাহেবের জীবদ্দাশয়ই ভারতের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন ঘটে। আজমীর তার গুরুত্ব হারায় । সেস্থান দখল করে দিল্লী। খাজা সাহেব তার প্রধান শাগরেদ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে দিল্লীতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে নিজে বাকী জীবন আজমিরেই কাটিয়ে দেন।

৩

খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সময়কে চিশতিয়া সিলসিলার স্বর্ণযুগ বিবেচনা করা হয় । গিয়াসপুরে তার খানকাহ ছিল আধ্যাত্মিকতার প্রাণকেন্দ্র। ধনী গরীবের কোনো ভেদাভেদ ছিলো না সেখানে। দুবেলা বিছানো হত শাহী দস্তরখান। সেই দস্তরখানের আয়োজন হার মানাতো শাহী দরবারকেও। খাজা সাহেব নিজে সারা বছর রোজা রাখতেন। আহার করতেন এক আধখানা রুটি , সামান্য করোলা ভাজি অথবা ভাত দিয়ে। তার কাছে হাদিয়া-তোহফা যা আসত সবই বিলিয়ে দিতেন আগত ও বিদায়ী লোকদের মাঝে।

চিশতিয়া সিলসিলার শায়খরা প্রথম থেকেই দুটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। একটি হলো রাজ দরবারের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখা।

খাজা সাহেবের দরবারে সম্রাট জালালুদ্দিন খিলজি কয়েকবার আসতে চেয়েও অনুমতি পান নি। আলাউদ্দিন খিলজি একটু জোরাজুরি করেছিলেন। খাজা সাহেব বলেছিলেন, 'এই ফকিরের ঘরে দুটি দরজা। এক দরজা দিয়ে বাদশাহ্ প্রবেশ করবে অন্য দরজা দিয়ে ফকির বেরিয়ে যাবে'

সম্রাটরা আর তাকে ঘাটাতে সাহস করেন নি। দূর থেকে শ্রদ্ধা করে গেছেন। বিপদে-আপদে দোয়া চেয়েছেন।

কুতবুদ্দিন মোবারক শাহ্ কিন্তু এত সহজে সব মেনে নেন নি। তার আদেশ ছিল প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে শহরের গণ্যমান্য লোকেরা যেন তার দরবারে গিয়ে তার সাথে দেখা করে। খাজা সাহেব কখনোই এ আদেশ মানেন নি। শুধু নিজের খাদেম ইকবালকে পাঠাতেন সেই অনুষ্ঠানে। আমীর খসরুর ভাষ্যানুযায়ী কুতুবুদ্দীন নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে খাজা সাহেবের মাথা আনতে পারবে তাকে এক হাজার তংকা বখশিশ দেয়া হবে। প্রায় চার বছর এই দ্বন্দ চলতেই থাকে। শেষে খসরু খানের হাতে কুতুবুদ্দীন নিহত হলে এই বিরোধের নিরসন হয়।

খাজা সাহেব জীবনে একবারই রাজদরবারে গিয়েছেন। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সময়ে। সামা শোনার বৈধতা নিয়ে রাজদরবারে বিতর্কসভা হয়। খাজা সাহেব সেখানে অংশগ্রহণ করেন।

কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ারের ঘটনা থেকেও রাজদরবারের প্রতি নিস্পৃহতার প্রমান মেলে। তিনি হাসী নামক এলাকায় থাকতেন। একবার সে এলাকায় মুহাম্মদ বিন তুঘলক সফরে যান। সবাই তুঘলকের সাথে দেখা করতে গেলেও তিনি যান নি। পরে তাকে দিল্লীতে তলব হয়। তুঘলকের দরবারে দাড়িয়েই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন 'আল আযমাতু লিল্লাহ'

রাজদরবারের সাথে সম্পর্কহীনতা মানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসিনতা নয়। চিশতিয়া সিলসিলার শায়খগন সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সতর্ক নজর রাখতেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক যখন ঠাঠ মালিক তুগার বিদ্রোহ দমন করতে যান তখন নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহল্ভীও তার সংগ দেন।

বাংলার বিখ্যাত বুযুর্গ নুর কুতবে আলমের সময় বাংলার রাজনৈতিক আকাশে ছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়ার জায়গিরদার রাজা গনেশের অত্যাচারে জনগন ছিল অতিষ্ঠ। নুর কুতবে আলম তখন জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কির কাছে পত্র লিখে এ ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তার এবং সাইয়েদ আশরাফ জাহাংগীরের পত্রালাপ থেকেই বোঝা যায় সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তারা অসচেতন ছিলেন না।

সিলসিলার দ্বিতীয় মূলনীতিটি ছিল, সিলসিলার একটি কেন্দ্র থাকবে। সেই কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনে সিলসিলার অন্য খানকাহগুলো পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্র বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর সময়ে সিলসিলার মূলকেন্দ্র ছিল আজমীর। কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সময়ে দিল্লী। ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শকর দিল্লীর চাকচিক্য পছন্দ করেন নি। বখতিয়ার কাকীর পর তিনি হাসীতেই ফিরে যান। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সময় কেন্দ্র গিয়াসপুরে। নাসিরুদ্দীন চেরাগে দিল্লীর সময়ে কেন্দ্র আবার দিল্লীতে।

নাসিরুদ্দীনের ইন্তেকালের কিছুদিন পরেই মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী সরিয়ে নেন দেবগিরিতে। দিল্লী হয়ে যায় বিরান । এ সময় চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়েখগন দুটি মূলনীতি থেকেই সরে আসেন। নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ব্যতিতই বাংলা, দাকান, মালোয়াহ এসব এলাকাতে স্বাধীন খানকাহ গড়ে উঠে। চিশতি সিলসিলার অনেকেই রাজদরবারের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

প্রফেসর খলিক আহমদ নিজামী লিখেছেন, এভাবেই ভারতবর্ষে চিশতিয়া সিলসিলার প্রথম যুগ শেষ হয়।

৪

চিশতী শায়খগন কখনোই আধ্যাত্মিকতা বলতে বৈরাগ্যবাদ কিংবা নির্জনবাসকে সমর্থন করেন নি। তারা সমাজে থেকেই সমাজ বদলের চেষ্টা করেছেন। জনতার মাঝে নির্জনতা খুজেছেন।

শায়খ নাসিরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী একবার আমীর খসরুর মাধ্যমে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন নির্জনে থাকার।

'নির্জনে থাকার অনুমতি নেই। তুমি নির্জনে চলে গেলে দিল্লীর লোকদের দেখভাল করবে কে?' বলেছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া।

চিশতী শায়খদের খানকাহগুলো সমকালীন জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা বিপর্যয়ের সময়গুলিতে এসব খানকাহ ছিলো শান্ত, স্থির। জনগনের আত্মার খোরাক জুগিয়েছেন তারা।

ইলমবিহীন তাসাউফ চর্চা ক্ষতিকর। অনেক সময় এটি বিভ্রান্তির কারন হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন , সুন্নাহর সঠিক ইলমের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারনেই বিভিন্ন সময় তাসাউফপন্থীদের মধ্যে বিকৃত আকীদা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। চিশতী শায়খগন প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত খানকাহর প্রতিষ্ঠাতা আখী সিরাজের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়।
আখী সিরাজ, যার পুরো নাম সিরাজুদ্দীন উসমান, তিনি ছিলান লখনৌতির বাসিন্দা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার খানকাহে যান। তারপর থেকে সেখানেই থাকতেন। শুধু বছরে দু একবার লখনৌতি আসতেন। আমলের দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তার তেমন পড়াশুনা ছিল না। নিজামুদ্দীন আউলিয়াকে কেউ কেউ বলেছিলেন তাকে এযাজত দিতে। কিন্তু তিনি রাজী হন নি। বলেছিলেন, আমাদের এ কাজে প্রথম শর্তই হলো ইলম থাকা। তার তো ইলমই নেই।
পরে মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদি তাকে পড়াশোনা করান। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার খানকাহে বিশাল কুতুবখানাও ছিল। আখী সিরাজ সেই কুতুবখনায় পড়াশুনা করতেন।
আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহল্ভীর ভাষ্যানুযায়ী, নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ইন্তেকালের পর তিনি বাংলায় ফিরে আসার সময় সেই কুতুবখানা থেকে অনেক কিতাব নিয়ে আসেন। পাণ্ডুয়ার খানকায় তিনি একটি কুতুবখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল বাংলার প্রথম চিশতি খানকাহ ও কুতুবখানা।

তথ্যসূত্র

হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালীম ও তরবিয়ত – সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী
তারীখে মাশায়িখে চিশত – প্রফেসর খলীক আহমদ নিজামী
আখবারুল আখইয়ার– আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী
সিয়ারুল আউলিয়া — সাইয়েদ মোহাম্মদ বিন মোবারক কিরমানী *(মীর খোর্দ)*
তারীখে দাওয়াত ও আযিমত — সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
তারীখে ফেরেশতা– আবুল কাসেম ফেরেশতা

ভারতবর্ষের কাগজ

মূল: আবু জাফর নদভী
ভাষান্তর: ইমরান রাইহান

আজকাল ভারতবর্ষে যে হারে কাগজ ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখে কেইবা ভাববে এক যুগে এখানে কাগজের প্রচলনই ছিল না।

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ এলাকায় কাগজের পরিবর্তে অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করা হতো। লেখালেখির প্রয়োজন হলে ভুজ পাথর, খেজুরের পাতা, তাল গাছের পাতা, রেশমী কাপড়, তামা ইত্যাদীর উপর লেখা হতো। পাথরের উপর লেখা সম্রাট অশোকের একটি ফরমান এখনো টিকে আছে। মুম্বাই মিউজিয়ামে আছে তামার উপর লেখা একটি পত্র।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরাও উল্লেখ করেছেন। ইবনে নাদীম লিখেছেন, আরবরা সাধারনত উটের হাড় ও খেজুরের পাতায় লেখালেখি করে। ভারতবর্ষের লোকেরা তামা, পাথর ও সাদা রেশম কাপড়ে লেখালেখি করে।[৩১৯]

বেরুনী লিখেছেন, দক্ষিন ভারতে খেজুর ও নারিকেল গাছের মতো উচু এক প্রকারের গাছ দেখা যায়। এই গাছের ফল খাওয়া হয়। এই গাছের পাতা প্রায় এক হাত লম্বা হয়। এই গাছকে তাল গাছ বলা হয়। এই গাছের পাতার উপর লেখা হয়। মধ্য ভারত ও উত্তর ভারতের এলাকাগুলিতে তুজ গাছের ছালের উপর লেখা হয়।[৩২০]

সজন রায় উড়িষ্যা সম্পর্কে লিখেছেন, তালের পাতায় লোহার কলম দিয়ে লেখা হতো। কালি খুব কম ব্যবহার করা হতো।

কাশ্মীর সম্পর্কে লিখেছেন, সাধারণত ভুজ পাথরের উপর লেখা হতো। কাশ্মীরে এটি প্রচুর মিলতো।[৩২১]

---

[৩১৯] আল ফিহরিস্ত, ৩২ পৃষ্ঠা, মিসর।

[৩২০] কিতাবুল হিন্দ, ৮১ পৃষ্ঠা, লন্ডন।

[৩২১] খুলাসাতুত তাওয়ারিখ, দারুল মুসান্নেফিন , আযমগড়।

এইসব উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় ভাতবর্ষে কাগজের প্রচলন ছিল না। পাতার উপরই বেশিরভাগ লেখা হত। বেরুনী বলেছেন পাতার উপর অনেক পুথি লেখা হতো। এসব পুথির কিছুকিছু আজো ভারতবর্ষে টিকে আছে। একবার আহমেদাবাদে আমি জৈন ধর্মের একটি পুথি দেখি। এটি লেখা হয়েছে ভুজ পাথরের উপর। মিয়ানমার সফরকালে[৩২২] রেংগুনের বৌদ্ধ মন্দিরে একটি প্রাচীন পুথি দেখি যা লেখা হয়েছে তাল পাতার উপর।

কাগজের প্রথম প্রবর্তন করেছিল চীনারা। তারা এক প্রকার ঘাস থেকে কাগজ তৈরী করতো। ইবনে নাদীম লিখেছেন, চীনের লোকেরা চীনা কাগজে লেখে। এটি এক প্রকার ঘাস থেকে প্রস্তুত করা হয়। এই কাগজ তাদের আয়ের অন্যতম মাধ্যম।[৩২৩]

শুরুর দিকে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতো না। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা এর ব্যবহার শিখে এবং দ্রুতই বিভিন্ন অঞ্চলে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। বেরুনী লিখেছেন, মুসলমানরা সমরকন্দ বিজয়কালে যাদেরকে বন্দী করেছিল তাদের কয়েকজন ছিল কাগজ প্রস্তুতকারক। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে কাগজ প্রস্তুতপ্রনালী শিখে নেয় এবং এই শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করে। বেরুনী আরো লিখেন, ভারতবর্ষে গ্রীকদের মতো চামড়ায় লেখার প্রচলন নেই।[৩২৪]

ভারতবর্ষ বিজয়ের আগেই মুসলমানদের মধ্যে কাগজের প্রচলন শুরু হয় এবং তারা বিভিন্ন অঞ্চলে কাগজের কারখানা স্থাপন করে। সম্ভবত খোরসান ও সমরকন্দে সর্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপন করা হয়। সেখানে এ জাতীয় ঘাস প্রচুর পাওয়া যেত। ১৩৪ হিজরীতে (৭৫১ খ্রিস্টাব্দ) আরবরা আরো এগিয়ে যায়, তারা তুলা থেকে কাগজ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়[৩২৫]। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতেই সরকারীভাবে এই কাগজের ব্যবহার শুরু হয়[৩২৬]। ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন হিজরী প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকেই শুরু হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই শতাব্দীর শেষদিকে (৯৩ হিজরী) সিন্ধু জয় করেন। এই অভিযানে হাজ্জাজের নির্দেশ ছিল প্রতি তিনদিন পরপর তাকে পত্র লিখে সব জানাতে হবে। বালাজুরি লিখেছেন, তিনদিন পর পর হাজ্জাজের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের

[৩২২] এই সফর নিয়ে লেখক একটি বই লিখেছেন, সফরনামায়ে বার্মা। অত্যন্ত তথ্যবহুল বই। –অনুবাদক।

[৩২৩] আল ফিহরিস্ত, ৩২ পৃষ্ঠা, মিসর।

[৩২৪] কিতাবুল হিন্দ, ৮১ পৃষ্ঠা, লন্ডন।

[৩২৫] এনসাইক্লোপেডিয়া, ২০শ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

[৩২৬] সুবহুল আ'শা, ২য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।

পত্র যোগাযোগ হতো। অভিযানের শুরুতেই হাজ্জাজ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন[৩২৭]।

এই পত্র কিসে লেখা হতো তা স্পষ্ট নয়। তবে কলকশান্দি লিখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাদা পাথর ও খেজুরের ডালে লেখা হতো। পরবর্তীকালে সাহাবীরা পাতলা চামড়ায় লিখতেন। আব্বাসী যুগের শুরু পর্যন্ত এসবেই লেখা হতো। হারুনুর রশিদই প্রথম খলিফা যিনি আদেশ দেন, সরকারী সকল ফরমান কাগজে লিখতে হবে। সেদিন থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাগজের ব্যাপক প্রচলন হয়[৩২৮]। সম্ভবত সিন্ধু বিজইয়ের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে কাগজ এসে পৌছেনি। আব্বাসী আমলেই আরবরা সিন্ধু ও আশপাশের এলাকায় কাগজ নিয়ে আসে। হিজরী পঞ্চম শতাব্দির শুরু পর্যন্ত সিন্ধুতে আরবদের শাসন টিকে ছিল। সম্ভবত, এসময় তারা খোরাসান ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা কাগজই ব্যবহার করতো।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষে কাগজ নির্মান শুরু হয়। হামেদ গার্নাতি লিখেছেন, বলখের কাগজ, ইরাক , খোরাসান ও ভারতবর্ষের কাগজের অনুরুপ।[৩২৯]

হামেদ গার্নাতি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। তার বর্ননা থেকে বুঝা যায় ততদিনে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত শুরু হয়ে যায়। সম্ভবত লাহোর কিংবা দিল্লীতেই এই কাজ শুরু হবে কারন তখন এই দুই শহরই ছিল রাজধানী।

কাশ্মীর: শাহী খান কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের একজন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। জীবনের শুরুর দিকে তিনি সমরকন্দে অবস্থান করে লেখাপড়া করেন। কাশ্মীর ফিরে আসার সময় তার সাথে অনেক কারিগরকে নিয়ে আসেন। তারীখে কাশ্মীরে গ্রন্থকার লিখেছেন, তিনি কিছুদিন সমরকন্দে অবস্থান করে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। ফিরে আসার সময় সাথে করে কাগজ, কার্পেট, জীন নির্মানে দক্ষ একদল শ্রমিক নিয়ে আসেন।

৮২৬ হিজরীতে শাহী খান সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান যাইনুল আবেদিন নাম ধারণ করেন। তারীখে কাশ্মীরের গ্রন্থকার লিখেছেন, সুলতান তার সাথে নিয়ে আসা এইসব শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জায়গির দান করেন[৩৩০]।

---

[৩২৭] ফুতুহুল বুলদান, ১৪২ পৃষ্ঠা, মিসর।

[৩২৮] সুবহুল আ'শা, ২য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

[৩২৯] তুহফাতুল আলবাব, ২০২ পৃষ্ঠা।

[৩৩০] ওয়াকেয়াতে কাশ্মীর, কুতুবখানা হাবিবগঞ্জ, আলীগড়।

সম্ভবত এ সময় কাশ্মীরে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটিই ছিল ভারতবর্ষে স্থাপিত প্রথম কাগজ কারখানা। ইতিহাসের পাতায় এর আগের কোনো কারখানার বিবরণ পাওয়া যায় না।

দ্রুতই এই শিল্পে কাশ্মীর প্রসিদ্ধি অর্জন করে। অন্যান্য অঞ্চলে কাশ্মীরি কাগজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বাদশাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে এই কাগজ হাদিয়া পাঠানো হতো। সুলতান যাইনুল আবেদিন তার শাসনকালে গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বিগ্রাহ ও খোরাসানের সুলতান আবু সাইদের কাছে কাশ্মীরি কাগজ উপহার পাঠান। খোরাসানে অনেক আগ থেকেই কাগজ প্রস্তুত করা হতো। তবু সুলতান কর্তৃক কাগজ উপহার দেয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায় সেসময় কাশ্মীরি কাগজের মান খোরাসানী কাগজের চেয়ে ভালো ছিল। ঐতিহাসিক আবুল কাসেম ফেরেশতা এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, খোরসানের শাসক আবু সাইদ সুলতানের কাছে আরবী ঘোড়া ও উন্নত প্রজাতির উট উপহার পাঠান। সুলতান এই উপহারে খুব খুশি হন। তিনি মেশক, জাফরান, আতর ও কাগজ ইত্যাদী মূল্যবান জিনিস উপহার পাঠান[৩৩১]।

গুজরাট: হিজরী নবম শতাব্দীর শুরুতে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদের গোড়াপত্তন হয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরে এই শহর এতটাই উন্নতি করে যে পুরো ভারতবর্ষে তখন এর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো শহর ছিল না। সুলতান মাহমুদ বিগ্রাহ এই শহরের উন্নতির দিকে বিশেষ খেয়াল রেখেছিলেন। তিনি তার পাশে বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের ডেকে নেন। তখন গুজরাটে বেশকিছু কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে নানা রংগের কাগজ তৈরী করা হতো। লোকেরা রোজনামচা ও ব্যবসায়িক হিসাব লেখার জন্য রংগিন কাগজ ব্যবহার করতো। যারা কাগজ প্রস্তুত করতো তাদের কাগজি বলা হতো। এভাবে কয়েকটি বংশের নামই কাগজি নামে প্রসিদ্ধ হয়। এখনো এই বংশের লোকদের দেখা মেলে। আহমেদাবাদে এখনো কাগজি মহল্লা নামে একটি মহল্লা আছে, যেখানে কাগজিরা বসবাস করতো। আহমেদাবাদের পীর মুহাম্মদ শাহ লাইব্রেরীতে বেশকিছু পুরনো বই পাওয়া যায় যা আহমেদাবাদে তৈরী কাগজে লেখা। মিরআতে আহমদিতে আহমেদাবাদের কাগজের বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে এভাবে, বিভিন্ন শহরে কাগজ প্রস্তুত হলেও আহমেদাবাদের কাগজের শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা একে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য[৩৩২]।

---

[৩৩১] তারিখে ফেরেশতা, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, নওল কিশোর প্রেস।

[৩৩২] মিরআতে আহমদি, ১৮ পৃষ্ঠা, বোম্বাই।

তবে এই কাগজের একটি দুর্বলতা ছিল। মিরআতে আহমদির লেখক লিখেছেন, আহমেদাবাদ যেহেতু মরু অঞ্চল তাই প্রায়ই কাগজ তৈরীর সময় বালু উড়ে মিশ্রণে পড়তো। শুকানোর পর এই বালুকনাগুলা ছোট ছোট লাল ফুটকির মতো দেখা যেত। এই কাগজের এটিই একটি দুর্বলতা[৩৩৩]।
তবে এই দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই কাগজ আরব ও রোমে রফতানি করা হতো। মিরআতে আহমদির ভাষ্যমতে,প্রতিবছর হাজার রুপির এই কাগজ আরব ও রোমে পাঠিয়ে ব্যবসায়িরা অনেক লাভ করতো[৩৩৪]।
দৌলতাবাদ: মুঘল আমলে ওখানে প্রস্তুতকৃত কাগজের বেশ সুনাম ছিল। এখানকার কাগজ পুরো দক্ষিণ ভারতে সরবরাহ করা হতো[৩৩৫]
বিহার: বিহারের রাজধানী আজিমাবাদে (পাটনা) অনেকগুলো কাগজের কারখানা ছিল। সজন রায় বিহারের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, পাটনায় খুব উন্নতমানের কাগজ প্রস্তুত হতো[৩৩৬]।
আমার ব্যক্তিগত মত হলো, পাটনায় কাগজ তৈরী হতো না। এর কিছু দূরে যে এলাকা আছে, যাকে আজও কাগজি মহল্লা বলা হয়, সেখানেই কাগজ প্রস্তুত হতো। সে এলাকার বাসিন্দাদের এখনো কাগজি বলা হয়। যেহেতু পাটনা থেকে এই কাগজের বিপণন ও সরবরাহ হতো তাই হয়তো এই কাগজকে পাটনার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।
গয়া: এখানেও বেশকিছু কাগজের কারখানা ছিল। গোলাম হোসেন খান তবতবায়ি এসব কারখানার কথা লিখেছেন[৩৩৭]।
বাংলা: মুর্শিদাবাদ ও হুগলি অঞ্চলে প্রচুর কাগজ তৈরী করা হতো। এসব এলাকায় অনেককে কাগজি বলে ডাকা হতো।
জৌনপুর: আউধের যফরাবাদ গ্রামে অনেক কাগজি বসবাস করতেন। এখানকার বাশের তৈরী কাগজের খুব সুনাম ছিল। এখানেও কাগজি মহল্লা নামে একটি এলাকা আছে[৩৩৮]
পাঞ্জাব: পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে কয়েকটি কাগজের কারখানা ছিল। এখানকার কাগজ হতো ধবধবে সাদা ও শক্ত। পুরো পাঞ্জাবে এই কাগজ ব্যবহার করা হতো।

---

[৩৩৩] প্রাগুক্ত।
[৩৩৪] প্রাগুক্ত।
[৩৩৫] মামলাকাতে বিজাপুর, ৩য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা।
[৩৩৬] খুলাসাতুত তাওয়ারিখ, বিহার জেলার আলোচনা, দারুল মুসান্নেফিন।
[৩৩৭] সিয়ারুল মুতাআক্ষেরিন, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, নওল কিশোর প্রেস।
[৩৩৮] আলীগড় ইউনিভার্সিটির সাবেক নাযেমে দ্বীনিয়াত মাওলানা আবু বকর শিস জৌনপুরী আমাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। –লেখক।

সজন রায় লিখেছেন, এখানকার কাগজ খুবই ভালো। বিশেষ করে মান সিংগি, নিম হারিরি ও জাহাংগিরি কাগজের সুনাম সর্বত্র। এসব কাগজ খুবই সাদা ও শক্ত হতো[৩৩৯]।

এখানে নিম হারিরি কাপড় সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। রেশম কাপড়ের সাথে তুলা মিলিয়ে এই কাগজ তৈরী করা হতো। এই কাগজগুলো নরম ও শক্ত হতো।

এইসব কাগজের নমুনা এখন খুজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। সৌভাগ্যক্রমে নবাব সদরে ইয়ার জং হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানির ব্যক্তিগত কুতুবখানায় (কুতুবখানা হাবিবগঞ্জে) এসব কাগজের অনেক নমুনা সংরক্ষন করা আছে। নবাব সাহেব অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রাচীন এসব বইপত্র সংগ্রহ করে সংরক্ষন করেছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই কুতুবখানা ঘুরে বিভিন্ন প্রকারের কাগজ দেখার। আহমেদাবাদী কাগজগুলো সাধারণত একটু মোটা। সোনালী রংগের বেশকিছু কাগজ দেখেছি। এই কাগজগুলো খুবই শুভ্র। এই কাগজের বৈশিষ্ট্যই এটি। হাবিবগঞ্জের কুতুবখানায় কাশ্মীরি কাগজে লিখিত কিছু বই দেখেছি। এই কাগজগুলোও খুব মজবুত। শিয়ালকোটে তৈরী হতো জাহাংগিরী কাগজ, সম্রাট জাহাংগিরের নামে যার নামকরন। এই কাগজগুলো শুভ্র, নরম। কুতুবশাহী শাসনামলে হায়দারাবাদে যে কাগজ প্রস্তুত হতো তাও কয়েক রংগের হতো। ইতিহাসের কোনো বইতে ফয়েজাবাদের কাগজের উল্লেখ না পেলেও কুতুবখানা হাবিবগঞ্জে এই কাগজের একটি নমুনা আছে। কানপুরি কাগজ ছিল সাধারন মানের। এটি হতো খাকি রংগের। দৌলতাবাদে কয়েক প্রকারের কাগজ তৈরী হতো। ৯৩৯ হিজরীতে বাহাদুর শাহ যখন দৌলতাবাদ দখল করেন তখন থেকে তার নামে এক প্রকার কাগজ তৈরী করা হতে থাকে। এই কাগজের নাম ছিল বাহাদুরখানি। এছাড়া সাহেবখানি ও মুরাদশাহী নামে দুই প্রকার কাগজ তৈরী হতো সেখানে। বালাপুরি নামে এক প্রকার কাগজ তৈরী হতো যা ছিল হালকা সাদা। কাসেম বেগি নামক এক প্রকার কাগজ আছে। এটির নামকরন করা হয় এর নির্মাতার নামানুসারে। রুবকারী নামক কাগজে লেখা কিছু ফরমান দেখেছি। তবে এই কাগজ কোথায় প্রস্তুত হত তা জানা যায়নি। শরবতি নামে আরেকপ্রাকার কাগজ দেখেছি যা অন্যদের তুলনায় সাদামাটা।

---

[৩৩৯] খুলাসাতুত তাওয়ারিখ, ভূমিকা, দারুল মুসান্নেফিন।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম (পর্ব ১)

মূল: আব্দুস সালাম নদভী

অনুবাদ: ইমরান রাইহান

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকরা নানাভাবে জনকল্যাণের দিকে খেয়াল রাখতেন। তাদের এমনই কিছু উদ্যোগ নিয়ে এই প্রবন্ধ।

হাসপাতাল

মুসলিম শাসকদের মধ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক (সিংহাসন আরোহণকাল ৭৫২ হিজরী) সর্বপ্রথম একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালকে তখন সিহহত খানা বলা হতো। সুলতান এই হাসপাতালের জন্য কয়েকজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। হাসপাতালের পক্ষ থেকেই রোগীদের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হতো। হাসপাতালের ব্যয় বহনের জন্য সুলতান বেশকিছু জমি ওয়াকফ করে দেন।[৩৪০]

তারীখে ফিরোজশাহীতে শুধু এই একটি হাসপাতালের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মোট ৫ টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪১]

এরপর সুলতান আলাউদ্দিন বিন সুলতান আহমদ শাহ বাহামনি (মৃত্যু ৭৫৭ হিজরী) আহমেদাবাদে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালের ব্যয় বহনের জন্য জমি ওয়াকফ করা হয়।[৩৪২]

---

[৩৪০] তারীখে ফিরোজশাহী, ২য় খন্ড, ৩৫৩-৩৫৯ পৃষ্ঠা।

[৩৪১] তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড,১৫১ পৃষ্ঠা।

[৩৪২] প্রাগুক্ত, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণাত্যে সুলতান আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করা হতো।[৩৪৩]
৮৪৯ হিজরীতে মালোয়ার শাসক মাহমুদ খিলজি শাদিআবাদ শহরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালের জন্য জমি ওয়াকফ করা হয় এবং হেকিম মাওলানা ফজলুল্লাহকে পাগলদের চিকিৎসা করার দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩৪৪]
মুঘল বাদশাহদের মধ্যে জাহাঙ্গীর সর্বপ্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি যে ফরমান জারি করেন তাতে গুরুত্বের সাথে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ ছিল।[৩৪৫]
সেকালের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হেকিম আলি প্রতিবছর দরিদ্রদের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার ওষুধ বিলি করতেন।[৩৪৬]
সম্রাট শাহজাহান নতুন কোনো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেননি তবে তার একজন সভাসদ উযির খান, যিনি সাত বছর পাঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন, তিনি একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪৭]
আলমগীরের শাসনামলে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বুঝা যায় সম্রাট এদিকে মনোযোগী ছিলেন। খফি খান লিখেছেন একবার সম্রাট দুজন চিকিৎসক কে দায়িত্বে অবহেলার কারনে বরখাস্ত করেন।[৩৪৮]
এছাড়া মিরআতে আহমদি গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে, সম্রাট হেকিম মোহাম্মদ রকি সিরাজি ও হেকিম রাজিউদ্দিনকে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩৪৯]

সরাইখানা

ঐতিহাসিক বর্ননা থেকে দেখা যায়, মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সরাইখানা নির্মান করেন । তিনি যখন রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) সরিয়ে নেন, তখন পথে অনেক সরাইখানা নির্মান করেছিলেন। সরাইখানা নির্মানের জন্য ছায়াময় স্থান বেছে নেয়া হয়েছিল।[৩৫০]

---

[৩৪৩] তারীখে দাক্কান, ৭৮ পৃষ্ঠা।
[৩৪৪] তারীখে ফেরেশতা, ২য় খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা।
[৩৪৫] তুজুকে জাহাঙ্গীরি, ৫ পৃষ্ঠা, নওল কিশোর প্রেস।
[৩৪৬] মাআসিরুল উমারা, প্রথম খন্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা।
[৩৪৭] প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৯৩৬ পৃষ্ঠা।
[৩৪৮] খফি খান, ২য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা।
[৩৪৯] মিরআতে আহমদি, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।
[৩৫০] তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

এরপর গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বিগ্রাহ গুজরাটে অনেক সরাইখানা নির্মান করেন[৩৫১]। ৮৯৪ হিজরীতে সুলতান সিকান্দার লোদি সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনিও অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫২]

শেরশাহ ৯৫২ হিজরীতে দিল্লী থেকে লাহোরগামী সড়কে প্রতি দুই ক্রোশ পরপর সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫৩] এছাড়া তারীখে ফেরেশতার বিবরণ অনুযায়ী শেরশাহ যখন গ্রান্ড ট্রাংক রোড নির্মান করেন তখন এই সড়কের পাশে প্রচুর সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫৪]

সোনারগা থেকে সিন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়কে প্রায় তিনশো সরাইখানা ছিল। শের শাহের মৃতুর পর যখন সেলিম শাহ উত্তরাধিকারী হন তখন তিনিও প্রচুর সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫৫] মুঘল সম্রাট আকবরও অনেক সরাইখানা নির্মান করেছিলেন। আবুল ফজলের বক্তব্য থেকে একথার প্রমান মেলে।[৩৫৬]

এছাড়া আকবরের সভাসদদের অনেকেও সরাইখানা নির্মান করেছিলেন। শায়খ আব্দুর রহিম লখনভী নামে আকবরের এক সভাসদের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী স্বামীর স্মৃতির স্মরণে অনেক বাগান ও সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫৭]

সাদেক মুহাম্মদ খান নামে আকবরের এক আমির ধলপুরে বসবাস করতেন। এটি আগ্রার পাশে অবস্থিত একটি এলাকা। সাদেক মুহাম্মদ খান এখানে একটি মসজিদ ও সরাইখানা নির্মান করেন।

সম্রাট জাহাংগীর সিংহাসনে আরোহনের পর যে ফরমান জারী করেন তার ৩য় আদেশ ছিল, কেউ লা ওয়ারিশ মারা গেলে তার সম্পত্তি দিয়ে মসজিদ এবং সরাইখানা নির্মান করা হবে। এছাড়াও সম্রাটের আদেশ ছিল যেসব সড়কে ডাকাতি হয় সেসব স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মান করা।[৩৫৮]

জাহাংগীরের একজন সভাসদ শেখ ফরিদ মুর্তজা বোখারি অনেক সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৫৯] আমির আল্লাহ ওয়ার্দি খান ছিলেন সম্রাট জাহাংগিরের একান্ত সহচর। তিনিও একটি সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৬০] শাহজাহানের শাসনামলেও

---

[৩৫১] মিরআতে সিকান্দরি, ৭৫ পৃষ্ঠা।
[৩৫২] তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।
[৩৫৩] প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।
[৩৫৪] প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা।
[৩৫৫] প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।
[৩৫৬] আইনে আকবরি, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।
[৩৫৭] মাআসিরুল উমারা, ২য় খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা।
[৩৫৮] তুজুকে জাহাংগীরি, ৫ পৃষ্ঠা, নওল কিশর প্রেস।
[৩৫৯] মাআসিরুল উমারা, ২য় খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠা।
[৩৬০] প্রাগুক্ত, ৭৫৭ পৃষ্ঠা।

আমিররা অনেক সরাইখানা নির্মান করেন। আজম খান ইসলামাবাদে বেশকিছু সরাইখানা নির্মান করেন। নসরত জং বুরহানপুরে অনেক সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৬১]

তবে তখনো বেশকিছু সড়কে সরাইখানা নির্মান করা হয়নি। বিশেষ করে লাহোর থেকে কাবুলগামী সড়ক ও আওরংগাবাদ থেকে আকবরাবাদের পথে কোনো সরাইখানা ছিল না। এই পথে মুসাফিরদের অনেক কষ্ট হতো। আলমগীর ক্ষমতায় এসে এসব সড়কে অনেক সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৬২] অন্যান্য মুঘল বাদশাহরা যেমন শাহ আলম, মুহাম্মদ শাহ প্রমুখ অনেক সরাইখানা নির্মান করেন।[৩৬৩]

সাধারনত এসব সরাইখানার সাথে মসজিদ নির্মান করা হতো। কখনো কখনো সরাইখানার পাশে বাজার বসতো। এমনকি একে ঘিরে গ্রামও আবাদ হতো। সরাইখানা সাধারনত রাস্তার পাশে নির্মান করা হতো। পথিকরা অর্থের বিনিময়ে এখানে খাবার গ্রহন করতো ও রাত্রীযাপন করতো।

মেহমানখানা

মেহমানখানা নির্মান করা হতো শহরে। এসব মেহমানখানায় যে কেউ তিনদিন অবস্থান করে খাবার গ্রহন করতে পারতো। এরজন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে হতো না। সাধারনত মেহমানখানার জন্য আলাদা কোনো ভবন নির্মান করা হতো না। সুফিদের খানকাহগুলোকেই এই কাজে ব্যবহার করা হতো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মেহমানদের থাকার জন্য দিল্লী ও ফিরোজাবাদে ১২০ টি খানকাহ নির্মান করেন। এসব মেহমানখানার দেখভালের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার বেতন দেয়া হতো।[৩৬৪]

আযমগড়ে একটি খানকাহ নির্মান করা হয়। যার নামানুসারে সেখানে খানকাহ নামে একটি বসতি গড়ে উঠে।

লংগরখানা[৩৬৫]

সুলতান মাহমুদ খিলজি মালোয়াহ শহরে প্রচুর লংগরখানা নির্মান করেন। এসব লংগরখানা থেকে দরিদ্র ও দুস্থদের খাবার দেয়া হত।[৩৬৬]আলাউদ্দিন সাইয়েদ

---

[৩৬১] প্রগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।

[৩৬২] আলমগীরনামা, ৭৬৫ পৃষ্ঠা।

[৩৬৩] মুন্তাখাবুল লুবাব, ৯৩৬ পৃষ্ঠা।

[৩৬৪] তারীখে ফিরোজশাহী, ২য় খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

[৩৬৫] লংগরখানয় দরিদ্র ও ফকিরদের বিনামূল্যে শুকনো কিংবা রান্না করা খাবার দেয়া হতো। –অনুবাদক।

[৩৬৬] তারীখে ফেরেশতা, ২য় খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

হুসাইন মক্কি বাংলায় অনেক লংগরখানা খোলেন। এসব লংগরখানার জন্য কিছু গ্রাম ওয়াকফ করে দেয়া হয়।
বিখ্যাত সুফী সাধক নুর কুতবুল আলমের খানকাহ সংলগ্ন লঙ্গরখানার জন্য গ্রাম ওয়াকফ করা হয়।[৩৬৭] সম্রাট জাহাংগীর আহমেদাবাদ , এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর ইত্যাদী শহরে অনেক লংগরখানা নির্মান করেন।[৩৬৮] এসব লংগরখানা সারা বছর খোলা থাকতো।
এছাড়া কোথাও দুর্ভিক্ষ হলে সেখানে অস্থায়ী কিছু লংগরখানা খোলা হতো যা দুর্ভিক্ষ শেষে বন্ধ করা হতো। গুজরাটে সুলতান বাহাদুর শাহর আমলে দুর্ভিক্ষ হলে তিনি সেখানে কিছু অস্থায়ী লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬৯] সম্রাট শাহজাহানের আমলে গুজরাটে দুর্ভিক্ষ হলে বোরহানপুর ও আহমেদাবাদে অনেক অস্থায়ী লংগরখানা খোলা হয়।[৩৭০]
শাহজাহানের শাসনামলে পাঞ্জাবে তীব্র দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। লোকজন বাধ্য হয়ে নিজের সন্তানদের বিক্রি শুরু করে। সম্রাট এ সংবাদ জানতে পেরে দশটি লংগখানা খোলার নির্দেশ দেন। প্রতিটি লংগরখানায় দৈনিক দুশো রুপি খরচ করা হত। কাশ্মিরে দুর্ভিক্ষ হলে শাহজাহান সেখানে কইয়েকটি লংগরখানা খোলেন।
আলমগীরের শাসনামলে দুর্ভিক্ষ হলে তিনি রাজধানীতে বেশকিছু লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আমিররাও লংগরখানা খুলতেন। মীর জুমলা এমন কিছু লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৭১]

অসহায় ও দুস্থদের সাহায্যের বিভিন্ন পদ্ধতি

মুসলমান শাসকরা গরীব ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য নানা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসনকালে (৬৬২ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহন করেন) ফখরুদ্দিন নামে একজন আমীর ছিলেন যাকে মালিকুল উমারা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি প্রতিবছর প্রায় এক হাজার দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন।[৩৭২]
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দরিদ্র মেয়েদের সাহায্যের জন্য একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানের আদেশ ছিল যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে আছে এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে বিয়ে দিতে পারছে না, তারা এই বিভাগে এসে

---

[৩৬৭] রিয়াজুস সালাতিন, ১৩৫/১৩৬ পৃষ্ঠা।
[৩৬৮] তুজুকে জাহাংগিরী, ৩৬, ১০০ পৃষ্ঠা।
[৩৬৯] তারীখে ফেরেশতা, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।
[৩৭০] বাদশাহনামা, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।
[৩৭১] মাআসিরুল উমারা, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।
[৩৭২] তারীখে ফিরোজশাহী, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

নিজের কথা জানাবে। দায়িত্বশীল কর্মকর্তা খোজখবর নিয়ে তাদের আর্থিক সাহায্য করবেন। এই বিভাগ থেকে তিন স্তরের ভাতা দেয়া হতো।

- ৫০ তংকা
- ৩০ তংকা
- ২৫ তংকা

এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর দরিদ্র ও অসহায় মেয়েরা এবং বিধবা নারীরা প্রচুর আর্থিক সাহায্য লাভ করে।[৩৭৩]
আকবরের শাসনামলে শায়খ ফরিদ মুরতাজা খান বোখারী গুজরাটের দরিদ্র মেয়েদের একটি তাল্কা করে তাদের বিয়ের খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় করেন। তিনি দরিদ্র গর্ভবতী মেয়েদের জন্যেও ভাতার ব্যবস্থা করেন।[৩৭৪]
সুলতান মাহমুদ শাহ বাহামনি দৌলতাবাদ, কান্দাহার, ইবলিচপুর, খায়বার, গুলবর্গা, জিউল ইত্যাদী এলাকায় ইয়াতিমদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি অন্ধদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেন।[৩৭৫]
সুলতান সিকান্দার লোদি বছরে দুবার দরিদ্রদের তালিকা করে তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন।[৩৭৬] সুলতান ইবরাহিম লোদিও তার শাসনামলে পিতার কাজের ধারা চালু রাখেন। সুলতান মাহমুদ খান গুজরাটে অনেক কর্মচারী নিয়োগ করেন যাদের কাজ ছিল দরিদ্রদের তালিকা করে তাদের সাহায্য করা এবং মুসাফিরদের খাবারের ব্যবস্থা করা।
সম্রাট জাহাংগীরের শাসনামলে কাশ্মীরে তীব্র শীত শুরু হয়। সম্রাট এ সময় একটি গ্রাম ওয়াকফ করে দেন। যার আয় দ্বারা দরিদ্রদের শীতের কাপড় দেয়া হয় এবং মসজিদে গরম পানির ব্যবস্থা করা হয়।[৩৭৭] সম্রাট আলমগীর প্রতি শীতে আহমেদাবাদে দেড় হাজার কম্বল ও দেড় হাজার শীতের বিতরন করার আদেশ দেন।[৩৭৮] বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান দরিদ্র ও বিধবা নারীদের আর্থিক সাহায্য করতেন।[৩৭৯] এছাড়া বিভিন্ন সময় সুলতান ও আমীররা নানাভাবে দান খয়রাত করতেন যার বিবরন ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় পাতায় আজো বিদ্যমান।

---

[৩৭৩] প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।
[৩৭৪] মাআসিরুল উমারা, ২য় খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠা।
[৩৭৫] তারীখে ফেরেশতা, ১ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।
[৩৭৬] প্রাগুক্ত, ১৮৬ পৃষ্ঠা।
[৩৭৭] তুজুকে জাহাংগিরী, ৩৫২ পৃষ্ঠা।
[৩৭৮] মিরআতে আহমদি, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা।
[379] রিয়াজুস সালাতিন, ২২২ পৃষ্ঠা।

বাংলায় মুসলিম শাসন : সুলতানী আমল

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ। নদীয়া।

দুপুর। নিজের প্রাসাদে মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব্যস্ত রাজা লক্ষণ সেন। আচমকা শোরগোলের শব্দ শোনা গেল বাইরে। শোরগোল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। রাজা খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে কী হচ্ছে দেখা দরকার। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো এক ভৃত্য। 'তুর্কিরা আক্রমণ করেছে।' কোনোমতে বললো সে। শুনে লক্ষণ সেন আতংকে কাঁপতে থাকেন। পণ্ডিতরা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তুর্কিরা নদীয়া জয় করবে। তাঁরা রাজাকে বলেছিলেন পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদস্থানে চলে যেতে। লক্ষণ সেন তাঁদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে রাজমহলের তেলিয়াগড় দুর্গে সেনা সমাবেশ করেন। কিন্তু পণ্ডিতরা ছিলেন আতংকিত। তাঁরা রাজাকে ছেড়ে একেকজন একেকদিকে চলে যান।

তুর্কিরা রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি চলে এসেছে, এর মানে হলো তারা তেলিয়াগড় দুর্গ জয় করে এসেছে। সুতরাং লক্ষণ সেনের আর কোনো আশা নেই। বৃদ্ধ রাজা দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে কী করতে হবে। এখুনি পালাতে হবে। তিনি প্রাসাদের পেছনদিকে চলে গেলেন। মৃত্যুভয়ে ভীত রাজা খালি পায়েই প্রাসাদ থেকে বের হলেন। নদীপথে রওনা হলেন রাজধানী বিক্রমপুরের দিকে।

২.

লক্ষণ সেনের ধারণা ভুল ছিল। তুর্কিরা তেলিয়াগড় দুর্গ জয় করে আসেনি। তারা এসেছিল ঝাড়খন্ডের দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করে। সেনাপতি বখতিয়ার খলজি, খাটো আকৃতি আর কুৎসিত চেহারার কারণে যিনি মুহাম্মদ ঘুরির সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে পারেননি, তিনি জানতেন লক্ষণ সেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। তাই তিনি তেলিয়াগড়ের পথ না ধরে ঝাড়খন্ডের জঙ্গল অতিক্রম করে নদীয়ার দিকে

অগ্রসর হন। তাঁর বাহিনীর পুরো অংশই পেছনে পড়ে যায়। তিনি ১৮ জন সেনাসহ নদীয়ায় এসে উপস্থিত হন। লোকসংখ্যা কম দেখে প্রথমে স্থানীয়রা তাঁদের ঘোড়া-ব্যবসায়ী মনে করেছিল। কিন্তু দ্রুতই বখতিয়ারের মূলবাহিনী এসে উপস্থিত হয়। রাজা আগেই পালিয়ে গেছেন, বখতিয়ারের বাহিনী কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি না হয়েই নদীয়া জয় করে ফেলে। তিনদিন পর বখতিয়ার নদীয়া থেকে আহরিত ধন-সম্পদ নিয়ে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে চলে যান। সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন।[৩৮০]

৩.

বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। অবশ্য বখতিয়ারের রাজ্যের সীমানা ছিল পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত। এর বাইরে বাংলার বিস্তৃত এলাকা তখনও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বখতিয়ার কোনো স্বাধীন শাসক ছিলেন না, তিনি নিজের জন্য সুলতান উপাধিও নেননি। বরং তিনি মুহাম্মদ ঘুরির নামে মুদ্রা চালু করেন। গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার খলজি রাজ্যশাসনের দিকে মনোযোগ দেন। এসময় তিনি মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। ঢেলে সাজান প্রশাসনিক কাঠামো।[৩৮১]

৪.

বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়। কিন্তু এটিই বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আগমন নয়। বাংলায় মুসলমানদের আগমন শুরু হয়েছে অনেক আগে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে। সম্প্রতি লালমনিরহাটে ৬৯ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হওয়ায় এই দাবি আরও শক্তিশালী হয়েছে। প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত, আরব ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলা অপরিচিত ছিল না। খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত আরব ভূগোলবিদদের (ইবনে খুরদাদবা, সুলাইমান তাজির, আল ইদ্রিসি) বইপত্রে চট্টগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসময় বাণিজ্যিক কারণে আরব ব্যবসায়ীরা বাংলায় সফর করতেন। প্রথমযুগের মুসলিমরা অন্তরে তীব্র দাওয়াতি স্পৃহা লালন করতেন। এইসকল আরব বণিককে নিছক ব্যবসায়ী ভাবলে ভুল হবে। ব্যবসার পাশাপাশি তাঁরা একইসাথে এককেজন মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠতেন। ফলে

---

[৩৮০] আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, ঢাকা।

[৩৮১] প্রাগুক্ত, ৮৪ পৃষ্ঠা।

তাঁদের মাধ্যমে বাংলার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। ড. এম এ রহিম ও ড. এনামুল হক মনে করেন, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরব বণিকরা বসবাসও করেছিলেন। এই দুই অঞ্চলের ভাষা ও রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা এই অনুমান ব্যক্ত করেন।[৩৮২] পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে খলিফা হারুনুর রশিদের আমলের একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে ড. এনামুল হক প্রাচীন বাংলায় মুসলমানদের আগমনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন[৩৮৩]। অর্থাৎ বখতিয়ারের আগমনের আগেও বাংলায় মুসলমানরা এসেছিলেন। এবং তাঁদের দ্বারা স্থানীয়রা অবশ্যই কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়েছিল।

৫.

বখতিয়ার খলজি মারা যান ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে। এর কিছুদিন আগে তিনি তিব্বতের ব্যর্থ অভিযান থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। বখতিয়ারের পর খলজিরা কিছুকাল বাংলা শাসন করেন। শুরুর দিকে তাঁরা দিল্লির সুলতানদের আনুগত্য করতেন। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে আলি মর্দান খলজি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান উপাধি নেন। তিনি ছিলেন লখনৌতির প্রথম স্বাধীন সুলতান। ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় বসেন ইওজ খলজি। তিনি জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন।

---

[৩৮২] বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক আকবর আলি খান এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তার মতে আরব বণিকেরা ছিল শাফেয়ী মাজহাবের সদস্য। সুতরাং তারা যদি এখানে বসতি স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই এখানে শাফেয়ী মাজহাবের প্রাধান্য পাওয়া যেত। (বিস্তারিত জানতে দেখুন- বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা- আকবর আলি খান। প্রথমা, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা)। আকবর আলি খান যে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এ বক্তব্য দিয়েছেন তা খুব দূর্বল। । আকবর আলি খান শাফেয়ি মাজহাবের কথা বলছেন। ইমাম শাফেয়ির জন্ম ১৫০ হিজরিতে। লালমনিরহাটে আবিষ্কৃত মসজিদের শিলালিপিতে এর প্রতিষ্ঠাকাল লেখা আছে ৬৯ হিজরি। অর্থাত ইমাম শাফেয়ির জন্মের প্রায় একশো বছর পূর্বেই বাংলায় মুসলিমরা এসেছে এমনকি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরিতে। ইমাম মালেকের জন্ম ৯৩ হিজরিতে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম ১৬৪ হিজরিতে। অর্থাৎ মাজহাবের ইমামদের জন্মের অনেক আগেই বাংলায় মুসলিমরা এসেছিল। সে সময় যেহেতু মাজহাব চতুষ্টয়ের জন্মই হয়নি তাই তাদের কোনো মাজহাবের অনুসারী হওয়ার কথা নয়। অপরদিকে মসজিদ নির্মান থেকেই বুঝা যায় বাংলায় তখন ক্ষুদ্র হলেও দু একটি মুসলিম বসতি অবশ্যই গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া শুরুর দিকে অনেকগুলো মাজহাব ছিল । ইমাম যাহাবি অন্তত ৪০ জন ইমামের কথা লিখেছেন, যাদের নিজস্ব মাজহাব ছিল, অনুসারীও ছিল (বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮ম খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা- ইমাম যাহাবী। মুআসসাতুর রিওসালাহ, বৈরুত) । দেখা গেল প্রথমদিকে অনেকগুলো মাজহাবের প্রাধান্য ছিল। তাদের অনুসারীও ছিল। সুতরাং আরব বণিকরা বসতি স্থাপন করলে সবাইই শাফেয়ি হবে এটা বেশ কষ্টকল্পনা।

[৩৮৩] আবদুল করিম অবশ্য তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে এই মুদ্রা অনেক পরে কেউ নিয়ে এসেছিল। দেখুন, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ৬২ পৃষ্ঠা।

তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় নৌবাহিনী গঠন করেন। নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। এসবের পাশাপাশি রাজ্যবিস্তারেও মনোনিবেশ ছিল তাঁর। চারদিকে নিজের রাজত্বের সীমানা খানিক বৃদ্ধি করেন। তিনি তাঁর পূর্বের শাসক আলি মর্দান খলজির মতো স্বাধীন শাসক ছিলেন। দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশ বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুতমিশ লখনৌতি আক্রমণ করেন। যুদ্ধ শেষে দুপক্ষে সন্ধি হয়। ইওজ খলজি ইলতুতমিশের বশ্যতা স্বীকার করলেও ইলতুতমিশ ফিরে গেলে তিনি আবার নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন।
১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করলে ইওজ খলজি পরাজিত ও নিহত হন। আবদুল করিমের মতে, তিনি লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিল্লির সুলতান বৈরীভাব পোষণ না করলে তিনি হয়তো সফল হতেন।[৩৮৪]

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন। লখনৌতি আবারও দিল্লির অধিনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লির অধীনে শাসিত হতে থাকে। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খান লখনৌতিতে স্বাধীন বলবনি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। আবারও লখনৌতি দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় বসেন বুগরা খানের ছেলে রুকনুদ্দিন কায়কাউস। তিনি রাজত্বের সীমানা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। জয় করেন হুগলি জেলার ত্রিবেনী। পরবর্তী শাসক শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ এই সীমানা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি সোনারগাঁ জয় করেন। ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁ টাকশাল থেকে উতকীর্ণ একটি মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি ময়মনসিংহ ও সিলেট জয় করেন। সিলেট অভিযানকালে তাঁর সাথে বিখ্যাত সুফি ব্যক্তিত্ব শাহ জালাল মিলিত হন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজশাহের সময় একদিকে রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছিল অপরদিকে এসময় বাংলায় ইসলাম প্রচারের গতিও বেড়ে যায়। বিশেষ করে হজরত শাহজালালের কারণে সিলেট অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। দিল্লিতে তখন চলছিল ক্ষমতার পালাবদল। খলজিদের পতনের পর ক্ষমতায় আসে তুঘলকরা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক। ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লখনৌতি আক্রমণ করেন। তিনি বাংলাকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করেন–লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁ। প্রতিটি প্রদেশে পৃথক গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁর গভর্নর বাহরাম খান মারা গেলে তাঁর বর্মরক্ষক

[৩৮৪] আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.), ২৯ পৃষ্ঠা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ স্বাধীন সোনারগাঁ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। চট্টগ্রাম জয় করেন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি সড়কও নির্মাণ করেন।

৬.

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ। সে বছর লখনৌতির শাসক আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসলেন হাজি ইলিয়াস। সিংহাসনে বসে তাঁর নাম হলো শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি ইলিয়াস শাহি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ প্রায় ৭০ বছর বাংলা শাসন করেছিল।

শুরুতে ইলিয়াস শাহ শুধু লখনৌতির শাসক ছিলেন। সোনারগাঁ শাসন করতেন স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ। সাতগাঁও শাসন করতেন দিল্লির অনুগত গভর্নর। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ সাতগাঁও আক্রমণ করে দখলে নেন। সেখানে নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁ আক্রমণ করে ইখতিয়ারুদ্দিন গাজিশাহকে পরাজিত করেন। এর ফলে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার শাসক হন। এর আগে আর কেউ পুরো বাংলার সুলতান হতে পারেননি। তাঁরা ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের শাসক। ইলিয়াস শাহের আমল থেকেই এই অঞ্চল বাংগালা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। দিল্লির ঐতিহাসিকরাও তাঁকে শাহ-ই-বাংগালা, সুলতান-ই-বাংগালা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করে অনেক ধনসম্পদ অর্জন করেন। পাশাপাশি কামরুপ, উড়িষ্যা ও বাহরাইচ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলার অভিযানে আসেন। ইলিয়াস শাহের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু যুদ্ধ হয়। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন ছাড়াই ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লি ফিরে যান। ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সিকান্দার শাহ ক্ষমতায় বসেন। সিকান্দার শাহ অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক দ্বিতীয় বার বাংলা আক্রমণ করেন এবং ব্যর্থ হন। ৩১ বছরের রাজত্ব শেষে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এক লড়াইয়ে তিনি নিহত হন।

১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মসনদে আসীন হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ। তিনি ছিলেন সিকান্দার শাহের ছেলে এবং ইলিয়াস শাহের নাতি। উদার, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ একজন সুশাসক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। যৌবনে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও আবদুল করিমের মতে, তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার। একজন কবি ও বিদ্বান ছিলেন তিনি। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্র-যোগাযোগ ছিল। ছিলেন বিখ্যাত সুফি-বুজুর্গ নুর কুতবুল আলমের

সহপাঠি। মক্কা-মদিনায় লোক পাঠিয়ে মাদরাসা, মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেন তিনি। বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৭.

১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে হত্যা করা হয়। এই হত্যায় গনেশ নামে তাঁর একজন হিন্দু সভাসদের হাত ছিল। গনেশ ক্ষমতায় বসায় নিহত সুলতানের ছেলে হামজাহ শাহকে। দুবছর পর, ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে গনেশ তাঁকেও হত্যা করে। এর সাথে বাংলায় ইলিয়াস শাহি শাসনের অবসান হয়। এই বংশের অবদান হলো তাঁরা বাংলাকে এক রাজদন্ডের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। সীমানাও বিস্তৃত করেছিলেন।

৮.

১৪১২ থেকে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ–এই তিনবছর একজন ক্রীতদাস বাংলা শাসন করেছিলেন। তাঁর নাম শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ। ১৪২৫ সাতলে তাঁকে হত্যা করে গনেশ সরাসরি ক্ষমতায় বসে। এর ফলে দুশো বছর ধরে চলা মুসলিম শাসনের অবসান হয় এবং হিন্দু শাসনের সূত্রপাত হয়। রিয়াজুস সালাতিন-রচয়িতার বক্তব্য অনুসারে, গনেশ ক্ষমতায় বসেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করে। অনেককে সে হত্যা করে। বাধ্য হয়ে শায়েখ নুর কুতবুল আলম জৌনপুরের শাসক ইবরাহিম শর্কির কাছে পত্র লিখে গনেশের অত্যাচার সম্পর্কে জানান। সুলতান ইবরাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করতে এগিয়ে এলে গনেশ সিংহাসন ছেড়ে দেয়। তার পুত্র যদুকে ক্ষমতায় বসায়। যদু নুর কুতবুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জালালুদ্দিন। জালালুদ্দিনকে ক্ষমতায় বসানোর কারণে ইবরাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ না করেই ফিরে যান। তিনি ফিরে যেতেই গনেশ আবার ক্ষমতায় বসে যায়। একটি বর্ণনামতে জালালুদ্দিনকে গনেশ বন্দী করে রাখে।

বাংলায় হিন্দু রাজত্বের সময়কাল আরও বাড়তে পারত, কিন্তু ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে গনেশের মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন আবার ক্ষমতায় বসেন। তিনি রাজধানী গৌড়ে সরিয়ে নেন। মিসরের খলিফার কাছ থেকে সনদ নেন। গনেশ কর্তৃক নির্বাসিত শায়েখ জাহেদকে ফিরিয়ে আনেন। এছাড়া জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। তিনি চিন, মিসরে দূত পাঠান। তৈমুর লং-এর ছেলে শাহরুখের সাথেও যোগাযোগ করেন। একজন শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন যথার্থ। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শামসুদ্দিন আহমাদ

শাহ তিন বছর রাজত্ব পরিচালনা করে। ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ক্ষমতায় আরোহণ করেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহি পরিবারের সদস্য। সুতরাং তাঁদের এই শাসনামলকে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি শাসনামল বলা যায়। তাঁর শাসনামলে খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় খান জাহান বাগেরহাট জয় করেন। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর মৃত্যর পর ক্ষমতায় বসেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। একজন শাসক ও সেনাপতি হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ত্রিহুত ও বরিশাল জয় করেন। ১৪৭৪ খ্রিষ্টা ব্দে তিনি মারা যান। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তি ইলিয়াস শাহদের হটিয়ে হাবশিরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। চারজন হাবশি সুলতান ৬ বছর বাংলা শাসন করেন। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের হটিয়ে হোসেন শাহি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৯.

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রজাদরদি শাসক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নসরত শাহ ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহের আক্রমণে গৌড়ের পতন হয়। হোসেন শাহি বংশকে সরিয়ে এবার ক্ষমতায় আসে আফগানরা। বাংলায় সূচনা হয় আফগান শাসনের। শেরশাহের বাংলা বিজয়ের সংবাদ শুনে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ভারত থেকে পালাতে বাধ্য হন। শেরশাহ দিল্লির মসনদে বসেন। বাংলাকে পরিণত করেন দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে। খিজির খানকে বাংলার গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়।

শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের শাসনামলেও বাংলা ছিল দিল্লির নিয়ন্ত্রণাধীন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শামসুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ বাংলার মসনদে বসেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা দেন। এরপর তাঁর বংশের কয়েকজন শাসক শাসন করেন। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানি গৌড় জয় করেন। তিনি কয়েকমাস শাসন করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন তাঁর ভাই সোলাইমান কররানি। দিল্লিতে ততদিনে মুঘলরা নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে। সম্রাট হুমায়ুন ফিরে এসে মারা গেছেন। ক্ষমতায় বসেছেন তরুন সম্রাট আকবর। সোলাইমান কররানি আকবরকে ক্ষেপিয়ে তোলার পরিবর্তে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। তাই প্রথমদিকে আকবরও এদিকে আগ্রহ দেখাননি। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে

তিনি মারা গেলে তাঁর ছেলে দাউদ খান কররানি ক্ষমতায় বসেন। তাঁর সময়ে আকবরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বাংলার দিকে।
এদিকে দাউদ খান কররানিও নিজের নামে মুদ্রা ও খুতবা চালু করেন। ফলে আকবরের মেজাজ বিগড়ে যায়। দাউদ খানকে পরাস্ত করতে মুগল বাহিনী এগিয়ে আসে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে আফগানরা মুঘলদের মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে মুঘলরা জয়ী হয়। দাউদ খান কররানিকে হত্যা করা হয়। সমাপ্ত হয় সাড়ে তিনশো বছর ধরে চলা সুলতানি আমলের। সূচনা হয় মুঘল শাসনামলের। অবশ্য রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করেই মুঘলরা পুরো বাংলায় নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি। সেজন্য তাদেরকে আরও অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[৩৮৫]

[৩৮৫] প্রাগুক্ত, ৫০-১২২ পৃষ্ঠা।

ইতিহাসের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রশ্নোত্তর পর্ব – ১

হাম্মাদ রাগিব, ঢাকা।

প্রশ্ন- খলিফা হারুনুর রশিদের একজন পুত্রের কথা শোনা যায়। তিনি নাকি দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। এর সত্যতা কতটুকু?

উত্তর- খলিফা হারুনুর রশিদের একজন ছেলের গল্প বেশ প্রসিদ্ধ। ওয়াজ মাহফিলে এই ঘটনা বেশ শোনা যায়। কিছু অনির্ভরযোগ্য বইপত্রেও এই ছেলের উল্লেখ আছে। তাকে ঘিরে গল্পটা এমন, 'হারুনুর রশিদের একজন ছেলে হঠাত করেই দুনিয়াবিমুখ হয়ে যান। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর সন্ধান মেলে। দেখা যায় তিনি এক এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন। তিনি সপ্তাহে একদিন কাজে আসেন। বাকি ছয়দিন ইবাদত করেন। তাকে রাজদরবারে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি আসেননি। কেউ কেউ এর সাথে যোগ করেন, তিনি দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। তারপর ইটকে ইশারা করতেন, ইট এসে দেয়ালে বসে যেত। এভাবে অন্যদের এক সপ্তাহের কাজ তিনি একদিনেই করতেন।

এবার দেখা যাক এর ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু।

ঐতিহাসিক ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ খলিফার এই পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু কাসির যা লিখেছেন তাঁর সারাংশ হলো, খলিফার এই পুত্রের নাম ছিল আহমাদ আস সাবতি। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, যাহেদ। তিনি মাটি কেটে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একটি বেলচা আর খেজুর পাতার ঝুড়ি ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। সপ্তাহে শুধু শনিবার তিনি কাজ করতেন। এক দিরহাম ও এক দানেক (এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ) গ্রহণ করতেন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলি এই অর্থ ব্যয় করে কাটাতেন। এ সময় নিজেকে ইবাদতে ব্যস্ত রাখতেন। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী যুবাইদার সন্তান। তবে সঠিক তথ্য হলো তিনি খলিফার অন্য একজন স্ত্রীর সন্তান। খলীফা হওয়ার পূর্বে হারুনুর রশিদ একজন নারীর প্রেমে পড়েন। তিনি গোপনে তাকে বিবাহ করেন। এই নারীর গর্ভেই আহমাদ আস সাবতি জন্মগ্রহণ করেন। খলিফা তাঁর স্ত্রীকে লাল ইয়াকুতের একটি আংটি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে বসরায় পাঠিয়ে দেন। তাকে বলা ছিল হারুনুর রশিদ সিংহাসনে আরোহন করলে তিনি যেন ফিরে আসেন। কিন্তু এই নারী আর ফিরে আসেননি। তাঁর সন্ধানও পাওয়া যায়নি। হারুনের কাছে

সংবাদ এসেছিল মা-সন্তান দুজনই মারা গেছেন। কিন্তু আহমাদ আস সাবতি মারা যাননি। তিনি একা বসবাস করতেন। তিনি জানতেন তিনি খলিফার পুত্র। কিন্তু তবু তিনি কখনো খলিফার সাথে যোগাযোগ করেননি। তিনি মূলত রাজদরবার থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে একজনকে লাল ইয়াকুতের আংটি দিয়ে বলেন, আমার মৃত্যুর পর এটি নিয়ে খলিফার কাছে যাবে। তাকে এটি দিবে। তারপর তাকে বলবে, এই আংটির মালিক আপনাকে বলেছেন, এই নেশাগ্রস্ত (পার্থিব ভোগবিলাসের নেশা) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে সতর্ক হোন, অন্যথায় অনুতপ্ত হবেন। এরপর তিনি মারা যান।

তাকে দাফনের পর সেই ব্যক্তি খলিফার দরবারে আসে। খলিফা আংটি দেখেই চিনে ফেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন এই আংটির মালিক কোথায়? সেই ব্যক্তি বলে, তিনি মারা গেছেন। খলিফা চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। তারপর তাকে আহমাদ আস সাবতির কথা শোনানো হয়। খলিফা বিলাপ করে বলেন, হায় পুত্র, তুমি আমাকে নসিহত করে গেলে। এরপর তিনি আদেশ করেন তাকে পুত্রের কবরের কাছে নিয়ে যেতে। কবরের কাছে নেয়া হলে সারারাত তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং কাঁদতে থাকেন। এটি ছিল ১৮৪ হিজরির ঘটনা।[৩৮৬]

খলিফার এই পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন ইবনু খাল্লিকানও। তিনি লিখেছেন, আহমাদ বিন হারুনুর রশিদ প্রতি শনিবার উপার্জন করতেন। তাই তিনি সাবতি নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।[৩৮৭]

এছাড়াও খলিফার এই পুত্রের কথা ইবনু কুদামা মাকদিসি[৩৮৮], ইবনুল জাওযি[৩৮৯] ও সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সাফাদি[৩৯০] তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন।

---

[৩৮৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/৬২৭,৬২৮- হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির। মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা। ১৪১৯ হিজরি।

[৩৮৭] ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ১/১৬৮ - ইবনু খাল্লিকান। দার সাদের, বৈরুত। ১৩৯৮ হিজরি।

[৩৮৮] কিতাবুত তাওয়াবিন, পৃ-১৭২- ইবনু কুদামা মাকদিসি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৭ হিজরি।

[৩৮৯] আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ৯/৯৩- ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[৩৯০] আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, ৮/১৪৩ - সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সাফাদি। দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত। ১৪২০ হিজরি।

প্রশ্নোত্তর পর্ব – ২

আহমেদ রিজভি, ঢাকা।

প্রশ্ন- সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ইবনে তাইমিয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে শুনেছি। এ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর- দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১২৯০-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন এক বৈচিত্রময় চরিত্রের অধিকারী। প্রশংসা আর সমালোচনা ছিল তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী। তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে নানা অভিযোগ। সুফিদের উপর তিনি ছিলেন বেশ কঠোরহস্ত। আবার ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন বলেও লিখেছেন ঐতিহাসিকরা।

সুলতানের সমসাময়িক একজন মুসলিম মনিষী ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ)। মিসর ও দামেশকে তিনি দরস দিয়েছেন, নানা সংস্কারমূলক কর্মকান্ড শুরু করেছেন। বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। প্রশ্ন হলো, দিল্লির সুলতান ইবনে তাইমিয়া দ্বারা কোনোভাবে প্রভাবিত ছিলেন কিনা।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায় তারীখে ফিরোজশাহিতে। এটি লিখেছেন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী। তিনি সতেরো বছর মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সান্নিধ্যে ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি একইসাথে সুলতানের নিন্দা ও প্রশংসা দুটিই করেছেন। তবে এখানে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারার সাথে সুলতানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেননি তিনি।

এ সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায় মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার সফরনামায়। তিনি সুলতানের শাসনকালে দিল্লি সফর করেছিলেন।

ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় লিখেছেন, শায়খ আবদুল আযিয আরদবেলি একজন ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি দামেশকে ইবনে তাইমিয়ার কাছে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কাছে এলে সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। তারা বনু আব্বাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। সুলতান মুগ্ধ হয়ে তাকে চুম্বন করেন।[৩৯১]

---

[৩৯১] তুহফাতুন নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আসফার, পৃ-৪৬৬ – ইবনে বতুতা। দার ইহইয়ায়িল উলুম, বৈরুত। ১৪০৭ হিজরি।

এই বর্ননা থেকে ইবনে তাইমিয়ার একজন ছাত্রের সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাক্ষাতের প্রমান মেলে। এই সাক্ষাতের ফলে সুলতান কর্তৃক ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে সুলতানের কৌতুহলী মন ও জ্ঞানপিপাসার কথা মাথায় রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ইতিহাস গবেষক শেখ মুহাম্মদ ইকরাম মনে করেন, আবদুল আযিযের মাধ্যমে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা অবশ্যই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কানে পৌছেছিল।[৩৯২] প্রফেসর খলিক আহমাদ নিজামিও এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি শায়খ আবদুল আযিয আরদবেলির সাথে সুলতানের সম্পর্কের কথা উল্লেখের পর লিখেছেন, ইবনে তাইমিয়ার জীবনকালেই তাঁর লিখিত বইপত্র মিসর থেকে চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এটা খুবই স্বাভাবিক মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত জ্ঞানপিপাসু সুলতান এইসব বইপত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দিল্লির সুফিদের সাথে সুলতান যে আচরণ করেছেন, গভীরভাবে দেখলে এর সাথে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার যথেষ্ট মিল দেখা যায়।[৩৯৩]

শিরক বিদাতের উপর মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কঠোরহস্ত হওয়ার জন্য ইবনে তাইমিয়ার ছাত্রদের ভূমিকা আছে বলে মন্তব্য করেছেন আকবর শাহ নজিবাবাদিও।[৩৯৪]

---

[৩৯২] আবে কাউসার, ৪১১- শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম। ইদারা সাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর।

[৩৯৩] সালাতিনে দিহলি কি মাজহাবি রুজহানাত, পৃ- ৩৩৬ - প্রফেসর খলিক আহমাদ নিজামি। নদওয়াতুল মুসান্নেফিন, দিল্লি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

[৩৯৪] আইনায়ে হাকিকতনুমা, পৃ- ৪৮০ – আকবর শাহ নজিবাবাদি । শাইখুল হিন্দ একাডেমি, দেওবন্দ, ২০১৩।

প্রশ্নোত্তর পর্ব — ৩

মাওলানা খালেদ হোসাইন, নরসিংদী।
-মুফতি কাজি ইবরাহিম সাহেবের এক বক্তব্যে দেখলাম তিনি বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনকে মুসলিম বলছেন। তার ভাষ্যমতে নিউটন 'ক্ষুরধার' তাওহিদবাদী ছিলেন। আল্লাহর উপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। মুফতি সাহেব আরো কিছু বিচিত্র তথ্য জানানোর পর রেফারেন্স হিসেবে জিহাদ তুরবানির লেখা 'মিয়াতুম মিন উজামাই উম্মাতিল ইসলাম গায়্যারু মাজরাত তারিখ' বইটির নাম বলেছেন। এই বইটি সম্পর্কে জানতে চাই। বইটি কি নির্ভরযোগ্য?
-
উত্তর- জিহাদ তুরবানির বইটি বছরখানেক আগে পড়েছি। বইটি সাধারণ পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয়। পরিচিত অনেককেই দেখেছি তারা এই বই পড়েন, অন্যকেও সাজেস্ট করেন। ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকের সাথে বিভিন্ন সময় বইটি নিয়ে আলাপ করেছি, এর বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু কাজি ইবরাহিম সাহেবের মত প্রবীন একজন আলেম যখন এই বইকে প্রমোট করেন তখন বইটি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা আবশ্যক।
জিহাদ তুরবানি একজন ফিলিস্তিনি কবি ও লেখক। তার লেখা 'ইন্নানাল আবতাল' নাশিদটি তাঁকে পরিচিত করেছে বিশ্বব্যাপী। এছাড়া 'মিয়াতুম মিন উজামা' বইটিও তাঁকে এনে দিয়েছে তুমুল খ্যাতি। বইটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে জিহাদ তুরবানির অপূর্ব লিখনশৈলির কারণে। বইটির প্রতি যারা মুগ্ধ তারা সাধারণত এর লিখনশৈলী দ্বারাই প্রভাবিত হন, এর বিষয়বস্তু ও তথ্যের বিশুদ্ধতার দিকে তাদের নজর কম থাকে।
বইটির নামের সাদামাটা অর্থ হলো 'মুসলিম উম্মাহর একশো মনীষী যারা ইতিহাসের গতিধারা বদলে দিয়েছিলেন'। স্বাভাবিকভাবে এই বইতে মুসলিমদের জীবনি আলোচনা করা হবে এটাই স্বাভাবিক। বইয়ের ভূমিকাতেও তুরবানি লিখেছেন, তিনি মাইকেল এইচ হার্টের দ্যা হান্ড্রেড বইটি দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছেন। তাই তিনি চেয়েছেন এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যেখানে মুসলিম

উম্মাহর শ্রেষ্ঠ একশো মনিষীর নাম থাকবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো তুরবানি তার এই বইতে কয়েকজন অমুসলিমকে মুসলিম বলে চালিয়ে দিয়েছেন, এমনকি তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
জিহাদ তুরবানি তার বইতে আরইউসকে মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার মৃত্যু ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে। আলেমদের মতে তিনি তাওহিদবাদী (মুওয়াহহিদ) ছিলেন না। মুসলিমও ছিলেন না। যেসব গ্রন্থে আরইউসের মুসলিম হবার বিষয়টি নাকচ করা হয়েছে তা হলো

১। আল জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ- ইমাম ইবনু তাইমিয়া
২। শারহু মুসলিম- ইমাম নববী।
৩। ফাতহুল বারি- ইবনু হাজার আসকালানি।
৪। হিদায়াতুল হায়ারা- ইবনুল কায়্যিম।
জিহাদ তুরবানি তার স্বপক্ষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস ব্যবহার করেছেন। সম্রাট হিরাকলের কাছে লেখা পত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরিসিয়্যিনদের কথা বলেছেন। এই আরিসিয়্যিনরা কারা তার ব্যখ্যা মুহাদ্দিসগন দিয়েছেন। কিন্তু তুরবানি সে ব্যখ্যা না নিয়ে নিজের মনগড়া ব্যখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। এখানে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। এ বিষয়টি ফাতহুল বারি ৯ম খন্ডের ৭৩২ পৃষ্ঠা থেকে পড়ে নিতে পারেন।
জিহাদ তুরবানি তার এই বইতে বিখ্যাত চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ সাবিত বিন কুররার আলোচনা করেছেন। তাকেও মুসলিম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অথচ সে ছিল তারকা পূজারী। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী লিখেছেন, সে ছিল ইরাকে তারকা পূজারীদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সে এবং তার পুত্ররা গোমরাহী নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/৪৮৫)। ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, সারাজীবন সে তারকাপূজা করেই বেঁচে ছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৮৫)
জিহাদ তুরবানির এই বইতে অমুসলিমদেরকে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে উপস্থাপনের প্রবনতা এতই প্রকট যে তিনি আবরাহাম লিংকনকেও মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নামের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। বিষয়টি এতই হাস্যকর যে এ নিয়ে কিছু বলারও প্রয়োজন নেই।
জিহাদ তুরবানি তার বইতে ইতিহাসকে মুখরোচক করার জন্য প্রচুর বানোয়াট গল্প সাজিয়েছেন। এতে বইয়ের আলোচনা রসালো হলেও হারিয়েছে গ্রহনযোগ্যতা। ক্ষুদ্র পরিসরে তার সবগুলো বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। একটু

সচেতনতার সাথে পড়লে পাঠক নিজেই টের পাবেন তার বইয়ের দূর্বলতাগুলো। খাইরুদ্দিন বারবারোসার জীবনিতে তুরবানি আন্দালুসে বারবারোসার একটি অভিযানের কথা লিখেছেন অনেকটা স্পাই থ্রিলারের মত বর্ননা দিয়ে। বারবারোসার স্পেন অভিযান সত্য হলেও তুরবানি যে ঘটনার বর্ননা দিয়েছেন তা ইতিহাসের বইপত্রে অনুপস্থিত। আবদুল করিম খাত্তাবির জীবনিতে তার মিসর গমনের যে গল্প লিখেছেন সেটিও বানোয়াট। জিহাদ তুরবানি তার লেখায় সরাসরি কোনো বইয়ের রেফারেন্স দেননি। তবে বইয়ের শেষে তথ্যসুত্র হিসেবে অনেকগুলো বইয়ের নাম দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, তার লেখায় তিনি সেসব বইতে থাকা তথ্যের বিপরীত তথ্যই উপস্থাপন করেছেন।
মোটকথা, জিহাদ তুরবানির বইটি নির্ভরযোগ্য নয়। এতে প্রচুর ভুল, বানোয়াট ও বিকৃত তথ্য আছে। গবেষক মুসা ইসমাইল সাফাদি এই বইয়ের ভূল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম সিলসিলাতু গায়াতিল ইতকান ফির রদ্দি আলা মুদাল্লিসি আখবারিজ জামান। বিস্তারিত জানতে এই বইটি পড়া যেতে পারে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর শহীদ টিপু সুলতান

ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর শহীদ টিপু সুলতান
লেখক : মুহাম্মদ ইলয়াস নদভী
অনুবাদক : আবদুল্লাহ আল ফারুক
প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার
মূল্য : ৫০০ টাকা
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
টিপু সুলতান সেই স্বদেশপ্রেমী, সাহসি শাসক ও সমরবিদের নাম, যিনি বলেছিলেন, 'শৃগালের মতো একশো বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম'। সারাজীবন তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইংরেজের করুণা ভিক্ষার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীরংগাপত্তনামে ৪ মে ১৭৯৯ ঈসাব্দে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন।

.টিপু সুলতানের জীবনী নিয়ে অনেক বইপত্র রচিত হয়েছে। মুসলিম, অমুসলিম উভয়প্রকার ঐতিহাসিকরাই কলম ধরেছেন। কেউ আঁধার সরিয়ে আলো খুঁজেছেন, আবার কেউ চেষ্টা করেছেন অহেতুক ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে।

.তাকে নিয়ে যেসব বইপত্র রচিত হয়েছে তাতে একজন শাসক ও সমরবিদ টিপুর কথাই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলী নদভীর ভাষায়, 'এমন কোনো গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়েনি- যেখানে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাঁর দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুন্নত প্রতিষ্ঠার নানামাত্রিক প্রয়াস এবং জিহাদের ময়দানে তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে'। .এমন একটি গ্রন্থ রচনা ছিল সময়ের দাবি, যাতে এক মলাটে টিপুর জীবনের সমস্ত দিক আলোচনা করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছেন টিপু সুলতানের দেশের মানুষ, নদওয়াতুল উলামা লখনৌর কৃতী সন্তান, মুহাম্মদ ইলয়াস নদভী। তার জন্ম দক্ষিনাত্যের ঐতিহাসিক নগরী ভাটকালে।

.১৯৯২-১৯৯৬, এই চার বছর ধরে লেখক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন টিপু সুলতানের জীবনী লেখার জন্য। প্রকাশিত, অপ্রকাশিত বইপত্র ও ঐতিহাসিক দলিলসমূহের সাহায্য নিয়ে তিনি বইটি রচনা সমাপ্ত করেন।
মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি একটি ভূমিকাও লিখে দেন। এ বই

বিস্তারিত পড়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক খলীক আহমদ নিজামিও একটি ভুমিকা লিখে দেন।

.বইটি মোট ২৫টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। লেখক প্রথমে হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। তারপর মহিসুর ও এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের আলোচনা করেছেন। দিয়েছেন টিপুর পূর্বপুরুষদের বিবরণ। টিপুর পিতা হায়দার আলী সম্পর্কেও আছে বিস্তারিত আলোচনা। এরপর তুলে ধরেছেন টিপুর জীবনের নানাদিক। একের পর এক যুদ্ধ, চুক্তি আর গাদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা লেখক আলোচনা করেছেন নির্মোহভাবে। গাদ্দারদের পরিচয় ও তাদের নির্মম পরিণতি নিয়ে সপ্তদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে টিপুর বিশ্বস্ত সহচরদের পরিচয় নিয়ে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শ্রীরংগপত্তনম পতনের কারণ, ভারতবর্ষ ও মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে মুসলিম ধর্মপ্রচারক, আলেম ও দক্ষ শাসক হিসেবে টিপু সুলতানের ভূমিকা নিয়ে । এখানে পাঠক সুলতান টিপুর নানাবিধ পরিচয়ের সঙ্গে পরিচিত হবেন। টিপু সুলতানের আমলে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও মহিসুরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়েও আছে বিশদ আলোচনা । জ্ঞানচর্চায় টিপুর আগ্রহ পাঠককে মুগ্ধ করবে। লেখক এমন ৪৫টি বইয়ের তালিকা দিয়েছেন যেগুলো টিপু স্বহস্তে লিখেছেন কিংবা কাউকে দিয়ে সংকলন করিয়েছেন। সুলতানের সেনাবাহিনীর বিন্যাসগুলো পাঠকের নজর কাড়বে। পাঠক পরিচিত হবেন অনেক প্রাচীন পরিভাষার সঙ্গে। বইয়ের শেষে বইয়ে আলোচিত অপরিচিত স্থানগুলোর নাম ও বর্তমান অবস্থানের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ কাড়বে।

.অনুবাদ প্রসঙ্গ :

বইয়ের অনুবাদক আবদুল্লাহ আল ফারুক। তার অনুবাদ সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। তার কর্মদক্ষতা ইতোমধ্যে বোদ্ধামহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তার সাবলীল অনুবাদের কারণে জীবনী নির্ভর এই বইটিও হয়ে উঠেছে সুখপাঠ্য। বইয়ের শেষে আর্ট পেপারে প্রায় পঞ্চাশটির বেশি ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। মূল বইয়ে এ ছবিগুলো ছিল না। এগুলো অনুবাদক যোগ করেছেন, যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। *দুঃখের বিষয় হলো এ বইতে 'ছাপাখানার ভূতে'র আনাগোনা একটু বেশিই চোখে পড়েছে। বিশেষ করে ঈসাব্দকে হিজরি লেখা কিংবা ইবনে আসীরকে 'আল্লাহ ইবনে আসীর' লেখা, খুবই দৃষ্টিকটু লেগেছে। আশা করি আগামী সংস্করণে এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে।*

আবুল হাসানাত নদভীর 'হিন্দুস্তান কী কদীম ইসলামী দরসগাহে'

বই: হিন্দুস্তান কী কদীম ইসলামী দরসগাহে
লেখক: আবুল হাসানাত নদভী
প্রকাশক: দারুল মুসান্নেফিন, শিবলী একাডেমী, আজমগড়, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯২২

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামল নিয়ে উর্দু ফার্সিতে প্রচুর ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয়েছে। বরাবরের মতোই ইতিহাস রচয়িতাদের ঝোঁক ছিল রাজা বাদশাহদের যুদ্ধ, শিকার আর বিয়েশাদী ইত্যাদীর বর্ণনার দিকেই। ইবনে খালদুন 'মুকাদ্দিমা'য় যে বিন্যাসের কথা বলেছেন তা ছিলো অনুপস্থিত। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাই আফসোস করে বলেছেন 'দিল্লীর উপকণ্ঠে খেলারত বালকদের কথা ইতিহাস বইতে আছে কিন্তু আলায়ী ও সার্মাদ অনুপস্থিত' (দ্রষ্টব্য : গুবারে খাতির)
বিশ্বের অন্য যেকোনো ভূখন্ডের মতো ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকরাও সচেষ্ট ছিলেন ইলমের প্রচার প্রসারে। তারা প্রচুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ওয়াকফ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এসবের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো বই রচিত হয় নি। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে দায়সারা ভাবে কিছু আলোচনা আছে যার পরিমান খুবই সামান্য। সম্ভবত এ কারনেই প্রথম দিকে আল্লামা শিবলী নোমানী মনে করতেন ভারতবর্ষে মাদ্রাসার কোনো আলাদা কাঠামো ছিল না। পরে অবশ্য তিনি এ নক্তব্য থেকে সরে এসেছিলেন।
এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে মানাজির আহসান গিলানী 'হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নিজামে তালিম ও তরবিয়ত' রচনা করেছেন যাতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেখানে মাদরাসাগুলোর পরিচিতি বিশদভাবে উঠে আসে নি।
কেমন ছিল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো?? কারা ছিলেন সেখানে উস্তাদ?? কারা ছিলেন ছাত্র?? কী ছিলো সেখানের পাঠ্যক্রম?? সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কি এখনো টিকে আছে নাকি অনেক আগেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে??

এসব প্রশ্ন ইতিহাসের সচেতন পাঠককে ভাবায়। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয় নি।

আগ্রহী পাঠকের এসব প্রশ্নের জবাব নিয়েই উপস্থিত 'হিদুস্তান কী কদীম ইসলামী দরসগাহে'। লেখক আবুল হাসানাত নদভী। যিনি আল্লামা শিবলী নোমানী ও সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর স্নেহধন্য। বিদগ্ধ লেখক প্রচুর পরিশ্রম করে ভারতবর্ষের প্রাচীন মাদরাসাগুলো সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। সাহায্য নিয়েছেন উর্দু, ফার্সি ইতিহাসগ্রন্থের। ভ্রমন করেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল।নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের সাথে। যেমন ঢাকার হাকিম হাবিবুর রহমানের সাথে তার পত্রালাপ ছিল।

হিন্দুস্তান কী কদীম ইসলামী দরসগাহে বইয়ের প্রথম সংস্করণ

সর্বশেষ সংস্করণ

এই বইতে লেখক বিবরণ দিয়েছেন প্রাচীন অনেক মাদরাসার। আলোচনা করেছেন সেখানকার উস্তাদ, ছাত্র ও পাঠ্যক্রম নিয়ে। আলোচনার শুরু সুলতান মাহমুদ গজনভীর সময়কাল থেকে। লেখকের আলোচনা এগিয়েছে বিভিন্ন শহরকে কেন্দ্র করে। একে একে আলোচনা করেছেন দিল্লী, সহেলি, লখনৌ, বিহার, আজমগড়, লাহোর, পাটনা, জৌনপুর, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিনাত্য, বালাগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার। বিভিন্ন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাকাল ও ছাত্র উস্তাদদের আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিবরণ দিয়েছেন এসব মাদরাসার পাঠ্যক্রম ও সমকালীন জনজীবনে এসব মাদ্রাসার প্রভাব।

লেখক ঢাকা শহরের প্রাচীন কয়েকটি মাদরাসার বর্ণনাও দিয়েছেন। বইটি থেকে আলোচনা তুলে দিচ্ছি:

১. শায়েস্তা খাঁর অসমাপ্ত কেল্লা (লালবাগ কেল্লা) থেকে দুই ফার্লং দূরে খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ। চমৎকার এই মসজীদটি দোতলা। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। নিচতলায় ছিল মাদরাসা। ছাত্রদের থাকার জন্য অনেকগুলো কক্ষ ছিল, যা এখনো টিকে আছে।

(বি:দ্র: মুনতাসির মামুন তার 'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির' নগরী বইতে এই মসজিদের আলোচনা করেছেন। তবে সেখানে মাদ্রাসার কথা নেই।)

২. শায়েস্তা খান বুড়িগঙ্গার তীরে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মান করেন। মাদ্রাসাটি ১৮৫০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিলো। ঢাকার বিখ্যাত বুজুর্গ শাহ নুরী র., যিনি ঢাকা শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে মগবাজার নামক গ্রামে থাকতেন,

তিনি ‘কিবরিয়্যাতে আহমার’ নামক কিতাবে লিখেছেন তিনি প্রতিদিন নিজ গ্রাম থেকে হেটে এই মাদরাসায় যেতেন।

বইটি পড়লে বুঝা যায় লেখক কী পরিমান পরিশ্রম করে বইটি লিখেছেন। ওয়াকিয়া নবিশদের লিখনী আর সম্রাটদের যুদ্ধযাত্রার বিবরণের মাঝে চাপা পরা এইসব মাদ্রাসার ইতিহাস তুলে আনা সত্যিই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। একটু উদাহরণ দেই। ‘তারীখে ফিরোজশাহি’তে ফিরোজশাহ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদ্রাসাটির আলোচনা আছে ফিরোজশাহের জীবনির পঞ্চম অধ্যায়ে। যদিও সেখানে এই মাদ্রাসার আলোচনা এসেছে ফিরোজশাহের আমলে নির্মিত বিভিন্ন ইমারতের সৌন্দর্যের বর্ননা হিসেবে। সেখানে ফিরোজশাহ নির্মিত এই মাদ্রাসাটির বিবরণ পাওয়া গেলেও অন্যান্য শহরে ফিরোজশাহ কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসার আলোচনা নেই। সেজন্য লেখককে দারস্থ হতে হয়েছে অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থের। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ছেকে মাদ্রাসার ইতিহাস তুলে আনার এই কঠিন কাজটিই লেখক করেছেন।
তবে মনে রাখতে হবে এটি লেখকের অনুসন্ধানে পাওয়া মাদ্রাসাসমূহের বর্ননা এবং এটি পূর্ণাংগ তালিকা নয়। । এই তালিকার বাইরেও অনেক মাদ্রাসা ছিল। যেমন লেখক বাংলার মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলেও সেখানে সোনারগায়ে প্রতিষ্ঠিত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্রাসার আলোচনা নেই। বিশুদ্ধ মত অনুসারে বাংলায় এই মাদ্রাসাতেই প্রথম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের পাঠদান শুরু হয়। ইবনে বতুতা এই মাদ্রাসা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই মাদ্রাসার আলোচনা না থাকা খানিকটা আশ্চর্যকর। ভারতবর্ষের মাদ্রাসাগুলো নিয়ে আব্দুস সালাম নদভীর একটি প্রবন্ধ আছে ‘তালীম কী তরক্কী’ নামে, যা প্রথমে মাসিক মা’আরিফে ছাপা হয়। পরে এটি ‘ হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ কে তামাদ্দুনি কারনামে’ বইতে সংকলিত হয়। সেখানেও এই মাদ্রাসার আলোচনা নেই। কারণ তিনি মূলত আবুল হাসানাত নদভীর লেখা থেকেই বেশীরভাগ তথ্য নিয়েছেন। ভারতবর্ষের মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে আরেকটি আলোচনা পাওয়া যায় বিস্ময়কর লেখক আব্দুল হাই হাসানির ‘আল হিন্দ ফি আহদিল ইসলামী’ গ্রন্থে। সেখানে বেশকিছু ক্ষেত্রে তিনি আবু হাসানাত নদভীর চেয়েও বেশী আলোচনা করেছেন। যেমন আবুল হাসানাত নদভী আগ্রা, পাঞ্জাব ও রোহিলাখন্ডের মাদ্রাসার আলোচনা করেন নি। আব্দুল হাই হাসানি করেছেন। সেই বইতে বাংলার মাদ্রাসার জন্য আলাদা শিরোনাম থাকলেও সোনারগায়ের সেই মাদ্রাসা অনুপস্থিত। যদিও লেখকের (আব্দুল হাই হাসানি) বিস্ময়কর গ্রন্থ ‘নুজহাতুল খাওয়াতিরে’ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার জীবনি

আলোচনা করা হয়েছে। এই মাদ্রাসার আলোচনা আছে , বিখ্যাত দরবেশ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানির পত্রাবলী এবং মানাকিবুল আসফিয়া, এম এ রহিমের লেখা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ড. কে এম আইয়ুবের হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ইত্যাদী গ্রন্থে।

বাংলার আরো দুটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ছিল আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে নির্মিত দরসবাড়ি মাদ্রাসা এবং নওগায় প্রতিষ্ঠিত তকিউদ্দিন আরাবীর মাদ্রাসা। এই বইতে এই মাদ্রাসাগুলোর আলোচনাও আসে নি।

বইয়ের শেষে লেখক আব্দুল হাই হাসানির একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করেছেন, যা ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের ইতিহাস নিয়ে লেখা। মূল প্রবন্ধটি আব্দুল হাই হাসানির আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ বইতে আছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন মাদ্রাসা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য হিন্দুস্তান কী কদীম ইসলামী দরসগাহে বইটি এক অসামান্য উপহার, সন্দেহ নেই।

শেষ সিপাহীর রক্ত ও কিছু কথা

(কিছুদিন আগে এক পোস্টে জুরজি যায়দান সম্পর্কে গবেষকদের মূল্যায়ন উদ্ধৃত করেছি। নবপ্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত জুরজির বই ' হাজ্জাজ বিন ইউসুফ' এর ভূমিকাতে জুরজির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এতে করে জুরজিকে প্রমোট করা হয়েছে। আর তা থেকে সতর্ক করতেই সেই পোস্ট দেই। (পোস্টের লিংক প্রথম কমেন্টে)। সেই পোস্টের পর অনুবাদক এবং নবপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট আরো দুয়েকজনের বক্তব্য ছিল, এই বইতে কোনো সমস্যা থাকলে বলুন। অনুবাদক সাহেব এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন, এই বইয়ের তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে যাচাই করে নিয়েছি। ভক্তদের কেউ কেউ বলেছিলেন, অনুবাদক একজন আলেম। তাই এই বইতে সমস্যা থাকার কথা নয়। সে সময় আমার মূল আপত্তি ছিল, জুরজির বইপত্র অনুবাদ করা নিয়ে। নির্দিষ্ট ভাবে এই বই নিয়ে কিছুই বলিনি। যাই হোক, পরে বইটি পড়া হয়েছে এবং মনে হয়েছে ইতিহাসের একজন পাঠক হিসেবে কিছু কথা বলা দরকার। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আজকের এই লেখা।)

প্রথমে বইয়ের মূল কাহিনী বলে নেয়া যাক। এটি একটি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস। সময়কাল ৭৩ হিজরী। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর মক্কায় অবরুদ্ধ। মক্কা ঘিরে রেখেছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বাহিনী। মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে কাবার দিকে। সেই অস্থির সময়ে হাসান নামে এক যুবকের আগমন ঘটে । সে এসেছে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের সাথে সাক্ষাত করতে। একইসাথে তাঁর প্রেমিকা সুমাইয়ার সাথেও দেখা করতে হবে তাঁকে। যুদ্ধের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলে হাসান সুমাইয়ার প্রেমকাহিনী। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। নানা ঘটনার পরে হাসান-সুমাইয়ার মিলন ঘটে। উপন্যাসও সমাপ্ত হয়।
প্রথমেই আমরা এই কাহিনীর কলকব্জা একটু নেড়ে দেখবো। ইতিহাস আর উপন্যাসকে আলাদা করে ফেলবো। কোনটা সত্য আর কোনটা জুরজির কল্পনা তা আলাদা করে ফেলব। অন্য কোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনটা করা দরকার ছিল না। কিন্তু এখানে দরকার। কারণ, এই বইয়ের কাহিনী এগিয়ে গেছে ৭৩ হিজরীতে। যেটা খাইরুল কুরুনের যুগ। তখনো জীবিত আছেন সাহাবীদের অনেকে। এই বইয়ের কাহিনী এগিয়েছে মাদীনাতুর রাসুল ইয়াসরিব এবং পবিত্র শহর মক্কার গলিপথ ধরে। এই বইয়ে উল্লেখিত তথ্যের সামান্য বিকৃতিও আঘাত করতে পারে এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। সেই স্বর্নালী সময় সম্পর্কে আমাদের মানসপটে একে দিতে পারে বিকৃত চিত্র। তাই এখানে বর্ণিত সকল তথ্য প্রথমে আমরা দুভাগ করে ফেলবো। যেগুলো জুরজির কল্পনা সেগুলো বাদ দিব। বাকি

থাকবে ইতিহাস। আমরা দেখবো ইতিহাস বর্ননার ক্ষেত্রে জুরজি কতটা স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে। সামনের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি, উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ৭৩ হিজরীর ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এবং উপন্যাসের চরিত্ররা ঘুরে বেরিয়েছে মক্কা-মদীনা, এই দুই পবিত্র শহরে।

দুই কাল্পনিক চরিত্র

বইয়ের মূল চরিত্র হল হাসান ও সুমাইয়া। জুরজি এই দুই চরিত্রের চিত্রায়ন এমনভাবে করেছে, সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন এরা ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু ড. শাওকি আবু খলিল বিস্তারিত অনুসন্ধান শেষে জানিয়েছেন, এই দুই চরিত্র জুরজির তৈরী। ইতিহাসে তাদের কোনো উল্লেখ নেই।[৩৯৫]

এই দুই চরিত্র কাল্পনিক, ফলে এই দুই চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বইয়ের বিশাল অংশ কাল্পনিক তথ্যে ভরপুর। সমস্যা হলো এর মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে যা পাঠক মনে করবে ইতিহাসের অংশ অথচ তা কাল্পনিক, বানোয়াট। যেমন-

১। হাসানের সাথে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের আলাপচারিতা। (১৫০ ও ১৯৬ পৃষ্ঠা)

২। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও সুমাইয়ার বিয়ের ঘটনা। (১৫৭ পৃষ্ঠা)

৩। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পত্র লেখা। (২১৭ পৃষ্ঠা)

আরো সহজভাবে বলে দিলে, হাসান ও সুমাইয়ার সাথে সম্পর্কিত যত ঘটনা আছে এই বইতে সবই বানোয়াট ও কাল্পনিক।

আজজাহ-আল-মায়লা

অনূদিত বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় আছে, হিজরি প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মদিনায় একজন বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন। তার নাম আজজাহ আল মায়লা।... মদীনায় কেউ এলে একবারের জন্য হলেও আজজাহর গান শোনার বা তাকে দেখার ইচ্ছা হতো তার। ... গানের আসরে তিনি যখন গান গাইতেন, তখন উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত তার গান। সবাই এতটাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেত, মনে হতো তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

জুরজি আমাদেরকে একজন গায়িকার কথা জানাচ্ছেন, যিনি হিজরি প্রথম শতকের মাঝামাঝি মদিনায় বাস করতেন। তিনি গানের আসর করতেন। মদীনায় যারা আসতো তারা এই আসরে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখতো। এই গায়িকার সন্ধান করে আসা যাক। প্রথমে দেখা যাক এই গায়িকা সম্পর্কে ইতিহাস কী বলে? সর্বপ্রথম আজজাহ আল মায়লার কথা আলোচনা করেছেন আবুল ফারাজ

---

[৩৯৫] জুরজি যায়দান ফিল মিযান, পৃষ্ঠা- ১০৫– ড. শাওকি আবু খলিল।

ইস্ফাহানি (মৃত্যু ৩৫৬ হিজরী) তার রচিত 'আল আগানি' গ্রন্থে। তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন খাইরুদ্দিন যিরিকলি 'আল আলাম' গ্রন্থে (৪র্থ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)। জুরজি যায়দানও এই চরিত্রটি নিয়েছেন আল আগানি গ্রন্থ থেকেই। মূল বইয়ের শুরুতে তিনি কয়েকটি বইয়ের নাম দিয়েছেন, যা থেকে তিনি ইতিহাসের তথ্য নিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। তবে অনূদিত বইতে এই বইগুলোর নাম আসেনি। অনুবাদককে পুরো দোষারোপ করা যাচ্ছে না, সম্ভবত তিনি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত অনলাইন সংস্করণ দেখে অনুবাদ করেছেন। এবার দেখা যাক জুরজির সেই আল আগানি গ্রন্থের লেখক আবুল ফারাজ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ কী বলেন।

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি তার গ্রন্থে পাপাচার উসকে দিয়েছেন। মদপানকে হালকা করে দেখিয়েছন। যে কেউই গভীরভাবে তার আল আগানি গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে শুধু ঘৃণ্য আর খারাপ কাজের বর্ননাই পাবেন।[৩৯৬]

আবু মুহাম্মদ হাসান বিন হাসান নুবাখতির সূত্রে খতীব বাগদাদি তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৩৯৭]

আবুল ফারাজ ইস্ফাহানী ছিলেন শিয়া। তার বইটিও ইতিহাসের কোনো নির্ভরযোগ্য বই নয়। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি আজব আজব সব ঘটনা বর্ননা করেছেন।[৩৯৮]

আবুল ফারাজ ইস্ফাহানী ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হলো। এবার দেখা যাক, আজজাহ আল মায়লা সম্পর্কে তিনি কী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আজজাহ আল মায়লা মদীনার বিখ্যাত মহিলা গায়ক। উমর বিন আবি রবিআ ও তুয়াইস তার গৃহে যেতেন গান শুনতে।[৩৯৯]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল আগানি কোনো গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ নয়। সেখানে সত্য মিথ্যা নানা ধরণের তথ্যই আছে। অপরদিকে আজজাহ আল মায়লা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের কেউই কিছু লিখেননি। পরে যারা লিখেছেন তারা আল আগানির সূত্রে লিখেছেন। সুতরাং প্রথমেই আজজাহ আল মায়লার অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর এই চরিত্র যদি সত্যও হয় তবু মদীনায় তার গানের আসর হতো এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেই। আবুল ফারাজের বর্ননা

---

[৩৯৬] আল মুন্তাজাম, খন্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৮৫– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা। বৈরুত, লেবানন।
[৩৯৭] মিযানুল ইতেদাল, ৫ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা। বৈরুত, লেবানন।
[৩৯৮] প্রাগুক্ত।
[৩৯৯] আল আগানি, খন্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৪– আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি।

থেকে জানা যায়, দুয়েকজন লোক তার গৃহে গিয়ে গান শুনতো। অথচ জুরজি লিখেছেন, গানের আসরে তিনি যখন গান গাইতেন, তখন উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত তার গান। সবাই এতটাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেত, মনে হতো তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা সাধারণ একটা বিষয়। একটা উপন্যাসে তো সব সত্য লেখা হবে না। এজন্য আগেই বলেছি, মাথায় রাখতে হবে এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের স্থান ও সময়কাল। জুরজি চিত্রায়ন করছে ৭৩ হিজরীর মদীনাকে। আর লিখছে, মদীনায় কেউ এলে একবারের জন্য হলেও আজজাহর গান শোনার বা তাকে দেখার ইচ্ছা হতো তার।

একবার ভাবুন কী বিষ লুকিয়ে আছে এই এক দুটি বাক্যের আড়ালে। মদীনায় সেসময় সফর হতো যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অথবা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে। এটা খাইরুল কুরুনের যুগের কথা। যখন ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া মাসমুদি 'হাতি' দেখার জন্যেও ইমাম মালিকের দরসগাহ থেকে বের হননি। এমনই নিমগ্নতা ও একাগ্রতা ছিল তাদের। অথচ তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে মদীনায় এলে তাদের আজজাহর গান শোনার ইচ্ছে হতো। (আজ্জাহর অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ। আর গানের আসরের কথা তো কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়)। জুরজির এই এক লাইনেই সেকালের মদীনার সামাজিক অবস্থা ও শহরবাসী সম্পর্কে বিকৃত চিত্র একে দিবে পাঠক-মানসে।

বিকৃত চিত্রায়ণ

এই বইয়ের অনেক তথ্যই প্রকৃত ইতিহাসের বিপরীত। যেহেতু এটি ইতিহাসের বই নয়, স্রেফ উপন্যাস (যদিও বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখা আছে, এই বইটি নাকি উপন্যাসের চেয়ে বেশি কিছু) তাই এসব নিয়ে এই পোস্টে আলোচনা করবো না। শুধু একটা জায়গায় ফোকাস করার চেষ্টা করছি। জুরজি এই বইয়ের মাধ্যমে মদীনার সামাজিক জীবনের যে চিত্রায়ন করেছে তা কোনোভাবেই ইতিহাস সত্যায়ন করে না। কৌশলে সে সেকালের মদীনার জনজীবন সম্পর্কে বিকৃত চিত্র একে দিয়েছে। তার এই বিকৃতি কখনো কখনো এতই স্পষ্ট যে সীরাতের সাথে যাদের সামান্য সম্পর্ক আছে তারাও ধরে ফেলতে পারবেন। অথচ আমাদের অনুবাদক নির্দ্বিধায় তা অনুবাদ করে গেছেন। উদাহরণ দেয়া যাক

১। অনূদিত বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় আছে সাকিনা বিনতু হোসাইনের গৃহে গানের আসর বসেছে। কবিরা এসেছে মহিলারা এসেছে। দাসীরা উপহার দিচ্ছে। এর না কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। না হযরত আলী (রা) এর নাতনী সম্পর্কে এমন তথ্য বিশ্বাস করা যায়।

২। ৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, হাসান অনুমতি না নিয়েই সুমাইয়াদের ঘরে ঢুকে পড়ে। সুমাইয়াকে দেখে ফেলে। খাইরুল কুরুনের যুগে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের সাথে এই চিত্রায়ণ কখনোই মানানসই হয় না। অবশ্য পুরো ঘটনাই তো মিথ্যা, কারণ এই দুই চরিত্রের অস্তিত্বই নেই।
৩। ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সুমাইয়ার বাবা তার জীবনরক্ষক হাসানকে হত্যা করার কৌশল করে।

নিষ্পাপ এক প্রেমকাহিনি

বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখা হয়েছে, সেই সময়ের এক নিষ্পাপ প্রেমকাহিনির হাত ধরে পাঠক প্রবেশ করবেন খেলাফত রক্ষার এক সাহসী সংগ্রামে। এবার নিষ্পাপ প্রেমকাহিনীর অবস্থা দেখা যাক
১। সুমাইয়া বারবার আত্মহত্যা করতে চায়। এমনকি হাসানের সাথে দেখা করার জন্য সে ঘর থেকে বের হয়ে নির্জনে আসে।
২। ২০৬ পৃষ্ঠায় হাসানের বক্তব্য, যদি আমাকে মেরে ফেলে তাহলে ভাববে তোমার ভালোবাসায় আমি শহীদ হয়েছি। (নাউজুবিল্লাহ)
যদিও চরিত্রগুলি মিথ্যা, ঘটনাগুলিও। কিন্তু এইসব চিত্রায়ন পাঠকের মনে উপস্থাপন করবে অন্য এক মদীনাকে। এ যেন উম্মে কুলসুমের কায়রো কিংবা আনারকলির লাহোর। যেখানে গান, নারী ও প্রেমই শেষ কথা।
জুরজির লেখা অনুবাদ প্রসঙ্গে আগেও কথা বলেছি। প্রকাশকরা বলেছিলেন তারা বইকে যাচাই-বাছাই করেই অনুবাদ করবেন। ভূল কিছু থাকলে বাদ দেবেন। অথচ দেখা গেল হুবহু অনুবাদ হয়েছে। জুরজি যে বিষ ছড়িয়েছিল আরবিতে, তা বাংলাতেও চলে এসেছে। সাধারণ পাঠককে সাবধান করা দরকার ছিল, আমরা শুধু সে দায়িত্বই পালন করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের নিয়তের ব্যাপারে জানেন।

কয়েকটি বই সম্পর্কে ফুটনোট

এক সময় বই পড়ার পর তা সম্পর্কে দুই এক লাইন ডায়েরিতে লিখে রাখার অভ্যাস ছিল। ডায়েরিতে জমে থাকা এমনই কয়েকটি লেখা

১। তাদবীনে সিয়ার ও মাগাজি– আল্লামা কাজী আতহার মোবারকপুরী র.। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে যেকজন মনীষী ইতিহাস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন কাজী আতহার মোবারকপুরী তাদের অন্যতম। প্রচুর খেটে খেটে ইতিহাসের বিভিন্ন দুর্লভ তথ্য একত্র করেছেন তিনি। তার এই বইতে তিনি সিয়ার ও মাগাজি সংকলনের ইতিহাস , মাগাজির কিছু প্রসিদ্ধ কিতাব, হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই শাস্ত্রে উলামায়ে কেরামের অবদান ইত্যাদী নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটি ছেপেছে শাইখুল হিন্দ একাডেমী, দেওবন্দ।

২। খাইরুল কুরুন কী দরসগাহে — আল্লামা কাজী আতহার মোবারকপুরী র. । এই বইকে যদি লেখকের শ্রেষ্ঠ বই বলা হয় তাহলে বাড়াবাড়ি হবে না। এই বইতে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের সময়কাল, সাহাবীদের যুগ এবং তাবেঈদের যুগের বিভিন্ন দরসগাহ এবং এর শিক্ষাপদ্ধতী ও পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইতে মোট ১২৮ টি দরসগাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব দরসগাহে্র অবস্থান কোথায় ছিল, কারা শিক্ষক ছিলেন, কারা ছাত্র ছিলেন সব তথ্য তিনি তুলে এনেছেন ইতিহাসের পাতা থেকে। বইটি ছেপেছে শাইখুল হিন্দ একাডেমী , দেওবন্দ।

৩। হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নেজামে তালীম ও তরবিয়ত — সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী । শায়খ গিলানী তার তুখোড় মেধা ও অসামান্য লিখনীর জন্য সুপরিচিত। এই বইতে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। দুই খন্ডে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বইতে লেখক এত বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছে যা যে কাউকে অবাক করবে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের মাকতাবাতুল হক থেকে এর একটি আধুনিক সংস্করণ বের হয়েছে।

৪। মাকালাতে শিবলী — আল্লামা শিবলী নোমানি । আল্লামা শিবলী নোমানি ও তার লিখনীর পরিচয় নতুন করে দেয়ার কিছু নেই। বিভিন্ন বিষয়ে তার লিখিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন এই মাকালাত। সম্প্রতি দারুল মুসান্নেফিন আযমগড় ৩ খন্ডে এর একটি আধুনিক সংস্করণ ছেপেছে। তৃতীয় খন্ডটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে মুসলিম বিশ্বের অনেক মাদরাসার নাম ও ইতিহাস আছে, যা শেকড়সন্ধানী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

৫। তারিখে ফেরেশতা – মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা। এই বইয়ের অপরনাম গুলজারে ইব্রাহিমী। মুহাম্মদ কাসেম বিন গোলাম অস্ত্রাবাদী বিজাপুরী ১০১৮ হিজরীতে (ইবরাহীম আদিল শাহের শাসনামলে বইটি লেখেন। স্বীয় বিষয়ে এটি একটি অসাধারণ বই। ইসলামের সূচনা যুগ থেকে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসকদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে বইটিতে। সাধারণত বইটি তারীখে ফেরেশতা নামেই অধিক পরিচিত ।

৬। জামিয়া নিজামিয়া বাগদাদ কা ইলমি ওয়া ফিকরি কিরদার, এক তাহকিকি জায়েযা – ড. সুহাইল শফীক । ড. সুহাইল শফীক করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২০০৯ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এটি তার পিএইচডি থিসিস। প্রায় সাড়ে পাচশো পৃষ্ঠার এই থিসিসে তিনি বাগদাদের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া নিজামিয়ার ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা আছে বাগদাদের বাইরে অন্যত্র গড়ে উঠা নিজামিয়াগুলো নিয়েও।

৭। হিন্দুস্তান কী কদিম ইসলামী দরসগাহে — আবুল হাসানাত নদভী । শায়খ আবুল হাসানাত নদভী ছিলেন আল্লামা শিবলী নোমানী ও সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর স্নেহধন্য। এই বইতে তিনি মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা মাদরাসাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষাপদ্ধতী নিয়েও সামান্য আলোচনা আছে। বইটি দারুল মুসান্নেফিন আযমগড় থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা লেখেন আল্লামা সাইয়েদ সোলাইমান নদভী। সম্প্রতি দারুল মুসান্নেফিন থেকে এর একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৮। মিন রাওয়াউই হাদারাতিনা– ড. মোস্তফা আস সিবাঈ। ড. মোস্তফা আস সিবাঈ ছিলেন দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন অনুষদের ডীন। ১৯৫৫ সালে তিনি রেডিও দামেশকে একটি সিরিজ বর্কÍৃতা দেন। তাতে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরেন। সেই বর্কÍৃতাগুলোই পরে মিন রাওয়াউই হাদারাতিনা নামে প্রকাশিত হয়। এই বইতে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

৯। মাশরেকি কুতুবখানা — আব্দুস সালাম নদভী। এই বইতে লেখক প্রাচ্যের বিভিন্ন কুতুবখানা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি প্রথমে আযমগর থেকে প্রকাশিত মাসিক মাআরিফে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বই আকারে সংকলিত হয়। সম্প্রতি এর একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১০। আল কিতাব ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়া– ড ইয়াহইয়া ওহিব জুবুরী। চমৎকার একটি বই। এই বইতে বিদগ্ধ লেখক ইসলামী সভ্যতায় বইয়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি আছে ওয়াররাকদের আলোচনা। বই কীভাবে বাধাই করা হতো, মলাট কেমন হতো, বাধাইকারকদের বেতন কেমন ছিল এসব নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য আছে এই বইতে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের বেশকিছু কুতুবখানার বর্ননা আছে এই বইতে। বইটি ১৯৯৮ সালে দারুল গারবিল ইসলামী থেকে প্রকাশিত হয়।

১১। হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ কে তামাদ্দুনি কারনামে — দারুল মুসান্নেফিন , আযমগড়। এটি মূলত বিভিন্ন সময় মাসিক মাআরিফে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্যবান এই বইটিতে সাইয়েদ সবাহুদ্দিন আব্দুর রহমান। আবু জাফর নদভী, আব্দুস সালাম নদভীর মতো খ্যাতনামা গবেষকদের লেখা আছে। আলোচনা আছে ভারতবর্ষের মাদরাসা , কুতুবখানা, কাগজশিল্প ও সুলতানদের দরবার নিয়ে। সম্প্রতি দারুল মুসান্নেফিন থেকে এর আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১২। তারিখুস সাক্বাফাতিল ইসলামিয়া — ওয়াজেহ রশীদ নদভী । এই বইতে ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । বিভিন্ন শহর, জামে মসজিদ ইত্যাদীর আলোচনা আছে বইতে । এছাড়া মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে বইতে। ২০০৯ সালে লখনৌর দারুর রশীদ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়।

১৩। আল ফিহরিস্ত– ইবনে নাদীম। বিস্ময়কর এক গ্রন্থ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এই বইতে লেখক তার যুগ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল শাস্ত্রের বই ও লেখক সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। তিনি শীয়া মতালম্বী ছিলেন , কিন্তু আল্লামা তাকী উসমানি লিখেছেন, এই বইতে দুয়েকটি জায়গা ব্যতিত আর কোথাও তিনি তার ধর্মীয় মতবাদের কারনে প্রান্তিকতার পরিচয় দেন নি।

১৪। মাদীনাতু ফাস ফী আসরিল মুরাবিতীন ওয়াল মুয়াহহিদীন — ড. জামাল আহমাদ ত্বহা । এই বইতে লেখক মুরাবিতীন ও মুয়াহহিদীন শাসনামলে মরক্কোর ফাস শহরের শিক্ষা সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২০০১ সালে ইস্কান্দারিয়ার দারুল ওয়াফা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়।

ইসহাক ভাট্টি রচিত মুহাম্মদ ইবনে কাসিম

১। বইটি ছোট হলেও তথ্যসমৃদ্ধ। বইয়ের শেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কিছু পত্র দেয়া আছে। এসব পত্র সে সময়কার প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলী বুঝতে সাহায্য করবে।
২। পত্রের অংশ বাদ দিলে বাকি অংশে ইসহাক ভাট্টি সাহেবের নিজস্ব গবেষণা ও বিশ্লেষন নেই। এসব তিনি কাজি আতহার মোবারকপুরীর বিভিন্ন গ্রন্থ (আরব ও হিন্দ আহদে রেসালত মে, ইসলামি হিন্দ কি আযমতে রফতা) থেকে হুবহু তুলে দিয়েছেন। সুতরাং, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ভাট্টি সাহেবের লেখার চাইতে সরাসরি মোবারকপুরীর লেখা পড়াই ভালো। সেখানে আরো বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা আছে।
৩। মোবারকপুরীর লেখা হুবহু উদ্ধৃত করার কারনে ভাট্টি সাহেব এক জায়গায় হোচট খেয়েছেন। তিনি উপমহাদেশে হাদিসচর্চা শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ (৩৭ পৃষ্ঠা) লিখেছেন। এই অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন উপমহাদেশে হাদিসচর্চার সূচনা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যদিও তিনি এখানে কোনো উদ্ধৃতি দেননি, তবে তিনি এখানে মোবারকপুরীকেই অনুসরণ করেছেন। কাজি আতহার মোবারকপুরী তার রচিত 'হিন্দুস্তান মে ইলমে হাদিস কি ইশাআত' গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেন। তবে তার এই মত সঠিক নয়। শায়খ হাবিবুর রহমান আযমি তার লিখিত 'মাকালাতে আবুল মাআসির' এর তৃতীয় খন্ডে (২৩২ পৃষ্ঠা) বেশ শক্তভাবে এর বিরোধিতা করেছেন।
৪। সবমিলিয়ে বইটি উপকারী। তবে ব্যক্তি ও গ্রন্থের নামে প্রচুর ভুল আছে। যা কিঞ্চিত বিরক্তিকর।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি?

লেখক– শাইখ মুহাম্মদ আল আবদাহ
অনুবাদক– মুফতী আব্দুল্লাহ খান
প্রকাশক– আল রিহাব পাবলিকেশন্স
পৃষ্ঠা–১৭৪
মুদ্রিত মূল্য — ২৫০ টাকা।

মাঝেমাঝে এমন কিছু বই হাতে আসে যেগুলো সম্পর্কে অনলাইন বা অফলাইনে খুব কম আলোচনা হয়, অথচ বইগুলো গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত 'সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান' বইটির কথা। বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও তথ্যের সমাহারে বইটি অনন্য। কিন্তু এই বই নিয়ে খুব একটা আলোচনা দেখা যায় না।

'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি?' এই বইটিও আলোচনার আড়ালে থেকে যাওয়া একটি বই। বইটি গতানুগতিক কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এখানে ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। এই পুনরাবৃত্তি হুবহু আগের মত হয় না, কিন্তু এর মৌলিক সূত্রগুলো একই থাকে। ইতিহাস পাঠ তাই কোনো বিনোদন নয়, বরং ইতিহাস হলো ভবিষ্যতের আয়না। অতিত ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করাই ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য।

এই বইতে লেখক হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এই সময়ে মুসলিম উম্মাহর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল দুর্যোগের ঝড়ঝাপটা। একদিকে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল ওবায়দিরা, সুযোগ বুঝে আঘাত হানছিল ফেদাইরা, ওদিকে এগিয়ে আসছিল ক্রুসেডাররা। মুসলিম শাসকরা নিজেদের ভেতরকার দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে ক্রমশ দূর্বল হচ্ছিল, একইসাথে তারা হারিয়ে ফেলেছিল ঈমানী দৃঢ়তা ও উম্মাহর প্রতি ভালোবাসা।

শায়খ আবদাহ তার গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বিষয় আলোচনা করেছেন, একইসাথে তিনি এসব ঘটনাবলী থেকে অর্জিত শিক্ষা অনুসন্ধানের দিকে আগ্রহী হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এই সময়কালে জনগনের উপর বাড়ছিল করের বোঝা, পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল দ্রব্যমূল্য, অপরদিকে শাসকশ্রেনী ক্রমেই সম্পদের পাহাড় জমা করছিল। স্বাধীন অনেকগুলো রাজ্য গড়ে উঠে, তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর

নেমে আসা জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে তারা ছিল নিরুদ্বেগ। এইসব ঘটনাবলীর সাথে আমাদের বর্তমান সময়ের মিল খুজে পাওয়া যায়। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে উজির আফজালের যুদ্ধের সাথে যেভাবে মিল খুজে পাওয়া যায়, '৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের। লেখক সে সময়কার বাতেনিদের সাথে শিয়াদের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন, একইসাথে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীও বিশ্লেষণ করেছেন। মিসরে ফাতেমীদের উৎখাত করে আহলুস সুন্নাহর আকিদা প্রসারে সালাহুদ্দিনের কর্মপন্থা ও তা থেকে অর্জিত শিক্ষা নিয়েও আছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কীভাবে জাগরণের সূচনা হয়, কীভাবে তা পথ হারায় এই সম্পর্কিত আলোচনায় পাঠক পাবেন ভাবনার খোরাক। বইটি তথ্যসমৃদ্ধ, তবে পাঠককে ধরে রাখে। পাঠক ইতিহাসের পাতায় ঘুরে ঘুরে আহরণ করতে পারেন মূল্যবান মণিমাণিক্য।
বইটিতে একটাই সমস্যা। ব্যক্তির নাম ও বইপত্রের নাম লেখার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। কোথাও লেখা হয়েছে তারিখুল কামেল, কোথাও আল কামেল, কোথাও আল কামিল। নিয়ামুল মুলক, সিয়ারু আমিন নুবা, ইবনে খালিকান, দুহ ইসলাম, এমন প্রচুর অসংগতি আছে। আরেকটা সমস্যা করা হয়েছে, রেফারেন্সে কিছু কিছু বইয়ের নাম অনুবাদ করে ফেলা হয়েছে। যেমন লুই জুবেতশিকের 'কাইফা নাফহামুত তারিখ' কে অনুবাদ করে লেখা হয়েছে, আমরা কিভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করবো। এভাবে আরো অনেকগুলো বইয়ের নাম বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে যা খুবিই বিরক্তিকর।

এই সমস্যগুলো বাদ দিলে বইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

বই- সালাহউদ্দীন আইয়ুবী

লেখক- শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান
অনুবাদক- আশিক আরমান নিলয়
সম্পাদনা- সাজিদ ইসলাম
প্রকাশক- সমর্পন প্রকাশন
পৃষ্ঠা- ১৬৮
মুদ্রিত মূল্য- ২৪২ টাকা।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী। ইতিহাসের মহানায়ক। মুসলিম উম্মাহর ঘোর অমানিশার কালে সালাহুদ্দিনের আবির্ভাব। মাওদুদ বিন তুনিতকিন, ইমাদুদ্দিন যিংকি ও নুরুদ্দিন যিংকিরা ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় যে প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন, সালাহুদ্দিন তা আরো বেগবান করেন। তার হাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস পুরনরুদ্ধার হয়।
দুঃখের বিষয়, অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর নির্ভরযোগ্য জীবনি পাওয়া যেত না। একমাত্র পাঠ্য ছিল আলতামাশের ঐতিহাসিক উপন্যাস ঈমানদীপ্ত দাস্তান। যা ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে রচিত। আট খন্ডে রচিত এই উপন্যাসে তথ্যের পরিমান খুবই কম। তাছাড়া বইটির আলোচনা শুরু হয়েছে ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। অর্থাৎ সালাহুদ্দিনের জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি, মিসর আগমনের প্রেক্ষাপট, ফাতেমীদের বিরুদ্ধে তার পদক্ষেপ এসব নিয়ে আলোচনা নেই। পরের দিনগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে তেমনটাও নয়। একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এমনটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক শ্রেনীর পাঠকের ধারণা এসব উপন্যাস পড়ে প্রচুর ইতিহাস জানা যায়, তাই কথাগুলো বলতে হলো।
আশার কথা হলো, সম্প্রতি সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর জীবনি সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত 'সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী'। সমর্পন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে আব্দুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান রচিত 'সালাহউদ্দীন আইয়ুবী'। আকিক পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হবে সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহচর কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ রচিত ' আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যা', কালান্তর থেকে প্রকাশিত হবে, ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবি রচিত 'সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ওয়া

জুহুদুহু ফিল কাদাই আলাদ দাওলাতিল ফাতিমিয়্যাহ ওয়া তাহরিরি বাইতিল মাকদিস'। অনুবাদ হওয়া উচিত সুলতানের সমসাময়িক আলেম ইমাদুদ্দিন কাতেব রচিত 'আল বারকুশ শামি' ও 'আন নাফহুল কাসি ফিল ফাতহিল কুদসি' বই দুটিও।

মূল আলোচনায় আসি। আব্দুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান রচিত 'সালাহউদ্দীন আইয়ুবী' বইটি সংগ্রহ করেছি গতকাল। বইটি পড়ে মনে হলো বন্ধুদেরকে বইটির কথা না জানালে অন্যায় হবে। বইটি কলেবরে খুবই ছোট। পেপারব্যাক সাইজে মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠা। বইটির যেসব বিশেষত্ব চোখে পড়েছে-

১। বইটিতে ইতিহাসের দীর্ঘ ও খুটিনাটি বর্ননা এড়িয়ে সংক্ষেপে সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর জীবনি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সাধারণ পাঠক পড়ার সময় একঘেয়ে অনুভব করেন না।

২। ইতিহাস লেখার সাথে সাথে এ থেকে অর্জিত শিক্ষা ও তার প্রায়োগিক রুপ পাঠককে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। বইটি রচিত হয়েছে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে। প্রতিটি তথ্যের সাথে তথ্যসূত্র দেয়া আছে। ফলে তথ্যের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

৪। সালাহুদ্দিনের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং আমাদের সময়ের সাথে তার তুলনা করে আমাদের দূর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে।

৫। বইটি রচনা করা হয়েছে সত্তরের দশকে। লেখক ফিলিস্তিন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন। ফিলিস্তিনের মুক্তিকামীদের মৌলিক সমস্যাবলীও তিনি তুলে ধরেছেন।

৬। অনুবাদ সাবলিল, পাঠককে ধরে রাখে।

তবে বইটিতে দুটি স্থানে একটু দৃষ্টিকটু লেগেছে।

১। বইয়ের শুরুতে , ১৮ পৃষ্ঠায়, লেখা হয়েছে, 'সালাহুদ্দীন আইয়ুবির জন্ম এক সম্ভ্রান্ত কুর্দি পরিবারে। এই পরিবারটি মিশর ও শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন) শাসন করতো। একে বলা হতো আইয়ুবী সাম্রাজ্য।

এখানে অনুবাদ ঠিকই আছে। (মূল বইতে আছে- _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ । কিন্তু সমস্যা হলো, আইয়ুবীর জন্মের বর্ননার পরেই লেখা হয়েছে এই পরিবারটি মিশর ও শাম শাসন করতো। যা থেকে মনে হতে পারে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর আগ থেকেই এই পরিবার মিশর ও শাম শাসন

করতো। (মূলত সে সময় মিশর ছিল ফাতেমিদের নিয়ন্ত্রণে। শামে শাসন করছিল যিংকি রাজবংশ। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতেই আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। সংক্ষেপে আইয়ুবী সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস জানতে দেখুন, ড. ওয়াফা মুহাম্মদ আলি রচিত 'কিয়ামুদ দাওলাতিল আইয়ুবিয়্যাহ ফি মিসর ওয়াশ শাম'।) এটাকে ঠিক অনুবাদের ভুল বলা যায় না। তবে এই বাক্য থেকে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে। বাক্যের গঠনটা অন্যরকম হলে সুন্দর হতো।

২। ২১ পৃষ্ঠায় বাআলবেক শহর সম্পর্কে টীকায় লেখা হয়েছে, বাআলবেক বর্তমান লিবিয়ার একটি জেলার নাম। কিন্তু বইতে বর্নিত বাআলবেক শহরটির অবস্থান লেবাননে। এই শহর সম্পর্কে ইয়াকুত হামাভী মুজামুল বুলদানে লিখেছেন,

– –
– –
– –

ইতিহাসের আগ্রহী পাঠকের জন্য বইটি অবশ্যপাঠ্য বিবেচনা করি। আল্লাহ এর সাথে জড়িত সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিক।

দ্যা প্যান্থার ও ভ্রান্তি নিরসন, পর্ব-১

শুরুর কথা

দ্য প্যান্থার বইটি প্রকাশের পর থেকেই সংগ্রহের ইচ্ছা ছিল। বাংলা ভাষায় মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সের জীবন নিয়ে এত বিস্তৃত কাজ আগে হয়নি। বইটি সংগ্রহ করবো ভেবেও করা হচ্ছিল না। এদিকে বিভিন্ন সময় পরিচিত অনেককে সাইফুদ্দিন কুতুয, আইনে জালুত ও বাইবার্স সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াতে দেখি। প্রায় সবার সাথে আলাপ করে দেখি, উনারা দ্যা প্যান্থার বইটি থেকেই এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বইকে তারা ইতিহাসের আকরগ্রন্থ ভেবে বসে আছেন। বইটি সংগ্রহ করি। পড়তে গিয়ে দেখি লেখক একের পর এক বানোয়াট তথ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। বাইবার্সের গুন গাইতে গিয়ে ছোট করছেন সাইফুদ্দিন কুতুয ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর মত মহানায়কদের। ইবনে কাসীর, ইবনে খালদুন, যাহাবী, মাকরেজি, সুয়ুতীর মত ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য ফেলে নিজের মনগড়া তথ্য পরিবেশন করছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশকের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, পরের সংস্করণে এসব ভুল সংশোধন করা হয়েছে। এরপর আমি আগস্ট ২০১৮ তে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ সংগ্রহ করি। পুরোটা আবার পড়ি। দুই একটা জায়গায় পরিবর্তন আসলেও বেশিরভাগ জায়গা আগেরমত অপরিবর্তিত। ইতিহাসের একজন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, এই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অন্তত ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি তুলে দরকার। লেখক ইতিহাসের মোড়কে যে কালো পর্দা লেপ্টে দিয়েছেন, তা সরানো উচিত। সেই চিন্তা থেকেই এই লেখা। এটি বইয়ের উপর কোনো রিভিউ নয়। বইয়ে উল্লেখিত কিছু ভুল তথ্যের সংশোধন মাত্র। সুতরাং, 'বইটির অনেক ইতিবাচক দিকও তো আছে' এমন প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

গ্রন্থপঞ্জি প্রসংগে

বইয়ের শেষে লেখক যেসব বই থেকে সাহায্য নিয়েছেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা দরকার।

১। ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দিমা। সচেতন পাঠক জানেন আল মুকাদ্দিমা কোনো গতানুগতিক ইতিহাসগ্রন্থ নয়। বরং এটি ইবনে খালদুন রচিত ইতিহাসগ্রন্থ কিতাবুল ইবারের ভূমিকা হিসেবে লেখা। এই গ্রন্থে ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসতত্ত্বের ব্যখ্যা দিয়েছেন। এই গ্রন্থে রুকনুদ্দিন বাইবার্সের ইতিহাস নেই।

বাইবার্স সম্পর্কে তিনি লিখেছেন কিতাবুল ইবারে। অর্থাৎ প্যান্থার বইয়ের লেখক গ্রন্থপঞ্জিতে এই বইয়ের নাম উল্লেখ করলেও এখান থেকে বাইবার্স সম্পর্কে কোনো তথ্য নেয়ার সুযোগ তার ছিল না। তবে নগররাষ্ট্র ও বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য নিতে পারেন।

২। ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড। এই খন্ডে মামলুক সালতানাত, কুতুয, আইয়ুবী, বাইবার্স কারো সম্পর্কেই আলোচনা নেই। সুতরাং লেখক তার বইতে এই গ্রন্থ থেকেও খুব বেশি তথ্য নিতে পারেননি, এটা নিশ্চিত।

৩। সিরাতুজ জাহির বাইবার্স। জামাল আল গাইতানি লিখিত বাইবার্সের জীবনি। ৫ খন্ডে রচিত বাইবার্সের বৃহদাকার জীবনি। এই গ্রন্থ থেকে লেখক তথ্য নিয়েছেন সত্য কিন্ত এখানকার অনেক তথ্য বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া তথ্য পরিবেশন করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। অর্থাৎ, অনেক জায়গাতেই এই গ্রন্থের বিপরীত তথ্য দিয়েছেন।

৪। তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক। ইবনে জারীর তাবারী রচিত ইতিহাসগ্রন্থ। ইবনে জারীর তাবারী ইন্তেকাল করেছেন ৩১০ হিজরীতে। ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তিনি রুকনুদ্দিন বাইবার্সের প্রায় ৩৫০ বছর আগের লোক। সুতরাং তার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ থেকে বাইবার্সের জীবনি চয়নের কোন সুযোগ নেই। মূলত লেখক শিয়াদের আলোচনার সময় এই গ্রন্থ থেকে দুটি তথ্য নিয়েছেন বলে দেখা যায়। ১২৭ পৃষ্ঠায় ও ১২৮ পৃষ্ঠায় তিনি এই বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, ১২৮ পৃষ্ঠায় লেখক কারামাতিদের মক্কা আক্রমনের ঘটনা লিখে এই বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। অথচ কারামতিরা মক্কা আক্রমন করেছিল ৩১৭ হিজরী তথা ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ ইবনে জারির তাবারীর ইন্তেকালের ৭ বছর পর। সম্ভবত বিজ্ঞ লেখক এই গ্রন্থটি খুলেও দেখেননি। খুললে দেখতে পেতেন ইবনে জারির তাবারী তার গ্রন্থে ৩০২ হিজরীর পর আর আলোচনা করেননি। সম্ভবত লেখক অন্য সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরে গ্রহনযোগ্যতা বাড়াবার জন্য তাবারীর বইটির নাম উল্লেখ করেছেন।

৫। তারিখুল মালিক আজজাহির। ইযযুদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ রচিত বাইবার্সের জীবনি। এই বই থেকে লেখক কিছু তথ্য নিয়েছেন।

৬। হুসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহেরা। জালালুদ্দিন সুয়ুতী রচিত ইতিহাসগ্রন্থ। যদিও বইটির নাম অশুদ্ধ লেখা হয়েছে তবু আমাদের ধারণা এটা টাইপিং মিসটেক। আমাদের অনুসন্ধানে দেখেছি, লেখক এই বই থেকেও তথ্য নেননি। বরং এই বইয়ের বিপরীত তথ্যই দিয়েছেন তার লেখায়। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা করা হবে।

৭। Sultan Baibars & Mamluks নামের ফেসবুক পেজ। এই পেজে বাইবার্সের জীবন নিয়ে বিস্তৃত কাজ হয়েছে। দ্য প্যান্থার এর লেখক যেখানেই ভুল তথ্য দিয়েছেন সেখানেই এই পেজে বর্নিত তথ্যের সাথে মিলে গেছে। যা থেকে বুঝা যায়, লেখক এই পেজের তথ্যকে হুবহু অনুসরণ করেছেন, ইতিহাসগ্রন্থ খুলে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি।
৮। সমসাময়িক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ফিচার। বলতে দ্বিধা নেই , খুবই অস্পষ্ট রেফারেন্স।
বইয়ের ভেতরে কয়েক জায়গায় আল্লামা মাকরেজির আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যদিও বইটির নাম ভুল ছিল এবং আমরা ধারনা করছি তা টাইপিং মিসটেক, তবু যদি উদ্ধৃতি সঠিক হত তাহলে সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু আফসোস, লেখক মাকরেজি বর্নিত তথ্যের বিপরীত তথ্য দিয়ে মাকরেজির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।
বই প্রসংগে
বইটি পড়ে মনে হয়েছে লেখক বাইবার্সের প্রতি অতিরিক্ত দূর্বল। তিনি বাইবার্সের প্রশংসা করার পাশাপাশি অন্যদের নামে মিথ্যা ছড়িয়েছেন , তাদের ছোট করেছেন। অথচ একজন লেখক, গবেষকের কাজ হলো সত্য তুলে ধরা। কাউকে ছোট করা কিংবা কাউকে বড় করা নয়।
লেখক এই বইতে যেখানে যেখানে ভুল তথ্য দিয়েছেন, তার একটা *সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ-*

১। সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর অবদান খাটো করে দেখানো।
২। শাজারাতুদ দুরের হত্যাকান্ড সম্পর্কে ভুল তথ্যদান।
৩। আইন জালুত যুদ্ধ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া।
৪। সাইফুদ্দিন কুতুযের নামে মিথ্যাচার ও তাকে কাপুরুষ প্রমাণের চেষ্টা।
৫। ফারিসুদ্দিন আকতাইয়ের হত্যাকান্ড সম্পর্কে ভুল তথ্যদান।
৬। সাইফুদ্দিন কুতুযের হত্যাকান্ড সম্পর্কে ভুল তথ্যদান।

এগুলো হলো মোটাদাগে লেখকের কিছু ভুল। এছাড়াও বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক ভুল, বিকৃত তথ্য আছে, যা নিয়ে আলাপ করতে গেলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। যেমন, ১৩২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, দরসে নেজামির উদ্ভাবক হলেন নিযামুল মুলক। (এ বিষয়ে জানতে চাইলে দেখতে পারেন

[https://www.facebook.com/notes/imran-raihan/দরসে-নেজামির-প্রণেতার-খোঁজে/৬৫৪০৫৫৯৯৮২৭৫৩৩৮/]

৫৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, কুতুযের কাছে কিতবুগা পত্র পাঠিয়েছেন। অথচ পত্রটি পাঠিয়েছিল হালাকু খান। (এ বিষয়ে জানতে আন নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা, আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক ইত্যাদী গ্রন্থ দেখা যেতে পারে)। ১৫৭ পৃষ্ঠায় সুলতান নুরুদ্দিন যিংকির যে স্বপ্নের ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, গবেষকদের কাছে তার সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ (বিস্তারিত জানতে দেখুন ড. আলী মোহাম্মদ আস সাল্লাবী প্রণিত আদ দাওলাতুয যিংকিয়্যাহ)। এখানে সবগুলো বিষয়ই জরুরী নয় তাই দীর্ঘ আলাপ এড়িয়ে আমরা শুধু জরুরী কয়েকটি বিষয়েই আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।
বইয়ের শুরুতে প্রকাশক লিখেছেন, 'তথ্যগত ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। কারণ ঐতিহাসিক কোনো বিষয়ে একাধিক মত থাকতেই পারে'। এই বই সম্পর্কে এমন কথা আরো অনেকেই বলে থাকেন।
এজন্য লেখাটি কয়েক পর্ব দীর্ঘ হবে। লেখকের ভুলগুলো যে একাধিক মতের অংশ নয় বরং নিছকই মনগড়া তথ্য, তা প্রমাণ করা হবে। ইনশা আল্লাহ।

দ্যা প্যান্থার ও ভ্রান্তি নিরসন, পর্ব-২

এই পর্বে সাইফুদ্দিন কুতুয সম্পর্কে দ্য প্যান্থার গ্রন্থের লেখক যেসব তথ্য দিয়েছেন তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এক নজরে সাইফুদ্দিন কুতুযের জীবনি দেখে নেয়া যাক।

সাইফুদ্দিন কুতুয

সাইফুদ্দিন কুতুযের প্রকৃত নাম মাহমুদ বিন মামদুদ। তিনি ছিলেন খাওয়ারেজমের সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহের ভাগ্নে। জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ তাতারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়ে পরাজয় বরণ করেন। এসময় তার পরিবারের বড়দের তাতারীরা হত্যা করে। ছোটদের অনেকের সাথে মাহমুদ বিন মামদুদ বন্দী হন। তার সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে তাতারীরা তার নামকরণ করে কুতুয । এই শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট কুকুর।

তাতারীরা কুতুযকে দামেশকের দাস বাজারে বিক্রি করে দেয়। এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে মিশরে নিয়ে আসেন। বালক কুতুয বেড়ে ওঠেন মিশরের মামলুকদের সাথে। আরবীতে মামলুক বলা হয় গোলাম বা দাসকে। আইয়ুবী শাসনামলে আমীর ও সুলতানরা যুদ্ধের জন্য মামলুকদের উপর ভরসা রাখতেন। তাদের দেয়া হতো উচ্চতর প্রশিক্ষণ।

মামলুকদের আরবী শেখানো হতো। ফিকহের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত। প্রাপ্তবয়সে পৌছলে তাদের রণশাস্ত্র, অশ্বারোহণ, তীর নিক্ষেপ ও তরবারী চালনা শিক্ষা দেয়া হত। তাদের পরিচর্যার প্রতি খেয়াল রাখা হত। এমনকি সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মত প্রভাবশালী আইয়ুবী সুলতানও মামলুকদের পাশে এসে তাদের খোজখবর নিতেন। তাদের সাথে গল্প করতেন, খাবার খেতেন।

এভাবেই মামলুকরা বেড়ে উঠতো। কুতুযও এদের সাথেই বেড়ে উঠেন। কয়েকজন মনিবের হাত ঘুরে কুতুয , ইযযুদ্দিন আইবেকের মালিকানায় আসেন। কুতুযের গুনে মুগ্ধ হয়ে ইযযুদ্দিন আইবেক তাকে নিজের সেনাপতি বানান। শাজারাতুদ দূর কর্তৃক ইযযুদ্দিন আইবেক নিহত হওয়ার পর ইযযুদ্দিন আইবেকের বালক পুত্র নুরুদ্দিন আলির বায়াত নেয়া হয়।

এসময় সেনাপতি কুতুযকে তার অভিভাবক মনোনিত করা হয়। এটা ৬৫৫ হিজরীর ঘটনা। কিছুদিন পর ৬৫৬ হিজরীতে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পতন ঘটে। হালাকুর বাহিনী একের পর এক দখল করে নেয় ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার

বিস্তৃর্ণ এলাকা। ৬৫৭ হিজরীর যিলকদ মাসে হালাকুর বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল আলেপ্পোর দিকে। আর সেসময় বালক নুরুদ্দিনকে হটিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করেন সাইফুদ্দিন কুতুয। কুতুযের এ সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। কারন বালক নুরুদ্দিন শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না। এদিকে সিরিয়া দখলের পর হালাকুর বাহিনী মিসর আক্রমন করবে তা নিশ্চিত ছিল। সুতরাং এ সময়ে মিসরে প্রয়োজন ছিল একজন শক্তিশালী শাসক যিনি তাতারী ঝড়কে রুখে দিবেন।
সাইফুদ্দিন কুতুয দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, এসময় হালাকু পত্র পাঠিয়ে হয় যুদ্ধ নইলে শর্তহীন আত্মসমর্পন এর আহবান জানায়। রুকনুদ্দিন বাইবার্সের পরামর্শে হালাকুর দুতদেরকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। ২৫ রমজান ৬৫৮ হিজরীতে আইন জালুত প্রান্তরে তাতারী বাহিনীর মুখোমুখি হয় মুসলিম বাহিনী।
এ যুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতুয ও রুকনুদ্দিন বাইবার্সের বীরত্বের ফলে তাতারীরা পরাজিত হয়। থমকে যায় তাদের বিজয়রথ। এই যুদ্ধ জয়ের দুমাস পর মিশরে ফেরার পথে নিহত হন সাইফুদ্দিন কুতুয। *(বিস্তারিত জানতে দেখুন ড. আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি রচিত 'আস সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ওয়া মারিকাতু আইনি জালুত' এবং ড. কাসেম আবদুহু কাসেম রচিত 'আস সুলতানুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুয বাতালু মারিকাতি আইনি জালুত')*

দ্য প্যান্থার ও সাইফুদ্দিন কুতুয

দ্য প্যান্থার বইয়ের লেখক শুরু থেকেই কুতুযের উপর একের পর এক অভিযোগ করেছেন। তাকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। কুতুযের উপর তার আপত্তিগুলো নিম্মরুপ—

১। কুতুয নিজের ক্ষমতা মজবুত করতে শাজারাতুদ দুরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়েছেন।
২। হালাকুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কুতুযের ছিল না।
৩। কুতুয আইন জালুত থেকে পালাতে চাচ্ছিলেন।
এবার এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

শাজারাতুদ দুরকে কেনো হত্যা করা হলো?

শাজারাতুদ দুর ছিলেন আইয়ুবী সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের স্ত্রী। তিনি ছিলেন তুর্কি দাসী। ৬৪৭ হিজরীতে নাজমুদ্দিন আইয়ুব ইন্তেকাল করলে তার ছেলে তুরান শাহ ক্ষমতায় আসেন। তুরান শাহর সাথে সৎ মা শাজারাতুদ দুরের বিরোধ শুরু হয়।

শাজারাতুদ দূরের পরামর্শে রুকনুদ্দিন বাইবার্স, ফারেসুদ্দিন আকতাইসহ অন্যান্য মামলুকরা তুরান শাহকে হত্যা করেন। এটি ৬৪৮ হিজরীর ঘটনা[৪০০] তুরান শাহের মৃত্যুর পর শাজারাতুদ দূর নিজেকে মিসরের রানী ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন নানা গুনে গুনান্বিত একজন মহিলা। শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতায় আরোহনের ফলে সর্বত্র নিন্দার ঝড় উঠে।

বাগদাদের খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ এক পত্রে মিসরবাসীকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, আপনাদের মধ্যে পুরুষের অভাব থাকলে আমাকে জানান, এখান থেকে পুরুষ পাঠিয়ে দিব।[৪০১] পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শাজারাতুদ দুর ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। তবে তিনি একটি কৌশল করেন। তিনি ইযযুদ্দিন আইবেককে বিয়ে করেন।

ইযযুদ্দিন আইবেক পরবর্তি সুলতান মনোনিত হন। মূলত ক্ষমতার কলকাঠি ছিল শাজারাতুদ দুরের হাতেই। ক্ষমতায় এসে ইযযুদ্দিন আইবেক নিজেকে স্ত্রীর প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালান। শাজারাতুদ দুরের প্রভাব খর্ব হতে থাকে। বিষয়টি শাজারাতুদ দূর মানতে পারছিলেন না। তাই তিনি ৬৫৫ হিজরীতে ইযযুদ্দিন আইবেককে হত্যা করেন।[৪০২]

হত্যার পর সাইফুদ্দিন কুতুয কয়েকজন সালারসহ প্রাসাদে যান। ইযযুদ্দিনের খুনিদের একজনকে সেখানে হত্যা করা হয়। শাজারাতুদ দুরকে বন্দী করা হয়। কয়েকদিন পর নুরুদ্দিন ক্ষমতায় আরোহন করলে শাজারাতুদ দুরকে নুরুদ্দিনের মা তথা ইযযুদ্দিনের আগের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নুরুদ্দিনের মা দাসীদের নির্দেশ দেন খড়মের আঘাতে শাজারাতুদ দুরকে মেরে ফেলতে। খড়ম দিয়ে পিটিয়ে

---

[৪০০] আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ম খন্ড, ৪৫৭/৪৫৮ পৃষ্ঠা– আল্লামা মাকরেজি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[৪০১] হুসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা– জালালুদ্দিন সুয়ুতী। দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবী।

[৪০২] ক)তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম, ৪৮শ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত।

খ)আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ম খন্ড, ৪৯৪পৃষ্ঠা– আল্লামা মাকরেজি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করা হয়। (শাজারাতুদ দুরের জীবনি জানতে দেখুন ড. নুরুদ্দিন খলিল লিখিত শাজারাতুদ দুর)।

এ বিষয়ে প্যান্থার লেখকের বক্তব্য হলো, শিশু সুলতানকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে গেলে মা শাজারাতুদ দূর বাগড়া দিতে পারেন, এই ভয়ে শাজারাতুদ দূর এর একটা বিহিত করার মনস্থ করলেন কুতুয। সেমতে তাকে গ্রেফতার করালেন তিনি। কুতুযের প্রশ্রয়ে সেই ডাইনি শাজারাতুদ দুরকে ছিন্নবস্ত্র করে কায়রোর রাজপথে ঘুরালো। অবশেষে খড়ম দিয়ে পিটিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩৩)
এ বিষয়ে ঐতিহাসিক মাকরেজি লিখেছেন, মুইজ্জিয়া মামলুকরা ইযযুদ্দিনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা চাচ্ছিল শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করতে। নুরুদ্দিন ক্ষমতায় আরোহনের পর শাজারাতুদ দুরকে নুরুদ্দিনের মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আদেশে দাসীরা শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করে।[৪০৩]
মাকরেজির বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, মুইজ্জিয়া মামলুকরা প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল, আর নুরুদ্দিন ক্ষমতায় আসার পর শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করা সহজ হয়। বলে রাখা ভালো কুতুয তখনো পুরোদস্তুর শাসক হননি, তিনি ছিলেন নুরুদ্দিনের অভিভাবক। এই হত্যাকান্ড নুরুদ্দিনের শাসনকালের শুরুর দিকেই সংঘঠিত হয়েছিল, তখনে পরিস্থিতি কুতুযের নিয়ন্ত্রনে আসেনি। তাই কুতুয এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন সরাসরি একবাক্যে বলে দেয়াটা বড় ধরনের ভুল।
ইবনুল ইমাদও তার গ্রন্থে শাজারাতুদ দুরের হত্যাকান্ডের সাথে কুতুযকে জড়াননি।[৪০৪] ইবনে তাগরি বারদি আন নুজুমুয যাহিরা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা গ্রন্থে শাজারাতুদ দুরের হত্যাকান্ডের আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেখানেও এর সাথে কুতুযের সংশ্লিষ্টতার আভাস নেই।[৪০৫]
খাইরুদ্দিন যিরিকলি লিখেছেন, পিতার মৃত্যুর জন্য নুরুদ্দিন শাজারাতুদ দুরকে বন্দী করেন এবং তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে তার আদেশে শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করা হয়।[৪০৬]
ড. আহমাদ খলিল জুমআ লিখেছেন, স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইযযুদ্দিনের আগের স্ত্রী শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করেন।[৪০৭] এখানেও কুতুযকে জড়ানো হয়নি।

---

[৪০৩] আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ম খন্ড, ৪৯৪পৃষ্ঠা– আল্লামা মাকরেজি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
[৪০৪] শাজারাতু যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব, ৭ম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা– ইবনুল ইমাদ। দার ইবনে কাসির, বৈরুত।
[৪০৫] আন নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা, ৭ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা– ইবনে তাগরি বারদি।
[৪০৬] আল আ’লাম, ৩য় খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা– খাইরুদ্দিন যিরিকলি।
[৪০৭] নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা, ২১৬ পৃষ্ঠা– ড আহমাদ খলিল জুমআ। আল ইয়ামামা, দামেশক।

শাজারাতুদ দুরের জীবনিকার ড. নুরুদ্দিন খলিল লিখেছেন, নতুন সুলতানের আদেশে শাজারাতুদ দুরকে ইযযুদ্দিনের আগের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি সাত বছর ধরে এমন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। শাজারাতুদ দুরের কারনে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছিল। তিনি দাসীদের আদেশ দিলেন শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করতে।[৪০৮]

পরিস্থিতি বিশ্লেষনে বুঝা যায়, ইযযুদ্দিন আইবেকের হত্যার বদলা কিংবা ইযযুদ্দিনের আগের স্ত্রীর ক্ষোভ থেকেই শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করা হয়। এর পেছনে কুতুযের উসকানি থাকার কোনো প্রমাণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে অনুপস্থিত।

হালাকুর পত্র পেয়ে কুতুয ভয় পাচ্ছিলেন?

৬৫৮ হিজরীতে হালাকু খান মিসরে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুযের কাছে একটি পত্র পাঠান। এই চিঠিতে হালাকু খান পরিস্কার হুমকি দিয়ে শর্তবিহীন আত্মসমর্পন করতে বলেছিল। আর নইলে যুদ্ধ ও মৃত্যুর হুমকি।

এই ঘটনা বর্ননা করতে গিয়ে দ্য প্যান্থার বইয়ের লেখক লিখেছেন, সুলতান কুতুজ রাগে অগ্নিমর্শা হলেও এর জবাবে কার্যকর কিছুই করলেন না। অবশ্য সে মুরোদ তার ছিলও না। (৫৫ পৃষ্ঠা)

লেখকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, সাইফুদ্দিন হালাকুর পত্র দেখে ভীত হয়েছিলেন। তার মধ্যে দৃঢ়তাও ছিল না। এবার দেখা যাক ইতিহাসগ্রন্থগুলো কী বলে?

আল্লামা মাকরেজি লিখেছেন, হালাকুর পত্র পেয়ে কুতুয আমিরদের সাথে পরামর্শ করেন। আমিররা তাতারীদের মোকাবেলা করতে ভয় পাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল না তাতারীদের মুখোমুখি হতে। সাইফুদ্দিন কুতুয তখন আমিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুসলমান নেতারা, আপনারা দীর্ঘদিন বাইতুল মালের সম্পদ গ্রহন করেছেন।

আর এখন যুদ্ধে যেতে আপনারা অনাগ্রহী। আমি জিহাদে যাচ্ছি। যে জিহাদ কামনা করে, সে আমার সাথী হতে পারে। অন্যথায় সে ঘরে বসে থাকুক,নিশ্চয় আল্লাহ তাকে দেখবেন। মুসলমানদের সম্মানহানীর গুনাহ জিহাদ থেকে বিরত থাকা লোকদের ওপর বর্তাবে। কুতুযের কথা শুনে আমিরদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাতেরবেলা কুতুয ঘোড়ায় আরোহন করলেন, সবাইকে বললেন আমি একাই তাতারীদের সাথে লড়াই করতে যাবো।[৪০৯]

---

[৪০৮] শাজারাতুদ দূর, ৮৬ পৃষ্ঠা– ড নুরুদ্দিন খলিল।

[৪০৯] আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ম খন্ড, ৫১৫ পৃষ্ঠা– আল্লামা মাকরেজি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

মাকরেজির বর্ননা থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, সভাসদ ও আমিররা তাতারীদের সাথে লড়তে না চাইলেও কুতুয তাতারীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ চাইছিলেন। এমনকি তিনি বলেছেন, তিনি একাই তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়বেন! অথচ তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তার কার্যকর কিছু করার মুরোদ ছিল না।
মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়াস হানাফী লিখেছেন, হালাকুর পত্র পেয়ে কুতুয তার সভাসদদের সাথে বৈঠকে বসেন। তিনি তাদের বলেন, যদি তোমরা তাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে না যাও তাহলে শীঘ্রই তারা তোমাদের শহর দখল করে নিবে। তারা বাগদাদে যা করেছে আমাদের সাথেও তা করবে। এরপর তিনি হালাকুর দূতদেরকে বন্দী করেন এবং জিহাদের ঘোষণা দেন।[৪১০]
রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ হামদানি লিখেছেন, হালাকুর পত্র পেয়ে কুতুয পরামর্শসভা আহবান করেন। একজন সভাসদ বলে উঠে, হালাকু খান চেংখিজ খানের নাতী। ইতিমধ্যে সে এক বিশাল ভূখন্ড জয় করেছে। আমরা যদি তার কাছে গিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। এই কথা শুনে কুতুয বলেন, নাহ। আমরা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদেই যাচ্ছি।[৪১১]
ড. আলী সাল্লাবি লিখেছেন, সভাসদদের পরামর্শ শুনে কুতুয বললেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো, আমরা সবাই একসাথে জিহাদে যাব। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। আর পরাজিত হলেও আমরা মানুষের কাছে অপদস্থ হবো না।[৪১২]
বর্ননাগুলো থেকে পরিস্কার অন্য সভাসদরা তাতারিদের ভয় পেলেও কুতুয বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছিলেন না। মূলত সেই সভায় তিনি এবং বাইবার্স দুজনের কেউই তাতারীদের ভয় পাচ্ছিলেন না। এবং তারা তাতারীদের বিরুদ্ধে নিজেরাও জিহাদে বের হয়েছিলেন, আমিরদেরকেও বের করিয়েছিলেন।

কুতুয কি সত্যিই আইন জালুত থেকে পালাতে চাচ্ছিলেন?

২৫ রমজান ৬৫৮ হিজরীতে আইন জালুত ময়দানে মুসলিম বাহিনী তাতারী বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধের বর্ননা দিতে গিয়ে দ্য প্যান্থার বইয়ের লেখক লিখেছেন, পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী দেখে হতাশ কুতুজ মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ ছুড়ে দিয়ে পালাবার পথ খুজছিলেন। কিন্তু শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলায় সৈন্যরা তাকে চিনে ফেলে, তাই সুলতান কুতুজ চক্ষুলজ্জায় ‘হায় আমার ইসলাম’ বলে আর্তনাদ করে

---

[৪১০] বাদাইয়ূয যুহুর ফি ওয়াকাইয়ূদ দুহুর, ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা– মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়াস হানাফি।
[৪১১] জামিউত তাওয়ারিখ, ১ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা– রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ হামদানি।
[৪১২] আস সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ওয়া মারিকাতু আইনি জালুত, ১১৬ পৃষ্ঠা– ড আলি সাল্লাবি।

উঠেন এবং সৈন্যদের চিৎকার করে দৃঢ়পদে লড়ে যাওয়ার আহবান করেন কিন্তু সবই বৃথা যায়। (৬১ পৃষ্ঠা)
পুরো বইয়ের সবচেয়ে আপত্তিকর জায়গা এটি। এটি সরাসরি সত্যের বিপরীত তথ্য। এর মাধ্যমে সাইফুদ্দিন কুতুযকে কলুষিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। অবশ্য এ তথ্যটি এতটাই হাস্যকর, পাঠক একটু চিন্তা করলেই ভুল ধরে ফেলতে পারবে। প্রথমত, যে সেনাপতি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাবেন, তিনি শিরস্ত্রাণ খুলে সবাইকে চেহারা দেখিয়ে পালাবেন, এটা হাস্যকর। দ্বিতীয়ত, পালানোর সময় তিনি ওয়া ইসলামাহ বলে চিৎকার করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, এটাও মেনে নেয়ার মত নয়।

এবার ঐতিহাসিকদের বক্তব্য দেখে আসা যাক।

ঐতিহাসিক মাকরেজি লিখেছেন, তাতারী বাহিনীর তীব্র হামলায় সুলতানের বাহিনী কেপে উঠলো। তখন সুলতান কুতুয তার শিরস্ত্রাণ খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, ওয়া ইসলামাহ। তারপর তিনি সেনাদের কাতারে নেমে আসেন। এবং শক্তিশালী হামলা করেন। এরপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। তাতারী সেনাপতি কুতবুগা নিহত হয়।[৪১৩]
আবদুল্লাহ সাইদ মুহাম্মদ সাফির গামেদি লিখেছেন, যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়ছিল। এসময় কুতুয চিৎকার করে তিনবার ওয়া ইসলামাহ বলেন। তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ আপনার বান্দা কুতুযকে তাতারীদের মোকাবেলায় সাহায্য করুন। এই বলে তিনি সেনাদের মাঝে নেমে আসেন।তাকে দেখে সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তারা তাতারিদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে।[৪১৪]
ফায়েদ হাম্মাদ মুহাম্মদ আশুর লিখেছেন, সাইফুদ্দিন কুতুয ওয়া ইসলামাহ বলে ময়দানে নেমে আসেন। তার এই হুংকারেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। [৪১৫]

---

[৪১৩] আস সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ম খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা– আল্লামা মাকরেজি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
[৪১৪] জিহাদুল মামালিক দিদ্দুল মগুল ওয়াস সলিবিয়্যিন, ১২৩ পৃষ্ঠা– আবদুল্লাহ সাইদ মুহাম্মদ সাফির গামেদি
[৪১৫] আল জিহাদুল ইসলামি দিদ্দুস সলিবিয়্যিন ওয়াল মুগল ফিল আসরিল মামলুকি, ১১২ পৃষ্ঠা- ফায়েদ হাম্মাদ মুহাম্মদ আশুর

কুতুয সম্পর্কে অনুরূপ তথ্যই দিয়েছেন আলি মোহাম্মদ আস সাল্লাবি[৪১৬] ও ড. কাসেম আবদুহু কাসেম[৪১৭].
দেখা যাচ্ছে, যে ঘটনাটি ছিল কুতুযের সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত, যে ঘটনার ফলে যুদ্ধের গতিপথ পালটে গিয়েছিল, লেখক তাকেই ব্যবহার করেছেন কুতুযের বিরুদ্ধে। লিখেছেন কুতুয পালাতে চাচ্ছিলেন।

কুতুযের হত্যাপ্রসংগে

দ্য প্যান্থার বইয়ের লেখক লিখেছেন, কুতুযকে দুজন মামলুক হত্যা করেছে। (৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠা)। ৬৭ পৃষ্ঠায় এ তথ্য লিখে তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন মাকরেজির আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক গ্রন্থের। অথচ মাকরেজির সেই গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠায় পরিস্কার লেখা আছে কুতুযকে বাইবার্স হত্যা করেছেন।
এ বিষয়ে লম্বা আলোচনায় যাবো না। শুধু কিছু বই ও পৃষ্ঠা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আগ্রহী পাঠক মিলিয়ে নিতে পারবেন। সবাই লিখেছেন কুতুযকে বাইবার্সই হত্যা করেছেন।

১। তারিখুল ইসলাম, ৪৮/৩৫৫– ইমাম যাহাবী।
২।আনু নুজুমুজ জাহিরা, ৭/১০২– ইবনে তাগরি বারদি।
৩। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৭/৪০৪– ইবনে কাসির।
৪। তারিখ ইবনে খালদুন, ৫/৪৩– ইবনে খালদুন।
৫। আর রওযুয যাহির ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির, ৬৮ পৃষ্ঠা– মুহিউদ্দিন বিন আব্দুজ জাহের
৬। হায়াতুল মালিকিজ জাহির বাইবার্স, ৮৩ পৃষ্ঠা– মাহমুদ শিবলী।
৭। আস সুলতানুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুয বাতালু মারিকাতি আইনি জালুত, ১৪৬ পৃষ্ঠা– ড. কাসেম আবদুহু কাসেম।
৮। আস সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ওয়া মারিকাতু আইনি জালুত, ১২৯ পৃষ্ঠা– আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি।

---

[৪১৬] আস সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয ওয়া মারিকাতু আইনি জালুত, ১২২ পৃষ্ঠা– আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি।
[৪১৭] আস সুলতানুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুয বাতালু মারিকাতি আইনি জালুত, ১৩১ পৃষ্ঠা– ড. কাসেম আবদুহু কাসেম।

শেষ কথা

প্যান্থার সম্পর্কে লেখার উদ্দেশ্য ছিল এই বইয়ে থাকা ভুলগুলো সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করা। ইতিমধ্যে প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। তারা জানিয়েছেন, অচিরেই যোগ্য কাউকে দিয়ে বইটি সম্পাদনা করানো হবে। তাদের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই। একইসাথে আমরা আশা করবো, ভবিষ্যতে যে কেউ, যেকোনো বই প্রকাশের আগে বইয়ের বানান ও ভাষারীতির পাশাপাশি বইয়ের তথ্যগুলোও নিরীক্ষণ করে নিবেন।

হারুনুর রশিদের রাজ্যে   পাঠ প্রতিক্রিয়া- ১

নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত, নাজমুস সাকিব অনুদিত, ড. আহমাদ আমিনের 'হারুনুর রশিদের রাজ্যে' বইটি পড়া হয়েছে।বইটির প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন, বাঁধাই মজবুত, অনুবাদ সুখপাঠ্য। বইটি রচিত হয়েছে আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের জীবন, শাসন ও তার সময়কালের জনজীবন নিয়ে। বাংলায় ইতিহাস বিষয়ক বইপত্রের শূন্যতা আছে। নবপ্রকাশ এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে, এজন্য তাদের প্রশংসা করতেই হয়। আশা করি, আগামী দিনে তারা সুচিন্তিত নির্বাচনের মাধ্যমে পাঠককে সুন্দর সুন্দর বই উপহার দিবেন। আজকের এই লেখায় হারুনুর রশিদের রাজ্যে বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানানো যাক।

লেখক পরিচিতিতে অসতর্কতা

বইয়ের লেখক পরিচিতিতে লেখা আছে, আহমাদ আমিন তার জীবনে অমূল্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে ফাজরুল ইসলাম, দুহাল ইসলাম, জুহরুল ইসলাম ও ইয়াওমুল ইসলাম গ্রন্থসমূহ বেশ পরিচিতি লাভ করে। তোহা হোসাইন এ সম্পর্কে বলেছেন, এ গ্রন্থগুলোর কারণে আহমাদ আমিন অমর হয়ে থাকবেন। বিশ্ববাসীকে তিনি এক বিরাট উপহার দিয়েছেনেই গ্রন্থগুলো রচনার মাধ্যমে।

শুরুতেই বলে রাখি, শুধু লেখকের জন্মসাল, মৃত্যুসাল আর বইপত্রের নাম উল্লেখ করে দেয়াই লেখক পরিচিতি নয়। । লেখক পরিচিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, লেখকের চিন্তাধারা, তার রচিত বইপত্রের মান ইত্যাদী উল্লেখ করে দেয়া। এই বিষয়গুলো উল্লেখ না করলে সাধারণ পাঠকের কাছে সঠিক চিত্রটি স্পষ্ট হবে না।

নবপ্রকাশ কর্তৃপক্ষ এই বইতে লেখকের চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। তবে তার বইপত্রকে 'অমূল্য' বলে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এখানে আমরা লেখক ও তার বইপত্র সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করবো। আহমাদ আমিন একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচন্ডভাবে ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত। এই প্রভাবের কারণে 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থে তিনি অনেক হাদিস অস্বীকার করেছেন, হাদীস সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছেন,

হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন, এমনকি সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন মুহাদ্দিসদের ব্যাপারেও।

তার সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর (র) লিখেছেন, ১৯৩৮/৩৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরি লেখক আহমাদ আমিনের ফাজরুল ইসলাম ও দুহাল ইসলাম পড়ার সুযোগ হয়। বইদুটি নববী, উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে লেখা। বইদুটি লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ ও সুন্দর সিদ্ধান্তে পৌছার উৎকৃষ্ট নমুনা। তবে এই বই পাঠে হাদিস শাস্ত্রের প্রতি ভরসা অনেকটাই বিনষ্ট হয়, এমনকি এই শাস্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভক্তি নষ্ট হয়, যা একজন মুসলমানের অন্তরে থাকা আবশ্যক। সে সময় আমার অনভিজ্ঞতা ও সমালোচকসুলভ মানসিকতার অভাবে তার লেখার এইসব সীমাবদ্ধতার অনুভূতি আমার হয়নি। এর সঠিক অনুভূতি ও জ্ঞান আমার তখন হয়েছে যখন আমি শায়খ মুস্তফা আস সিবাঈর কিতাব 'আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলামি' অধ্যয়ন করি।[৪১৮]

ড. মুস্তফা আস সিবাঈ তার অমর গ্রন্থ 'আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলামি'তে আহমাদ আমিনের বিভ্রান্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাদিসশাস্ত্রের উপর তার আরোপিত অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। আহমাদ আমীন গবেষক হিসেবে শতভাগ সৎ ছিলেন না, তার বিবরণ পাওয়া যায় শায়খ মোস্তফা আস সিবাঈর লেখায়। তিনি লিখেছেন, ১৩৬০ হিজরিতে জামেয়া আজহারে ডক্টর আলি হাসান আবদুল কাদেরের ইমাম যুহরি সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তখন আহমাদ আমিন তাকে বলেন, আজহারে স্বাধীন গবেষণা ও মুক্তচিন্তার সুযোগ নেই। এজন্য আপনি ওরিয়েন্টালিস্টদের যেকোনো বক্তব্য গ্রহণ করুন এবং এসব বক্তব্য তাদের দিকে সম্পৃক্ত না করে নিজের গবেষণার ফলাফল বলে চালিয়ে দিন। উপস্থাপনে সুক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করুন যেন কেউ বুঝতে না পারে। আমার গ্রন্থ দুহাল ইসলাম ও ফাজরুল ইসলামে আমি এমনটাই করেছি।[৪১৯]

আহমাদ আমিনের বিভ্রান্তিগুলোর বিশদ বর্ননা দেয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মুস্তফা আস সিবাঈর 'আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলামি' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে আহমাদ

---

[৪১৮] মেরি ইলমি ও মুতালাআতি জিন্দেগি, পৃষ্ঠা- ২৩/২৪-- সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ একাডেমী)

[৪১৯] আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলামি, পৃষ্ঠা- ২৬৬ - ড. মুস্তফা আস সিবাঈ। (দারুল ওয়াররাক, ২০০০ খৃষ্টাব্দ)

আমীনের চিন্তাধারা ও তার বইপত্রের মান সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমরা মনে করি লেখক পরিচিতিতে আহমাদ আমিনের ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত হওয়া এবং ফাজরুল ইসলাম ও দুহাল ইসলাম গ্রন্থে তার হাদিস অস্বীকার করার বিষয়টি উল্লেখ করে দেয়া উচিত ছিল। আলেম এবং মাদরাসার ছাত্ররা সাধারণত অনুদিত বই পড়েন না। বা পড়লেও আহমাদ আমিনের চিন্তা ও লেখালেখি সম্পর্কে ধারণা থাকার কারণে তাদের সমস্যা হবে না। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ পাঠক যারা হয়তো এই বইয়ের মাধ্যমেই আহমাদ আমিনকে চিনবে, তাদের কাছে বিষয়গুলো পরিস্কার করা দরকার ছিল। অন্তত লেখকের অবস্থান পাঠকের জানা থাকা দরকার। এখানে বলে রাখা দরকার, আহমাদ আমিন সম্পর্কে তোহা হোসাইনের যে বক্তব্য বইতে উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই, কারণ তোয়াহা হোসাইন নিজেই ছিলেন প্রচন্ড ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত।
আহমাদ আমিন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করছি তার সম্পর্কে ডক্টর শাওকি আবু খলিলের মূল্যায়ন উদ্ধৃত করে। তিনি লিখেছেন, আহমাদ আমিন ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তথ্যের পরিশোধন, মূল উৎসের পাঠ, উদ্ধৃত তথ্যের সত্যতা এসব থেকে অনেক দূরে ছিল তার অবস্থান। তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত।
আহমাদ আমিনের অসততার কথা উল্লেখ করেছেন শাওকি আবু খলিলও। তিনি লিখেছেন, আহমাদ আমিন জামেয়া আজহারের ইতিহাস বিভাগের একজন অধ্যাপককে বলেছিলেন, ওরিয়েন্টালিস্টদের যেকোনো চিন্তা ও বক্তব্যকে নিজের কথা বলে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করুন। সরাসরি ওরিয়েন্টালিস্টদের নাম নিলে ছাত্ররা তা অপছন্দ করবে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনি প্রজন্মের মগজে যা গেথে দিতে চাইবেন তা সহজে পারবেন।[৪২০]
বইয়ের ভেতরে

হারুনুর রশিদের মদপান

বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠায় হারুনুর রশিদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, আবার কখনো দুনিয়া নিয়ে মেতে উঠতেন, মদ্যপান ও সঙ্গীত নিয়ে তখন তাকে ব্যস্ত দেখা যেত।
এখানে এসে চমকে গিয়েছি। আশা ছিল এমন স্পর্শকাতর স্থানে অনুবাদক টীকা দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন। হারুনুর রশিদের নামে মদপানের অভিযোগ মিথ্যা। ইবনে খালদুন মদপানের অভিযোগকে ভিত্তিহিন স্যবস্ত করে লিখেছেন, ঐতিহাসিকগন সম্রাট হারুনের সুরাসক্তি ও অন্তরংগদের সাথে সুরাপানের আসর

[৪২০] হারুনুর রশিদ, পৃ- ২১৩ - ড. শাওকি আবু খলিল। (দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ)

বসানোর যে অবমাননার কাহিনি বর্ননা করেছেন, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তার সম্পর্কে অনুরুপ দুর্মতির কোনো জ্ঞানই আমাদের নেই। খেলাফতের উত্তরসূরী, ধর্ম ও ন্যায়পরায়নতার প্রতিভূ সম্রাট হারুনের পক্ষে এটা কীভাবেই বা সম্ভব । তিনি সর্বদা জ্ঞানীগুনি ও আধ্যাত্মিক মনিষীদের সাহচর্যে থাকতেন। ফুজাইল ইবনে ইয়াজ, ইবনে সামাক, উমরির ন্যায় গুনিদের সাথে আলচনা করতেন। সুফিয়ান সাউরির ন্যায় মনিষীর সাথে তার পত্রালাপ চলতো।[৪২১]

মদের ব্যাপারে খলিফার অনাসক্তি বুঝতে এটাই যথেষ্ট যে, খলীফা মদপানের কারনে কবি আবু নাওয়াসকে গ্রেফতার করেন এবং মদপান ত্যাগ করার আগে তাকে মুক্তি দেয়া হয় নি।

ডক্টর শাওকি আবু খলিল লিখেছেন, ইমাম মালেক, আবুল আতাহিয়া, কাজি আবু ইউসুফ প্রমুখ খলিফা হারুনুর রশিদকে যে উপদেশ দিতেন সেখানে যুহদ, মৃত্যুর স্মরণ, আল্লাহর ভয়, রাজত্বের লোভ পরিহার এসব বিষয় ছিল। কিন্তু তাদের কোনো উপদেশে মদপানের বিষয়ে কিছু নেই। যদি সত্যিই খলিফা মদপানে অভ্যস্ত হতেন তাহলে এ বিষয়েও তাদের নসিহত পাওয়া যেত।[৪২২]

আহমাদ আমিন খলিফা সম্পর্কে মদপানের অভিযোগ তুলেছেন। অনুবাদক আমানতদারীতার সাথে অনুবাদ করে গেছেন, টীকা লাগানোর সামান্য প্রয়োজন অনুভব করেননি। মদপানের অভিযোগ তোলা হয়েছে এমন এক খলিফা সম্পর্কে যার ব্যাপারে ফুজাইল ইবনু ইয়াজ বলেছিলেন, হারুনুর রশিদ ছাড়া আর কারো মৃত্যু আমার জন্য এত কষ্টদায়ক নয়। আল্লাহ যদি আমার জীবন থেকে কিছুটা নিয়ে হারুনের জীবন বৃদ্ধি করে দিতেন। আম্মার বিন লাইস ওয়াসেতি বলেন, হারুনের মৃত্যুর পর যখন একের পর এক ফিতনা আসা শুরু হলো, খলিফা মামুন খলকে কুরআনের মতবাদ নিয়ে এলেন মানুষের কাছে তখন আমরা বুঝলাম ফুজাইল ইবনু ইয়াজ যা বলেছেন বুঝেশুনেই বলেছেন।[৪২৩]

মজার কথা হলো, আহমাদ আমিন নিজেই অন্যত্র মদপানের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তার লিখিত দুহাল ইসলাম গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ইবনে খালদুনের সাথে আমরা একমত, হারুনুর রশিদ মদপান করতেন না। *(দুহাল ইসলাম, ১/১১৪- আহমাদ আমিন)*

---

[৪২১] আল মুকাদ্দিমা (১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) – আবদুর রহমান ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

[৪২২] হারুনুর রশিদ, পৃ- ২১৫ - ড. শাওকি আবু খলিল। (দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ)

[৪২৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খন্ড ৯, পৃ-৮৯ -- হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪০২ হিজরি।

আহমাদ আমিন লিখেছেন সংগিত নিয়েও তাকে ব্যস্ত দেখা যেত। এই সংগিত কেমন ছিল, ডক্টর শাওকি আবু খলিলের লেখা থেকেই জানা যাক। তিনি লিখেছেন, হারুনুর রশিদের মজলিসের কথা প্রসিদ্ধ। শরয়ী সীমার মধ্যে থেকেই এটি পরিচালিত হতো। সুন্দর কণ্ঠে সাহিত্যমান সম্পন্ন কবিতা আবৃত্তি করা হতো। আহমাদ আমিন অবশ্য এত বিস্তারিত আলাপে যাননি। একবাক্যে বলে দিয়েছেন, খলিফা মদ ও সংগিত নিয়ে মেতে উঠতেন। যার কোনোটিই প্রমানিত নয়।

যে চিত্র সামনে আসে

বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন, কিতাবুল আগানির লেখকের মতে, সে যুগে পর্দার প্রচলন উল্লেখযোগ্য ছিল না। মহিলারা পুরুষদের সাথে চলাফেরা ও উঠাবসা করত। রাতের বেলা যেসব গল্পের আসর চলত, সেখানে মহিলারাও থাকত।

এই কয়েকটি বাক্য সেকালের জনজীবন ও মহিলাদের সম্পর্কে আমাদের সামনে একটি চিত্র উপস্থাপন করে। কথা হলো, আসলেই কি চিত্রটি এমন ছিল? আহমাদ আমিন এখানে রেফারেন্স দিয়েছেন কিতাবুল আগানির। শুধু এখানেই নয় আহমাদ আমিন তার এ গ্রন্থে বারবার রেফারেন্স দিয়েছেন আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির কিতাবুল আগানির । এই বইটি তথ্যের উৎস হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। কিতাবুল আগানির লেখক আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি ছিলেন শিয়া। তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযি লিখেছেন, তিনি তার গ্রন্থে পাপাচার উসকে দিয়েছেন। মদপানকে হালকা করে দেখিয়েছন। যে কেউই গভীরভাবে তার আল আগানি গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে শুধু ঘৃণ্য আর খারাপ কাজের বর্ননাই পাবেন।[৪২৪]

ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি আজব আজব সব ঘটনা বর্ননা করেছেন।[৪২৫] আবু মুহাম্মদ হাসান বিন হাসান নুবাখতির সূত্রে খতীব বাগদাদি তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৪২৬]

কিতাবুল আগানি কখনোই ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়। এখানে যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাও সঠিক ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে না।

ডক্টর শাওকি আবু খলিলের ভাষায়, যে কেউ কিতাবুল আগানি পড়বে, সেখানে দেখবে আব্বাসিদের জীবন ছিল গান-বাজনা, অনর্থক কাজে পরিপূর্ণ। কিন্তু কেউ যদি ইতিহাসের মূল উৎসগুলোর দিকে ফিরে যায় তাহলে সেখানে সে দ্বীন, ইলম, তাকওয়া ও সভ্যতার এক অনুপম চিত্রই পাবে। আগানির লেখক জনজীবনের যে

---

[৪২৪] আল মুন্তাজাম, খন্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৮৫– ইবনুল জাওযি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা। বৈরুত, লেবানন।
[৪২৫] মিযানুল ইতেদাল, ৫ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা– হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা। বৈরুত, লেবানন।
[৪২৬] প্রাগুক্ত।

চিত্র আঁকেন তা অদ্ভুত তথ্যে ভরপুর। আর দ্বিতীয় যে চিত্র সামনে আসে সেটিই প্রকৃত চিত্র, এমন এক শাসকের চিত্র যিনি এক বছর হজ্ব করতেন, পরের বছর জিহাদ করতেন। যিনি প্রতি রাতে একশো রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।[৪২৭]

আহমাদ আমিন কিতাবুল আগানিকেই উৎস বানিয়েছেন এবং সেকালের সমাজের এমন চিত্র তুলে ধরেছেন যা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আহমাদ আমিন নিজেও কিতাবুল আগানিকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। এই বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, তাবারি, ইবনে খালদুন ও আবু ইউসুফের মতো ঐতিহাসিকরা তাঁর একরকম চিত্র উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আরব্য রজনী, কিতাবুল আগানি ও বারমাকিদের কালো অধ্যায় অন্য এক হারুনুর রশিদকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

আরেকটু এগিয়ে তিনি লিখেছেন, বলা যায়, ঐতিহাসিকদের মতটিই বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। কারণ, অন্য গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন স্বাধীন। ইতিহাসের বদলে গল্প বলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বর্ননার ক্ষেত্রে তারা সাবধানতা অবলম্বন করেনি।

কী অদ্ভুত। একদিকে তিনি নিজেই স্বীকার করছেন ঐতিহাসিকদের মতটি বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। আবার তিনিই এই বইতে একটু পরপর কিতাবুল আগানির উদ্ধৃতি দিয়ে নানা তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেকালের মহিলাদের পর্দার প্রচলন ছিল না, রাতের আসরে তারাও পুরুষদের সাথে বেপর্দা বসতো, এমন প্রচুর তথ্য তিনি নিয়েছেন কিতাবুল আগানি থেকে, যাকে কিনা তিনি নিজেই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ মনে করতেন না। আহমাদ আমিন কেনো এমনটা করেছেন তা বুঝতে হলে তার সম্পর্কে শুরুতে বলে আসা ঘটনা দুটি আমাদের সহায়তা করবে। সেখানে পরিস্কার দেখা যায়, আহমাদ আমিন নিজেও বুদ্ধিবৃত্তিক কারচুপি করতেন এবং অন্যদেরকেও একাজে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় আহমাদ আমিন লিখেছেন, আলিফ লায়লার গল্পের মতোই ছিল মহিলাদের স্বভাব। পরনিন্দা, ষড়যন্ত্র আর কূটচালে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত।

পুরো বইয়ের সবচেয়ে হাস্যকর অংশ এটি। লেখক একটি সমাজের মহিলাদের সম্পর্কে মন্তব্য করছেন আর তার দলিল হচ্ছে আরব্য রজনীর মত একটি গল্পের বই। আরব্য রজনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মিসর, পারস্য, ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত ফোক গল্পের একটি সংকলন এটি। এখানে বর্নিত গল্পগুলো ইতিহাসের কোনো সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। এমনকি আহমাদ

---

[৪২৭] জুরযি যায়দান ফিল মিজান, পৃ-১৬৪ - শাওকি আবু খলিল। (দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৪০১ হিজরি)

আমিন যাদের গবেষণায় মুগ্ধ সেই ওরিয়েন্টালিস্টদের একজন হ্যারল্ড ল্যাম্ব জানাচ্ছেন, গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন এই গল্পের সংগ্রহ কায়রো থেকে। হারুনের বলে কথিত কর্মকান্ডের বিরাট অংশ মূলত বাইবার্সের।[৪২৮]

আহমাদ আমিন কখনো কিতাবুল আগানির দারস্থ হয়েছেন, আবার কখনো আরব্য রজনির। আর এগুলোর কোনোটাই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়।

আব্বাসাকে নিয়ে বিভ্রান্তি

খলিফা হারুনুর রশিদের বোন আব্বাসা সম্পর্কে একটি প্রচলিত গল্প হলো তাঁর সাথে উজির জাফর বারমাকির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আহমাদ আমিন নিজেও এই গল্প বারবার উল্লেখ করেছেন। বইয়ের ৬৯ ও ৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি আমাদের জানিয়েছেন আব্বাসার সাথে জাফরের প্রেম ছিল এবং তাদের বিয়েও হয়েছিল। তিনি বারামেকাদের পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে জাফর ও আব্বাসার প্রনয়কেও উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বারামেকাদের পতনের সাথে আব্বাসা ও জাফরের প্রেমের সম্পর্কের গল্প তৈরী করা হয়েছে অনেক আগেই। তবারী প্রথম এই বর্ননা উল্লেখ করেছেন। এরপর এই গল্প ডালপালা মেলেছে। ঐতিহাসিক মাসউদি তো বিশাল এক কাহিনীও বানিয়েছেন। কিন্তু মাসউদির বর্ননা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার এই কথাই যথেষ্ট, মাসউদির বইতে এত বেশি ভুল ও বানোয়াট তথ্য আছে যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে গননা করা সম্ভব নয়।[৪২৯]

তবারির আলোচনাতেই আসা যাক। তবারির বর্ননামতে, খলিফা যৌন মিলন না করার শর্তে আব্বাসার সাথে উজির জাফরের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মিলন করে এবং একটি সন্তানের জন্ম হয়। খলিফা রেগে শিশুটিকে হত্যা করেন এবং জাফরকেও হত্যা করেন।[৪৩০]

তবারির এই বর্ননার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, তবারির আগে কেউই এই বর্ননা আনেননি। বারামেকাদের পতনের পর আবু নাওয়াস ও অন্যান্য কবিরা যেসব কবিতা লিখেছেন তাতেও এ সম্পর্কে আভাস নেই। ইবনে খালদুন তাই এ ঘটনাকে বানোয়াট বলেছেন। তিনি লিখেছেন, জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার সাথে আব্বাসার

---

[৪২৮] The Crusades The Flame Of Islam, p-৩৪৪ - Harold Lamb. Thornton Butterworth Limited.

[৪২৯] মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৮৪ - শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা। জামিয়া ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ, ১৪০৪ হিজরি।

[৪৩০] তারীখে তাবারী , ৮ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা– আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী। দারুল মাআরিফ, কায়রো।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কী করে সম্ভব হতে পারে? একজনের পূর্বপুরুষ রাসুলের (সা) পিতৃব্য ও কোরায়শ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আর অন্যজনের পিতৃব্য অনারব পারস্যবাসী। আব্বাসিয়রাই বারমাকিদের ক্রীতদাসের কলংক থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেন। চিন্তাশীল পাঠক যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন তাহলে তার বিবেক কিছুতেই এই কথা সমর্থন করবে না যে, আব্বাসা নিজ বংশের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত একজনের সাথে এ প্রকার সম্পর্কে রাজী হবেন।[৪৩১]

কিন্তু আহমাদ আমিন ইবনে খালদুনের গবেষণা মানতে নারাজ। গায়ের জোরে তিনি বলে বসেছেন, ইবনে খালদুন এ বিষয়ে যা বলেছেন সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। (পৃষ্ঠা-৯৭)

আব্বাসার বিয়ে সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহনযোগ্য বক্তব্য দিয়েছেন আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি। তার জন্ম ২১৩ হিজরীতে। অর্থাৎ, জাফরের হত্যাকান্ডের ২৬ বছর পরে। জীবনের এক দীর্ঘ সময় তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। সেসময় বাগদাদে বারমাকিদের অনেকেই বেচে ছিল যারা জাফর হত্যাকান্ডের পূর্বাপর জানতো। যদি বারমাকিরা জাফর হত্যার জন্য আব্বাসার সাথে জাফরের বিবাহের গল্প বলতো তাহলে আবু আবদুল্লাহ অবশ্যই সে তথ্য উল্লেখ করতেন। কিন্তু আব্বাসা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, আব্বাসার প্রথম বিবাহ হয় মুহাম্মদ বিন সোলায়মান বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে। মুহাম্মদ মারা গেলে পরে ইবরাহীম বিন সালেহ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়।[৪৩২]

আব্বাসার জন্ম হয় ১৫৪ হিজরীতে, কুফায়। ১৭২ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন সোলায়মানের সাথে তার বিয়ে হয়। মুহাম্মদ বিন সোলায়মান ছিলেন বসরার গভর্ণর। ১৭৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে আব্বাসার বিয়ে হয় ইবরাহীম বিন সালেহর সাথে। আবু আব্দুল্লাহ দিনাওয়ারি ছাড়াও এই বিয়ের উল্লেখ করেছেন সালেহ হিন্দী। তিনি হারুনুর রশীদের রাজ চিকিতসক ছিলেন। একবার ইবরাহিম বিন সালেহ প্রচন্ড অসুস্থ হলে তিনি চিকিতসা করেন। ইবরাহিম

---

[৪৩১] আল মুকাদ্দিমা (১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা) –ইবনে খালদুন। দার ইয়ারাব। দামেশক।

[৪৩২] আল মাআরিফ (৩৯৪ পৃষ্ঠা)– আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দিনাওয়ারি। উর্দু সংস্করণ। কিরতাস পাবলিকেশন্স, করাচী।

সুস্থ হলে আব্বাসার সাথে তার বিয়ে হয়। সময়কাল ১৭৬ হিজরী।[৪৩৩] ইবরাহীমকে মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ও আব্বাসা মিসরেই ইন্তেকাল করেন।[৪৩৪] আধুনিক গবেষকদের প্রায় সকলেই একমত আব্বাসার সাথে জাফরের প্রেম ও বিবাহের ঘটনা বানোয়াট। এ বিষয়ে আরো জানতে দেখুন

-নিসাউন ফি কুসুরিল উমারা, পৃ-৩৩৪ - ড. আহমাদ খলিল জুমআ। দারুল ইয়ামামা, দিমাশক, ১৪২১ হিজরি।
-জুরযি যায়দান ফিল মিযান, পৃ ১৬৭- ড. শাওকি আবু খলিল। (দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৪০১ হিজরি)
-আল আব্বাসিয়্যুনাল আকবিয়া, পৃ-৪৫০ - মুহাম্মদ ইলহামি। মুআসসাসাতু ইকরা, কায়রো, ২০১৩ খৃষ্টাব্দ।
-তানকিয়াতু উসুলিত তারিখিল ইসলামি, পৃ-১১৯ - ড. হুসাইন মুনিস। দারুর রাশাদ, কায়রো, ১৪১৭ হিজরি।
আহমাদ আমিন এ গবেষনার পথে যাননি। বরাবরের মতই অনির্ভরযোগ্য বর্ননা দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন।
অরণ্যে রোদন
ভাষাজ্ঞান আর শাস্ত্রীয় জ্ঞান এক নয়। ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে আপনি কোনো ভাষায় রচিত বইপত্র পড়তে পারবেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞান ছাড়া আপনি সেসব বই থেকে খুব একটা উপকৃত হবেন না। কেন যেন আমাদের অনুবাদজগতে ভাষাজ্ঞানের উপরই জোর দেয়া হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দিকে বিবেচনা করা হয় না। ফলে অনুবাদকরা চোখ বুঝে অনুবাদ করে যান, এবার মূলে সত্য-মিথ্যা যাই থাকুক না কেনো। তারা মূল বইটির তথ্যের বিশুদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামান না, কোথাও টীকা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তারা ধরেই নিয়েছেন, 'আরবীতেই যেহেতু লেখা হয়েছে, সব সহিই লেখা হয়েছে'। এ প্রবণতা থেকে বের হওয়া দরকার। যে যে বিষয়ে কাজ করবেন তার উচিত সে বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখা।

---

[৪৩৩] উয়ুনুল আনবা ফি তবাকাতিল আতিব্বা (৩২৪ পৃষ্ঠা)– ইবএন আবি উসাইবা। মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত।

[৪৩৪] আল বারামেকা , (২৭৭ পৃষ্ঠা) — মুনশী আব্দুর রাজ্জাক কানপুরী।নামী প্রেস, কানপুর

সোনালি দর্পণে

- ইমরান রাইহান

আমি দিওয়ান-ই-আমে বেজে উঠা গালিবের সেই অমর সুর,
আমি হেরাত থেকে গজনীর পথে হেটেছি বহুদূর।
আমি খোরাসান থেকে খারিজম, বিশাল উপত্যকা,
আমি ফারগানা থেকে দিল্লীর পথে বাবরের পতাকা।
আমি পলাশী থেকে মহীশুর, পরাধীনতার কাহিনী,
আমি আফগান থেকে পানিপথ, শাহ আবদালীর বাহিনী।
আমি গৌড় থেকে সোনারগাঁ, বারো ভুইঁয়ার শাসন,
আমি লালদিঘী থেকে শাপলা চত্বর, আহমদ শফীর ভাষন।
আমি রায় থেকে নিশাপুরের পথে থেমেছি সরাইখানায়,
আমি রেশম পথের দুই ধারে বসেছি গাছের ছায়ায়।
সমরকন্দের সোনালী গম্বুজে, দেখেছি রোদের ঝলক,
আল হামরার প্রাসাদ দেখে পড়েনি চোখের পলক।
আমি দামেশকের বাজারে ঘুরেছি, হাজারো মানুষের ভীড়ে,
অবশেষে ক্লান্ত পাখির ন্যায়, ফিরে গেছি নিজ নীড়ে।
আমি গজনী থেকে মুলতান, সুলতান মাহমুদের বাহিনী,
আমি কুতাইবা বিন মুসলিমের সমরকন্দ বিজয়ের কাহিনী।
আমি আটলান্টিকের তীরে দাঁড়িয়ে উকবা বিন নাফের পাশে,
হারানো ঐতিহ্যের কথা ভাবলে এখন, দু চোখে জল আসে।

আমি কর্ডোভা, বাগদাদ আর গ্রানাডার কুতুবখানা,
আমি আগ্রা থেকে লাহোরের পথে আজো হই দিওয়ানা।
আমি ইমাম বুখারীর দরসে বসেছি নব্বই হাজারের সাথে,
আমি ইলমের সন্ধানে ছুটে চলেছি মধ্য এশিয়ার পথে।
আমি হাজারো মুহাদ্দিসের দেশ 'মা ওয়ারাউন্নাহার'
চলার পথে বাধা হয়নি সাগর কিংবা পাহাড়।
আমি ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা', সুয়ুতির 'আল ইতকান',
আমি ইয়ামানের পথে মহান তাবেয়ী ত্বউস ইবনে কায়সান।
আমি 'বায়তুল হিকমাহ'র নীরব কক্ষে বসেছি জ্ঞান সাধনায়,
আমি কায়রোর মসজিদে জায়নামাজ বিছিয়ে প্রভুর আরাধনায়।
আমি দিল্লির 'রহিমিয়া', বাগদাদের 'নিজামিয়া',
আমি ভারতমনীষা আবুল হাসান আলী মিয়া।
আমি দিল্লির কুতুবমিনারে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দেই আজান,
আমি হেমস থেকে হিত্তিনের পথে উড়িয়ে যাই বিজয় নিশান।
আমি আবুল ফজলের তোষামোদ নই, আমি সিরহিন্দীর সাহসী উচ্চারণ,
আমি গোয়ালিয়র, আন্দামান, মাল্টা আর রেঙ্গুনে বীর মুজাহিদের কারাবরণ।
আমি আইয়ুবির 'সৈন্যবাহিনী', বলবনের 'ন্যায়পরায়ণতা '
আমি পরাধীনতার কালো আকাশে এক চিলতে স্বাধীনতা।
আমি সাদির 'গুলিস্তা', রুমির 'মসনবি' আর ফেরদৌসির 'শাহনামা',
আমি আব্দুল আজিজের সাহসী খুতবা, মাথায় বাধা আমামা।
আমি ইবনে তাইমিয়ার 'জিহাদি ফতোয়া', ইসমাইল শহীদের 'বালাকোটি চেতনা',
চে, লেনিন, মাও কিংবা ফিদেল নয়, সাইয়েদ আহমদ আমায় দেয় প্রেরণা।
আমি দজলা থেকে আমু দরিয়া, সেনাবাহিনী আগুয়ান,
আমি গাদ্দার 'আলকামা' নই, গোয়েন্দা 'আলী বিন সুফিয়ান'।
আমি নিজামুদ্দিনের খানকাহে যাই তাসাউফের সন্ধানে,
গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদ ধ্বসে পড়ে, শাহ জালালের আজানে।
আমি তুঘলকের দরবারে কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ারের কণ্ঠ , 'আল আযমাতু লিল্লাহ',
আমি উবাইদুল্লাহ আহরারের সামনে বসা মহান সাধক 'খাজা বাকী বিল্লাহ'।
আমি আরব থেকে সিন্ধু এসেছি, মুসলিম বোনের আর্তনাদে,
রাজা দাহিরের প্রাসাদ কাপিয়েছি, 'আল্লাহু আকবার' নিনাদে।
আমি শিহাবুদ্দিন ঘুরির বাহিনী, পৃথ্বিরাজের সাথে লড়াই,

আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, কখনো করিনি বড়াই।
আমি গজনী থেকে সোমনাথ, সুলতান মাহমুদের বাহিনী,
আমি ইখতিয়ারউদ্দিনের হাতে, নদীয়া বিজয়ের কাহিনী।
আমি জ্ঞানের মশাল জ্বালি, দূর করি অজ্ঞতার আঁধার,
আমি 'রুহবানুন ফিল লাইল, ওয়া ফুরসানুন ফিন নাহার'।
আমি ওয়ালিউল্লাহর হাদিসের সনদ,শাহ জাফরের কবিতা,
ষড়যন্ত্র কিংবা গাদ্দারী নয়, আমার অস্ত্র সরলতা ।
আমি ফজলে হক খয়রাবাদী, কাফনের কাপড়ে লিখি আজাদির ইতিহাস,
আমি দেওবন্দ, নদওয়া আর সাহারানপুরে হাদিস পড়ি বারোমাস।
আমি 'ঝড়োকা বারান্দা'য় দাঁড়িয়ে স্বাধীন সূর্য দেখি,
আমি 'রেশমি রুমালে' হাজারো গোপন বার্তা লেখি।
আমি ইলিয়াসের 'তাবলিগি মেহনত', থানভির 'তাজকিয়া',
আমি মাদানির 'জিহাদ', গাংগুহির 'ফতোয়ায়ে রশিদিয়া'।
আমি ইলমের পাহারাদার, নজর রাখি সবার উপর,
বিদাত কিংবা ইলহাদ, ঢুকতে দিই না দ্বীনের ভেতর।